নব্যভারত

অষ্টাদশ খণ্ড।

১৩০৭

অনন্ত সংগ্রাম।

১৩০৬ সাল অতীত হইয়াছে, কিন্তু ... একটী মহাশিক্ষা রাখিয়া ... শিক্ষা এই—জীবন-সংগ্রামে ...

... আমি জীবিত ...

... স্বাধীন হইবে ... ১৩০৬ ...

[illegible] ... সহ্য হয় না। [illegible]

[illegible] চুরি, সকল, [illegible]
[illegible] সেই [illegible]

[illegible] অনেক টাকা, তাহার
[illegible] কম, কিন্তু অভাবের [illegible],
[illegible] তাহার, [illegible] হয়, [illegible]
তাহার ঘরে হয়ত পুত্র কন্যা [illegible]
[illegible], মৃত্যু অপহরণ করি-
[illegible] পরিবার হয়ত তেমন [illegible]
[illegible] পারে না। অথবা
[illegible] বন্ধু এবং আত্মীয়েরা সকলেই কেবল
[illegible] টাকা [illegible] নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসে না।
[illegible] পাছে তার টাকা যায়,

[illegible] টাকা নাই, [illegible]
[illegible] জন্য চিন্তা চিন্তিত
[illegible] ভোগী
[illegible] যে বিবাহ
[illegible] পরই
[illegible] একটী কন্যা
[illegible] করিতেছে।
[illegible] কথা
[illegible] অথবা তিনি
[illegible] একটী
[illegible] দিগের
[illegible] আর
[illegible] ঘরে,
[illegible] উঁকি
[illegible] আছে,
[illegible] আমা

[illegible]

একদা এক [illegible] ব্যক্তির [illegible]
[illegible] দেখিলে, সকলেই বলিবে, [illegible]
"না, সুখ শান্তি কিছুই জীবনে পাইলাম
না। ঘুরিলাম, খাটিলাম, বিষম সংগ্রাম
করিলাম, কিন্তু কিছুতেই শান্তি পাইলাম
না। দুঃখ-দরিয়ায় ভাসাইবার জন্যই বুঝি
বিধাতার এই [illegible]।"

মানবজীবন মহা সমস্যাময়। মহাসমস্যা-
ময় নয়, মহা সংগ্রামময়। জন্ম হইতে মৃত্যু
পর্যন্ত দিবারাত্রি মানুষকে সংগ্রাম করিতে
হইতেছে। কেন, কিসের জন্য এই সংগ্রাম,
মানুষ তাহা জানে না। কোথা হইতে মানুষ
আসিয়াছে, জানে না; কোথায় [illegible]
জানে না,—আদি এবং [illegible]
কিছুই মানুষ জানেনা। দিবারাত্রি [illegible]
ভূতের বেগার খাটিতেছে। কিসের [illegible]
[illegible]? যাহাদের জন্য রক্ত জল করি-
তেছি, তাহারাও ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাই-
তেছে। লোকে সুখের জন্য ঘর বাঁধিতেছে,
সে ঘর ঝড়ে পড়িতেছে, আগুনে পুড়িয়া
যাইতেছে! আবার আশা, আবার [illegible]
ভয়। ক্রমাগত আশার নিরাশা। [illegible]
জন্য মানুষ এত [illegible] জীবন [illegible]
মহা প্রহেলিকাময়।

কেহ কেহ বলেন, সব মানুষ যদি [illegible]
হইত, তবে এই সংসারে এত দুঃখ [illegible]
থাকিত না। স্বার্থ, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, [illegible]
বঞ্চনা, হিংসা, বিদ্বেষ—এ সকল যদি [illegible]
থাকিত, মানুষ সকলে যদি [illegible]
[illegible] জন্য [illegible] হইত, তবে [illegible]
[illegible] থাকিত [illegible]
[illegible] এই [illegible]

অষ্টাদশ খণ্ড নব্যভারতের সূচী পত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

[illegible] জন্য সাধারণের সম্পত্তি প্রতিষ্ঠায় [illegible]। একজন যে অভাব দূর করিতে পারে না, দশের সাহায্য পাইলে অনায়াসে তাহা পূরণ হইতে পারে। তাহারা [illegible], সহানুভূতির অভাবে এই পৃথিবী মরুভূমির ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। দুঃখ দারিদ্র্য, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। এ কথায় কতক সত্য থাকিলে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সহানুভূতি দিন দিন এজগতে এত দুষ্প্রাপ্য হইতেছে কেন? মানব-প্রেম, দিন দিন মানব-বক্ষ হইতে তিরোহিত হইতেছে কেন? পরার্থের স্থানে স্বার্থচিন্তা দিন দিন [illegible] অন্তরে বদ্ধমূল হইতেছে কেন? [illegible] ভাল, অন্যের সহ্য হয় না কেন? একজন কে অপদস্থ করিতে অনেে দলবদ্ধ হয় কেন? এত দলাদলি, মারামারি, রক্তারক্তি কেন? তুমি বাল্যকাল হইতে একজনকে প্রতিপালন করিয়াছ, বুকের রক্ত জল করিয়া মানুষ করিয়াছ; ভাবিয়াছিলে, বার্দ্ধক্যে সে তোমাকে দুঃখ দারিদ্র্যের কষাঘাত হইতে রক্ষা করিবে; কিন্তু হায়, সে স্বাধীন হইয়াই তোমার বুকেই অস্ত্রে [illegible]বিদ্ধ করিবার জন্য ব্যস্ত। কেন [illegible]? তুমি যাহার উপকারের জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলে, আজ সে-ই তোমার সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর! যাহার নিকট যত আশা, সেইখানে তত নিরাশা!! কেন এরূপ হইল? কৃতজ্ঞতা কোথায়? এ জগতে আর কি রামের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার আশা আছে? কমুনিষ্ট, সোসিয়া[illegible] আশা কি কখনও পূর্ণ হইবে? [illegible] পৃথক পৃথক হইবার জন্যই [illegible]। এ পৃথিবী যেন [illegible] [illegible] কোথায়? [illegible]

[illegible], বাস্তবের [illegible] অতি দূর। [illegible] মানুষকে সহ্য করিতে হইতেছে, [illegible] ইতিহাস লিখিতে পারে?

আশার দ্বারেই নিরাশা। [illegible] সহা পিপাসা ছিল, ধার্ম্মিক হইব। [illegible] চেষ্টা, কত সাধনা করিলাম; [illegible] দিন দিন যেন পশু। বাল্যকালে [illegible] পিপাসা বড় প্রবল ছিল, যেরূপে হয়, [illegible] উপার্জ্জন করিব, আশা ছিল; এখন জীবনের শেষ অঙ্কে পৌঁছিয়া দেখিতেছি, দিন দিন যেন সহা মূর্খ হইতেছি। [illegible] এত চেষ্টা, সব যেন পণ্ড হইয়া গিয়াছে। বাল্যকালে আশা করিতাম, আর কিছু না পারি, মানুষকে হৃদয় ঢালিয়া ভালবাসিব, বুকের রক্ত দিয়া মানুষের সেবা করিব। এখন ঠেকিয়া, শিখিয়া, মানব-ঘৃণার [illegible] পরিচারণা করিবার জন্য যেন [illegible] হইতেছি! একজন বন্ধু বলেন—"তোমাকে নিদানখ্যোপ হইতেই হইবে, [illegible] নয় কাল।" আমি মহাদর্পে বলিয়াছিলাম "কখনই না, বিধাতা নিশ্চয় আমাকে [illegible] করিবেন।" কিন্তু এখন অন্তরে [illegible] করিয়া দেখিতেছি, হায়, কোন [illegible] আছি? প্রতারিত হইয়া হইয়া এখন [illegible] মানব-ঘৃণা নরকেই আমার গতি হইবে? বিধাতাকে সভয়ে ডাকিতেছি এবং [illegible] করিতে বলিতেছি। কিন্তু মনের গতি [illegible] কই? গতি চলিয়াছে, অবিরাম [illegible] প্রাণে! [illegible] সংগ্রাম [illegible]!

এইরূপ অনেক কথা এবং [illegible] [illegible] কথা [illegible] [illegible] কথা—আশা এবং নিরাশা [illegible] সংগ্রাম। [illegible]

[illegible] বিরুদ্ধে ও বিরাম নাই [illegible] অনন্ত [illegible] অবসান হইবে [illegible] ইহা সম্ভবও মনে হয় না [illegible] অনুভব করিতেছি, কিন্তু [illegible] প্রতিনিয়ত মহাসংগ্রাম [illegible] অপরাধিকে [illegible] স্বার্থে নিঃস্বার্থে, হিংসা [illegible] আশায় নিরাশায় প্রতিনিয়ত [illegible] শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, [illegible] হইবে।

অনন্তকাল অনন্ত সংগ্রাম। [illegible] মানুষ [illegible] অনন্ত আশায় [illegible] অনন্ত আশাই থাকেই অনন্ত [illegible] অনন্ত পিপাসা মানুষের [illegible] তাই যেন অনন্ত সংগ্রাম [illegible] ডুবিয়া জীবন [illegible] এই সংগ্রাম চলিবে কিন্তু [illegible] চলিবে কিনা, যে [illegible] হইতেছি প্রতিনিয়ত, হারিতেছি [illegible] আবার অগ্রসর হওয়ার [illegible] করিতেছি। পরিণাম [illegible] পারিত, কখনও একত্র করিত [illegible] মানুষ [illegible] আশার [illegible] স্থূলসূক্ষ্ম ক্ষুদ্র রাজা, [illegible] সময়ে থাকিয়া পরিণাম [illegible] ক্ষমতা ডুবিয়াছে শক্তি [illegible] আমাদেরও দশা [illegible] প্রতিনিয়ত [illegible] পরাজিত হইয়া [illegible] সংগ্রামময় [illegible] শান্তিময় সংগ্রামের [illegible]

[illegible] ১৩৪৯ সালে এই [illegible] অনন্ত [illegible] মত্ততা [illegible] অধীনতা থাকায় কমিতে আবকাশে না,— দুঃখের না, পাপের না, [illegible] না, শোকের না,—না, যে [illegible] করিতে [illegible] অতীত [illegible] সে নিরানিশি সংগ্রামে মত্ত। [illegible] বুঝাইবে না, সে তাহা বুঝিবে না, তুমি জ্ঞানী পণ্ডিত, তাহাকে গালাগালি দিলে কি হইবে, সে কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইবে না। এই জন্যে মহাসংগ্রামের মধ্যে মত্ততার [illegible] বাকে বেরিয়াছে। কেহ তাহা থামাইতে সমর্থ নয়।

বৎসরের পর বৎসর [illegible] নিরাশার অন্ধকারে ডুবিয়া মরিব মনে ভাবি, আর পারিব না, এইবার বুঝি [illegible] আবার যেন কে মাতাইয়া তোলে। [illegible] দেশের সেবা করিয়া [illegible] পাইয়াছে কি?—অপযশ, নিন্দা, [illegible] অবজ্ঞা—কত কি!! [illegible] আদর পাইয়া [illegible] সহানুভূতির অভাবে [illegible] আমার [illegible] যেন মরুভূমি হইয়া [illegible] সময়ে সময়ে [illegible] পাইয়া ভাবিয়াছি, আমাদের [illegible] লইয়া কেন এই মাতৃসেবারূপ পবিত্র [illegible] যাইবার চেষ্টা পাইতেছি? কেন [illegible] মজিতেছি? আমরা কি মাতৃসেবার [illegible] আসক্তি নাই, পাণ্ডিত্য নাই, [illegible] নাই, নিঃস্বার্থতা নাই, [illegible] নাই, [illegible] নাই, [illegible] এই [illegible]

[illegible] মানুষ [illegible] কেন [illegible] করিলা সেদিকে [illegible] হই। [illegible] শরীরের রক্ত জল করিয়া [illegible] [illegible]—[illegible] বৎসর [illegible] অর্থাভাবে নিষ্পেষিত হইয়া পত্রের উপর পত্র [illegible] লিখিলাম, কত আতঙ্কে পায়ে ধরিলাম, কিন্তু তেমন কিছু পাইলাম না। কতজন নীরবে কাগজগুলি আত্মসাৎ করিলেন। সহানুভূতি পাইলাম যদি শতকরা ২০ জনের, গালাগালি পাইলাম [illegible] জনের। তাঁহাদের মতের [illegible] যেন প্রবন্ধ ছাপাইব না। এরূপ পরাধীনতায় কর্ণপাত [illegible] দিয়া চিরকাল কাগজ পাঠাইতে রত থাকি নাই, আমাদের [illegible] [illegible] চাওয়া [illegible] বেয়াদবি। [illegible] টাকা দিতেও বাধ্য নন। [illegible] [illegible] বাধ্য নন। * জাতীয় ভাব [illegible] সকলের সাহায্য চাওয়া [illegible] সহানুভূতি পাইব, ভালবাসা পাইব [illegible] পাইব, এইরূপ আশা করাই [illegible] এই রূপ আশা যে করে, সে কি মানুষ? তাহার দ্বারা কি জগতের কোন কাজ হইতে পারে, এই চিন্তা এখন সমুপস্থিত। যে ক্ষেত্রে সহানুভূতি ও অর্থাভাবে [illegible] [illegible] গেল, [illegible] গেল [illegible] [illegible] গেল, [illegible] গেল, [illegible] সম্পাদক ও [illegible] হইল, [illegible] ক্ষেত্রে শক্তিহীন আমাদের দ্বারা কি

[illegible] পাইবার আশা [illegible] ভাবে প্রয়োগ করে। [illegible] বিফলতা [illegible] [illegible] করে, [illegible] সহানুভূতি [illegible] লোকেরা মনে করেন [illegible] ভিন্ন দেশের উন্নতি [illegible]। [illegible] সম্মিলন সহানুভূতি উদ্দীপনের [illegible] চেষ্টা [illegible] করুন, এই [illegible] তাহা হইবে না। [illegible] দেশের [illegible] তাহার আদর বাড়িবে না। কিন্তু এই [illegible]

[illegible]

তখন অনাযাসেই [illegible] যেন [illegible] হইয়া যায়। আদর পাইয়া [illegible] সকলেই, আদর না পাইয়া [illegible] পারিলেই ত রক্ষা। যে আমাকে চায় [illegible] আমি তাহার হইতে পারিলেই [illegible] [illegible] পারি। [illegible] দিন [illegible] এইরূপ কথা বলিতেছি। কিন্তু প্রত্যাশা না রাখিয়া জীবন [illegible] কর—কে যেন কেবল এই [illegible] আমাদের প্রতি [illegible]

[illegible]

* [illegible] এইরূপ অবস্থা, বোধ হয়, এদেশের অনেক [illegible] ঐতিহাসিক লেকি বলেন—"Somehow [illegible] though agitation is every day [illegible] charity is continually shrin[king] within narrower and narrower limits. [illegible] The legitimate sphere of [illegible] [illegible] should be not that [illegible] [illegible] on [illegible], but that [illegible] [illegible]

[illegible] কি. ইহা [illegible] আজ [illegible] এবং [illegible] জনের জন্য অপেক্ষা করি-[illegible] সেইরূপ [illegible] যেমন স্বাধীনতার [illegible] দেহ-বিসর্জ্জনের জন্য অপেক্ষা [illegible], আজ উৎসর্গ-মঞ্চে দাঁড়াইয়া [illegible] তেমনি অপেক্ষা করিতেছেন। [illegible] সকলেই, কিন্তু স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য [illegible] মারিবে কে? বিধাতার আদেশ, [illegible] ব্রত পরিত্যাগ করিবার [illegible] নাই। সেনাপতির আদেশ, সংগ্রাম-[illegible] পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই।

নিজ ইচ্ছা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, সেনা-পতির হাতে পুত্তলিকাবৎ আমরা নাচি এবং খেলি। মহা মত্ততা দেখিয়া জগৎ হাসুক, আমরা মায়ের সন্তান, [illegible] স্বাধীনতার সংগ্রামে জয়ী হইয়া মাতৃ ক্রোড়ে উঠিয়া যাই। মা আনন্দময়ী আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। অভাব আছে, তাহা থাকুক, নিঃসম্বল ব্যক্তি কেবল মাতৃ কৃপা-সম্বলে মাভৈঃ মাভৈঃ রবে জীবন-সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ মন্ত্রে দীক্ষিত হউক। মা আনন্দময়ীর লীলা-রহস্যের জয় হউক।

পূজ্যপাদ ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উক্তি।

একজন [illegible] জীবতত্ত্ব জানিতে চাহিলে [illegible] বলিলেন,—এই শরীর আমি [illegible] ইহার মধ্যে একজন আছে, যে [illegible] বলে ইত্যাদি। যদি এই শরীরই সব [illegible], তবে মৃত মানুষ কেন শুনে না, দেখে না, কথা বলে না? অতএব এই দেহের মধ্যে দেহ ব্যতিরিক্ত একজন আছেন, তিনিই আত্মা। দেহ তিন প্রকার, স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম দেহ ও কারণ দেহ। স্থূলদেহ চক্ষে দেখা যায়, সূক্ষ্ম দেহ চক্ষে দেখা যায় না। গুটী পোকা যেমন কোষ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে আবদ্ধ হয়, আত্মাও তেমনি পঞ্চকোষ মধ্যে বদ্ধাবস্থায় আছেন। গুটীপোকা একটী কোষ মধ্যে আবদ্ধ থাকে; আত্মা [illegible] পঞ্চকোষ মধ্যে আবদ্ধ। ১ম অন্নময় কোষ, ২য় প্রাণময় কোষ, ৩য় মনো-ময় কোষ, ৪র্থ বিজ্ঞানময় কোষ, ৫ম আনন্দ-ময় কোষ। [illegible] আনন্দময় কোষে আসিলে, [illegible] হইতে [illegible], কোথা [illegible] [illegible] আর উপস্থিত [illegible] অবস্থায় আনন্দ [illegible]

এই পর্য্যন্ত বদ্ধাবস্থা। আত্মা পঞ্চকোষে যতক্ষণ আবদ্ধ, ততক্ষণ জীবাত্মা নামে থাকে। এই অবস্থায়, কখন সুখ, কখন দুঃখ। পঞ্চকোষ [illegible] ভেদ হইলে তখন উঁহাকে আত্মা [illegible]। ইহার পরও আত্মার বাসনা থাকে, সেই বাসনা পূর্ণ করিতে দেহ ধারণ করেন। কেহ স্থূল দেহ ধারণ করিয়া বাসনা ভোগ করেন, কেহ বা আতিবাহিক দেহে বাসনা ভোগ করেন। ইহারা (পরবর্ত্তীরা) জননী জঠরে প্রবেশ করেন না, ইচ্ছা [illegible] একটী দেহ অবলম্বন করেন, ইহাকে আতি-বাহিক দেহ বলে। বাসনান্তে আত্মা মুক্ত হয়, মুক্তির পর আর কোন ক্লেশ থাকে না, সত্য লোক, ব্রহ্মলোক, [illegible] প্রভৃতি স্থানে তখন মুক্তাত্মা বিহার করেন। ভগবান জীবের মঙ্গলের [illegible] অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহাকে [illegible] [illegible] আপনাদের [illegible] তিনি [illegible] অবতার। অবতার [illegible] তিনি ভগবান, [illegible]

[illegible] এই জন্য তিনি মাতৃত্বে হস্ত হইয়া [illegible]দেব মধ্যে আছেন, মানুষের মত খান [illegible], [illegible] করেন, হাসেন, এবং মানুষের মন [illegible]। আপনি আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দেন। এক রাজা পুত্র কামনায় ছাগ বলি দিতেছিলেন, বুদ্ধদেব বাধা দিয়া বলিলেন, উহাকে কাটিও না, উহার পরিবর্ত্তে আমাকে কাট। ভগবান ও জীবে কিরূপ সম্বন্ধ, যেমন সূর্য্য ও তাঁহার কিরণে। সূর্য্য ও কিরণ একও নয় ও পৃথকও নয়। সমুদ্র ও তরঙ্গ কি বুদ্‌বুদ। সমুদ্র ও তরঙ্গ কি বুদ্‌বুদ একও নয় পৃথকও নয়। আপনাদের শাস্ত্রেও [illegible] আমাদের শাস্ত্রেও তাই। আবার [illegible]নের সময় হইয়াছে, এখন আর অপেক্ষা করিতে পারি না, ইহা অতিশয় বিস্তৃত বিষয়।

(এক [illegible] প্রতি) "সত্যবাদী হইবে। সত্য বাক্য বলিবে, সত্য চিন্তা করিবে, সত্য কার্য্য করিবে। অসার বৃথা কল্পনা করিবে না, [illegible] কথা শুনিবে না।

পরনিন্দা করিবে না, পরনিন্দা শুনিবে না, যেখানে পরনিন্দা হয়, সেখানে থাকিবে না।

জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমস্ত [illegible] সেবা করিবে। পিতা মাতাকে [illegible] দেবতা জ্ঞানে পূজা করিবে। স্ত্রীকে ভগবানের শক্তিরূপে, দেবীরূপে শ্রদ্ধা করিবে, [illegible] পোষণ করিবে, রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। [illegible] ব্যক্তি পত্নীকে সাক্ষাৎ দেবীরূপে না [illegible], তাহার গৃহের শান্তি ও মঙ্গল হয় না, স্ত্রীকে বিলাসের সামগ্রী কিম্বা দাসী বলিয়া মনে করিবে না।

[illegible] দক্ষ, [illegible] পক্ষী, [illegible] দয়া করিবে, [illegible]

অতিথি [illegible] মাস খান কিছু ভিক্ষা [illegible] শিক্ষে গুরু ও দেবতা [illegible] করিবে।

যে দিন ২৪ ঘণ্টা একটী [illegible] না হইয়া যায় চলিবে, সেদিনই [illegible] হইবে।

আমি সাধন করিয়াছি [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] না, কিন্তু হঠাৎ একদিন ঠিক হইয়া [illegible]

আমাদের [illegible] দের ধর্ম্ম। এই পথে ধর্ম্ম সম্বন্ধে [illegible] কিন্তু [illegible] করিয়া [illegible]

[illegible]

[illegible] দের প্রতি একবারও দৃষ্টি করেন না।

লোকেরা কোন কাজ করেনা, অথচ কেবল শক্তি চায়। তোমরা এক বৎসর বীর্য্য রক্ষা কর এবং মিথ্যা কথা বলিওনা, মিথ্যা কল্পনাও করিওনা, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমাদের বাক্য সিদ্ধ হইবে।" [illegible]

সত্য লাভ।

১

[illegible] কি করিবে দান,
[illegible] বালিকা,
[illegible] আমরা যে [illegible],
[illegible]
[illegible]।

[illegible]
[illegible] তোমার ?—

পড়িয়াছি বাঘ ছাল, শিরে [illegible]
গলায় রুদ্রাক্ষ মালা
কি [illegible] ?

৩

কি চাহিব—[illegible] আমার
[illegible]—[illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible]
[illegible]।

[illegible] ভরিয়া প্রভাতে

[illegible] খানি ধৌত করি বারে,

[illegible] সুখে মন খুলে

[illegible] সেই আনাথালয়ে

[illegible] বহে।

৫

মধ্যাহ্নে, [illegible] রবি-কর [illegible],

[illegible] বসি নিতম্বীর কক্ষে,

[illegible] আহারীয়ে, [illegible] কৃষা নিবারিতে

[illegible]

[illegible]

৬

[illegible] ছটা [illegible]

[illegible] শশধর,

[illegible] ভুলে থাকি সব তাপে,

[illegible] যায়

[illegible]

৭

[illegible] উপাদানে

[illegible] কিম্বা নদী-তীরে,

[illegible] পড়ি, সুখে সেই গঙ্গাগতি

[illegible] ভাব, মোরে

[illegible] ফুটিবে ?

[illegible]

[illegible] মেহারি নয়ন

[illegible] করুণ সম্ভাষ ;

[illegible] ফিরে, দিয়া অন্ন অতিথিরে,

[illegible] সাধ

[illegible] প্রিয়ার !"

৯

"হে দেব ! হে [illegible] বীর !

শ্রীচরণে প্রণতি আমার,

আমি [illegible] ধর্ম পরার্থে নিষ্কাম কর্ম,

আমি শুনিয়াছি, ত্যাগ

[illegible] নাম।

১০

[illegible] আমি এসেছি কেবল

[illegible] নিপুণা কত কতি,

[illegible] প্রতিমান,

[illegible] নহে

[illegible] চিরদিন।

১১

[illegible] সেবাতে মত্ত

[illegible] উপরে

তাতেই আনিবে হিয়া, উঠিবে [illegible]

আপনা ভুলিয়া যাব.

কি বলিব আর !

১২

কুশাঙ্কুরে ক্ষত ও চরণ

শোণিত ঝরিছে অবিরল,

হইয়া সদয় মতি, [illegible] অনুমতি,

আনিব শীতল জলে

ভিজাব অঞ্চল।

১৩

শুকায়ে গিয়াছে মুখ খানি,

অনুমানি কাতর ক্ষুধায়,

[illegible] ফল, [illegible] সুশীতল জল

ক্ষুধা তৃষা নাশ, করি

করুণা আমায়।"

১৪

[illegible] কথা শুনিয়া তবকি

তুমি মোরে করিবে প্রদান ?—

[illegible] সুখ [illegible] ভালবাসিয়া, তৃপ্ত হবে "দান" দিয়া

[illegible] বাসনা তব ?—

কোথা ভগবান্ !

১৫

কত শাস্ত্র শিখিয়াছি আমি,

জ্ঞান লাভে মিটিয়াছে আশা,

পড়েছি বেদান্ত তত্ত্ব [illegible] জপিয়াছি মহামন্ত্র

শিখিনি [illegible] সরল প্রাণে

[illegible] ভালবাসা।

১৬

জানিয়াছি পদার্থের কথা

"পরমম" হইনি কখন,

'সর্ব্ব জন আত্মতুল্য' বুঝিনি [illegible]

তুমিই শিখালে আজ

প্রথম, নূতন !

১৭

তুমি যে মা, মঙ্গলের [illegible]

তুমি যে মা, [illegible] মধুরতা,

শিখিনু তোমার কাছে, সংসারে [illegible]

[illegible] বিনা শূন্য সব,

[illegible]

[illegible]

বেদান্তদর্শন ও অদ্বৈতবাদ।*

উপক্রমণিকা।

১। বেদান্ত গ্রন্থ ও তাহাদের কাল নির্ণয়।

অদ্বৈতবাদকে দর্শনশাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত বলা যায়। সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র মন্থন করিয়া শঙ্করাচার্য্য এই অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই জন্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদকে 'শাঙ্কর দর্শন' বলে। (সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহ দ্রষ্টব্য) এই অদ্বৈতবাদ বুঝিবার পূর্ব্বে বেদান্ত শাস্ত্র কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইবে।

"বেদান্ত বলিলে, স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণাত্মক উপনিষদ ও তাহার অনুকূল শারীরিক সূত্রাদি বুঝায়।" (বেদান্ত সার, ২)। বেদের শেষাংশকেই বেদান্ত বলা যায়। "এই অর্থ প্রতিপাদক বেদাংশই উপনিষদ্।" উপনিষদ্, শারীরক সূত্র ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—বেদান্ত প্রতিপাদক এই তিন মূল গ্রন্থকে বেদান্তের তিন প্রস্থান বলে।

বেদের তিন অংশ। সংহিতা (বা মন্ত্র) ব্রাহ্মণ ও সূত্র। আরণ্যক—ব্রাহ্মণের অন্তর্গত, আর উপনিষদ্—এই আরণ্যকের অন্তর্গত। শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণের দশম খণ্ডে 'উপনিষদ' শব্দের প্রথম উল্লেখ আছে। (উপনিষদাম্ আদেশঃ)। উপনিষদ্ শব্দের মূল অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বেদান্তসারের বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী টীকায় লিখিত আছে যে "ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত ষদ্‌ধাতুর বিশরণ, গতি ও অবসাদন এই তিন অর্থ। এই তিন অর্থ হইতে উপনিষদের তিন অর্থ হইতে পারে:—(১) যাহা দ্বারা সংসারাসক্তি শিথিল হয়, অথবা (২) আত্মার দিকে যাহা হইতে গতি হয়, কিম্বা (৩) যাহা অজ্ঞানকে উন্মূলিত করে—তাহাই উপনিষদ্।" কেনোপনিষদের ৩২ শ্লোকে আছে;—

"উপনিষদং ভো ব্রহীত্যুক্তা ত উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদম্ ব্রূমেতি।" অর্থাৎ "উপনিষদ্ বলিতে বলিয়াছিলে, তোমাকে উপনিষদ্ বলা হইল, ব্রহ্ম বিষয়িণী উপনিষদ্ তোমাকে বলিলাম।" ইহা হইতে [illegible] যায় যে, উপনিষদ্ অর্থে ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র। মোক্ষমূলর বলেন, [illegible] বসিয়া যে উপদেশ [illegible] উপনিষদ্। অতএব উপনিষদ্ অর্থে [illegible] বা seances। এই শেষ অর্থ [illegible] বোধ হয় না।

ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব—বেদের এই চারি ভাগ। প্রত্যেক ভাগ আবার ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদ্ আছে। উপনিষদ্ গ্রন্থ অনেক গুলি। কেহ বলেন ৯০, কেহ বলেন ১২৩, কেহ বলেন ১৪৭। মহাবাক্য মুক্তাবলী ও মুক্তিকোপনিষদে উপনিষদের সংখ্যা ১২৩ বলা আছে। আজ পর্য্যন্ত প্রায় সার্দ্ধ দুইশত উপনিষদ পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক, ইহার মধ্যে ১০৮ খানি সমধিক প্রসিদ্ধ। পুরাতন উপনিষদ্ গুলি ঋক্ সাম

---

* পুস্তকাকারে যাহা প্রকাশ করিবার সংকল্প আছে, তাহা সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে খণ্ডশঃ প্রচার করা যুক্তিযুক্ত বা সুবিধাজনক নহে। তথাপি আমার বিশেষ শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু নব্যভারতের সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে ইহার কিয়দংশ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। লেঃ

[illegible] আর্য্যদিগের [illegible]
[illegible] করিয়াছেন। [illegible]
[illegible] উপনিষদ্ [illegible] প্রামাণ্য। সে উপনিষদ্ [illegible]
ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য,
তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক।

[illegible]
[illegible]

এই দশখানি উপনিষদ্ ব্যতীত কৌষী-তকি ও শ্বেতাশ্বতর, [illegible] উপনিষদ্‌ও প্রামাণ্য। এই দশ [illegible] উপনিষদ্ অবলম্বনেই বেদান্ত [illegible] কেন না, বেদান্ত [illegible] ভাষ্যকার [illegible] উপনিষদের উক্তি [illegible] হইয়াছে, এবং শঙ্করাচার্য্য তাঁহার [illegible] ভাষ্যে কেবল এই দশখানি উপনিষদের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, বেদান্ত [illegible] রচনা কালে কেবল উল্লিখিত [illegible] উপনিষদ্‌ই প্রচলিত ও প্রামাণ্য ছিল। [illegible] শঙ্করাচার্য্যের সময়েও কেবল ঐ দশ [illegible] উপনিষদ্ প্রামাণ্য [illegible] ছিল। [illegible] উপনিষদ্ মধ্যে ঐতরেয় [illegible] ঋগ্বেদের অন্তর্গত; ছান্দোগ্য [illegible] উপনিষদ্ সামবেদের অন্তর্গত; তৈত্তিরীয়, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ কৃষ্ণ যজুর্বেদের; বৃহদারণ্যক ও ঈশোপনিষদ্ শুক্ল যজুর্বেদের অন্তর্গত [illegible] উপনিষদ্ অথর্ববেদের অন্তর্গত [illegible]
[illegible] উপনিষদ্ [illegible]
[illegible]

অনাদি, এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করিয়া [illegible] না পারেন। [illegible] উপদেশ [illegible] নিষদ্ [illegible] প্রথম প্রচার করিলেন, তখন [illegible] প্রচারই উপনিষদের প্রথম রচনা কাল [illegible] যায়। যাহা হউক, উপনিষদের কাল নির্ণয়ের কোন প্রকার উপায় আছে বলিয়া বোধ হয় না। [illegible] ব্রাহ্মণ ভাগের সময়ে যে কয়খানি উপনিষদ্ প্রচলিত ছিল, [illegible] যে গুলি কবে প্রথম প্রচারিত হয়, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। প্রাচীন উপনিষদ্ মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বিশেষ প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। এই ছান্দোগ্য উপনিষদ্ মধ্যে দেবকী পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, ঘোর ঋষির নিকটে শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন, এই কথার উল্লেখ আছে। (১) [illegible] প্রভৃতি উপনিষদেও ঠিক এই রূপ কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে, পাণ্ডবদিগের [illegible] সময়ে অথবা তাহার অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী সময়ে প্রাচীনতম উপনিষদ্ গুলি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, ছান্দোগ্য উপনিষদে [illegible] কৃষ্ণের [illegible] উল্লেখ আছে [illegible] 'কৌষীতকি' 'অস্ত্র কৃষ্ণের' উল্লেখ আছে [illegible] আছে। অতএব [illegible] কাল নির্ণয় করিতে পারিলে, উপনিষদের সময়ও [illegible] নির্ণীত হইতে পারে।

(১) [illegible]
[illegible]

[ব]্যাসের আবির্ভাব কাল নির্ণয় সম্বন্ধে [মতভে]দ আছে। দ্বৈপায়ন ব্যাস কুরুক্ষেত্র [যুদ্ধ] কালে বর্ত্তমান ছিলেন। কুরুক্ষেত্র [যুদ্ধ] কলিযুগের আরম্ভে হইয়াছিল। রাজ-[তর]ঙ্গিনী প্রভৃতি গ্রন্থ মতে, কলিযুগ পাঁচ [সহস্]র বৎসর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। [বর্ত্ত]মান বর্ষের পঞ্জিকা অনুসারে কলি[য়ুগা]ব্দ ৫০০১), তাহা হইলে ব্যাসের, আবি-[র্ভা]বের কাল অনুমান পাঁচ সহস্র বৎসর [পূ]র্ব্বে ধরিয়া লওয়া যায়। *

শারীরক সূত্র বা উত্তর মীমাংসা দর্শন-বেদান্তের দ্বিতীয় গ্রন্থ। ইহাই প্রকৃত বেদান্ত দর্শন। বেদান্ত দর্শন প্রধানতঃ উপনিষদ ভিত্তির উপর স্থাপিত। কিন্তু ইহার অনেক সূত্রে স্মৃতির উল্লেখ আছে।

"স্মৃতে শ্চ" "অপি চ স্মর্য্যতে" (১) প্রভৃতি স্থলে, স্মৃতি অর্থে যে ভগবদ্গীতা, তাহা শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মহাভারতে শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতাকে উপনিষদ্ বলা হইয়াছে বটে, [illegible] বলিয়া, ইহাকে [illegible]

[illegible]

[illegible] ত উল্লেখ ও খণ্ডন আছে। বেদান্ত [illegible] জৈমিনি (২) উড়ুলোমি(৩)কাষ্ণাজিনি [আ]শ্মরথ্য (৫) বাদরি (৬) ও বাদরায়ণের

* এই উপনিষদের কাল নির্ণয় উপলক্ষে বেদের [কা]ল নির্ণয় সম্বন্ধে দুই একটী কথা এস্থলে বলা [প্রয়ো]জন। 'ঋগ্বেদ' সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, [illegible] [আ]ধুনিক পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত। ব্যাস, বেদের [illegible] [ক]রি, সুতরাং ব্যাসের সময়ে তাঁহার সংগৃহী[ত] [illegible] [বি]ভাগ বিদ্যমান ছিল। ব্যাসের কাল [illegible] [বৎস]র পূর্ব্বে ধরিলে বেদ তদপেক্ষা পুরাতন [illegible] [প্রতি]পন্ন হইবে। পণ্ডিতবর তিলক, ঋগ্বেদো[ল্লিখিত] [নক্ষ]ত্র বিশেষের সংস্থান হইতে গণনা করিয়া, [illegible] [ক]রিয়াছেন যে, বেদ খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর পূ[র্ব্বে র]চিত। পণ্ডিত যেকবি (Jacobi) বলেন, উহা খ্রী[ঃ পূ]ঃ ৪০০০ বৎসর রচিত। মোক্ষমূলর প্রমুখ পণ্ডি[তগণ] [ব]াইবেলের কাল নির্ণয় অক্ষুন্ন রাখিতে গি[য়া বলে]ন—বেদ খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। [মো]ক্ষমূলর বলিয়াছেন :—

"If Mr. Tilak in a very learned work [la]tely published claims 6000 B. C, as the [v]ery latest date of vedic literature, if Professor Jacobi insists on 4000 B. C. [a]s the last concession that can be made [I] still keep to the date which I originally [c]laim for the hymns of the Rig Veda Viz, 1200 B. C. or 1500 B. S.

(Nineteenth Century. Sept. 1895).

জর্ম্মনির পণ্ডিত ওয়েবার (Weber) বেদকে আরও আধুনিক বলিতে চাহেন। তিনি বলেন, ঋগ্বেদ খ্রীঃ পূঃ ১২০০ সালে রচিত ধরিলেও ঐ অন্ত [বে]দগুলি খ্রীঃ পূঃ ৩।৪ শতাব্দীর অধিক পূর্ব্বে রচিত নহে।

ওয়েবার সাহেব বলেন, উপনিষদ গুলির মধ্যে কোন খানিই খ্রীঃ পূঃ তিন শত বর্ষের পূর্ব্বে রচিত নহে। দর্শনগুলিরও কোন খানি আজি হইতে ১৫০০ বৎসরের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই। ইঁহার অসার ও ভিত্তিহীন মতের সমালোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

(১) ১।২।৩, ১।৩।২৯, ২।১।৪৫, ৩।২।১৭, ৪।১।১০ বেদান্ত সূত্র।

(২) ১।২।২৮, ১।২।৩১, ১।৩।৩১, ১।৪।১৮, ৩।২।৪০, ৩।৪।২, ৩।৪।১৮, ৩।৪।৪০, ৪।৩।১২, ৪।৪।১০, ৪।৪।২১ সূত্র দ্রষ্টব্য।

(৩) ১।৪।২১, ৩।৪।৪৫, ৪।৪।৬ সূত্র দ্রষ্টব্য।

(৪) ৩।৪।১৯ সূত্র।

(৫) ১।২।২৯ সূত্র।

(৬) ১।২।৩০, ৩।১।১১, ৪।৩।৭, ৪।৪।১০ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৭) নাম ও তাঁহাদের অভিমত উল্লিখিত হইয়াছে।

এই শেষোক্ত বাদরায়ণ ব্যাসই বেদান্ত দর্শনের প্রবর্ত্তক। বেদান্তদর্শন কোন্ সময়ে রচিত এবং বাদরায়ণ ব্যাসই বা কে, এ কথা প্রথমেই মনে উদিত হইতে পারে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে,প্রচলিত দর্শন শাস্ত্রগুলি আধুনিক। সকল গুলিই পাণিনি সূত্রের পরে রচিত। এমন কি, খ্রীঃ অব্দ প্রচলিত হইবার দুই তিন শত বৎসর পরেই অধিকাংশ দর্শন শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। এই মত স্থাপনা করিবার জন্ত তাঁহারা যে সকল যুক্তি দেন, তাহার মধ্যে প্রধান এই যে, বেদের ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকে, দর্শনশাস্ত্র-প্রণেতা কোন ঋষির নামোল্লেখ নাই; সূত্রের কো..ন কোন স্থলে তাঁহাদের দুই চারি ..নের নাম আছে মাত্র; আর সমগ্র বেদ ও আধুনিক উপনিষদের উল্লেখও দর্শন মধ্যে পাওয়া যায়। ইহারা বলেন, সাংখ্য সর্ব্ব প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র, তবে বর্ত্তমান স.. প্রবচন সূত্র নিতান্ত আধুনিক,এমন কি .. বস্তঃ উহা বিজ্ঞানভিক্ষুর রচিত। ই.. আরও বলেন যে, পূর্ব্ব মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শনের পরে রচিত। আর যখন সকল দর্শনের কথাই বেদান্ত দর্শনে উল্লিখিত হইয়াছে, তখন বেদান্ত দর্শনই ইহাদের মধ্যে সর্ব্বশেষে রচিত। এই সকল পণ্ডিতেরা আরও বলেন যে, ব্রহ্ম সূত্র বা বেদান্ত দর্শন কোন কোন শ্রৌত সূত্রের পরে রচিত, কেন না উল্লিখিত জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিদের মধ্যে কাহারও কাহারও নাম শ্রৌতসূত্রে পাওয়া যায়। আশ্বরথ্যের নাম অশ্বালয়ন গৃহ্যসূত্রে উ.. খিত আছে। বাদরি, কার্ষ্ণাজিনি, কাশকৃ.. কাত্যায়ণ, আত্রেয় প্রভৃতির নাম তৈত্তির.. প্রতিশাখ্যে উল্লিখিত আছে। এই জ.. ওয়েবার প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগ.. বলেন যে, বেদান্ত দর্শন অনধিক ১৫০০ .. সর পূর্ব্বে রচিত (৮) এবং মহাভারতব.. কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ও ব্রহ্ম সূত্র প্রণেতা বাদ.. য়ণ এক ব্যক্তি নহেন।

এই সকল যুক্তি আমরা এস্থলে সংক্ষে.. সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

গীতা প্রভৃতি স্মৃতি ও সাংখ্য প্রভৃ.. দর্শন শাস্ত্রের উল্লেখ বেদান্তদর্শনে আছে বলিয়া, এই সকল শাস্ত্রের পরে যে বেদান্ত দর্শনের সূত্র সকল গ্রথিত হইয়াছিল, এক.. বলা যায় না।

এ বিষয় মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে আম.. মনে রাখা উচিত যে, যেমন বেদান্ত দর্শ.. গীতা ও অন্ত দর্শন শাস্ত্রের উল্লেখ আছে .. তমনই গীতাতে, ও অন্যান্য দর্শন শাস্ত্রে.. ..খ্য বেদান্ত দর্শনের উল্লেখ আছে। গীতার .. অধ্যায়ের ৪ শ্লোকে আছে 'ব্রহ্ম.. পদৈশ্চৈব'; ব্যাখ্যাকার রামানুজ, স্বামী .. আনন্দগিরি বলিয়াছেন যে, এই ব্রহ্মসূত্র..

(৭) ১।১।২৬, ১।৩।৩৩, ১।৪।৪১, ৩।৪।১, ৩।৪।৮, ৩।৪।১৯, ৪।১।১৪, ৪।৪।৭, ৪।৪।১২ সূত্র দ্রষ্টব্য।

(৮) জর্ম্মনি পণ্ডিত উইণ্ডিস্‌ম্যান শঙ্করবিজ.. গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ অনুসারে বাদরায়ণ পুত্র শুক গৌড়পাদের গুরু, গৌড়পা.. গোবিন্দ স্বামীর গুরু ছিলেন, আর শঙ্কর গোবিন্দ স্বামীর শিষ্য ছিলেন। এ কথা সত্য হইলে বাদরায়ণ শঙ্করাচার্য্যের ২।৩ শত বৎসর মাত্র পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এ যুক্তি নিরর্থক। শঙ্কর বিজ.. গ্রন্থের কাল্পনিক অংশ ঐতিহাসিক সত্য নহে। শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং বেদান্ত সূত্র ভাষ্যে বলিয়াছেন যে (৩।৩।৩২) ব্রহ্ম সূত্র প্রণেতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন দ্বাপ.. ও কলির সন্ধি স্থলে জীবিত ছিলেন।

পদই এই বেদান্তদর্শন। এইরূপ সাংখ্য প্রবচনে অন্যান্য দর্শন মধ্যেও বেদান্ত-দর্শনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পরে এ কথার আলোচনা করা যাইবে। তাহার পর বেদান্তদর্শন মহাভারত-রচয়িতা দ্বৈপায়ন ব্যাসের রচিত এইরূপ প্রবাদই পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে। রামানুজ তাঁহার কৃত শ্রীভাষ্যের প্রথমেই বলিয়াছেন, 'পারাশর্য্য বচঃ সুধা মুপনিষদ্দুগ্ধাব্ধি মধ্যোদ্ধৃতাং" সুতরাং তাঁহার মতে বেদান্তদর্শন পরাশর পুত্র ব্যাসেরই রচিত। বল্লভাচার্য্য অনু-ভাষ্যের প্রথমেই বলিয়াছেন, 'হরি [illegible] [illegible]ন্যো বিচারং চিকীর্ষুঃ' 'সর্ব্ববেদব্যাসক[illegible] বেদব্যাসেনাকৃতত্বাৎ'। পূর্ণপ্র[illegible]দর্শনে আছে 'ভগবান্নারায়ণো ব্যাসরূপে[illegible] ·········বেদম্ চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ··· [illegible] সূত্রা[illegible]য়ার'। স্কন্দপুরাণে [illegible] অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং [illegible] ···চকার ব্রহ্মসূত্রানি।' শঙ্করাচার্য্য[illegible] বলিয়াছেন। সুতরাং বেদব্যাস [illegible]দান্তদর্শন রচয়িতা, সে বিষয়ে এ দেশ[illegible] [illegible]ন পণ্ডিতের সংশয় নাই। পণ্ডিত মোক্ষ[illegible]র-প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, [illegible]ক্ষসূত্র রচয়িতা বাদরায়ণ ব্যাস ও মহা-[illegible]রত-রচয়িতা বেদব্যাস একব্যক্তি নহেন। [illegible]দরায়ণ ব্যাস ৪০০ খ্রীঃ অব্দে অর্থাৎ প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। (১) সুতরাং মোক্ষ মূলারের মতে [illegible]বদান্ত দর্শন ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। মোক্ষমূলরের এরূপ কথার কোন ভিত্তি

আছে এরূপ বোধ হয় না। [illegible] বদরিকা-আশ্রমে থাকিতেন বলিয়া তাঁ[illegible] বাদরায়ণ বলা হইত। আর দ্বীপে জন্ম ব[illegible] তাঁহার অন্য নাম ছিল দ্বৈপায়ন। কৃষ্ণ তাঁহ[illegible] মূল নাম বা বর্ণজনিত বিশেষণ হইতে পারে।

যাহা হউক, বাদরায়ণ ব্যাস যে বেদান্ত-দর্শন রচয়িতা, তাহা আমাদের দেশে প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মত। তবে বেদান্তদর্শনের অনেকগুলি সূত্রে বাদরায়ণ ও বাদরির উল্লেখ আছে বলিয়া কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে বোধ হয় যে ইঁহারা ও বেদান্তসূত্র-প্রণেতা [illegible] এক ব্যক্তি নহেন। উক্ত বাদরায়ণ [illegible]

[illegible] বা পরবর্ত্তীসূত্রে জৈমিনির নামো-[illegible]। সুতরাং অনুমান হয়, জৈমিনি [illegible]দরায়ণ সমসাময়িক ও পরস্পর কতকটা প্রতিদ্বন্দ্বী মত স্থাপয়িতা ছিলেন। অর্থাৎ [illegible]দের উভয়ের মত প্রচলিত হইয়াছিল। [illegible]ভারতে পাওয়া যায় যে, এই জৈমিনী [illegible]ব্যাসের শিষ্য।

"বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারত পঞ্চমান্
সুমন্তং জৈমিনিং পৈলং শুকঞ্চৈব স্বমাত্মজম্।
প্রভুর্বরিষ্ঠো বরদো বৈশম্পায়নমেবচ
সংহিতাস্তৈঃ পৃথক্ত্বেন ভারতস্য প্রকাশিতা॥
আদিপর্ব্ব ৬৩ অধ্যায় ৮৫-৮৬ শ্লোক।

(১) Max Muller's Vedant Philosophy [illegible]ote at p. 39. জর্ম্মন পণ্ডিত Weber সাহেবও [illegible]রূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন:—Weber's [illegible]dian Literature p. 243 দ্রষ্টব্য।

* সামবেদের কোন ব্রাহ্মণে পারশার্য্যায়ণের শিষ্য এক বাদরায়ণের নাম আছে। ইনি তাণ্ড্য ও কাত্যায়নির গুরু। শাণ্ডিল্য সূত্রেও ইঁহার নাম আছে। কিন্তু ইঁহাকে কেহ বেদান্তদর্শন রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করেন নাই; সুতরাং বেদান্তদর্শন প্রণেতা ব্যাস বাদরায়ণ ও এই বাদরায়ণ এক নহেন।

হইতে বুঝা যায় যে, বেদব্যাসের
জৈমিনি বেদ ও মহাভারত শিক্ষা
াছিলেন। জৈমিনী স্বয়ং এক মহাভারত
া করেন। তাহার নাম জৈমিনিভারত।
এক্ষণে লুপ্তপ্রায়। ইহা ব্যতীত জৈমিনি
পূর্ব্ব মীমাংসাদর্শন প্রণয়ন করেন। সুতরাং
জৈমিনি বেদব্যাসের একজন কৃতীশিষ্য।
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ তৎ
প্রকাশিত বেদান্ত সূত্রের ভাষা ভাষ্য ভূমি-
কায় বলিয়াছেন, "মহামুনি জৈমিনি কর্ম্মী-
দিগের নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদভাগের
ও তদীয় গুরু বাদরায়ণ ব্যাস মুমুক্ষুদিগের
উৎকৃষ্ট মীমাংসা নিবন্ধন প্রস্তুত করিয়া
জগতের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন।" *

ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে,বেদান্ত
দর্শনের উল্লিখিত বাদরায়ণ ও জৈমিনি
ক্ত বেদব্যাস ও জৈমিনি ভিন্ন আর কেহ
নহে। তাহা হইলে,এই সন্দেহ হয় যে,বেদান্ত-
সূত্রকার যিনিই হউন, তিনি এই বাদরা-
য়ণ হইতে পারেন না। কেন না যিনি
মূল সূত্র রচনা করিতেছেন, তিনি
"তদুপর্য্যাপি বাদরায়ণ সম্ভবাৎ", "ভা
বাদরায়ণোঽস্তি হি" প্রভৃতি সূত্র স্বয়ং রচনা
করিবেন? আরও একটী কথা এস্থলে স্ম
করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে,বে
সূত্রে অনেক স্থলে ভগবদ্গীতার উ
আছে। অন্যদিকে তেমনি ভগবদ্গীতাতে
বেদান্তসূত্রের উল্লেখ আছে। সুতরাং ভগবদ্-
গীতায় যে বেদান্তসূত্রের উল্লেখ আছে,এখন-
কার প্রচলিত বেদান্তদর্শন ঠিক সেই বেদান্ত
সূত্র হইতে পারে না।

এখন কথা হইতেছে, এই গোলযোগের
কোন মীমাংসা হইতে পারে কিনা? বেদান্ত
সূত্রের ব্যাখ্যাকারগণ ইহার একরূপ মীমাং-
সার চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে
কোন কোন টীকাকারের মতে বেদান্ত-
সূত্রোক্ত বাদরায়ণ বা বাদরি বেদান্তদর্শন
প্রণেতা বেদব্যাস নহেন। গীতার টীকা-
কার মধুসূদন বলিয়াছেন, গীতায় যে
ব্রহ্মসূত্র পদের উল্লেখ আছে, তাহা উপ-
নিষদ্,বেদান্তসূত্র নহে। এ মীমাংসায় সকলে
সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না।

ইহার আরএকরূপ মীমাংসাও করা যাইতে
পারে। বাদরায়ণ বা বেদব্যাস প্রথমে বেদান্ত
সূত্র তাঁহার শিষ্যদিগকে শিক্ষা দেন। তখন
শিক্ষা মুখে মুখে চলিত। শ্রুতি প্রভৃতি লিখিয়া
রাখা তখন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ছিল। গুরুর নিকট
শিষ্য সেই সকল উপদেশ মনে করিয়া
রাখিত। সূত্রগুলি এইরূপে মুখে
গুরু পরম্পরা চলিয়া আসিত। পরে কোন
কৃতীশিষ্য সেই সকল সূত্রগুলি একত্র বিধি-
করিয়া লইয়াছেন। (১) পূর্ব্বকা
রীতি প্রচলিত ছিল। গ্রীসদেশে
ধান দার্শনিক সক্রেতিস্ কোন পুস্ত
চনা করেন নাই। তাঁহার শিষ্য প্লেতো
প্রভৃতিই সক্রেতিসের উপদেশ বিধিব

* এইরূপে গ্রীক দেশে পূর্ব্বকালে প্লেতো-
শিষ্য অরিষ্টতেল বিভিন্ন মত প্রচার করিয়াছিলেন।

(১) আবার একথাও বলা যাইতে পারে যে, বেদ
ব্যাস সম্বন্ধে তাঁহার কোন কৃতশিষ্য এই সকল সূত্র
প্রথম লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্ত্তী শিষ্যগণ কর্ত্তৃক
তাহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছিল। পণ্ডিত
ওয়েবার (Weber) কতক এইরূপ অনুমান করেন
তিনি বলিয়াছেন "Still it is uncertain whether its polemics (of Vedanta Darsana) directed against these systems in the form which they are now extant or against the original tenets. * * Each sutras citing its own reputed author show that they were composed by their respective School."

এই রূপ পূর্ব্ব মীমাংসায়ও জৈমিনির নাম
পাওয়া যায়।

করেন—সেই সময়েই ভূমিকম্প উপস্থিত হ। কিন্তু এবার তাহার বিপরীত ঘটিল। এবার আদি ব্রাহ্মসমাজরূপ ভূমণ্ডলের উৎকম্পে বাসুকীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি অনন্ত ফণাস্থিত অনন্ত লোচন বিস্ফারিত করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের দিকে কটাক্ষপাত করিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ ভয়ে কম্পমান হইয়া করযোড়ে অনন্ত দেবকে লিলেন যে—'আমার এই উৎকম্পের রণ ঐ নবোদিত সূর্য্যের বিরাট আকর্ষণ।' ... দেবে রোষ-কশায়িত দৃষ্টি ...দিত সূর্য্যের ও তাহা হইতে ...রতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজরূপ নব- ...দিকে পতিত হইল। সেই প্রতিষ্ঠাপিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম- অনন্তরূপী হিন্দুসমাজের বিষদৃষ্টিতে হইলেন

...দেবের অনন্ত ফণার তর্জ্জন গর্জ্জন ...বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কেশবচন্দ্রের ...য় ক্রমশঃ পুষ্টাবয়ব হইতে লাগি- ...ংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য-সভ্য- ...ভাবে হিন্দুর শাস্ত্র, হিন্দুর দেব- ...হিন্দুর আচার পদ্ধতি ও রীতি নীতি ...হিন্দুসমাজের অস্থিমজ্জাভূত বর্ণা- ...। যেন সমস্ত শিক্ষিত সমাজ ...ত হইয়াছিলেন। ইহার অনুকূলে ...াম কথা বলিলে তাঁহার মাথা রাখা ...য় হইত। এই বৈপ্লবিক দল—শিক্ষিত র নারী—ক্রমে ক্রমে বৈপ্লবিক নেতা কেশবচন্দ্র সেনের পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। 'ভাঙ্গ!—'ভাঙ্গ!!'—'চূর- মার করিয়া ভঙ্গ!!'—চতুর্দ্দিকে এই বৈপ্লবিক রব শ্রুত হইতে লাগিল। বোধ হইল যে মহা প্রলয় উপস্থিত! শ্রদ্ধাস্পদ অনরেবল্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় স্থিরধী আর্য্য নীরবে নির্জ্জনে হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর বিশুদ্ধাচার—রক্ষা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন অধিকাংশ সুশিক্ষিত নর নারী এই প্রলয়কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। একদিকে যেমন সংস্কৃত কালেজে কোন কোন অধ্যাপক প্রকাশ্যরূপে নাস্তিকতা প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন—সেইরূপ অন্য দিকে ব্রাহ্মগণ হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকগণ বেদিপীঠে উপবিষ্ট হইয়া পৌত্তলিকতা,বর্ণাশ্রম,বাল্যবিবাহ, অবরোধ-প্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা ... অনন্তরূপী হিন্দুসমাজকে উদ্বেলিত ... তুলিলেন। সেই বিরাট সমাজ চি... তন্দ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাই তুলিতে ... মৃদঙ্গ ও করতাল লইয়া হরি ... করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিকে ... সভা স্থাপিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মপ্র... গণের আদর্শে হিন্দুপ্রচারকগণ বে... আসীন হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মগণের উপর গালিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ঘোরতর ধর্ম্মবিদ্বেষে উভয় সমাজ কলঙ্কিত হইতে লাগিল। উভয় সমাজে বিদ্বেষভাব যেরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল—অন্য দেশ হইলে ইহার পরিণাম অতিশয় শোচনীয় হইত। বাক্-যুদ্ধ ক্রমে ঘোরতর সংগ্রামে পরিণত হইত। প্রোটেষ্টাণ্ট-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে প্রোটেষ্টাণ্ট-গণের সহিত ক্যাথলিকগণের যেরূপ সংগ্রাম বাধিয়াছিল—ভীরু ও শান্তিপ্রিয় হিন্দু ও ব্রাহ্মে সেরূপ কোন সংগ্রাম বাধে নাই। তাঁহাদের ধর্ম্ম-সংঘর্ষ কেবল বাক্‌যুদ্ধেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

সে সময় অনেক সুশিক্ষিত যুবক পৌত্ত-

লিকতা ও বর্ণাশ্রমের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কিম্বা সুশিক্ষিতা স্ত্রী পাইবার আশায় স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন। কেশবপ্রচারিত নব ধর্ম্ম সে অভাব পূরণ করায় আর কেহ খ্রীষ্টান্ হইতে যাইতেন না—পরন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা নবপ্রতিষ্ঠাপিত ব্রাহ্মসমাজ ক্রমশঃই পুষ্টাবয়ব হইতে লাগিল। ইহাতে খ্রীষ্টান্ মিসনরিগণ কেশব বাবু ও তদধিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বক্তৃতা করিয়া ও পুস্তিকাপ্রচার দ্বারা কেশব বাবু ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে ... আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ... বাবু তাঁহার চিত্তপ্রমাথিনী বক্তৃতা ... সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রচার করিয়া ... দগের ... ত ... খণ্ড খণ্ড করিতে ... লন। তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রতিভা ... ব সুশিক্ষিত দল খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক-... কবল হইতে রক্ষা পাইলেন। এই ... চিত কার্য্যের জন্য হিন্দু ও ব্রাহ্ম—উভয় সমাজই তাঁহার নিকট সবিশেষ ঋণী আছেন। এ সময় কেশব বাবু কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত না হইলে সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে হয় ত এত দিনে খ্রীষ্টান্ হইয়া যাইতেন।

যখন পঞ্জাবে দলে দলে হিন্দুকে মুসলমান করা হইতেছিল—সেই সময় তথায় ধর্ম্মবীর গুরু নানকের আবির্ভাব হয়। নানক নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের বিমল জ্যোতিতে ও তৎপ্রচারিত ধর্ম্মের পবিত্রতায় উজ্জ্বল ও পূত হইয়া পঞ্চ নদ প্রদেশস্থ হিন্দুগণ যাবনিক ধর্ম্মগ্রহণে বিরত হইলেন। এই মহাপুরুষের যথা-সাময়িক আবির্ভাবে পঞ্চনদ প্রদেশ ধর্ম্মবিপ্লব হইতে রক্ষা পাইল। গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন ... 'যখনই যখনই সনাতন ধর্ম্মের গ্লানি ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের উৎপীড়ন আরম্ভ হইবে—তখনই যুগে যুগে আমিই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া সনাতন ধর্ম্মের রক্ষা ও ধার্ম্মিকগণের উদ্ধার সাধন করিব।' এ... ভগবদ্-বাক্য অব্যর্থ। নানক সেই ভগবদ্বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবার জন্য যেন ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ... নানকের শিষ্য—বীর ... সী ... সিংহ ভারতের ভবিষ্য মঙ্গলের ... যবন মিশাইয়া একটী অপূর্ব্ব ... জাতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ... জাতি শিখসম্প্রদায় নামে খ্যা... গুরুগোবিন্দ প্রতিষ্ঠাপিত এই জা... সময় ভারতীয় সমস্ত হি... যবনকে ... গত করিতে উদ্যত হ...য়াছিল ... গোবিন্দ স্বয়ং ভগবতী ভ... নরমেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া ... ছিলেন যে, তাঁহার শিষ্যগণ প্রত্যে... জন্য প্রাণোৎসর্গ করিবে—এবং ... রণে অজেয় হইবে। এই বর পা... তন্ত্রোক্ত বিধিমতে হিন্দু যবন ... মন্ত্রশিষ্য করিতে লাগিলেন। ... উৎসাহে মাতিয়া—ও 'ভবানীর বরে রণে অজেয়' এই বিশ্বাসে ...ে হইয়া শিষ্যগণ—'সমস্ত পঞ্চনদ প্র... গুরুর জয়' উদ্ঘোষিত করিয়া বেড়াই... লাগিল। সে প্রচণ্ড স্রোতস্বিনীর নিক... যবন সেনা তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাই... লাগিল। দিল্লীর সিংহাসন টলমল করিতে লাগিল। এই সময় ঘা...ক হস্তে গুরু গোবিন্দ সিংহের মৃত্যু না হইলে শিখ সম্প্র...

য় যে কি মহাশক্তিতে পরিণত হইত, কে লিতে পারে ?

নানক ও গুরুগোবিন্দের ন্যায় বুদ্ধ, কর, চৈতন্য,রামমোহন ও কেশব—সকলেই বতের জাতীয় একতা সম্পাদনের চেষ্টায় বন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। জাতীয় কতা ব্যতীত ভারতের গৌরব রক্ষা হইবে —ইহা তাঁহারা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারি- ছিলেন। প্রত্যেকে বিভিন্ন বিভিন্ন উপায়ে মহালক্ষ্য াধন করিতে চেষ্টা করিয়া- লেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব কালে একতা পূর্ণতা লাভ করিয়া- র ফলে অশোকের জয়স্তম্ভ াত হইয়াছিল। পৃথিবীর ৎকালে অশোকের আদেশ রতেন। কিন্তু সম্রাট্ অশোক একবারে তুলিয়া দিতে চেষ্টা ং। তিনি ব্রাহ্মণগণকে ও বৌদ্ধ ক সমদৃষ্টিতে দেখিতেন এবং সম- খিবার জন্য প্রজাবৃন্দের উপর আদেশ াছিলেন। হিন্দু ও যবন মিলিত না তর জাতীয় জীবনের কোনও ই বিশ্বাস নানকের সময় হইতে ত হইতেছে। কিরূপে এই ন সম্পন্ন হইতে পারে—এই মাজ-সংস্কারক ও ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মাত্র- আশ্রয় করিয়া আসিতেছে। যখন মের সৃষ্টি হয়—তখন ভারতে যবনের র্ভাব হয় নাই। তখন এখানে শুদ্ধ গা আর্য্যজাতি ও বিজিত শূদ্র জাতি স্থান করিতেছিলেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ আর্য্যেরা ত অনার্য্য বা শূদ্র জাতিকে আপনা- গের ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইলেন। আর্য্যজাতি গুণকর্ম্ম বিভাগ বশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণে বিভক্ত হইলেন। যাঁহারা সত্ত্বগুণী ছিলেন ও নিরন্তর অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অনু- শীলন করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ বর্ণ হই- লেন। যাঁহারা রজোগুণী, তাঁহারা যুদ্ধ বিগ্রহ প্রজাপালনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় ক্ষত্রিয়বর্ণ হইলেন। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞ—অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মদর্শন পাইয়াছেন বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন—তিনিই ব্রাহ্মণ। আর যিনি স্বদেশীয়গণকে শত্রুর অস্ত্র-জনিত ক্ষত হইতে রক্ষা করেন— তিনিই ক্ষত্র বা ক্ষত্রিয় (ক্ষতাৎ ত্রায়তে চঃ সঃ ক্ষত্র)। আর যাঁহারা ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে সর্ব্বত্র গতি বিধি করিয়া থাকেন— তাঁহারাই বৈশ্যবর্ণ হইলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের যৌগিক অর্থ—(১) ব্রহ্মজ্ঞ, (২) ক্ষতত্রায়ক ও (৩) দেশব্যাপক। বিজিত বা শূদ্রজাতি সাধারণতঃ তমোগুণী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিল বলিয়া তাহাদিগকে কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত করা হইল। এইরূপে হিন্দুজাতি চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইল। কিন্তু সমাজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গুণকর্ম্মের সংমিশ্রণ হইতে লাগিল। চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত থাকায়, ক্রমে অসংখ্য শঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হইতে লাগিল। এই সকল শঙ্করবর্ণ আপন আপন প্রবৃত্তি ও যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন বিভিন্ন জীবিকা অবলম্বন করিতে লাগিল। ইহাতে বিজ্ঞান ও শিল্পের ভূয়সী চর্চ্চা আরম্ভ হইল।

ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্যা মাতার অনুলো- মমিলনে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি হইল। এই বৈদ্যজাতি চিকিৎসা শাস্ত্রকে আপনাদিগের জাতীয় ব্যবসায় রূপে গ্রহণ করিলেন।

এই বৈদ্যজাতি হইতে চিকিৎসা বিদ্যা পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। এই সঙ্করবর্ণ সাধারণতঃ নবশাখায় বিভক্ত হইলেন। এই সকল বর্ণের স্বরূপ ও কার্য্য নির্ণয় করা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য ও প্রতিপাদ্য নহে। সুতরাং ইহার উৎপত্তির উল্লেখ মাত্র করিয়া এখানে ক্ষান্ত হইব।

গুণ কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে প্রথমে বর্ণভেদ হয়। তাহাতে পুরাকালে অমৃতময় ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে এই বর্ণভেদ এরূপ জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ইহা আমাদিগের জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী হইয়া পড়িয়াছে। যাহা একদিন অমৃতময় ফল প্রসব করিয়া ভারতীয় হিন্দু জাতিকে জগতের আরাধ্য করিয়া তুলিয়াছিল, সেই বর্ণভেদ এক্ষণে ভারতীয় জাতীয় উন্নতির পথে কণ্টক-স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। যদি প্রত্যেক বর্ণ আপন পিতৃ পৈতামহিক কর্ম্মে রত থাকিয়া তাহাতে অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে ভারতের এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। কিন্তু বৈদেশিক সংমিশ্রণ আরম্ভ হওয়ার পর হইতেই—এই বর্ণভেদের মূল উদ্দেশ্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বৈদেশিক রাজার অধীনে বর্ণগত কর্ম্ম-পার্থক্য ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে এই বর্ণগত কর্ম্ম-পার্থক্য কিয়ৎ পরিমাণে ছিল—সুতরাং তখন বর্ণভেদ তত ক্লেশকর হইয়া উঠে নাই। কিন্তু ইংরাজ-রাজত্বকালে বর্ণগত কর্ম্ম-পার্থক্য প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিল। বীজ-নিহিত গুণপার্থক্য একবারে বিলুপ্ত হইবার নহে বলিয়াই এখনও ইহার অস্তিত্ব রহিয়াছে। কিন্তু এইরূপভাবে সমাজবন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইলে—আর দুই এক শতাব্দ মধ্যে বর্ণভেদ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে এক্ষণে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের কার্য্য যজন যাজ ও অধ্যাপনা—ক্ষত্রিয় তাঁহার কার্য্য যু বিগ্রহাদি কার্য্যে নিরত থাকিয়া এবং তাঁ দিগের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তনে ও বাজাব উ সহে অন্যান্য বর্ণও আপনাদিগের জাত ব্যবসায়াদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজপ্রাস ভোগের অভিলাষে পরস্পর পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। উচ্চ নীচ লঘুগুরু জ্ঞান ক্রমশঃই লে হইয়া য তেছে। এই বর্ণ-সংঘর্ষে উচ্চ ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। ব স্থান হইতে নামান যেন হইয়া দাড়াইয়াছে। অন্য সহিত এ বিষয়ে যোগ দিয়া না নামাইতে পারিলে বৈদেশি দিগের উপর অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্র করিতে পারিতেছেন না। সর্ব্ব ব্রাহ্মণকে প্রণাম করেন—কিন্তু গণকে সেলাম করেন। ইহা অসহ্য। এইজন্য রাজপুরুষগণ অন্য বর্ণের অধিকতর আদর ছেন। কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃ মাণ উচ্চপদ দিতেছেন—ব্র পরিমাণে দিতেছেন না। কিন্তু ব্র আজও সমাজপতি ও আধ্যাত্মিক রহিয়াছেন। এইজন্য ইংরাজ-রাজ গণের সহিত ব্রাহ্মণগণের ভিতরে f মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে। এই মহারাষ্ট্রদেশে পরিস্ফুট হইয়াছে। অ দেশে ইহা প্রধূমিত হইয়াছে মাত্র। রাজের সন্ন্যাসিগণের উপরও বিষদৃষ্টি য়াছে। পরস্পর সংঘর্ষ উৎপাদন কা

রাজত্ব করা ইংরাজ রাজনীতির একটী প্রধান অঙ্গ। তাহা ভারতে পূর্ণমাত্রায় প্রকটীকৃত হইয়াছে। আমরা অল্পবুদ্ধি—সুতরাং আমরা এই কূট নীতির মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিয়া এক্ষণে বর্ণসংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কেশব বাবুর অভিপ্রায় মহান্ হইলেও—তাঁহার প্রচার-কার্য্যের ফল অমৃতময় হয় নাই। বৈদেশিক শাসনের সময় অন্তর্বিচ্ছেদ হওয়া কোন মতেই প্রার্থনীয় নহে। বর্ণাশ্রমের উপকারিতা এক-...রে নাই—একথা কেহ বলিতে পারেন ... বর্ণাশ্রম থাকায় কোন বিজেতৃ-...ন পর্য্যন্ত হিন্দুজাতিকে কুক্ষিগত ...রেন নাই।

...শ্রমের মহিমায় আমরা সাতশত ...সত্বেও আমাদিগের জাতিগত ...া করিয়াছি। মুসলমানেরা কত ...ন ও কত লোভ দেখাইয়াও ...তিকে কুক্ষিগত করিতে পারেন ... উচ্চবংশের দুই চারিজন ও নিম্ন...র কতকগুলিকে স্বধর্ম্মচ্যুত করিতে ...য়াছিলেন মাত্র। হিন্দুর যে বর্ণাশ্রম ...জাতিকে এই সাতশত বৎসরের ...ন্তর সময় পূর্ণধ্বংস হইতে রক্ষা ...ছে, সে বর্ণাশ্রমের কোনও মহিমা ... এ কথা কে বলিতে পারেন? ...দিনের একটী প্রকাণ্ড এবং বজ্র ...পেক্ষা কঠিন অট্টালিকাকে চূর্ণ বিচূর্ণ ...রিতে চেষ্টা করা সমীচীন নহে। এই ঘোর বৈপ্লবিককালে আমাদিগের মস্তিষ্ককে স্নিগ্ধ রাখা অতি কঠিন বটে, কিন্তু এই মস্তিষ্কের চঞ্চলতার সময় আমাদিগের প্রাচীন সমস্ত আচার ব্যবহার, রীতি নীতি আমূল পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করা কোন মতেই উচিত নহে। ইহার ফল নিশ্চয় বিষময় হইবে।

কেশব বাবু হিন্দু শাস্ত্র ও বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হওয়ার কিছুকাল পরেই বিলাতযাত্রা করেন। তথায় তিনি যেরূপ সম্মান পাইয়াছিলেন—রাজা রামমোহন রায় ব্যতীত আর কোন বাঙ্গালী তাদৃশ সম্মান পান নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং তাঁহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাসাদে অদ্যাপি কেশব চন্দ্র সেনের প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। তাঁহার খাতিরেই সম্রাজ্ঞী কেশবদুহিতা কুচবিহারের মহারাণীকে তাঁহার পার্শ্বের আসনে সমাসীন করিয়াছিলেন। কেশব বাবু যে শুদ্ধ রাজসম্মান পাইয়াছিলেন—এরূপ নহে। তিনি প্রায় সর্ব্বত্র সমান আদর পাইয়াছিলেন। বিশেষতঃ ইউনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্টানেরা তাঁহাকে আপনাদের দলের অন্যতম নেতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অমানুষী বক্তৃতায় বিলাতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

বিলাতে খ্রীষ্টধর্ম্মের মহিমা স্বচক্ষে দেখিয়া কেশব বাবুর চিত্ত খ্রীষ্টধর্ম্মের দিকে স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই বিলাতে অবস্থিতিকালেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের আদর্শে গঠিত করার সঙ্কল্প মনে মনে পোষণ করেন। তাই বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি প্রচার করেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ইউনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্টীয়ান্ এক, একথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন নাই বটে—কিন্তু তাঁহার যিশুখ্রীষ্ট (Jesus Christ) নামক বক্তৃতায় তিনি খ্রীষ্টকে প্রকারান্তরে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বিলাত হইতে

ফিরিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের বেদিপীঠে বসিয়া যে সকল হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা দিয়াছিলেন—আমরা সে সকল বক্তৃতা স্বকর্ণে শুনিয়াছিলাম। সে সকল বক্তৃতায় ঈশ্বরের স্বরূপ যেরূপে বর্ণিত হইয়াছিল—তাহাতে ঈশ্বরকে রূপ ও গুণের আধার করা হইয়াছিল। তিনি স্বর্গের রাজা—স্বর্গের সিংহাসনে বসিয়া মানুষের পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া—তাঁহার পাপের দণ্ডবিধান করিতে থাকেন বা গুণের পুরস্কার দিয়া থাকেন—এ সকল ভাব তাঁহার তাৎকালিক বক্তৃতায় স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইয়াছিল। উপনিষৎ ও বেদান্ত প্রচারিত অদ্বৈতবাদ হইতে কেশব প্রচারিত দ্বৈতবাদ সুদূরপ্রক্ষিপ্ত। নিরাকার ব্রহ্ম—নিষ্ক্রিয় নির্গুণ নামরূপ বিহীন—অব্যক্ত—অনন্ত,আর তাঁহার ঈশ্বর ক্রিয়ান্বিত—গুণযুক্ত—নামরূপবান্—ব্যক্ত ও সসীম।

পৌরাণিক ও তান্ত্রিক কালে হিন্দুধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ সাধকগণের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মের যে রূপকল্পনা * করিয়াছিলেন—সেই স্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনাকেই ব্রাহ্মেরা পৌত্তলিকতা বলিয়া নিন্দা করিয়া নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, নামরূপ-বিহীন পরম ব্রহ্মের উপাসনা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় কোন নবধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করেন নাই। তিনি হরিহর বিধিবেদ্য ঋষিগণের ধ্যানগম্য জন্ম-মরণভীতি-ভ্রংশি নিখিল-ভুবনবীজ সৎ-চিৎআনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের পূজাপদ্ধতির পুনরাবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র। জনসাধারণ এই সূক্ষ্ম পূজায় অনধিকারী বলিয়া ঋষিগণ তাহাদিগের জন্য স্থূল বাহ্য পূজার অবতারণা করিয়াছিলেন যাহারা পৃথিবী কখন ভ্রমণ করে নাই—এবং করিতে পারিবেও না—তাহাদিগের নিকট শিক্ষকগণ যেমন গোলোক (globe) বা মানচিত্র (map) ধারণ করিয়া তাহাদিগকে পৃথিবীর স্থূল অবয়ব ও পৃথিবীস্থ দেশ রাজ্য, নগর, নদ, নদী, গিরিগুহা প্রভৃতি বুঝাইয়া দেন, সেইরূপ ঋষিগণ স্থূল উপাসকমণ্ডলীর সুবিধার জন্য ব্রহ্মের রূপকল্পনা করিয়া তাঁহার সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় রূপ ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা পুত্তলী-পূজা (idol ... নহে, অব্যক্ত ব্রহ্মের ব্যক্ত সাঙ্কেতিক (symbolic) ঋষিরা জানিতেন ব্রহ্মের ... সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মশব্দকে ক্লী... য়াছেন। অথচ তাঁহারা তাঁহ... জগদম্বা, কখন জগৎ-পিতা বলিয়া... য়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে শিব কালীকে স্তব করিতে গিয়া তাঁহাকে ... ও জননী—দুইই বলিয়াছেন। নিত... সাধক তাঁহাকে কখন কি বলিয়া না ডা... থাকেন। মহাম্মদও ঈশ্বরকে '... বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। 'অল্লা' ... শব্দ—ইহার প্রয়োগ বেদে দেখিতে ... যায়। 'অল্লা' শব্দের অর্থ 'অম্বা'—ইহার যোগরূঢ়ি অর্থ। তন্ত্রই মাতৃ ভাবে প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। বেদেও মাতৃভা... সাধনা অলক্ষিত ভাবে প্রচারিত হইয়াছে কারণ সূর্য্য হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া সূর্য্যকে 'প্রসবিতা'—'সবিতা' 'প্রসবিত্রী' প্রভৃতি শব্দে স্তব করা হইয়াছে কিন্তু তন্ত্রই স্পষ্টাক্ষরে সূর্য্যকে স্ত্রী ও চন্দ্রকে পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ই...

* সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

ন্ত্রের গুহ্যসাধনের অভ্যন্তরে বিশদরূপে র্নিত আছে।

পরম ব্রহ্মের উপাসনা লোক সাধারণের ধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্যই রাজা রাম-াহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার করেন। এই রম ব্রহ্মকে নির্গুণ ব্রহ্ম কহে—আর দেব-বীগণকে সগুণ ব্রহ্ম কহে। যাঁহারা র্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান ধারণায় অধিকারী, মমোহন রায় তাঁহাদিগকে লইয়া ব্রহ্মো-সনা করিতে আরম্ভ করেন। এই আদি হ্মগণ উপাসক সম্প্রদায়মাত্র ছিলেন। ন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজ একটী ল পরিণত হইল। যাঁহারা া অধীন হইয়া এই সম্প্রদায়ে ত ইচ্ছা করিতেন, তাঁহা- সম্প্রদায় ভুক্ত করিয়া লওয়া যে কারণে সুশিক্ষিত হিন্দুগণ ন হইতেন, সেই সেই কারণেই াহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইতে লাগি-হা মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে যে, বু এই স্রোতের গতি ফিরাইয়া হিন্দু—উভয়েরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন। কারণ কেশব বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মকে আদর্শে গঠিত করিবার চেষ্টা —ইহা বৈষ্ণবধর্ম্মের ন্যায় বিশাল তরুর একটী শাখামাত্র। সুতরাং আপনাদিগকে হিন্দু না বলিলেও—াজ ইঁহাদিগকে অন্তরঙ্গ বলিয়া মনে া থাকেন। আপনার বস্তু—কখন হয় না, আর পর কখন আপনার হয় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বৈদেশিক ধর্ম্ম—ইহার স্বনে দেশীয় খ্রীষ্টিয়ানগণ আচার ব্যব-রীতিনীতি ও ক্রিয়াকলাপে হিন্দুসমাজ সূত্র-বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং ইহারা হিন্দুদিগের সহিত কখনই মিশিতে পারিবেন না; কিন্তু ব্রাহ্মগণ সহজেই পারিবেন—যেহেতু ইহাঁদিগের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ও ক্রিয়াকলাপ এখনও হিন্দুসমাজের অনুগামী আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু পরিবারের সহিত ব্রাহ্ম পরিবারের আভ্যন্তরীণ অবস্থাগত পূর্ণ পার্থক্য এখনও অনুভূত হয় না। সুতরাং অগ্রগত হিন্দু পরিবারের সহিত ব্রাহ্ম সমাজের ক্রমশঃ মিল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। এখনই স্পষ্ট দেখা যায়, উভয় উভয়কে আকর্ষণ করিয়াছেন। এক ভাই ব্রাহ্ম ও এক ভাই হিন্দু—একত্র অবস্থিতি করিতেছেন—অথচ হিন্দুসমাজ হিন্দুভ্রাতাকে জাতিচ্যুত করিতেছে না। যেখানে পিতা ব্রাহ্ম—পুত্র হিন্দু—সে স্থলেও হিন্দুসমাজের এইরূপ উদারতা উপলক্ষিত হইতেছে। কেবল বিবাহাদি কার্য্যের সময় ব্রাহ্ম পিতা পুত্র বা ভ্রাতাকে—হিন্দুপুত্র—পিতা—বা ভ্রাতার গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয় মাত্র। এ সামান্য শাসন কালে অন্তর্হিত হইবে—তখন ব্রাহ্মগণ বৈষ্ণবগণের ন্যায় হিন্দুসমাজ মধ্যে পরিগৃহীত হইবেন। কেশব বাবু সেই বৈপ্লবিক কালে বীরের ন্যায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-স্রোতের সম্মুখে দণ্ডায়মান না হইলে আজ হিন্দুসমাজের বিশেষ দুর্গতি হইত, সন্দেহ নাই।

শিখ সম্প্রদায়ের আদিগুরু নানক যেমন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে যাবনিক ধর্ম্মের গতিরোধ করিয়াছিলেন—রাজা রামমোহন রায় সেই-রূপ বেদ উপনিষৎ ও তন্ত্রোক্ত নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়া বঙ্গে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের গতিরোধ করিয়াছিলেন।

গুরুগোবিন্দ সিংহ যেমন হিন্দু ও যবন মিশাইয়া তাঁহার সম্প্রদায়কে একটী মহা-শক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন—কেশব বাবুও সেইরূপ সর্ব্বজাতি মিশাইয়া বঙ্গের ব্রাহ্মসমাজকে সেইরূপ একটী মহাশক্তিতে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যদি কুচবিহারের বিবাহ বিভ্রাটে ব্রাহ্মসমা-জের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু জগদম্বার ইচ্ছা অন্যরূপ হওয়ায় তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। তাঁহার মনোরথ অঙ্কুরে বিদলিত হইয়া গেল। যে ব্রাহ্মসমাজকে মহাশক্তিতে পরিণত করিবার জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন—ঘটনা-স্রোতে পড়িয়া তিনিই সেই সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তিনিই আদিসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। আবার তিনিই স্ব-প্রতি-ষ্ঠাপিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে দ্বিধা বিভক্ত হইতে দিলেন। ইহাতে তাঁহার দোষ অধিক—কি বিদ্রোহি-দলের দোষ অধিক—ইহার বিচার করা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে। তবে ইহা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে যে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের সম্রাট্ হইয়া রামের ন্যায় প্রজারঞ্জন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন নাই। রামচন্দ্র সীতাকে পরম সতী জানিয়াও প্রজারঞ্জনানুরোধে পূর্ণ গর্ভাবস্থায় নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। কোন দেশের কোন রাজা প্রজারঞ্জনের এরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন নাই। সেই দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, কেশব বাবুর ন্যায় মহামতি ধর্ম্মাচার্য্য, কন্যার বিবাহে শিষ্যানুরঞ্জনার্থ আত্মত্যাগ দেখাইতে পারিলেন না—ইহা মহা ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। তি ব্রাহ্মগণের বিবাহের জন্য যে 'তিন আই (Act III of 1872) জারি করাইলেন—নিজের কন্যার বিবাহে তাহার অন্য করিলেন বলিয়া তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহা বেদিচ্যুত করিলেন। তিনি তাঁহাদিগ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির হইতে ি রিত করিলে—তাঁহারা 'সাধারণ ব্রাহ্মসমা আখ্যা ধারণ করিলেন। তিনি ভার বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য রহিলে অবশেষে তিনি সমাজের নাম 'নববিধ প্রদান করিয়া ইহার আচা হইলে—ভাই প্রতাপচন্দ্র মজু বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদ স্থাপিত হইলেন। এইরূ ব্দীর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ স্রোতঃ মন্দাকিনী হইতে উৎপন্ন হইয়া সরস্বতী ও গোদাবরী—এই বিভক্ত হইয়া পড়িল। আদিস তোয়া গঙ্গা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে ক্ষেত্র। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যমুনা নববৃন্দাবনকে পবিত্র করিয় সহিত মিলিত হইয়াছেন। সাধার সমাজ অন্তঃসলিলা সরস্বতী। ই আড়ম্বর নাই বটে, কিন্তু ইহা ধ একটী রাজনৈতিক ধর্ম্মসমাজের ধারণ করিতেছে। সরস্বতীর ব প্রধানতঃ ইহার পৃষ্ঠপোষক। 'নব পুণ্যসলিলা গোদাবরী—ইহার বিস্তৃতি ও বক্ষ মহৎ। কিন্তু ইহার স্থিতি সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে।

নববিধান—স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নহে—সর্ব সমন্বয় মাত্র। যে দিনে পৃথিবীতে সর্ব্ব সমন্বয় হইবে, সেই দিনেই পৃথিবীর সু

বমসীমায় উপনীত হইবে। যুদ্ধ বিগ্রহ—বাদ বিসম্বাদ—তখন থাকিবে না বলিলেও ত্যুক্তি হয় না। ইহাকে বাইবেলে লেনিয়ম (Millennium) বলিয়াছে। ষ্টানেরা বিশ্বাস করেন যে, যিশু পুনর্ব্বার বতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর রাজা হইবেন—ং সমস্ত পৃথিবীতে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাপিত রিবেন। আর্য্যেরা সনাতন ধর্ম্ম প্রচার রিয়াও কখন ভাবেন নাই যে, তাঁহাদিগের াতন ধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবীতে প্রচারিত বে। এই জন্য এই স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্মের ল্লথ গীতাতে দেখিতে পাওয়া যায়। র্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ'—উপদেশ দিয়াছেন যে স্বধর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিবে, সেও পরধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না—ভয়াবহ। কিন্তু কেশব মন্বয় করিয়া যিশু ও ভগ উদারতায় পরাস্ত করিয়া তাহার নিকট পর ধর্ম্ম নাই, তৎপ্রচারিত 'নববিধান' ক্ষগত করিয়া বিশ্বরূপ ধর্ম্মের । এই ভাব এত মহান ও তাকে ধারণা করা সাধারণ র্য্য নহে। যে কক্ষা সমস্ত ... —তাহার পরিমাপ স সাধ্য? কত কত ছায়াপথ, কত কত ধূমকেতু আপন আপন অভ্যন্তরে যে ভ্রাম্যমাণ হই-া চিন্তারও অগম্য। ব্রহ্মবিন্দুর জানিতে পারিয়াছেন—তাঁহারা াগে এই মহাকক্ষার কিছু সন্ধান পাইতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞান কোন কালেই আয়ত্ত করিতে না। অযোগী ব্যক্তিও কখন ইহার পাইবে না। সেইরূপ একটী ধর্ম্মের র অনুসন্ধান করিতে যখন একটী কুলায় না, তখন সর্ব্বধর্ম্মতত্ত্বকে করিয়া তাহার মীমাংসা করা যে,যে-সে বিশেষের সাধ্যায়ত্ত, তাহা আমাদের হয় না। তবে কেশব বাবুর স্থায় রূঢ় ও অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির ইহা অসাধ্য, একথা আমরা বলিতে পারি না। তাঁহার সাধ্য হইলেও তাঁহার সম্প্রদায়স্থ সমস্ত ব্যক্তির ইহা সাধ্যায়ত্ত, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। যদি তাহা না হয়—তাহা হইলে এরূপ বিশ্বরূপ ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা জগতের বিশেষ কি শুভ সম্পাদিত হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তবে কেশব বাবুর কল্পনায় এরূপ একটী প্রকাণ্ড ব্যাপার আসিয়াছিল বলিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি গাঢ়-তর হইয়াছে মাত্র। তিনি যে জীবন্মুক্ত, ইহা তাহার বিশেষ পরিচায়ক। তিনি শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নিঃসঙ্গ যোগ-তাপস না হইলে তাঁহার কল্পনায় এরূপ সূক্ষ্ম অথচ মহান্ বিশ্বরূপ ধর্ম্মের আবির্ভাব হইতে পারিত না। ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপী সুতরাং অতীন্দ্রিয়। যাহা বিশ্বব্যাপী, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। কারণ তাহা মহান্ হই-লেও সূক্ষ্মতম। সেইরূপ যে ধর্ম্ম বিশ্বরূপ—তাহার স্বতন্ত্র স্বরূপ কেহ দেখিতে পাইবে না। সুতরাং সে ধর্ম্ম সাধন ভজন ও ক্রিয়াকলাপের উপযোগী হইতে পারে না।

কেশব বাবু স্বরূপতঃ তান্ত্রিক যোগী ছিলেন। কারণ তিনি ভোগ ও যোগ উভয়কেই আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। জনকাদির ন্যায় তিনি সম্ভোগের মধ্যে থাকিয়াও পরম যোগী ও ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন। বৈদিক সন্ন্যাসে কামিনীকাঞ্চন বর্জ্জিত হইয়াছে, কিন্তু তান্ত্রিক সন্ন্যাসে কামিনীকাঞ্চন সাধনার উপকরণ সামগ্রী বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। "বিকারের কারণ থাকিতে যাহাদিগের চিত্ত বিকৃত না হয়, তাঁহারাই প্রকৃত ধীর।" (কুমার সম্ভব) এই উপদেশের মর্ম্মগ্রহণ করিলে উপলব্ধি হইবে যে, বর্জ্জনে পূর্ণ পরীক্ষা দেওয়া হইতে পারে না। যাঁহারা ভোগ করিয়াও ভোগে আসক্ত হন না—তাঁহারাই সিদ্ধ পুরুষ। কালিদাস রঘুবংশে লিখিয়াছেন যে, রঘুবংশীয় রাজারা 'অসক্তঃ সুখমন্বভূৎ'—অনাসক্ত হইয়া সুখভোগ করিতেন। ইহা মহাভোগের অবস্থা। কিন্তু সে ভোগ বৈধ দেওয়া চাই। কেশব বাবু ভোগী হইলেও—অবৈধ ভোগশীল ছিলেন, একথা কেহ কখন বলে নাই—বলিতেও পারে না। কেশব বাবুর ন্যায় জটিল চরিত্র

কেবল যোগিজনেরাই ধারণা করিতে পারেন। অযোগী জনে কখন তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই—পারিবে না। এই মহা পুরুষকে আমি বার বার নমস্কার করি।

সাংসারিক ভোগী যে দ্রব্য একবার ভোগ করেন, তাহার আস্বাদ ভুলিতে না পারায়, সেই দ্রব্য পুনঃ পুনঃ ভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ইহাতে অনন্ত বাসনার সৃষ্টি হয়। জন্ম বাসনাত্মক। এ জন্মে যদি সমস্ত বাসনা পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে অতৃপ্ত বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তাঁহার পুনরাবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ জন্ম হইবে কিন্তু যিনি ভোগ্য বিষয়ে অনাসক্ত ও অনাসক্তি নিবন্ধন বাসনাহীন, এরূপ ব্যক্তি সংসারে অতি দুর্লভ *। প্রথম শ্রেণীর লোককে বুভুক্ষু কহে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোককে মুমুক্ষু কহে। সংসার মধ্যে বুভুক্ষুর ন্যায় মুমুক্ষু ব্যক্তির সংখ্যাও অল্প নহে। কিন্তু যাঁহারা ভোগ মোক্ষ বাসনা শূন্য এরূপ মহানুভব ব্যক্তির সংখ্যা সংসারে আরও বিরল।* এরূপ ব্যক্তির বন্ধ-মোক্ষ থাকিতে পারে না। কিন্তু এই শেষ অবস্থায় আসিবার ক্রম আছে। ভোগ ব্যতীত ভোগের বাসনার ক্ষয় না। এই বিষয় লইয়া বেদে ও তন্ত্রে মতভেদ আছে। বেদ বলেন 'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥' কাম্য বস্তু উপভোগের দ্বারা কামনা নিবৃত্ত হয় না। ঘৃতাহুতি দিলে অগ্নি যেমন অধিকতর প্রজ্বলিত হয় সেইরূপ জ্ঞানাঙ্কুশ দ্বারা কামনা দমন না করিয়া, কাম্য বস্তু ভোগ করিলে, কামনা দিন দিন বাড়িতে থাকে। তন্ত্রের মত "কণ্টকে নৈব কণ্টকম্।" কণ্টক দ্বারাই, কণ্টক উত্তোলিত করিতে হইবে; 'বিষস্য বিষমৌষধম্'—বিষের ঔষধ বিষই। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনার অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এলোপ্যাথিক ও কবিরাজী চিকিৎসা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কোন্ চিকিৎসা-প্রণালী বা কোন্ সাধন প্রণালী শ্রেষ্ঠ, তাহার সমালোচনা করা এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে এইমাত্র বক্তব্য যে, কেশব বাবু প্রকৃ-

তিতঃ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তিনি প্রা
বুভুক্ষু পরে বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু, তৎপরে মুমুক্ষু
এবং সর্ব্বশেষে ভোগমোক্ষ-নিরাকাঙ্ক্ষী হই
ছিলেন এই শেষ অবস্থায় শ্রীশ্রীর
মকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সহিত তাঁহার প্র
সাক্ষাৎ হয়। পরমহংস দেব তাঁহা
বাগানে প্রথম দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে
'এরই ল্যাজ খসেছে দেখ্‌ছি'। এই ব
শুনিয়া সভাস্থ লোক হাসিয়া উঠি
ছিলেন—কিন্তু কেশব বাবু তাঁহাদিগ
স্থির হইতে বলিয়া পরমহংস দেবকে ইহ
অর্থ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তদুত্তরে বলি
ছিলেন—'যতদিন বেঙাচির ল্যাজ না খ
ততদিন সে কেবল জলে থা
ডেঙ্গায় বেড়াইতে পারে না
তার ল্যাজ খসে অমনি
ডাঙ্গায় পড়ে। তখন সে
আবার ডাঙ্গাতেও থাকে।
যতদিন অবিদ্যার ল্যাজ ন
সংসার জলে পড়ে থাকে।
খস্‌লে, জ্ঞান হ'লে, ত
বেড়াতে পারে। আবার
সংসারেও থাক্‌তে পারে।'
জীবন্মুক্ত অবস্থা। ভগবান্ র
সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাকে বি
য়াছেন। বেঙাচির ল্যাজ
তীরে উঠিবার অন্তরায়, সেইর
বাসনা তাহার উর্দ্ধগতির রোধ
খসিলে বেঙাচি যেমন জলে
থাকিতে পারে, স্থলেও উঠে
সেইরূপ বাসনা নিবৃত্ত হইলে মা
মত সংসারে থাকিয়াও সংসারাতীত
পারেন। পদ্ম পত্রস্থিত জলের ন্যা
তাঁহারা সংসারে থাকিয়াও সংসারে নি

এরূপ মহাপুরুষের সংখ্যা জগতে
বিরল। এ অবস্থায় ধর্ম্ম, অর্থ,
মোক্ষ—জীবন মরণ—কিছুরই উপর
পাদেয়তা, জ্ঞান থাকে না। সংসার
হউক্, ইহাও তাঁহার ইচ্ছা নহে, ত
সংসার স্থিতি বিষয়েও তিনি উদা
জীবিকানির্ব্বাহার্থ যদি কিছু আহা
হন, তিনি তাহাতেই সুখে কাল
করিয়া থাকেন * এই অবস্থায় ব

* * অষ্টাবক্র সংহিতা, ১১, ৪,৫।৬।৭

। মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন এই দশায় ...ত্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি ধন্ত ...গন্মান্ত। তাঁহাকে আমরা বার বার ...স্কার করি। তিনি অনুরাগিনী স্ত্রী ও ...কে সমচক্ষুতে দেখিতেন বলিয়া (শ্র,ব সংহিতা দেখ) তাঁহাকে আমরা মুক্ত পুরুষ জ্ঞানে বার বার নমস্কার করিতেছি। হে দেব। তুমি আমার পূজা গ্রহণ কর। ওঁ শান্তি।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

মহম্মদ ও মুসলমান ধর্ম্ম।

পশ্চিম আসিয়া বহুসংখ্যক একেশ্বরবাদী ...পুরুষের জন্মস্থান। প্রাচীনকালে পৃথ... । প্রায় সর্ব্বত্র পৌত্তলিকতা প্রচলিত ছিল। ...সাধারণকে একেশ্বরবাদ শিক্ষা দিতে ...। একেশ্বরবাদী মহাপুরুষেরা, ঘোরতর ... করিয়া গিয়াছেন। লুত, ...আরমিয়া ইযহা, ইলিয়াস্ ...সালেহ, নোয়া, ইব্রাহিম ...মাদের মধ্যে কেহই উৎ...হইতে পরিত্রাণ পান নাই। ...হস্তাগিহস্তে প্রাণ পর্য্যন্ত ...ছিলেন। মহাত্মা ইব্রাহিম ...অত্যাচারে প্রিয়তম জন্মভূমি ...হইয়াছিলেন। ...মন ...নওয়াস্, বহুসংখ্যক একেশ্বর...দের পোড়াইয়া মারিয়াছিল। ...ক্রুশ যন্ত্রে আরোপিত হইয়া ...করেন। ধর্ম্মের এমন মধুর ...সত্যের এমন বিশ্বজয়িনী শক্তি ...এরূপ বিভীষিকা তাঁহাদিগকে ...ব্রত হইতে পরাঙ্মুখ করিতে তিন্দুর বৈষয়িক কর্ম্ম করিবার অবকাশ থাকিতনা। তাঁহাদের সত্যের সাধনার্থ সমস্ত সময় ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত।

লোকে যাহা শুনিতে চাহেনা তাহা শুনাইয়া তাঁহাদের বিরাগভাজন হইতে অনেকেই ইচ্ছা করেনা, বরং আপনাদের বিশ্বাস গোপন করিয়া, জনসাধারণের মতে মত দিতে অনেকেই ব্যগ্র হয়, কিন্তু অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর প্রেমিকদিগের রীতি স্বতন্ত্র। তাঁহারা গড্ডালিকা প্রবাহের মধ্যে পতিত না হইয়া আপনাদের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া জগতের হিতকামনায় বিচরণ করেন। লোকে বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের প্রতিকূলাচরণ করে, কিন্তু তাঁহারা অদম্য উৎসাহে সত্য ... পথে অগ্রসর হন। সমসাময়িক লোক তাঁহাদের মহিমা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে না পারিলেও তাঁহাদের বংশধরেরা উদার শিষ্য হইয়া থাকে। প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনী, ইহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। মহাপুরুষেরা ভগবানের বিশেষ বিধান প্রচারার্থ পৃথিবীতে আগমন করেন, যথাসাধ্য সেই বিধান প্রচারিত করিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

...বরাদিগণের মধ্যে ইব্রাহিম ও ...বংশধর মহম্মদ, পৌত্তলিকতার ...বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা মনে ...ন যে, অনন্ত জগদাধার সর্ব্বশক্তি...মান জগদীশ্বরকে পরিমিত বস্তুতে আবদ্ধ ...রার ন্যায় অপরাধ আর নাই। ইব্রা...হস্তে অনেক প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ...ন। মহম্মদ শিষ্যেরা প্রতিমার বিষয় ...যে সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র, ...দেবমন্দিরে বহুসংখ্যক দেবমূর্ত্তি ...ত ... হইয়াছিল, ...মুসলমানেরা ভারতবর্ষে না আসিলে ...ন ... বংশ এক ...

মহাপুরুষ মহম্মদ, যখন আরব দেশে জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে আরবের সর্ব্বস্থান, ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। আরবের লোক নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল, তাহাদের মধ্যে অনুক্ষণ বিবাদ বিসংবাদ লাগিয়া থাকিত। আরবের লোকের বীরত্বের অভাব ছিলনা বটে, কিন্তু সে বীরত্ব লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডে পর্য্যবসিত হইত। নারীজাতির দুর্দ্দশার পরিসীমা ছিলনা। কোন কোন সম্প্রদায়ে বালিকা বধের রীতি ছিল, কন্যাকে জীবিত অবস্থায় ভূপ্রোথিত করা হইত। দাস দাসীদের প্রতি নিষ্ঠুর

ব্যবহার হইত। নৈতিক জীবনের ন্যায় ধর্ম্ম জীবনের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। উপাস্য দেবতার সংখ্যা ছিল না। কাষ্ঠখণ্ড ও লোষ্ট্রখণ্ড ও দেবতা বলিয়া পূজিত হইত। পূজিত কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রখণ্ড অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রখণ্ড পাইলে পূর্ব্ব গুলি পরিত্যক্ত হইত। এক কোরেশ সম্প্রদায়ে পনর শত দেবতা ছিল। ইবা হিম, মক্কার কাবা মন্দির, ঈশ্বরোদ্দেশে নির্ম্মাণ করেন, সেই মন্দিরে ছোট বড় অনেক গুলি দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আরবের এইরূপ শোচনীয় সময়ে মক্কা নগরে কোরেশ সম্প্রদায়ে মহম্মদের জন্ম হয়। মহম্মদের বাল্যজীবনের কোন বিশেষত্ব লক্ষিত হয় না। মহম্মদ লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই। উষ্ট্রপৃষ্ঠে পণ্য বাহিত করিয়া দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতেন। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার ধর্ম্ম জীবন আরম্ভ হয়। মহম্মদীয় শাস্ত্র বলেন, ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার বোধিদ্রুম লাভ হয়। মুসলমানেরা বলেন তিনি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন। "ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়, আমি এই মত প্রচারার্থ আদিষ্ট হইয়াছি" মহম্মদ আপনার এই মত, প্রথমতঃ, স্বীয় পত্নী খদিজার নিকট ব্যক্ত করিলেন। খদিজা শ্রদ্ধা সহকারে স্বামীর মত গ্রহণ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে জামাতা আলি ও কন্যা ফতেমা তাঁহার মত অবলম্বন করিলেন। আগুন কতকাল চাপা থাকে? ক্রমে আবুবেকর ও আরও কতিপয় ব্যক্তি এই নবীন ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে মহম্মদ আপনার ধর্ম্মমত প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহম্মদ, কাবা মন্দিরের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে বন্ধুগণ! ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, তিনি ভিন্ন অন্য উপাস্য নাই। আমি তাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। তিনি আমাকে প্রত্যাদেশ যোগে কোরাণ নামক গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন। তোমরা অন্তিম দিবসের বিচারের ভয় কর। সেদিবস প্রত্যেক পাপ ও প্রত্যেক পুণ্যের বিচার হইবে। পুণ্যবান্, অনন্তস্বর্গে ও পাপী অনন্ত নরকে গমন করিবে। ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তোমরা কোন প্রতিমাকে ঈশ্বর বোধে উপাসনা করিওনা।" এই স নূতন কথা শুনিয়া মক্কার লোক চমি উঠিল। তাহারা মহম্মদকে, দেবগণের নি করিতে নিষেধ করিল। মক্কার কোরেশগ যখন দেখিল, মহম্মদ নিষেধ মানিলেন ন তখন প্রথমতঃ ভয় প্রদর্শন ও পরে উৎপীড আরম্ভ করিল। মহম্মদ ও তাঁহার সহচরগ দশবৎসর যাবৎ যাদৃশ উৎপীড়ন সহ্য করি ছিলেন, পৃথিবীর কোন ধর্ম্মপ্রচারক তাদৃ উৎপীড়ন সহ্য করেন নাই। আত্মীয় বন্ধুগ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। নিদারু দারিদ্র্য তাঁহাকে নিষ্পেষিত করিতেছি তিনি অকাতরে সমস্ত সহ্য করিতেছিলে একদা তাঁহার কন্যা ফতে বলিয়াছিলেন, "বাবা! আমি অনাহারে আছি," মহম্মদ, ব লেন, বৎসে! আমি চারি কাটাইতেছি।" ভগবানের দেব জীবনের অনুপান হইয়া অপমান ও শত্রুর উৎপীড়নে ভূত হন নাই।

মহম্মদ, যখন কোরাণ তখন শত্রুগণ তাঁহাকে ঘের করিত। কেহ বলিত, মহ জানে। কেহ বলিত, মহম্মদ যখন এমন পবিত্রভক্ত কথা বলিতে ভাল লোক দিয়া রচনা করাই করিয়া আনে। কেয়ামত অর্থাৎ বিচারের দিন উপলক্ষ করিয়া মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিত, 'মহম্ম দের প্রতি কবে শাস্তি অবতীর্ণ মহম্মদ ধীরভাবে উত্তর করিতেন, জানিনা, আমার প্রতিপালক প জানেন।" তাহারা বলিত, "আমাদে গুলি ঈশ্বর দ্বারা জগতের কার্য্য ভাল চলিতেছেনা, তোমার একটী ঈশ্বর কি জগৎ চালাইবেন?" কেহ কোন কিক কার্য্য করিতে বলিলে, মহম্মদ তেন "বন্ধুগণ! আমি তোমাদের মনুষ্য ভিন্ন নহি। আমার প্রতিপা আমাকে যাহা বলিতে বা করিতে ব আমি তাহা ভিন্ন কিছু বলিতে ও ক পারিনা।" তোমরা পরমেশ্বরকে

চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জগতের যাবতীয় ঁাঁহার অনন্ত মহিমা ঘোষণা করি-
েছে, তোমরা কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস
রিতেছ না?" কোরেশগণ, মহম্মদের
াণ নাশার্থ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। একদা
'মর নামক বীর পুরুষ, মহম্মদের প্রাণ
াশার্থ কৃতসঙ্কল্প হইয়া তীক্ষধার শস্ত্র হস্তে
ান করিতে করিতে শুনিতে পাই-
লন যে, নিজের ভগ্নী ও ভগিনীপতি,
হম্মদের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। ওমর,
পিত কেশরীর ন্যায় ভগিনীর আলয়ে
াপস্থিত হইয়া, ভগিনীপতি ও ভগিনীর
পরনাস্তি দুর্দ্দশা করিয়া তাহাদের দ্বারে
'ত দম্পতী, যাতনার
নিশাযোগে কোরাণ
ন। দুর্দ্দান্ত ওমরের
াগ্নি জ্বলিয়া উঠিল
২৫ে কে যেন বলিয়া উঠিল,
ও অদ্বিতীয়, মহম্মদ তাঁহার
ওমর মহম্মদের উদ্দেশ্যে ধাবিত
মরকে আসিতে দেখিয়া মহ
রগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।
ম গুণশালী তেজস্বী পুরুষ
াহম্মদ, পূর্ব্ব-রজনীতে ওমরের
নের জন্য ঈশ্বরের নিকট

সহ মহম্মদ, মক্কা পরিত্যাগ করিলেন। শত্রুগণ, পশ্চাৎ ধাবিত হইল। মহম্মদের বিশ্বাস ছিল যখন পরমেশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন, তখন শত্রুগণের তাবৎ দুশ্চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। মহম্মদের শ্বশুর আবুবেকর, মহম্মদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি মহম্মদের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগে প্রস্তুত ছিলেন। মহম্মদ, অতি কষ্টে মদিনায় উপস্থিত হইলেন।

মদিনার লোক, মহম্মদের মত অবলম্বন করিল। কোরেশগণ, তখনও মহম্মদের প্রতি শত্রুতা বিস্মৃত হয় নাই। যাহারা মহম্মদের মত অবলম্বন করিয়াছিল তাহারা মক্কায় অত্যন্ত উৎপীড়িত হইতেছিল। দশবৎসর শান্তভাবে ধর্ম্মপ্রচারে অকৃতকার্য্য হইয়া মহম্মদ বুঝিতে পারিলেন, আরবের দুর্দ্দান্ত মূঢ়দিগকে কেবল মৌখিক উপদেশে ধর্ম্ম পথে আনয়ন করা যাইবেনা বল প্রয়োগের প্রয়োজন। মহম্মদ অনুচরগণের নিকট আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মহম্মদের মুখে তাহারা শুনিতে পাইল, জেহাদে অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তিগণ স্বর্গলোকে পরমসুখে কালাতিপাত করিবে। অনুচরগণ, পার্থিব সম্পদ্ ও পারলৌকিক সুখ লাভের আশায় উৎফুল্ল চিত্তে মহম্মদের প্রস্তাবে সম্মত হইল। দুই একটী যুদ্ধে পরাজিত হইলেও মহম্মদের সর্ব্বত্রই জয়লাভ হইল। অনেক লোক মুসলমান হইল। নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত আরবের লোক
পরস্পর শত্রুতা করিয়া আসিতে-
যা পরস্পরকে বন্ধু

আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ৪৪ বৎসর ধর্ম্মপ্রচার করিয়া মহাত্মা শাক্য সিংহ, মৃত্যুকালে পাঁচ হাজারের অধিক বৌদ্ধ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু মহম্মদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আবুবেকর, পঁয়ত্রিশ হাজার মুসলমান সেনা, সিরিয়া জয় করিতে পাঠাইয়াছিলেন। মুসলমান ধর্ম্ম যে কেমন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছিল, এই ঘটনায় তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। মুসলমানের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে পূর্ব্বরোম সাম্রাজ্য অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িল এবং পারস্য সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইল।"

কোরাণে মুশারি, ঈশারি, অগ্নিপূজক ও পৌত্তলিকদিগকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কথা বলা হইয়াছে। মুশার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে মুশারি, খ্রীষ্টানদিগকে ঈশারি ও পারসীকদিগকে অগ্নিপূজক বলা হইয়াছে। সে কালে আরবীয়েরা পৌত্তলিক ছিল। মহম্মদের বিশ্বাস ছিল, ঈশারি ও মুশারিদের গ্রন্থে তাঁহার প্রসঙ্গ আছে, ইহুদি ও খ্রীষ্টানেরা কুবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মগ্রন্থের তত্তৎ অংশের পরিবর্ত্তন করিয়াছে। পৌত্তলিক ও অগ্নিপূজকগণ আপনাদের দুর্ব্বল ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। ..

মুসলমান ধর্ম্মে সাম্য ও সখ্য ভাবের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কেয়ামত ... বিচারের একটা নির্দ্দিষ্ট ... অনন্ত নরক

অপেক্ষা অন্তঃশুদ্ধির গৌরব করিয়াকে অতি মহতী শিক্ষা দান করিয়া থাকে মুসলমান ধর্ম্মের প্রগাঢ় সাম্যবাদ কো.. কোটি নর নারীকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। মুসলমানের উপরে হিন্দু জাতির যে একটু ঘৃণা আছে, মুসলমানদের শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকিলে বোধ হয় তাহার লাঘব হইত। মুসলমানেরা আমাদের প্রতিবেশী, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের অন্তরে কোন ঘৃণার ভাব পোষণ করিতে নাই। আমি কোরাণ হইতে কয়েকটী উপদেশ উদ্ধৃত করিলাম।

(১) ধনবান্‌কে অনুরোধ করিয়া দরিদ্রকে কিছু দেওয়াইলে ... ভাগী হয়। (২) সত্যকে ... বা তাহার কোন অংশ ... (৩) যে কুকর্ম্ম করিবে, ... মুসলমান বলিয়া শাস্তি ... না। (৪) কাহার প্রতি বিশ্বাস বা তাহার গুণানুবাদে সীমা ... না। যতদূর সত্য; তাহা বলিবে কার্য্য সম্পাদনে যথেষ্ট। তাঁ সাহায্যকারীর আবশ্যকতা নাই। সর্ব্বজ্ঞ, পরাক্রান্ত, নিপুণ, ক্ষমাশী ...

— (৭) বিবাহবন্ধন ও ক্রম ...

সাহিত্য ও মনুষ্যত্ব*

মনুষ্য প্রকৃতি
ন্মোচিত করিয়া
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া,
কেব কোন অলৌকিক সত্য বা
প্রকটিত করেন, তিনি মানব-সমা-
র বন্ধু,—সমগ্র পৃথিবীর পূজাস্পদ।
বিষয় বিতৃষ্ণ, জ্ঞানমার্গাবলম্বী,—
গী ও তত্ত্বজ্ঞানী এই পথের
ইঁহারা অধ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে,—
ও জগতের কল্যাণ সাধন করিয়া
সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়াও ইঁহারা
জন্য চিন্তা করেন; মানব হিতের
রা প্রাণপাত করিতেও কুণ্ঠিত হন
াদের সাধনা সমুদ্ভূত,ধ্যান ও ধারণা-
তোসত্যের দুই একটা কণিকা লইয়া,
বুকের অভ্যুদয়। কবি ও দার্শ
ভক্ত ও ভাবুকের ক্ষুদ্র শিষ্য।
ব-রাজ্যের অধিপতি হইলেও,
নককে,—প্রকৃত ভক্ত ও ভাবু-
মস্তক অবনত করিতে হয়।
 কবি ও দার্শনিক,—অহমিকা-
 ও সৌন্দর্য্যের চরণে বিলুণ্ঠিত
রা শ্লাঘার বিষয় বোধ করেন।
ক্ত ও ভাবুক সেই সত্য ও সৌন্দ-
ট মূর্ত্তি।
ও সৌন্দর্য্য হইতে সাহিত্যের উৎ-
সত্যের ধারণা ও সৌন্দর্য্য বোধ
যে পরিমাণে অধিক,তিনি সেই পরি-
ৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করেন। যাঁহার
সৃষ্টি করিবার সৌভাগ্য নাই, তিনি
ক্তি বিষয়ান্তরে নিয়োজিত করেন।

মানব সেবাই তাঁহার ... অর্জ্জনই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। আর যে ক্ষণজন্মা পুরুষসিংহের একাধারে এই দুই শক্তি থাকে, মনুষ্যবেশে তিনি দেবতা। সমগ্র দেশ, সমগ্র সমাজ, সমগ্র পৃথিবী,—চিরদিন তাঁহাকে প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি উপহার দেয়।

এখন, এই সাহিত্য ও মনুষ্যত্ব কি, অদ্য তাহাই আমাদের আলোচ্য। সংক্ষেপে ব্যষ্টিভাবে আমরা এই কথাটীর আলোচনা করিব।

যে দিন জগতে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই দিন হইতে ভাষারও সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্যের হৃদয় নিহিত ভাবের সমষ্টিই ভাষা,—এবং সেই ভাব প্রকাশের নামই ভাষা। জাতি বিশেষের সাহিত্য নাই বটে, কিন্তু ভাষা সকল জাতিরই আছে। সেই সনাতন বৈদিক যুগ হইতে অনাদি কাল ধরিয়া যে ভাব-স্রোত চলিয়া আসিতেছে, তাহাই ভাষা। ভাষা,—সাহিত্যের প্রসূতি। সাহিত্য হইতে সমাজ, সমাজ হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে মনুষ্যত্ব। পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ, পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী। একটী ছাড়িলে আর একটি নিষ্প্রভ হয়; একটির অস্তিত্ব অভাবে আর একটির অস্তিত্বও ক্রমশঃ বিলয়প্রাপ্ত হয়। প্রকৃত সাহিত্যকার এই তিনকে একই কেন্দ্রে পরিণত করিয়া, তাঁহার অমানুষী প্রতিভা পরিচালিত করেন। তাহার ফলে মানুষের কর্ত্তব্যবুদ্ধি উদ্রিক্ত হয়, কার্য্যকরী শক্তি বৃদ্ধি পায়, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি জন্মে। সহানু-

---

*বক্তৃতা—বহুবাজার সরস্বতী ইন্‌ষ্টিটিউটের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।—২০শে বৈশাখ, ১৩০৭।

...হইতে একতা, একতা হইতে সভ্যতা, সভ্যতা হইতে জাতীয়তা উৎপন্ন হইয়া থাকে। জাতীয়তাই জাতীয় জীবনের উন্নতির সোপান। যে জাতির জাতীয়তা বা একপ্রাণতা নাই, সে জাতির উন্নতি সুদূর পরাহত। সে জাতি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে,—পরপদ লেহন করিবে বলিয়া; সে জাতি বাঁচিয়া থাকে,—অন্যের উপহাসাস্পদ হইবে বলিয়া, সে জাতির অস্তিত্ব,—পরস্পর রেষারিষী-দ্বেষাদ্বেষীতে জ্বলিয়া মরিবে বলিয়া। "তাহারা জাগিয়া থাকে, ঘুমাইবার লোভে, ঘুমায়,—আর জাগিতে পারে বলিয়া''।—আলস্যে তুড়ি দিয়া জৃম্ভন তুলিতে তুলিতে, অদৃষ্টের নামে কাপুরুষতার দোহাই দিতে দিতে, তাহারা দিনের পর দিন গণিয়া যায়, আর কালের ডাকে, যথাকালে ইহলোক হইতে সরিয়া পড়ে!

এই নিদ্রালস জীবন্মৃত জাতিকে উদ্বোধিত ও সঞ্জীবিত করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি করিতে হয়। কারণ সাহিত্যই সর্ব্ব বিষয়ের মূল এবং মেরুদণ্ড। মূল এবং মেরুদণ্ডকে সর্ব্বাগ্রে পোষণ ও রক্ষা না করিলে, কিছুই থাকে না, কিছুই হয় না। বুনিয়াদ পোক্ত না হইলে সুরম্য হর্ম্ম্য ঝঞ্ঝাবাতে পড়িয়া যায়; জাতীয় সাহিত্যের মূল দৃঢ় না হইলে জাতীয় জীবনেরও অবসান হয়;—তাহার রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বড় বড় বিষয়ও, আধারাভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সাহিত্যই এই সকলের আধার। সাহিত্যকে অতিক্রম করিয়া কিছুই চলিতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও পরিপুষ্টি আবশ্যক। সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া,—সমাজ, ধর্ম্ম, জাতীয়তা,—সকলই

পরিচালিত ...
মহৎ আর বে
সাহিত্যের অং
পরম বন্ধু আর ে
ত্যের উচ্চতর সোপা
অগ্রে, আপনাকে, তথা সাহি
শালী করিতে হইবে। প্রাণ দিয়া, ে
দিয়া, উন্মাদিনী শক্তি দিয়া সাহিত্য
জীবনের আদর্শ করিতে হইবে
যেমন প্রীতিভরা অশ্রুজলে হৃদয়
করিয়া আরাধ্য দেবতার অর্চ্চনা ক
প্রকৃত সাহিত্যসেবীও তেমনই
করণে, অকপটে সাহিত্যধর্ম্মের সেবা
তাঁহাতে কৃত্রিমতা বা ভাণ, পরমুখ
বা লাভ লোকসানের খতিয়ান্
পারে না। তিনি সাহিত্যের জন্য
ত্যের সেবা করেন; সত্যের জন্য
অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। এ
সাহিত্য। এই সাহিত্য প্রাণে
আত্মার খাদ্য। কবিত্বই ইহার
আদর্শই ইহার লক্ষ্য। এই
তেই ধর্ম্ম, এবং ধর্ম্ম হইতেই ম

মনুষ্যত্ব কি? উত্তরে
আসে, —অনেক মতও আসিয়া
কথা, সে মত সম্যক আলোচনার
নহে। সংক্ষেপে, একটি কথায়, আ
উত্তর দিব। মনুষ্যত্ব কি? উত্ত
"জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি ভ

কথাটা যতবার যেমন ভাবে
চনা করিয়াছি, মনের মধ্যে ঐ এক
পাইয়াছি,—"জীবে প্রেম, স্বার্থত্যা
ভগবানে।'—হিন্দুর চরম গ্রন্থ
বদ্গীতাও এই উপদেশ দেয়, মুস
কোরাণও এই শিক্ষা দেয়, খৃষ্ট

। বা
াকৃত
ধারণ
।চত্রপটে,
। জগতের
ছ, তাহা টানিয়া
কি, জগৎ কি, উভ-
বর কর্ত্তব্য ও পরিণাম
আরও অনেক প্রকার
াপন তীক্ষ্ণ অনুভবক্ষম
করিয়া,—সেই ক্ষণজন্মা
া বা সাহিত্যে তাহাই
াকেন। কারণ, "কবির
ত স্বতন্ত্র বলিয়া আমি মনে
াতের বুকে যে কথা লুকানো
ভাষায় তাহা পরিব্যক্ত
াপনার জগৎ সৃষ্টি করেন।
র্য্যই জগতের প্রাণ; সত্য ও
রও প্রাণ। সুতরাং কবির
—সত্য ও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি।
য়া এই সৃষ্টিতে প্রতিফলিত
। কোমল ও কঠোর, দুই
কৃতি। চিত্র অঙ্কিত করিতে
লাক ও ছায়ার প্রয়োজন, প্রকৃ-
ার জন্য সেইরূপ কোমল ও
—দুয়েরই প্রয়োজন। এই দুয়ের
বড়ই গভীর ও রহস্যময়। এবং
মল ও কঠোরের সমাবেশে, মানব
র মহাসমস্যা 'ছকে' মিলাইয়া,
একটি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতে
সুতরাং কবির কাজ অতি উচ্চ ও
ই জন্যই আমি প্রবন্ধের মুখবন্ধে
ছি, প্রকৃত কবি ও দার্শনিক,—সাধক,
বা তত্ত্বজ্ঞানী, এবং ভক্ত ও ভাবু-

কের ক্ষুদ্র শিষ্য। সংসারে থাকিয়াও তাঁহাদিগকে একটু স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে হয়; একটু নির্লিপ্ত ভাবে থাকিতে হয়। সাধারণ বিষয়ী লোকের মত তাঁহাদের খাত হইলে তাঁহাদের লেখার খাতও খাঁটী হয় না, স্থায়ী সাহিত্যেও তাহা স্থান পায় না। কারণ সত্যসেবী, সত্যের উপাসক, সত্যের প্রচারক হইতে হইলে, তাঁহাকে বড় কঠোর ব্রত গ্রহণ করিতে হয়;—সাময়িক সুখ্যাতি অখ্যাতি, নিন্দা যশঃ, লাভ ক্ষতি, শত্রুতা মিত্রতা, এ সকলকে তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়া আপন গন্তব্য পথে চলিতে হয়। সত্যের ধ্যান ও ধারণায় তন্ময় হইয়া,—বাক্যে কথনে মনে জ্ঞানে, ভাবে ব্যবহারে,—অসত্যের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ না করিয়া তাঁহাকে থাকিতে হয়। সংসারের নিষ্ঠুরতা ও নির্য্যাতন, অদৃষ্টের তাড়না ও বিড়ম্বন, পদে পদে তাঁহাকে সহিতে হয়। কোন এক ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, "দ্বাদশ বর্ষকাল অনন্যমনা হইয়া সত্যের সেবা করিলে, মিথ্যায় আর মন আসিবে না; অসত্যে আর প্রবৃত্তি হইবে না।"—হায়, দ্বাদশ বর্ষ! মোহান্ধ মায়ার জীব,—দ্বাদশ মুহূর্ত্ত, দ্বাদশ পল সত্যে অটল আস্থা স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে কি না, তাহাই সন্দেহ স্থল। এমত অবস্থায় নিত্য ও অনন্তকাল স্থায়ী সাহিত্যের উদ্ভব হইবে কিরূপে? সেই জন্যই না হিন্দুর বেদই এক মাত্র সনাতন সাহিত্য? আর সত্যময় হইয়াছিলেন বলিয়াই না ভারতকার ব্যাস আপন মাতৃজারত্বও অম্লানবদনে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? আর, সেই জন্যই না সেই পঞ্চমবেদ-প্রণেতা 'ব্যাসো নারায়ণঃ হরিঃ' ইত্যাকার বিশেষণে অভি-

হিত হন ? হায় সত্য ! তোমার সৌন্দর্য্যে যে বিমোহিত হইয়াছে, সে কি আর লোক-লৌকিকতার ধার ধারে ? না, পৃথিবীর যশঃ নিন্দায় স্ফীত বা সঙ্কুচিত হয় ? তোমাতে মোহিত হইয়া ছিলেন বলিয়াই মহাত্মা সক্রেটিশ বিষপান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই; আর মহামতি খ্রীষ্ট জীয়ন্তে ক্রুশ-কাষ্ঠে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ দিতেও পশ্চাদ্‌পদ হন নাই।

এই সত্য, এই সৌন্দর্য্য, এই মহাদর্শ, এই অলৌকিক জীবন্ত চিত্রে আকৃষ্ট হইয়া কবি ও দার্শনিক ক্ষণকালের জন্য বাহ্য জগৎ বিস্মৃত হন আপনাকে বিস্মৃত হন, গভীর ভাব-সমুদ্রে ডুবিয়া রত্ন আহরণ করেন। সেই রত্নের বিমল শোভা দেখিতে দেখিতে, ক্রমেই মানবের জ্ঞানচক্ষু ফুটিতে থাকে, হৃদয় ও মন প্রশস্ত হয়, হিংসা দ্বেষ, কুটিলতা ক্রুরতা এবং নীচতা ও স্বার্থপরতা ক্রমেই বিদূরিত হইয়া যায়। তখন মানব,—"জীবে প্রেম, স্বার্থ ত্যাগ, ভক্তি ভগবানে"—এই মহামন্ত্র ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের অধিকারী হয়।

সাহিত্যের এই যে উচ্চ আদর্শ, ইহা এখন পাইব কোথায় ? ইহা দিবে কে ? ধর্ম্মগ্রন্থ, শাস্ত্রগ্রন্থ, অথবা নীতিগ্রন্থ ত তেমন সহজ পাঠ্য নয় এবং সেই হিসাবে ইহা তেমন মনোজ্ঞও নয়;—তবে সাহিত্যের ঐ উচ্চ আদর্শপূর্ণ গ্রন্থ দেয় কে ? দার্শনিক ত একটা গম্ভীর বিষয় লইয়া তাহার বিশ্লেষণ করিতে করিতে মন মরা করিয়া মাথা ঘুরাইয়া দেন; বৈজ্ঞানিক তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন,—তিনি আবার প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ আবিষ্কারার্থ কতই না সংশ্লিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, একীকরণ, যন্ত্রসংযোগ প্রভৃতিতে ক্ষীণপ্রাণ মানবের

সহিং
পুরা·
ইতিবৃ
যকে অে
আশার মোহ
ত্বের পথে লইয়
কবিই সে ভার গ্রহণ
বের বর্ত্তমান ও ভবিষ
আশা সদাতা, বন্ধু ও গু
তুল্য লোকশিক্ষক আর
প্রকৃত সাহিত্যকার, এ
স্থায়ী সাহিত্য। কা
কেবলই ছন্দো-বন্ধ-সুর-
পদ্য বুঝিতে হইবে না,—
ময়, চির নূতনত্ব পূর্ণ,
সাহিত্যও কাব্যনামে
থাকে। দেশ কাল পাত্র
ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান বিস্মৃত হই
যথাজ্ঞানে, মনুষ্য জীবনের প্র
দিনের জন্য লোকশিক্ষার বি
তেই কবির জন্ম। জগতে
করুণ ক্রন্দন, বিশ্ববাসী নরনা
রোদন,—আপন প্রাণে উপলি
বুঝি কবির অভ্যুদয়। মহাপ্রাণ
সহানুভূতির সহিত জগতের সে
দূর করিতে সচেষ্ট হন। আশ
উপায় দেখাইয়া, পন্থা নির্দ্দেশ
তিনি তাঁহার ভক্তবৃন্দকে সান্ত্বনা
পুলপিটে দাঁড়াইয়া, বক্তৃতা না দি
কর' না বলিয়া, তিনি একটী 'মনের
অঙ্কিত করিয়া দেন, এবং তাহার
পার্শ্বিক ঘটনা ও কার্য্যাবলী এমন
চিত্রিত করিয়া থাকেন যে, নিরা
মহাদুঃখীও তাহা দেখিয়া সান্ত্বনা

কাঁদিতে কাঁদিতেও নির্ম্মল সুখের আস্বাদন পাইয়া থাকে। এই শ্রেণীর কবির যে কাব্য, তা পদ্যই হোক্ আর গদ্যই হোক্ স্থায়ী সাহিত্যে তাহারই স্থান সকলের উচ্চে। এই জন্য সকল দেশে, সকল সমাজেই কাব্য গ্রন্থের এত আদর! কাব্য,—উচ্চ আদর্শপূর্ণ, চির-নূতনত্বময়; তাই সৌন্দর্য্য-পিপাসু মানুষ সহজেই তাহাতে আকৃষ্ট হয়। অবশ্য সকলকে সংসার-ধর্ম্ম করিতে হইবে, ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে হইবে, জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইবে,—এমত অবস্থায় কেবলই কাব্য লইয়া থাকিলে চলিবে না,—তজ্জন্য ঘটনামূলক স্থূল সাহিত্য এবং সাময়িক সংবাদাদি পূর্ণ হিসাব-নিকাশ বিশিষ্ট জীবিকা উপায়োপযোগী গ্রন্থের ও প্রয়োজন। কিন্তু সত্যের অনুরোধে এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, স্থায়ী সাহিত্যে উহার স্থান অল্প। যাহা "সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের," তাহাই উৎকৃষ্ট সাহিত্য, এবং সেই সাহিত্য হইতেই মনুষ্যত্ব।

এ পর্য্যন্ত আমি কবি ও কাব্যেরই উল্লেখ করিয়াছি। আমার আশঙ্কা হইতেছে, যেমন অনেকে মনে করেন, সাহিত্যের নামে, ভিন্ন পূর্ণ কাব্য আসিল কেন? এ কথায় কঠোর, বক্তব্য এই,—প্রকৃত কাব্যই— সমাবেশ। কাব্যকে ছাটিয়া ফেলিলে সাহিত্যের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়। মহামতি দক্ষ-জীবনে [illegible]বকে বাদ দিয়াও যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার [illegible] করিয়াছিলেন! সেইরূপ, কাব্যকে [illegible] দিয়া সাহিত্যের আলোচনা করাও [illegible] স্পর্দ্ধার কথা। ভিন্ন কাল যেরূপ [illegible] আছে, তাহাতেই এই কৈফিয়ৎ টুকু [illegible] প্রয়োজন আছে। কেন আছে,—সে কথা হয়ত আমায় আর এক দিন বলিতে হইবে।

এখন যে কথা বলিতেছিলাম:—সাহিত্য হইতেই মনুষ্যত্ব। "আপনাকে লইয়া থাকাই মনুষ্যত্ব নহে। যাহা নিকৃষ্ট জীবের লক্ষ্য, মনুষ্যের লক্ষ্যও তাহাই নহে। মনুষ্যকে তাহার লক্ষ্য বুঝাইতে, তাহার অন্তরে জ্ঞানশিক্ষা প্রজ্বালিত করিতে, এবং রক্ত মাংসের শরীর ভুলাইয়া চিন্তা ও বুদ্ধির সর্ব্বপ্রথম অধিকার দিতে,—এক কথায় দেহকে ছাড়িয়া মনকে বুঝিতে [illegible] কাজ। সর্ব্বথা, প্রতিভাবান্ কবিও তাহাই করিয়া থাকেন।" সেইজন্যই কবি জগতের বন্ধু,—সমগ্র নর-নারীর প্রীতির পাত্র। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যখন মূলের অনুসন্ধান করিতে করিতে বিদ্যা, বুদ্ধি ও চিন্তার অতীত রাজ্যে গিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন, তখন এক হিসাবে তিনিও কবি হন; তাঁহার তত্ত্ব তখন কবির স্বভাবজাত সৌন্দর্য্যে মিশিয়া এক হইয়া যায়;—সে এক মহাযোগ! দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে মৃত্যুকে উল্লেখ করিতে পারা যায়। মৃত্যুর পরে যে কি হইবে, তাহা কবিও যেমন বুঝেন, দর্শনিকও সেইরূপ বুঝেন, বৈজ্ঞানিকও তদ্রূপ বুঝিয়া থাকেন। অথবা, এ তিনের কেহই কিছুই বুঝেন না। না বুঝিয়া, শেষোক্ত দুই জন কিছু সন্দিগ্ধচিত্ত হন; কিন্তু প্রথম জন তখনও আশা ছাড়েন না,—তখনও তিনি আশার অমৃতময়ী দেব-বাণী শুনাইতে থাকেন। সে কি অপূর্ব্ব গম্ভীর সান্ত্বনা!

কিন্তু হায়! পাশ্চাত্য জগতে এক রব উঠিয়াছে, 'বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সহিত

কবিতা ক্রমশই লয় প্রাপ্ত হইবে।' কিন্তু কথাটা কি ঠিক? কবিত্বের বিলোপ,—ইহা কি সম্ভবপর? "না, একথা মানিতে আমরা প্রস্তুত নই। যখন সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে কবিতার উৎপত্তি, তখন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কবিতাও অনন্তকাল স্থায়িনী হইবে। মানুষ যত দিন মানুষ থাকিবে, অথবা মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব লাভ করিবে, তত দিন কবিতাও সঙ্গে সঙ্গে বিরাজ করিতে থাকিবে। এবং সেই সঙ্গে তাহার শোভা, শ্রী, সৌন্দর্য্য ও স্ফূর্ত্তি সম্যকরূপে পরিবর্দ্ধিত হইবে। যাহা সত্য, সুন্দর, যাহা সার ও শুভপ্রদ, যাহা জীবনের সান্ত্বনা এবং আত্মার আহার, তাহাই কবিতা,—এবং তাহার অনুশীলন করাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।"

কবিতার বিলোপ অসম্ভব! বিজ্ঞানের আলোকে কাব্যের স্ফূর্ত্তি হয় না—একথা কখন বুঝিতে পারিলাম না। কাহারও কাহারও ধারণা,—কবিতা অর্দ্ধ নিদ্রা অর্দ্ধ জাগরণ, অর্দ্ধ চেতনা অর্দ্ধ স্বপ্ন, অর্দ্ধ স্মৃতি—অর্দ্ধ বিস্মৃতি!—যেন প্রাণটা কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন, প্রখর রবি-কিরণে তাহা ফুটিয়া উঠে! কিন্তু বিজ্ঞানের আলোক এতই সত্য, এতই তীব্র, এতই জ্বালাময় যে, ক্ষীণপ্রাণ কবিতা প্রাণভয়ে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়!—এ কথা আমরা এত দিন বলিতে শিখি নাই—শুনিয়াছি নাকি, এ কথা কোন্ সুসভ্য, সুশিক্ষিত সুদূর প্রদেশ হইতে আসিয়াছে! আমরা তাঁহাদের কাছেই ইহা শুনিয়াছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও শুনিয়া থাকি যে, সেই দেশে যখন বিজ্ঞানের বড় আদর, বড় খ্যাতি, বড় স্ফূর্ত্তি, কবিতা তখনও সেখানে রত্ন সিংহাসনে রাজ-রাজেশ্বরী রূপে অধিষ্ঠিতা! তাই বলিতেছিলাম, কবিতার বিলোপ নাই। তাহা হইলে এই অপূর্ব্ব কবিত্বময় নিখিল সংসার,—এই অসীম রহস্যময় মানব-জীবন সঙ্গে সঙ্গেই যে বিলুপ্ত হইবে! হায়! সে অনন্ত শূন্যে, জানি না, কোন্ মহাপুরুষ বিজ্ঞানের অসাধারণ ক্রীড়া-কৌতুক দেখিবার জন্য জাগিয়া থাকিবেন!

এখন, এ মহাবস্তু কবিতা পাইব কোথায়? মহাকবির কাব্য আলেখ্যেই তাহা পাইব। বিশ্ব-প্রকৃতির জাগ্রৎ জীবন্ত ভাব দেখিয়া যে মহাদর্শের সৃষ্টি, যাহা ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া পড়িতে হয় এবং প্রাণের আবেগে বলিতে হয়,—'হে কবি! কোথায় তুমি? হে প্রকৃতি! তুমি কে? কবি কে?'—প্রকৃত সাহিত্যকার কবি সেই মহা সত্য প্রচার করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হন, এবং সেই সত্যের আলো[illegible]ষ্যত্ব শিক্ষা করিয়া আমরাও ধন্য হ[illegible]

বলিবে, অনেক সময় সাধ[illegible]ধ্যের অনতিক্রমণীয় পথে মহাক[illegible]হতী প্রতিভা চলিতে থাকে,—তাহা[illegible]জের লাভ কি? লাভ আছে বৈ [illegible] "সেই প্রতিভা মর্ত্ত্যলোক ছাড়িয়া [illegible] গগনে বিলীন হইয়া যায়—যাউক; [illegible]মায়া-মন্ত্রে স্বপ্নরাজ্যে বিভোর হইয়া আত্মবি[illegible] হইয়া থাকে থাকুক;—কল্পনা-রথে চড়ি[illegible]া দেশ দেশান্তরে, লোক লোকান্তরে বিচর[illegible]ণ করে করুক; তাহাতেই সেই প্রতিভার সম্যক স্ফূর্ত্তি হইতে পারে। পরন্তু; সেই প্রতিভাকে আবার মনুষ্য-সমাজে [illegible]ফিরিতে হয়। উষার স্নিগ্ধ আলোকে আপন কুলায় ছাড়িয়া যে পক্ষী অনন্ত গগনে [illegible] অমর সঙ্গীতে জগৎ প্লাবিত করিয়া [illegible]

সন্ধ্যার স্নিগ্ধ মধুর ছায়ায় তাহাকে আবার নামিতে হয়।"

কাব্যেরও সেই রূপ—কখন কখন মানসচক্ষের অতি দূরে ঊর্দ্ধ-গমন আবশ্যক হয়। কিন্তু তাহা যতই ঊর্দ্ধে বিচরণ করুক, তাহার মূল তোমার আমার অন্তরের অন্তরে নিহিত আছে! লকে-বাঁধা ঘুড়ি, কত ঊর্দ্ধে উঠিবে উঠিতে দাও—সেত ক্রীড়ার পদার্থ মাত্র। আমার প্রাণের কথা বলিতে বলিতে যখন তোমার মহতী প্রতিভা অনন্ত শূন্যে উঠিতে থাকিবে, তখন কি
মি মনে কর, আমিই পড়িয়া থাকিব?
আমার প্রাণও সেই সঙ্গে সঙ্গেই উঠিতে
।! পথ অনন্ত, জীবনও অনন্ত।—
তোমায় আমায় একাকার হইয়া
যদি প্রতিভার সে ক্ষমতা না থাকে,
কেবল ঐ লকে-বাঁধা ঘুড়ির মত—
ঠিল, আবার বালকের ইচ্ছানু-
আকর্ষণেই নামিয়া পড়িল।
তা নহে,—প্রতিভার ভ্যাঙ্গানি

:, কাব্য সাধারণ মানুষের বুদ্ধি
অতীতে অগ্রসর হইলে, নিরাশায়
াইও না। কাব্য কেবল ইহ-
। ইহ-জীবন লইয়া নহে। তাহা
ার রূপান্তর হইত। যতই ঊর্দ্ধে
ব্য, তোমাকে আমাকে ভুলিবে
তে পারে না। কারণ তোমার
র হৃদয়-পটে বিশাল বিশ্বের
বাইতে তাহার প্রয়াস!
নাই, কাব্য কখন ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে
ারে না। দেশ কাল পাত্র বিশেষ
াহার পরিতৃপ্ত হয় না। তবে আব-
ধ, কবি দণ্ড-পুরস্কারের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন বটে। কিন্তু তাহাও অতি সাবধানে,—অতি বিচক্ষণতার সহিত। —আবশ্যক বোধে কবি তখন সমাজের নেতা হন, এবং অন্য অপেক্ষা অনায়াসে আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। কারণ সমাজের উপর—তথা মনুষ্যের হৃদয়ের উপর তাঁহার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এ জন্য সৎ কাব্য পাঠে সমাজের যেমন হিত হয়, অসৎ কাব্যে আবার তেমনই অহিত সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং কবিকে অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে চলিতে হয়। তাঁহার দায়িত্ব অতি গুরুতর। দেশাধিপতি বহিঃরাজ্য শাসন করেন, আর কবি মানবের অন্তর্রাজ্যে আধিপত্য করিয়া থাকেন!

যে কবি বা সাহিত্যক [illegible] গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ভুলিয়া বিপথে চালিত হন, তিনি দেশের শত্রু, সমাজের শত্রু, সমগ্র মানব জাতির শত্রু।*

* এখানে একটী গল্প মনে পড়িল। গল্পটি ইতিপূর্ব্বে প্রবন্ধান্তরে লিখিয়াছি।—ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় এক লেখককে লক্ষ্য করিয়া, জনৈক নীতিবেত্তা উপদেশচ্ছলে এই গল্পটি করিয়াছেন। গল্পটির মর্ম্ম এই:—এক ফরাসী লেখক বহু গ্রন্থ লিখিয়া পরলোকগত হইয়াছেন। পরলোকে ঈশ্বরের কাছে তাঁহার পাপ পুণ্যের বিচার হইল। বিচারে লেখক মহাপাপী বলিয়া গণ্য হইলেন। তাহার ফলে, উত্তপ্ত লৌহকটাহে উষ্ণ তৈলে তাঁহাকে নিক্ষিপ্ত করা হইল। লেখকের পার্শ্বে ঐরূপ তপ্ত তৈলে আর একটি জীবও দণ্ডভোগ করিতেছিল। সে,—দস্যু। কিন্তু তাহাকে বেশ শুষ্ক ইন্ধন সাহায্যে আগুন করিয়া তপ্ত তৈলে ভাজা হইতেছে। আর লেখক মহাশয়ের ভাগ্যে যত রাজ্যের কাঁচা কাঠ পড়িয়াছে। তাহার ফলে তিনি ধিকি ধিকি করিয়া, দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া সেই তপ্ত তৈলে পুড়িতেছেন। নিকটে রক্ষক দণ্ডায়মান। রক্ষককে দেখিয়া লেখক কাতর বচনে কহিলেন,

কথাটার বিশ্লেষণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। তবে কথা এই, যাঁহারা লোক-শিক্ষকের পদে আসীন হইয়া, ক্ষুদ্র স্বার্থানুরোধে আপন কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বিস্মৃত হন, তাঁহারা দেশের উপকার করিবার ব্যপদেশে, ঘোর অপকার করিয়া থাকেন। অবশ্য ইঁহাদের অস্তিত্ব, সাহিত্য জগতে অধিক দিন থাকে না। সম সাময়িক পত্র-সম্পাদকের সুখ্যাতি বা অখ্যাতি পাইয়া, শীঘ্রই ইঁহারা অনন্ত কাল-বুদ্বুদে লীন হন। সেই যা আশার কথা।

পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি, "জগতের বুকে যে কথা লুকানো আছে, হৃদয়ের ভাষায় তাহা পরিব্যক্ত করিয়া কবি আপনার জগৎ সৃষ্টি করেন।"—জগতের বুকে লুকানো আছে কি? ব্যথা, দুঃখ, অবসাদ, কান্না, মর্ম্ম-কাতরতা,—এই সব। কিন্তু ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন সুখের কোন ছবি কি জগতের বুকে নাই? আছে।—কিন্তু তাহার স্মৃতি বড় অস্পষ্ট, বড় ম্লান। ক্ষীণ সুখের আলোকে দুঃখের চিত্র ঘনীভূত হয়। ঘোর নিশীথে, প্রান্তরে, আলেয়ার আলোর ম আরও ভীতিপ্রদ হইয়া থাকে। মানুষের জন্ম, কাঁদিয়াই মানুষে এই অনন্ত দুঃখ-পারাবারে সুখে ধ্রুব-তারা দেখিতে পাওয়া যায়,- ভক্তবৎসল ভগবানের প্রেমচ্ছ ছায়ার অন্য নাম ধর্ম্ম। প্রতি প্রখর অন্তর্দৃষ্টিবলে, সেই ছায়াতে ও জগৎ দেখিয়া লন এবং কাব্যে অঙ্কিত করেন। তিনি দেখিয়া শোকাতুরা জননী ক্রন্দন করি তাহাতে কি অপূর্ব্ব কাব্য দেখিয়া লন, সতী মৃতপতি কে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া তাঁহার মুখে কি গভীর মর্ম্ম-ব্য পাইতেছে! দেখিয়া লন, নীর বিজন অরণ্যে, স্ফুটচন্দ্রালোকে প্রাণ প্রণয়িনী এক হস্তে দিয়া অন্য হস্তে অশ্রুমোচন করি প্রেমের কি জীবন্ত অভিনয় ক

"বাপু, এ তোমাদের রাজ্যের কেমন বিচার! ঐ দস্যু সারা জীবন পরের কাড়িয়া খাইয়াছে; কত লোককে প্রাণে মারিয়াছে; আর আমি গ্রন্থকার,—কত কষ্টে কয়েক খানা বই লিখিয়া কোন রকমে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছি,—তা ওর আর আমার এক বিচার হইল! বাড়ার ভাগে ওকে বেশ শুকনো জ্বালানি কাঠ দিয়ে জ্বাল দিবার ব্যবস্থা? হ'য়েছে, আর র ভাগ্যে রাজ্যের কাঁচা কাঠ।—কেবলই ধোঁয়া,—ধ'রে ধরে না। বাপু, তপ্ত তেলে ঝল্‌সে পুড়িয়ে ভেজে মার্‌বে, এতেও ইতর বিশেষ?" রক্ষক হাসিয়া উত্তর দিল—"গ্রন্থকার মহাশয়! এমন সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হ'লে আর আপনি গ্রন্থকার হন? বলি, ও তো ডাকাত; ওর মানুষ-মারার ত একটা সংখ্যা আছে; কিন্তু আপনার কাণ্ডটা কি, ভাবুন দেখি? জীয়ন্তেও আপনি সহস্র সহস্র লোককে মারিয়াছেন, আবার মরণান্তেও আপনি সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ-বধের বীজ পৃথিবীতে রাখিয়া আসিয়াছেন!—আপনার কেতাবের জড় ত শীঘ্র মরিতেছে না!" শ্রোতৃবৃন্দ বুঝিবেন, তখন ফরাসী রাজ্যের অবস্থা কিরূপ ভীষণ! লোকের ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই; পরকালে আস্থা নাই; পাপ পুণ্যের ধারণা নাই;—উচ্ছৃঙ্খলতায়, অরাজকতায় ও যথেচ্ছাচারিতায় তখন দেশ পূর্ণ; ভোগসুখ ও ইহকাল লইয়াই ফরাসী তখন দিশাহারা। সেই ভীষণ ভয়াবহ সময়ের চিত্র,—সত্য ও অভ্রান্তভাবে প্রতিপন্ন করিয়া উক্ত লেখক মহাশয়, লোকের হৃদয়ের উপর প্রবল আধিপত্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাই বিধাতার বিধানে লোকান্তরে তাঁহার এই দুর্গতি।

দেখিয়া লন, অনন্ত-বিস্তৃতা স্রোতস্বতী কেমন কুলু কুলু রবে কাঁদিতে কাঁদিতে আপন মনে চলিয়াছে। দেখিয়া লন, দুর্ভিক্ষে অগণিত বুবুক্ষু নরনারী জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার হইয়া, কেমন ধীরে ধীরে মাটীর দেহ মাটীতে মিশাইয়া রাখিতেছে! মানস-নয়নে এই সব দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, আর সেই কান্নার সঙ্গে সঙ্গে, তিনি তাঁহার আলেখ্য সম্পূর্ণ করেন। লীলাময়ী প্রকৃতি নীরবে এই যে সব নিষ্ঠুর খেলা খেলিতেছে, কবি প্রতি-
তাহা মানসচক্ষে অবলোকন করি-
,—আর কাব্যে ও সাহিত্যে তাহাই
করিয়া জগতের সহানুভূতি আক-
চেষ্ট হইতেছেন। অতএব—দুঃখেই
হার বিকাশ, এবং এই মনুষ্যত্ব হই-
হিত্যের উদ্ভব।

র স্বর্গভ্রষ্ট সোণার শিশু সুধা-
াসিয়া জননীর কোল আলো-
তেছে; শরতের চাঁদ জ্যোৎস্না
কাশে ভাসিতে ভাসিতে, সুধা-
ইতে ছড়াইতে চলিয়াছে; নব
স্মিত বদনে পরস্পরের পানে
য়নে চাহিয়া চাহিয়া কত আশা
গড়িতেছেন;—কি সুখের দৃশ্য!
সার দুঃখময়? কিন্তু হায়! মুহূর্ত্তের
মুহূর্ত্তেই শেষ! অকস্মাৎ ও কি
হসা ঝড় উঠিল, আকাশ মেঘা-
সূচীভেদ্য ঘন অন্ধকারে আকাশ-
ক হইয়া গেল, মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ
খিল,—হায় হায়, ও কি হইল!
[illegible]ডে চারিদিক্ প্রকম্পিত
[illegible] বজ্র নিম্নগামী হইল;—
[illegible]দিকে, যে [illegible] এই পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে উল্লসিত নবদম্পতী আশার স্বপ্ন বুকে লইয়া সংসারে নন্দনকাননের সৃষ্টি করিতেছিলেন, দেখিতে দেখিতে দেখিতে হায়! সেই কাননের একটী ফুটন্ত ফুল বজ্রদগ্ধ হইয়া ঝলসিয়া পড়িল,—আর সেই সঙ্গে আর একটি অফুটন্ত বালিকা-জীবন চিরঅন্ধকারময় হইয়া গেল। আর ওদিকে, আর এক স্থানে, সেই যে সোণার শিশু, মায়ের অঞ্চল ধরিয়া আঙ্গিনায় নাচিতে নাচিতে অস্ফুট ভাষায় কত খেলাই খেলিতেছিল,—ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে,সে গিয়া কুটীরে উঠিল;—ঝড়ের প্রাণে বুঝি ইহা সহিল না, সে রাগিয়া—আরও গর্জ্জিয়া সেই কুটীরখানি ভূমিসাৎ করিয়া দিল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে, সেই মাকে জীবিত রাখিয়া, মায়ের জীবনের অধিক স্নেহের নিধিটীকে ছিনাইয়া লইল। অভাগিনী জননী শিহরিয়া দেখিলেন, এক খণ্ড বংশ তাঁহার বুকের নিধির বুক ভেদ করিয়া পৃষ্ঠদেশে বাহির হইয়াছে! 'যাদু আমার!' বলিয়া জননী মূর্চ্ছিতা হইলেন, সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না! অ-হ-হ! নিষ্ঠুর ভবিতব্য!

কবি বলিতেছেন, "দেখ দেখি ভাই! আমি দুঃখের চিত্র অঙ্কিত করি বলিয়া তুমি অনুযোগ কর; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ কোন্ খান্‌টায় আছে বল দেখি? 'সুখ' বলিয়া লোকে যাহাকে গ্রহণ করে, প্রকৃত প্রস্তাবে, তাহা সুখ নয়, তাহা দুঃখেরই আর একটা দিক্। সুখ পাইবার আশায় লোকে সুখের অভিনয় করে মাত্র; প্রকৃত সুখ পায় না। প্রকৃত সুখ সংসারে নাই। যদি থাকে, তো এক ভগবৎ প্রেমে, আর আত্মবিসর্জ্জনে। এই আত্ম-বিসর্জ্জনেই মনুষ্যত্ব। আমি দুঃখের চিত্র দিয়া মনুষ্যত্বের

প্রচার করি। আমাকে না বুঝিয়া তুমি দোষ দাও!

"দেখ, অমন যে কুসুম, তাহাতে কীট আছে; অমন যে কমল, তাহাতে কণ্টক আছে; অমন যে চন্দ্র, তাহাতে কলঙ্ক আছে; অমন যে প্রণয়, তাহাতে বিচ্ছেদ আছে; আর অমন যে জীবন, তাহার পশ্চাতেও মৃত্যু আছে। এত সত্ত্বেও তুমি সংসারে সুখের আশা কর কি বলিয়া?"

এক হিসাবে এ সকল নিরাশা কাব্যের কথা। জগৎ দুঃখময়, জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই, মায়া নাই, মমতা নাই—দয়া নাই বিচার নাই। আমরা কেবল দুঃখ সহিবার জন্যই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, যত দিন বাচিয়া থাকি, কেবল নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করি, তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে চির বিদায় গ্রহণ করি। কোথায় যাই, কে বলিতে পারে? যদি জগদন্তর থাকে, তবে সেখানে ইহাপেক্ষাও যে দুঃখ নাই, কে বলিতে পারে? এইরূপ নিরাশার বাণী যে কাব্যের প্রাণ, তাহা নিরাশা কাব্য। আমি এমন কথা বলিতে পারি না যে, এই কাব্যকার যাহা বলেন, তাহা ঠিক নয়। তবে আমার বিরোধ এই, তিনি কেবল একটা দিক দেখিয়াই সৃষ্টি-রহস্য বুঝিতে চান। মানব সাধারণতঃ অবস্থা ও ঘটনার দাস, প্রতিকূল ঘটনার স্রোত মানুষকে প্রায়ই ভাসাইয়া লইয়া চলে; যদি কেহ সেই অবস্থায় সহানুভূতি করিয়া সান্ত্বনা দেয়, তবে মানব প্রাণ তাহারই দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হয়। এই জন্য নিরাশা কাব্যে জগতের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের আশঙ্কা কিছু অধিক। প্রতিনিয়ত প্রতিকূল ঘটনার আবর্ত্তে পড়িয়া মানব প্রাণ উন্মত্ত হয়। তখন দিগ্বিদিক হারাইয়া, মানুষ—হয় আত্মঘাতী হয়, নয় জীবন্মৃত হইয়া সংসারে অভিশপ্ত দেহভার বহন করে! সুখের বিষয়, আমাদের কাব্যের উপাদান এরূপ নহে। এখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমরা কাব্যের মধ্যে যতই নিরাশার কথা আনিনা কেন, তথাপি সেই নিরাশার মধ্যেও আমরা সুখের চিত্র না দেখাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। ইহা আমাদের অস্থি মজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে শুভ্র ফেনরাশির উদ্ভব হয়, যেমন মেঘে মেঘে ঘর্ষণ হইয়া ম বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়—সেইরূপ নান অশান্তির ভিতর দিয়াও সুখের হইয়া থাকে। আমরা কখনই ভ বিশ্বাস হারাইতে পারি না। আ ধ্রুব বিশ্বাস যে, জীবনের এ হাহাকার হাহাকারেই পরিসমাপ্ত হইবে না ক্রন্দন সেই সর্ব্বনিয়ন্তার চর ছে। দুর্দিনের অবসানে, আব আলোক দেখিতে পাইব!

এই আশার বাণী কেবল সা নহে। কোন্ হিন্দু ইহজীবনের পরিতৃপ্ত থাকিতে পারেন? সর্ব্বকর্ম্মের ভিতরও কোন অদৃ স্পষ্ট অনুভবনীয় কালের পানে ইয়া থাকেন? এই জন্য কাব্যে, আমাদের সাহিত্যে, সার কথা আলোচিত হইয়া থা দেশের কাব্য যতই উৎকর্ষ তাহা আমাদের আদর্শেই তেছে মাত্র। তবে আমরা কাব্যের একটা প্রশ্রয় আজ থাকি, তাহার কারণ, আ কিছু আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছি

বিশ্বাস যেন হারাইয়াছি। ইহার ফলে এই হইয়াছে যে, আমরা কিছু আত্মপ্রিয়, সুখান্বেষী, ও ইহকালসর্ব্বস্ব হইয়াছি! সুখান্বেষী হইয়াও সুখের আস্বাদ পাইতেছি না। তাই কাতর প্রাণে হাহাকার করিতে করিতে জীব-লীলা শেষ করিতেছি!

সুখ আত্ম-প্রতিষ্ঠায় নহে, আত্মবিসর্জ্জনে। এ কথা অতি প্রাচীন; কিন্তু হায়, আজিও ইহা শিখিবার বিষয়! আমরা এখন ইহ জীবনের সুখে এতই অন্ধ হইয়াছি যে, কড়াক্রান্তি হিসাব করিয়া সুখের মাত্রা ঠিক ক'　　যত্নপর হই! কাব্যের　　এখন নামিয়া পড়ি　　সেই জন্ম হীনতর　　এ দেশে নিরাশা　　ক্রমে বাড়িয়া যাই　　গণ বিবিধ দুঃখের　　ত্য, কিন্তু তাহার　　কটু অনাবিল　　স টুকু কি

[illegible]

.য় নাই। এটী হিন্দুর　টি হিন্দুর জাতীয় ধর্ম্মভাব। এই　ম্মপ্রাণিত হইয়া হিন্দুকে সাহিত্য　ত্ব লাভ করিতে হইবে। অন্য　থা যাহাই হোক্, আমাদের এ দেশ　র আবার উঠে, তো সে এই ধর্ম্ম　উঠিয়াছিল ও এক দিন যাহা, তাহাও　ভাবে। সেই ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার　হইবে। সাহিত্য ও মনুষ্যত্বের　[illegible] করিতে হইবে।

[illegible] সুখের, অনেক উত্তাপ, অনেক মলা, অনেক কালি ইহাতে ধুইয়া যায়। করুণতা জগতের প্রাণ, করুণ রস কবিরও সর্ব্বস্ব। তাই না সেই আদি কবি মহাকবির মুখনিঃসৃত করুণরসপূর্ণ "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং" ইতি শীর্ষক সেই আদি শ্লোক? মহাকবি মানসনেত্রে যেন মূর্ত্তিমতী করুণাকে দেখিয়া চরাচর বিশ্বের ক্রন্দনের সুর সম্যক উপলব্ধি করিয়া, হৃদয়ের পরিপূর্ণ আবেগে, যেন এই প্রথম কান্না কাঁদিলেন এবং তারপর সেই সুরে অপূর্ব্ব রামচরিত লিখিয়া, জগৎকে মন্ত্রমুগ্ধ করিলেন!

"দেখ, মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় জীবনের সেই প্রথম মুহূর্ত্তের সেই প্রথম কান্না, আর শেষদিনে বিদায়ের কালে সেই শেষ কান্না,—ভাল করিয়া ছকে মিলাইয়া দেখ, মধ্যকার ঘটনাগুলি যেন একটা দুর্জ্ঞেয় যাদুময়! অথচ আবার একটু ভাল করিয়া দেখ, সেই একই চাবিগান,—সেই একই কান্নার সুর,—সারাটা জীবন ব্যাপিয়া, তোমার হৃদয়ের উপর কি প্রবল আধিপত্য করিয়া গেল।

"সে দিন একখানা কাগজে পড়িতেছিলাম, একজন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন,—"মানুষ যে মরে, সে কেবল মরণ কামনা করে বলিয়া; মৃত্যুর ভাবনা ভাবে বলিয়া; নহিলে মানুষ অমর হইতে পারিত।" কথাটার আর কোন মূল্য না থাক্, ইহা ঠিক যে, মানুষ চিরদিন পুরাতন লইয়া থাকিতে ভালবাসে না; একঘেয়ে একটানা জীবন ক্রমেই তাহার কাছে বড় বেশী ভারবহ বোধ হয়;—নূতন দেখিব, নূতন পাইব, মরণেই বুঝি সুখ, এই রকম একটা ভাবনা, বুঝি তাহার মনের মধ্যে কখন কখন উ

ঝুকি মারিতে থাকে, আর সেই অবস্থায় সে তখন আপন মনে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে থাকে,—"কোথা তুমি হে জীব-জীবন! কোথা তুমি, হে নিখিল-নির্ভর! কোথা তুমি, হে মহাদর্শ। চিরদিন কি তোমায় আমায় প্রভেদ থাকিব? এ অভেদে প্রভেদ কি ঘুচিবে না? তোমার সহিত কি আমার মিলন হইবে না?"—এই রকম একটা কান্নার সুর, কখন জ্ঞাতসারে এবং কখন বা অজ্ঞাতসারে, মানুষের মর্ম্মস্থলে বাজিতে থাকে। ইহাকে যা খুসী বলিতে ইচ্ছা হয় বল, কিন্তু কথাটা খাঁটী।

"আর হাসি? যে হাসিতে সুধা ক্ষরে; যে হাসি দেখিয়া স্বর্গের কথা মনে পড়ে; যে হাসিতে অনাবিল, শুভ্র, শান্ত, পবিত্র হৃদয় জ্যোতি ফুটিয়া উঠে, ভগবদ্ভক্ত পরম-প্রেমিক যে হাসির গুণে সেই রসরাজ, শ্রীরাসেশ্বর সচ্চিদানন্দের অপূর্ব্ব লীলা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মুগ্ধ হন,—জীবন্মুক্ত পুরুষ যে হাসিতে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে একটা মায়ার খেলা ভাবিয়া, সদানন্দে জীবন অতিবাহিত করেন,—সেই স্বর্গীয় আসক্তিহীন হাস্যও কি এই কবিতা হইতে উদ্ভূত নয়?" কিন্তু এ হাসি হাসিতে পারে কয়জন? কাজেই কবিকে মনুষ্য-প্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, তাহার বুকের ব্যথা ও প্রাণের কথা টানিয়া বাহির করিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসির কিরণ দেখাইয়া তৎপ্রতি তাহার প্রাণকেও আকৃষ্ট করিতে হয়।

বিজ্ঞানালোকে কবিতা লোপ পাইবে? একথা তুমি মনেও ঠাঁই দিও না! "এই অনন্ত জীবজন্তু-পরিপূরিত প্রাণি-জগৎ,—এই অসংখ্য নদ-নদী-সাগর-ভূধর-অরণ্যময় ও স্থল,—এই চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারাভরা উদার আকাশ,—এই অপূর্ব্ব শোভার ভাণ্ডার শস্যশ্যামলা মেদিনী,—এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড,—যত দিন ইহার স্থিতি, ততদিন কবিতারও স্থিতি। ইহাও ছাড়িয়া দাও,—একবার ভাই, তোমার অন্তর্জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর,—তোমার অন্তর্নিহিত স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা,—পক্ষান্তরে শোক, বিরহ, মর্ম্মকাতরতা,—তোমার ধর্ম্ম, তোমার মনুষ্যত্ব,—কোন্ দিকে তুমি কবিতার হাত হইতে অব্যাহিত পাইবে? ভাবময়ী এই পৃথিবীতে [illegible]স করিয়া, কথন মহত্ত্বের উচ্চশিখরে [illegible] ধানে অবনতি [illegible] কবিতার অস্তি[illegible] করিতে পার না [illegible]

"তারপর ধ[illegible] রিক ব্যবহার, [illegible] ইত্যাদি; বে[illegible] ভিন্ন সর্ব্বা[illegible] তোমা[illegible]

মহৎকার্য্যে উৎ[illegible] অগ্রসর হইবে? অগ্রে তুমিই [illegible] হইলে, ত তোমার সমাজ, ধ[illegible] বাণিজ্য, ব্যবসায়—টিকিবে কি [illegible] তাই বলি, ভাই! প্রকৃত কবিত[illegible] কর এবং সেই গৌরবে তুমি [illegible] হও। ছন্দোময় সুরলয়ে-গাঁথা [illegible] কবিতা না পড়,—তোমাকে মনে [illegible] বিশ্বেশ্বরের বিশাল কার্য্য-কবিত[illegible] দৃশ্যমান্ এই অনন্ত বিশ্বের [illegible] করিতেই হইবে। নহিলে, ভাই, [illegible] বই থাকিবে না, [illegible]

একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বিজ্ঞান ও কাব্যে বিশেষ বিরোধ নাই। আমরা স্থূল ভাবে যাহা দেখি, তাহাতেই বুঝি, উভয়ে যেন উভয়ের ছাড়াছাড়ি। কবিই কেবল আদর্শ লইয়া থাকেন—আর বৈজ্ঞানিক জড় পদার্থ লইয়াই জীবন অতিবাহিত করেন। একথা কিন্তু ঠিক নহে।

কাব্যের উচ্চ ব... প্রতিনিয়ত মানুষকে আহ্বান করিতেছে,—"এস তুমি, শ্রান্ত পথিক! জীবনের এ অনন্ত পথে, অনন্ত সুখ দুঃখ, তোমাকে লইয়া কত খেলাই খেলিতেছে,—এস এস, দেখ কি অমূল্য উপহার তোমার জন্য রাখিয়াছি! তুমি কি সংসারে তু... সু... ও দুঃখ লইয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে? এই দেখ, অনন্ত দুঃখ তোমার ... রাখিয়াছি,—এই দেখ তোমার জন্য রাখিয়াছি! জন্য অনন্ত জীবন তুমি পাই- দুঃখ ভিন্ন তুমি কি পরি- রবে? এই দুঃখ দেখিয়া, শিহরিও না; এই সুখ দেখিয়া চঞ্চল হইও না। আত্মপর, ভেদাভেদ ভুলিয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। ঈশ্বরে ভক্তি, মানবে প্রীতি, হৃদয়ে শান্তি তিন মিলিয়া তোমার জীবন মধুময় করিবে, তখন তুমি প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবে।"

এই ভাবে যিনি সাহিত্যের আলোচনা করেন, তিনিই প্রকৃত কবি। "তাঁহার সৃষ্টি,—সেই বিশ্বেশ্বরের সৃষ্টির অন্যতম অংশ। জগতের বুকে যে কথা লুকানো আছে, হৃদয়ের ভাষায় তাহা পরিব্যক্ত করিয়া, কবি নিজেও কৃতার্থ হন, আর জগৎকেও কৃতার্থ করেন। সুতরাং কবিই প্রকৃত লোক-শিক্ষক, এবং কবিতার অনুশীলনই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।"

এইরূপেই সাহিত্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ, এবং মনুষ্যত্বে সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি! মানুষ যতদিন মানুষ থাকিবে, ততদিন সাহিত্যের সমাদর করিবে,—এবং সাহিত্যের গৌরবে গৌরবান্বিত হইবে।

২২শে বৈশাখ। শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

বর্ণভেদ ও জাত্যন্তর পরিণাম।

...াবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ...ত মানবসমাজের কর্ম্মক্ষেত্র ...হয়, অমনি তৎসঙ্গে লোক- বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই লোকসমাজের অন্তর্নিহিত ...বিক নিয়মে সংঘটিত হইতে ...র কর্ম্মক্ষেত্র সেই গুণ সকলের ...ধন করিতে থাকে। অবশেষে ...শ্রেণীর লোকে বিভক্ত ...বিভাগ একদিনে সম্পন্ন ...সম্পন্ন করিতে এক যুগ লাগে। এক যুগ লাগিলেও তাহা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে একে একে সম্পন্ন হয়। কিরূপে একে একে সম্পন্ন হয়, তাহা আমরা দেখাইতেছি।

মহাভারত বলিয়াছেন, "সমুদায় জগৎ ব্রহ্মময়। মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে।" মহাভারতের এই কথা পূর্ব্ব প্রস্তাবে আলোচিত হইয়াছে। একথা যদি সত্য হয়, তবে বলা যা কেন, "কর্ম্ম"ই বর্ণ-বিভাগের কারণ। এই "কর্ম্ম"

যেমন নিজক্ষেত্র সংসারে প্রসারিত করিতে থাকে, অমনি তৎ সঙ্গে সঙ্গে লোকের অন্তর্নিহিত গুণ সকল স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং লোকমণ্ডলী যতই সংসার-লীলায় রত হয়, ততই তাহারা সমাজ মধ্যে চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইয়া পড়ে। "কর্ম্ম"ই যদি বর্ণবিভাগের কারণ হইল, তবে যে গীতায় উক্ত হইয়াছে:—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।"

ভগবানের এই উক্তি কিরূপে সঙ্গত হয়? গীতা বলিয়াছেন,—চাতুর্ব্বর্ণ ভগবান্ কর্ত্তৃক সৃষ্ট,—একথা বলিবার বিশিষ্ট কারণ আছে। একথার রহস্য কেবল বৈদিকতত্ত্বে প্রকাশিত।

আর্য্যশাস্ত্র কেবল যে আদি সৃষ্টিকেই সৃষ্টি বলিয়াছেন এমত নহে, অন্যবিধ সৃষ্টির নাম নিত্যসৃষ্টি। পুরাণে চতুর্ব্বিধ প্রলয় বর্ণন করিয়া সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন।

"প্রকৃতি হইতে যে মহদাদি প্রসৃতি, তাহা প্রকৃতি সৃষ্টি, অবান্তর প্রলয়ের পর যে চরাচর সৃষ্টি, তাহা দৈনন্দিনী সৃষ্টি নামে কথিত। যাহাতে ভূতগণ অনুদিন জন্মায়, পুরাণার্থ বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ তাহাকে নিত্যসর্গ বলেন।" বিষ্ণুপুরাণ, ১ অংশ ৭ অধ্যায়

প্রতিপ্রলয়ের পর যে কল্পারম্ভ হয়, যাহা ব্রহ্মার দিবাভাগ নামে কথিত, তাহাই দৈনন্দিনী সৃষ্টি। এবং যে নৈসর্গিক ব্যাপার প্রতি জীবে প্রতিক্ষণে ঘটিতেছে, যদ্দ্বারা প্রতিজীবে প্রতিমুহূর্ত্তে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হইতেছে, তাহা নিত্যসৃষ্টি। শুধু তাহাই যে নিত্যসৃষ্টি এমত নহে। প্রতি জীবের জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস, মৃত্যু, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু এ সমস্ত ঘটনাও সৃষ্টি, স্থিতি, লয়।

"ভূতান্যনুদিনং যত্র জায়ন্তে মুনিসত্তম।
নিত্যঃ সর্গঃ স তু প্রোক্তঃ পুরাণার্থবিচক্ষণৈঃ॥"

"হে মানসত্তম, যাহাতে ভূতগণ অনুদিন জন্মায়, পুরাণার্থ-বিচক্ষণেরা তাহাকে নিত্যসর্গ (সৃষ্টি) বলেন।"

হিন্দুশাস্ত্রমতে চরাচর জীবের দ্বিবিধ শরীর—স্থূল শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীর। স্থূল শরীরে যেমন অনুদিন, অনুদিন কি, অনুক্ষণ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে, সূক্ষ্ম শরীরেও তাই। জীবের সূক্ষ্ম শরীর প্রতিদিন নূতন হইয়া সংগঠিত হইতেছে। সংগঠিত হইয়া কালে কালে নূতন জীবের উদ্ভব হইতেছে। আমি শৈশবে যাহা ছিলাম, এই তরুণকালে কি তাই? তরুণ কালে আমি নূতন হইয়া জন্মিয়াছি, আবার তরুণ বয়সে আমার যেরূপ প্রকৃতি ছিল, তাহা কি চিরদিনই একরকম ছিল, তাহার কি কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই? অবশ্যই তাহার সমূহ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। এত পরিবর্ত্তন যে, আমি যেন সম্পূর্ণ নূতন প্রকৃতির লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। যৌবনের পর প্রৌঢ়াবস্থা; প্রৌঢ়াবস্থায় আমার প্রকৃতির পরিচয় পাই আমাকে যৌবনকালের চিনিতে পারি... বাম নাই, আমার প্রৌঢ়াব নূতন গ্রাম, গ্রাম হইয়া দাঁড় শুই আমার সূক্ষ্মদেহের শেষে অন্তিমকালে মৃত্যু অবস্থায় পরিণত হইয়াছি, সেই দশাগ্রস্ত হইয়া আমা শরীর হইবে। সেই নূতন গ্রহ কালে আমি এক নূতন এই নূতন জীবের জন্ম, বৃ হইবে। এইরূপে জীবে ঘটিয়া আসিতেছে। যত্র বা লিঙ্গ শরীর থাকে, তত্র শরীর পরিগ্রহ করিয়া

করিতে হয়। তাহার সংসারযাত্রা কিছুতেই ঘোচে না। যতদিন দেহী কর্ম্ম করিবে, ততদিন তাহার লিঙ্গশরীর একরূপে না হয় অন্যরূপে সঞ্জাত হইবে। সংসারের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে জীব যেরূপ প্রবৃত্তিপরায়ণ হইবে, যেরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিবে, তাহার তদ্রূপ অভ্যাস হইয়া আসিবে। এই অভ্যাস বশতঃ তাহার লিঙ্গদেহের প্রকৃতি সংগঠিত বা সৃষ্ট হইয়া আসিবে। মৃত্যুকালে স্থূল দেহের পতন হইলে এই লিঙ্গদেহই পরলোকগামী হইয়া নূতন দেহ ' রিগ্রহ করিয়া থাকে।

জীবের এই নূতন দেহ পরিগ্রহ কি নিয়মে সম্পন্ন হয়? তাহাতে কি জীবের কিছু হাত আছে? জীবশরীর যখন মৃত্যু মুখে আইসে, তখন তমোগুণ দ্বারা অভি-ভূত হইয়া পড়ে। এই তমোগুণ যেমন
স সাধক, লিঙ্গেরও তেমনি
ং মৃত্যুকালে লিঙ্গ যে
প্ত হয়, তাহাই তাহাকে
ন্ন করিয়া রাখে। নবদেহ
ঙ্গ তাই পূর্ব্বের মত অচে-
বস্থায় থাকে। এখন কথা
ার পর দেহীকে কে চালনা
করিয়া তাহাকে যথাস্থানে
ক নবদেহ ধারণে সমর্থ
হলে ভগবৎশক্তির হাত।
জীবের সূক্ষ্মশরীর উপযুক্ত
ষ্ট হইয়া তাহা সেই শরীরে
যে "রাগ-বিরাগ" দ্বারা
ই রাগবিরাগশক্তিই সূক্ষ্ম
ামী শরীর[illegible] আকর্ষণ করে
শরীর হইতে পৃথক করিয়া
বিরাগশক্তিই যে ভগবানের
নের [illegible]শরীর শক্তি, যথা-

ভূত নামক পঞ্চ দেবশক্তিতে সম্পন্ন। ভগ-বান সেইরূপ শক্তিতে সম্পন্ন হইয়া সর্ব্ব-শক্তিমান।

জীবের এই লিঙ্গশরীরই পরলোকগামী। শাস্ত্র বলেন, দেহীর স্থূল শরীর পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকে এবং ক্রমশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহার লিঙ্গের বিনাশ নাই। এই সূক্ষ্মকায়া মৃত্যুকালে যেরূপ দশায় আসিয়াছে, তাহা তদনুরূপ নূতন জীবকায়া লাভ করে, লাভ করিয়া নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে। এই লিঙ্গই নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া নিজ ফল ভোগ করিতে থাকে। নানা যোনি ভ্রমণ করিবার সময়ে তাহা নানা জীবসমাজে নিজ লীলায় অনুরক্ত হয়। এই লিঙ্গের কর্ম্মফল ভোগ জন্য আমরা ইহ-লোকে এত প্রকার জীবসৃষ্টি দেখি। কর্ম্ম-ফল নানাবিধ হওয়াতে জীবসৃষ্টির এত বৈচিত্র্য হইয়াছে। সুতরাং যাহাকে আমরা ইহলোক বলি, তাহা লিঙ্গশরীরের পরলোক। ইহলোক, পরলোক এইরূপ নিয়তই বিদ্য-মান রহিয়াছে। যাহা আমার ইহজন্ম, তাহা পূর্ব্ব জন্মের পরলোক। এসমস্ত কথার প্রমাণ—যোগিদিগের আত্মপ্রত্যক্ষ।

আমরা শাস্ত্রাবলম্বন করিয়া জীবের কর্ম্ম-ফল ভোগার্থ তাহার যোনিভ্রমণে আসিয়াছি। এই যোনিভ্রমণে জীবের কর্ম্মফল ভোগ হইলে সে আবার পূর্ব্বকায়া ধারণ পূর্ব্বক নূতন মনুষ্যদেহে সমাগত হয়। মনুষ্য দেহে সমাগত হইলে যে লিঙ্গ শূদ্রোচিত গুণযুক্ত, তাহা শূদ্রশরীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়, যে বৈশ্যোচিত, সে বৈশ্যদেহে, যে ক্ষত্রিয়ো-চিত, সে ক্ষত্রিয় দেহে এবং যে ব্রাহ্মণো-চিত, সে ব্রাহ্মণদেহে আসিয়া জন্মলাভ করে। কি ব্রাহ্মণকুল, কি ক্ষত্রিয়কুল, কি

বৈশ্যকুল, কি শূদ্রকুল, সমস্ত কুলই এইরূপ জন্মমৃত্যু দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শুধু যে গুণ দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হয় এমত নহে, ভগবান তাহা জন্ম দ্বারাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাই ভগবান পতঞ্জলি মহাভাষ্যে লিখিয়াছেন :—

"সর্ব্বে এতে শব্দাঃ গুণসমুদায়েষু বর্ত্তন্তে, ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্র ইতি আতশ্চ গুণ সমুদায়ে। এবং হ্যাহ—'তপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চ এতদ ব্রাহ্মণ কারণম্। তপঃ শ্রুতাভ্যাং যোহীনো জাতি ব্রাহ্মণ এব সঃ।'

ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয় অর্থ করেন:—

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই শব্দ গুলি কতিপয় গুণসমষ্টির বাচক। এই কথা বলিয়াছেন * তপঃ (ব্রহ্মচর্য্য ব্রত) শ্রুত (বেদাধ্যয়ন) এবং যোনি বলিতে বীজ ও ক্ষেত্র (পিতা ও মাতার বংশকুলে জন্ম)— এই গুণ সমুদায় ব্রাহ্মণবর্ণতাকে প্রাপ্ত করায়।"

অতএব, ব্রাহ্মণকুলে, ক্ষত্রিয়কুলে, বৈশ্য কুলে এবং শূদ্রকুলে জন্মলাভ না করিতে পারিলে সেই সেই বর্ণধর্ম্মাক্রান্ত হওয়া যায় না।

আর্য্যশাস্ত্রের মীমাংসা এই। আর্য্য-শাস্ত্র বলিতেছেন, যাহার লিঙ্গ মৃত্যুকালে ঠিক যে কুলোচিত হইয়াছে, জন্মকালে তাহার সেই কুলে জন্ম হয়। জন্ম মৃত্যুর এই সাধারণ নিয়ম। এ নিয়ম শুদ্ধ হিন্দু-সমাজে খাটে, এমত নহে, সর্ব্বসমাজেই এই নিয়ম। সর্ব্বসমাজেই বিশ্ববিধাতা এই নিয়মে সর্ব্বজীবের জাত্যন্তর পরিণাম সাধন করিতেছেন। তুমি জোর করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হইতে পার না।

* মহর্ষি পতঞ্জলি বলিলেন 'এই কথা বলিয়াছেন।"—"এবং হ্যাহ" অতএব তাঁহার ন্যায় মহর্ষি যখন নাম করিয়া বলিলেন না কে বলিয়াছেন তখন অবশ্য বুঝিতে হইবে, এবাক্য তাঁহার অবগত শ্রুতি বাক্য।

ঠিক তুমি কোন্ কুলোচিত, মৃত্যু ও জন্ম-কালে ভগবান্ তাহা অবধারিত করিয়া দেন।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র লইয়া সর্ব্ববিধ মনুষ্য-সমাজ গঠিত। সকল সমাজে তাহাদের নামকরণ সমান না হউক; যা বলিয়া হউক, তাহাদের নামকরণ কর, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু গুণ ধরিয়া তাহারা সর্ব্বসমাজেই বিদ্যমান আছে। শুদ্ধ গুণ নয়, ভগবান প্রতি সমাজেই যে যেমন ধর্ম্মীয় জীব, তাহাকে তজ্জাতীয় কু জন্মনির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যাঁহার জন্ম যে রূপ, তিনি সেই রূপ জাত বলিয়া জন্মই জাতি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। হিন্দু সমাজে তাই জন্মানুসারে "জাতি ভেদ" প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। অন্য সমাজে
সেরূপ প্রথা না থাকিলে
সজাতীয় ধর্ম্ম বিশিষ্ট লোক
নাই। ভগবানের এই
সজাতীয়ের সহিত সজ
এই নিয়মে চালিত হইয়া
জন্ম পরিগ্রহ করে। সুতর
মত অপরাপর মনুষ্য সমা
ভেদ" প্রথা প্রচলিত না
বানের নিকট সে জাতিভেদ
রহিয়াছে। যে, যে জাতী
বানের নিকট তাহা
সুতরাং ভগবান্ তাহার
সমজাতীয় জীবের সঞ্চার ক
জীব সমজাতীয় পিতা মা
নিজ প্রকৃতির অনুরূপই
এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে
"জাতিভেদ" এমত জী
গীতায় উক্ত হইয়াছে

সারে ভগবান কর্ত্তৃক চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে।

অতএব, যে জীবলীঙ্গ যে জাতীয় বা যে বর্ণোপযুক্ত ধর্ম্মবিশিষ্ট, মৃত্যুর পর তাহার তদনুরূপ "জাত্যন্তর" পরিণাম হয়। এইরূপ জাত্যন্তর পরিণাম হয় বলিয়া মনুষ্যসমাজের শৈশবকালে বা সত্যযুগে সেই সমাজস্থ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ বিশেষ জাত্যন্তর পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া বর্ণবিভেদ কার্য্যের সহায়তা করিয়া দিয়াছিলেন। যে ব্যক্তির লিঙ্গ যে বিশেষ প্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম লাভ করিয়াছিল; তাহার তদনুরূপ জন্মলাভ হইয়াছিল। সে জীব তদনুরূপ জন্মলাভ করাতে তাহার বিশেষ ভাবের ক্রমশই বৃদ্ধি হইয়াছিল। এইরূপে শিশুসমাজের বর্ণভেদ উত্তরোত্তর বাড়িয়া গিয়াছিল। এককালে যে ভেদ অস্পষ্ট ছিল, তৎপরবর্ত্তী কালে,
ং স্ফূর্ত্তিসাধন হইয়াছিল।
র্ত্তী কালে সেই ভেদরেখা
ত হইয়াছিল। লোকের
ান্তর লাভ হইয়াছে, যেমন
রাড়িয়া আসিয়াছে, অমনি
তীয় কুলে জন্মলাভ করিয়াছে,
া আরও বিভিন্ন হইয়া পড়ি-
ন্ন জীবের বিশেষ বিশেষ
হওয়াতে শিশুসমাজে বর্ণভেদ
কাল অতিবাহিত হয় নাই।
চতুর্ব্বর্ণ সম্পূর্ণরূপে সমুদ্ভূত

শাস্ত্রে 'জাত্যন্তর' পরিণামের
স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে।
পরিণাম [illegible]বের এক বৃহৎ
পায়। এই জাত্যন্তর পরি-
ণামেই "জন্মান্তরবাদের"

মূল নিয়ম। এই নৈসর্গিক ব্যাপারে জগতের জীববৈচিত্র্য সাধিত হইতেছে। জগতে আমরা যে অসংখ্য জীব দেখিতেছি, তাহারা সমুদায় এই জাত্যন্তর পরিণামের ফল। এই জাত্যন্তর পরিণামই জাতি হইতে ব্যক্তির সৃষ্টি করিতেছে,—অনুদিন সৃষ্টি করিতেছে। জীব সকল এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে জন্মজন্মান্তরে পরিণত হইতেছে। মনুষ্য শৃগালত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, শৃগাল আবার মনুষ্যত্ব লাভ করিতেছে। একই মনুষ্য নানা জীবজাতিতে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া আবার মনুষ্যলোকে আসিয়া উপনীত হইতেছে। কখন হইতেছে? যখন তাহার কর্ম্মফল ভোগ শেষ হইয়াছে।

তাই আমরা বেদে দেখিতে পাই, জৈব সৃষ্টির সর্ব্বশেষে মনুষ্য জাতির উৎপত্তি। অগ্রে যে জীবজাতি সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারাই মনুষ্যজাতির পরিণাম—পূর্ব্ব কল্পের পরিণাম। পূর্ব্ব কল্পে যে সকল মনুষ্যেতর জীবজাতি ছিল, তাহাদের সৃষ্টি হইয়া গেলে মনুষ্যজাতি তাহাদেরই "জাত্যন্তর" পরিণামে আবার সমুদ্ভূত হইয়াছিল। এক এক জীবজাতি তদেতর জাতির পরিণাম। তাহাতেই সমস্ত তির্য্যগযোনির সৃষ্টি। বেদ উপদেশ করিয়াছেন, তির্য্যগযোনির সৃষ্টির পর মনুষ্যের উৎপত্তি। ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী সরস্বতী মহাশয় ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তের পঞ্চম মন্ত্রের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন :—

"সেই আদি পুরুষ হইতে ব্রহ্মাণ্ড হইল। সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডকেই অধিকরণ করিয়া সেই ব্রহ্মাণ্ড শরীরাভিমানী কোন এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন। তিনি জন্মিয়া দেব তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি বিবিধরূপ জীবভাব প্রাপ্ত হইলেন।" ইত্যাদি

সৃষ্টিতত্ত্বে ব্যক্ত হইয়াছে যে, এই অনি-

র্ব্বচনীয় পুরুষই ব্রহ্মা। ব্রহ্মার সূক্ষ্ম শাক্ত শরীরই জীবসমূহের সমষ্টি শরীরের বীজ-শরীর। এই বীজ শরীরেই সৃষ্টিবিকাশে প্রথমে দেবশক্তি সকল সমুদ্ভূত হইয়াছিল, পরে তির্য্যক্ শরীরের আবির্ভাব এবং তৎ পরে মনুষ্যজাতির উদ্ভব হইয়াছিল।

তবে যে, ঐতরেয় শ্রুতি বলিয়াছেন, অগ্রে একমাত্র পুরুষ সৃষ্ট হইয়াছিল, তাঁহাকে দেখিয়াই দেবগণ বলিয়া উঠিয়াছিলেন, এই পুরুষই অতি সুন্দর ও সুনির্ম্মিত, একথা কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে?

বেদ বলিয়াছেন, 'ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য, এবং পাদদেশ হইতে শূদ্র হইল।' কি অর্থে তবে বেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে? তাহাদের অর্থ একটী মাত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র নহে, তাহাদের অর্থ, ব্রাহ্মণ্য বা ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মবিশিষ্ট, ক্ষত্রিয়ত্ব বা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মাক্রান্ত, বৈশ্যত্ব বা বৈশ্য-গুণসম্পন্ন এবং শূদ্রত্ব বা শূদ্রধর্ম্মীয় জনগণ। বেদ অতি সূক্ষ্ম বিষয় প্রকাশ করেন। সেই সূক্ষ্ম হইতে স্থূলার্থ সংগৃহীত হয়। যে বেদাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বৈদিক ব্যাকরণ, এই অর্থ সেই ব্যাকরণ সঙ্গত। সামাধ্যায়ী মহাশয়ও সেইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চারিটি শব্দ এখানে ধর্ম্মপর (অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব বা ব্রহ্মণ্যদেব, ক্ষত্রিয়ত্ব বা নরদেব, বৈশ্যত্ব বা আর্য্যদেব, শূদ্রত্ব বা দাসদেব) ধর্ম্মিপর নহে।"

যে অর্থে শ্রুতিতে এই ব্রাহ্মণাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই অর্থেই উক্ত "পুরুষ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরুষত্ব সম্ভূত হই-লেই পুরুষ ধর্ম্মীয় নরনারী সম্ভূত হইতে আর বাকী থাকে না। এবং নরনারিত্বের সৃষ্টি হইলে আর নরনারী জাতীয় ব্যক্তি-পুঞ্জের অভাব হয় না।

তবেই "জাত্যন্তর" পরিণাম-প্রণালীক্রমে তির্য্যগযোনি হইতে যেরূপে মনুষ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। এক্ষণে কথা এই, সেই মনুষ্যজাতির মধ্যে এত ব্যক্তি মনুষ্য কিরূপে উদ্ভূত হইয়াছিল। এই "জাত্যন্তর" প্রণালী ক্রমেই প্রতি মনুষ্যের ব্যক্তিত্ব ঘটে।

মানব সমাজ পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রতীত হয়, কোন দুইটী লোক ঠিক এক সমান নহে। তাহাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিতে পারে—বর্ণগত, জাতিগত, প্রকৃতিগত, আকারগত, ধর্ম্মগত, প্রবৃত্তি-গত সাদৃশ্য থাকিতে পারে; দুই জনের রূপ এক প্রকার, প্রকৃতি এক প্রকার, আচার
ব্যবহার এক প্রকার, চরিত্র
সবই এক প্রকার হইতে পা[illegible]
সেই পর্য্যন্তই শেষ। সূক্ষ্ম
পরিদৃষ্ট হয়, সেই দুই জনের
ভিন্নতা আকাশ-পাতাল বি[illegible]
এক প্রকার বটে; কিন্তু কিছু
একত্ব কেবল প্রতি ব্যক্তির
এই ব্যক্তিগত একত্ব প্রতি[illegible]
প্রবৃত্তি, রুচি ও প্রকৃতি হই[illegible]
সহোদর একই প্রকার বটে, [illegible]
দর হইতে অন্য সহোদরে অ[illegible]
সে ভিন্নতা তাহাদের বিশেষ
ও স্বভাব জনিত। সেই
প্রবৃত্তি, ও স্বভাব ইহজন্মে [illegible]
হইতেছে, তদনুযায়ী তাঁহ[illegible]
সৃষ্ট হইতেছে। তাঁহার [illegible]
সৃষ্ট হইতেছে, তদনুযায়ী [illegible]

জন্মিতেছে। প্রতি জীবের এই সূক্ষ্মদেহ স্বতন্ত্র বলিয়া, তাহার ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র। এই ব্যক্তিত্ব অনুসারে প্রতি জীবের মৃত্যুর পর যখন জাত্যন্তর পরিণাম হয়, তখন তাহার সেই ব্যক্তিত্ব অনুসারেই দেহলাভ হয়। সহোদরে, সহোদরে এই রূপ ব্যক্তিত্ব আছে বলিয়া তাহাদের আকার প্রকার এবং প্রকৃতি গত সাদৃশ্য থাকিলেও সেই আকার প্রকার এবং প্রকৃতি স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। দুইটি যমকের মধ্যেও এই স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। এই স্বাতন্ত্র্য বশতঃ ব্যক্তিত্ব আছে বলিয়া যমকেরাও স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইয়া পড়িয়াছে। দুই জনের লিঙ্গদেহ পূর্ব্বজন্মে যেরূপে বিভিন্ন হইয়া গঠিত হইয়াছিল, পরজন্মে সেইরূপ ব্যক্তিত্ব লাভ করিয়াছে।

প্রকৃতি এইরূপ ব্যক্তি জীবের সৃষ্টি করে বলিয়া আদি সৃষ্টিকালে একই মনুষ্য
, "বর্ণ" গত বিভেদ সহজেই
। জাতিগত বিভিন্নতা ক্রম
বিভিন্নতায় আসিয়া উপ
তাহাতেই আদি সমাজের
গুণসাদৃশ্য ক্রমশ পৃথকত্ব
গুণগত সাদৃশ্য হেতু যে
প্রথমে একই বর্ণভুক্ত ছিল,
দুই বর্ণভুক্ত,—এক বর্ণ আর্য্য,
নার্য্য। ক্রমে আর্য্যগণ মধ্যে
ৎপত্তি। ভারতে যাহা ঘটিয়া-
। সর্ব্ব মনুষ্যসমাজেও ঠিক
প্রতি সমাজেই চারি বর্ণের
দেখা দিয়াছিল।
ন্ম বা ব্যক্তিভেদের সৃষ্টি করে
কর্ম্মই লিঙ্গদেহের সৃষ্টিকর্ত্তা;
ব্যক্তিভেদের কারণ। সুতরাং
ভক্ত করিয়া দেয়। প্রবৃত্তিও

রুচি অনুসারে আমি যেরূপ কর্ম্মপথ অবলম্বন করিব, সেই অভ্যাস বশতঃ আমার লিঙ্গশরীর তদ্রূপই তৈয়ারি হইয়া আসিবে এবং আমার মানসশরীর যেরূপ তৈয়ারি হইয়া আসিবে, আমার ব্যক্তিত্ব তদ্রূপ হইবে। এ নিয়ম সর্ব্ব মনুষ্যেই প্রতিপালিত হইতেছে। সুতরাং সর্ব্ব মনুষ্যসমাজ এই কর্ম্মবন্ধের বন্ধতায় আবদ্ধ রহিয়াছে। ব্যক্তিত্ব অনুসারে যদি জাত্যন্তর পরিণাম হয়, তবে সর্ব্ব মনুষ্য সমাজেই জাত্যন্তর পরিণাম হইতেছে।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, এই কর্ম্মই বর্ণভেদের কারণ। এক্ষণে দেখা গেল, এই কর্ম্ম আবার ব্যক্তিভেদের কারণ। সুতরাং এই কর্ম্মবিভাগের যতই বৃদ্ধি হইয়াছে, ততই আবার প্রতি বর্ণ মধ্যে নানা উপবিভাগ হইয়া গিয়াছে। এই উপবিভাগ সমস্তই হিন্দু সমাজস্থ "জাতি-ভেদের কারণ। এই "জাতিভেদ" বর্ণভেদের পরে হয়। যে জাতিভেদ আদি সৃষ্টি কালে বর্ণভেদের পূর্ব্বে হয় এবং যদ্দ্বারা মনুষ্য-জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, সেই জাতি-ভেদ যেমন ঈশ্বর সৃষ্ট ও স্বাভাবিক ব্যাপার, বর্ণভেদের পরে যে জাতিভেদ হয়, যাহা হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে, সে জাতিভেদও তদ্রূপ ঈশ্বরসৃষ্ট এবং স্বাভাবিক ব্যাপার। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, স্বাভাবিক বর্ণভেদ প্রতি মনুষ্য সমাজে বিদ্যমান, সে সমাজ আর্য্য হউক, অনার্য্য হউক; বন্য হউক, সুসভ্য হউক; সর্ব্বসমাজেই সেই সমাজের অবস্থানুসারে ভাল মন্দ লোক সাত্ত্বিকগুণ বিশিষ্ট এবং অসাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন লোক, ঘোর প্রবৃত্তির দাস এবং প্রবৃত্তিকে দমন করিতে পারে, এমন লোক আছে।

সেই ভালমন্দের মধ্যে আবার ইতর বিশেষ আছে। খুব ভাল লোক আছে, খুব মন্দ লোক আছে; আবার তাহাদের মধ্যাবস্থ লোকও আছে। গুণানুসারে প্রতি সমাজেই লোকবিভাগ আছে। এই গুণানুসারে যে লোকবিভাগ, তাহাকেই বর্ণভেদ বলা যাইতে পারে। আবার সেই গুণানুসারে সমজাতীয় বিভাগেরও নানা উপবিভাগ আছে। এই উপবিভাগ সকল কর্ম্মবিভাগ হেতু উৎপন্ন হইয়াছে। হিন্দু-দার্শনিক বলেন, শুধু গুণ নহে, শুধু কর্ম্ম নহে, নৈসর্গিক "জাত্যন্তর" পরিণাম এই বিভাগদ্বয়কে প্রধানতঃ সৃষ্টি করিয়াছে।

"জাত্যন্তর" পরিণাম এইরূপ স্বভাবিক ব্যাপার এবং ভগবানের হস্তে ন্যস্ত আছে বলিয়া হিন্দুসমাজ তাহার বিরুদ্ধে কার্য্য করে না। যাহা ঈশ্বরের হাতে, সামান্য মনুষ্য তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে কেন? যে সমাজ জানে না যে, জাতিভেদ ভগবান কর্ত্তৃক সৃষ্ট, সেই সমাজেই বাহ্য জাতিভেদ প্রথার প্রচলন নাই *। না থাকিলে কি হইবে, সে সমাজের অন্তরে জাতিভেদ বিলক্ষণ প্রবর্ত্তিত আছে। কোন সমাজেই উচ্চকুলের লোক, নীচকুলের সহিত কোন রূপে মিশে না। না ভক্ষ্যভোজ্যে মিশে, না আচার ব্যবহারে মিশে, না বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে মিশে। সর্ব্ব সমাজেই উচ্চকুলের সহিত নীচকুলের আকাশ পাতাল প্রভেদ। মধ্যবর্ত্তী কুল সকলও সেই নিয়মে চলে। নিজ নিজ থাক মধ্যেই ক্রিয়া-কলাপ অধিকাংশ চলে। দুই একটা যাহা এই নিয়ম ব্যতিক্রম করে, তাহা সাধারণ নিয়মের নিপাতন মাত্র। নিয়মের নিপাতন ধর্ত্তব্য নহে। তাহা সাধারণ নিয়মকেই সমর্থন করে। যাহারা এই নিপাতনগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বিরুদ্ধমতের সিদ্ধান্ত করিতে যান, তাঁহারা সাধারণ নিয়মের অজ্ঞতারই পরিচয় দেন। ব্যভিচার নিয়ম নহে; তাহা নিয়মের ব্যভিচার মাত্র।

এই জাত্যন্তর পরিণাম পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয়, সকল লোকের সহিত সকল লোকের বীজগত পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য সহজে অপনীত হইবার নহে। সেই পার্থক্য বশত প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ব্যক্তি। অবশ্য সৎকর্ম্ম, সাধু ব্যবহার, এবং সুশিক্ষা দ্বারা এই বীজগত পার্থক্য অনেক পরিমাণে সংশোধিত এবং অপনীত হইতে পারে। একজন শূদ্র অনেক পরিমাণে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারেন। তদ্রূপ উৎকর্ষ লাভ করিবার পন্থাও হিন্দুর বর্ণাশ্রম [illegible]
আছে। হিন্দুসমাজে যেমন
[illegible]ভেদ আছে, [illegible]
তেমনি আবার এমত শিক্ষা [illegible]
আছে—বর্ণাশ্রমনিয়ম যাহা
দিয়াছে—যদ্দারা একজন ব্র[illegible]
লোক অনেক পরিমাণে [illegible]
করিতে পারেন। তবে কে[illegible]
তাহাকে ব্রাহ্মণকুলান্তর্গত ক[illegible]
হিন্দুসমাজ যেমন একজন [illegible]
জাতির অন্তর্ভুক্ত করিবে না, [illegible]
জন ব্রাহ্মণকেও শূদ্রত্বে [illegible]
তাহার কারণ এই, প্রতি বর্[illegible]
অনেক জাতিবিভাগ আছে। [illegible]
অনেক শূদ্র ব্রাহ্মণ্য লাভে[illegible]
পারে, কিন্তু সে ঠিক কো[illegible]
প্রবেশযোগ্য, তাহা অধিকার[illegible]

* এই বৈদিক জ্ঞান কেবল হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিয়াছে। [illegible]

সাধ্যাতীত। শূদ্রের শূদ্রত্ব হাড়ে হাড়ে সংবিদ্ধ,—জন্মাবচ্ছিন্ন অদৃষ্টবশত সে শূদ্র;—শূদ্রশ্রেণীর যোগ্য বলিয়া সে শূদ্র জাতি মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যে প্রারব্ধ লইয়া সে শূদ্রকুলে জন্মলাভ করিয়াছে, সে প্রারব্ধ ও দৈব পুরুষকারে কতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা কি সহজ কথা? সে শূদ্র মুক্তিপথে গিয়া জাতির বাহিরে থাকুক, তাহাতে সমাজের কিছু ক্ষতি নাই। মুক্তিপথ তাহার জন্য খোলা রহিয়াছে। একজন ব্রাহ্মণ যেমন ধর্ম্মপথের পথিক হইতে পারে, একজন শূদ্র তদ্রূপই হইতে পারে। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত, তিন আশ্রম-নিয়মই শূদ্র অবলম্বন করিয়া ভক্তি-পথে দিন দিন প্রবিবর্দ্ধিত হইয়া কি চতুর্ব্বর্গের ফল, কি সালোক্য বা স্বর্গ, কি সামীপ্য বা দে[illegible]াপমত্ব, কি স্বারূপ্য বা দেবত্ব

[illegible]বন, কিন্তু কিন্তু তিনি সংসর্গ
[illegible]তিকুল নষ্ট এবং অপবিত্র
[illegible]। কেন না, তিনি কে[illegible]
[illegible] যোগ্য, তাহা নিরূপণ
[illegible]। যোগ্যতা কেবল ঈশ্বরই
[illegible]ন একজন শূদ্রের মৃত্যু হয়,
[illegible]গ্যতা অনুসারে পরলোকে
[illegible] গতি হইবে। হিন্দুসমাজ
[illegible] পূজা করিবে, তাহাকে
[illegible]করিয়া তাহার পাদসেবায়
[illegible]স্ত জাতি মধ্যে তাহাকে
[illegible]ব না। কারণ, সাধু যে
[illegible]য়াছে, তাহা জাতি নিয়-
[illegible] যদি সে জাতি নিয়মের
[illegible]ত থাকে, তবে সে সাধু
[illegible] ও সমীক্ষাই তাই।
[illegible]শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে:—

"অনার্য্যমার্য্য কর্ম্মাণমার্য্যঞ্চানার্য্য কর্ম্মিণম্।
সম্প্রধার্য্যাব্রবীদ্ধাতা ন সমৌ নাসমাবিতি॥"

মনুসংহিতা। ১০ম—৭৩।

"ব্রহ্মা সবিশেষ ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন যে, দ্বিজাতির কর্ম্ম করিলে দ্বিজাতি হয় না এবং দ্বিজাতি শূদ্রের (একজাতি) কর্ম্ম করিলে শূদ্র হয় না; যে হেতু শূদ্র ও ব্রাহ্মণ ইহারা পরস্পরের বিপরীত কর্ম্ম করিয়া পরস্পর সমান হইতে পারে না, অন্যপক্ষে ইহারা যে পরস্পর অসমান বা জাত্যন্তর, তাহাও নহে।"

ভগবান্ মনূক্তি এই। তিনি বলিয়াছেন, ইহলোকে ব্রাহ্মণ শূদ্র হইতে পারেন না, এবং শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। কেন হইতে পারে না, তাহা আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এই অসাম্য নীতি ব্যক্ত করিয়া ভগবান পরেই সাম্য নীতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি একবার বলিলেন, "সম" নয়, তৎপরে বলিলেন, "অসম"ও নয়। "সম" নয় কেন, তাহা বলা হইয়াছে, "অসম" নয় কেন, তাহাই বক্তব্য। হিন্দুশাস্ত্রে, কি [illegible]াম্যনীতি কি অসাম্যনীতি, উভয়ই বিদ্যমান। ব্যক্তি বিশেষের সহিত ব্যক্তি বিশেষ সমান নহে এবং অনেকাংশে সমানও বটে। শাস্ত্র বলিয়াছেন, সর্ব্বজীবেই ভগবান বর্ত্তমান। সর্ব্বলোকেই যেমন পশুত্ব বিদ্যমান, তেমনি দেবত্ব বিদ্যমান। পশুত্ব সর্ব্ব লোককে অবনত করিয়া দেয়, কিন্তু দেবত্ব সকলকে উচ্চে তুলিয়া লয়। এই পশুত্ব এবং দেবত্বের অনুসারে মনুষ্যের সহিত মানুষ সমান এবং অসমান। যে মনুষ্যে এই দেবত্বের যত স্ফূর্ত্তি হইবে, তিনি ততদূর দেবোপম হইতে পারিবেন। এই দেবত্বের স্ফূর্ত্তিতে ক্রমশঃ মানব সামীপ্যমুক্তি লাভ

করিতে পারেন—ক্রমে তিনি ঈশ্বরের সমীপস্থ হইতে পারেন। তাঁহার সামীপ্য হইলে তবে তিনি স্বারূপ্য মুক্তির অধিকারী হয়েন। এই দেবত্বের এক এক স্তরে আসিয়া মানবগণ সাম্য লাভ করেন। সে সাম্য কিসে হয়? সে সাম্য কেবল তপস্যায় সাধ্য। যে সকল লোকে একরূপ দেবভাব বিদ্যমান, তাঁহারা সমান। আবার সে সকল লোকে একরূপ পশুত্ব বিদ্যমান, তাহারাও সমান। এই দেবভাবই মানুষকে মানুষ করিয়া তুলে,—মানুষকে মনুষ্যত্বের স্ফূর্ত্তি সাধন করে। প্রথমে নরাকার পশু মানুষ হয়, তৎপরে দেবতা হয়। কেবল সংযম ও আত্মশুদ্ধিতে এই তপস্যা সিদ্ধ হয়,—শূদ্র ব্রাহ্মণ্য লাভ করে।

শূদ্রকে মনু একজাতি বলিয়াছেন, অপর ত্রিবর্ণ দ্বিজাতি। অপর বর্ণত্রয়ের দুইবার জন্ম হয়—একবার স্থূলশরীর পরিগ্রহ, আর একবার ধর্ম্মশরীর পরিগ্রহ। কিরূপে শূদ্রও এই দ্বিতীয় প্রকার শরীর গ্রহণ করিতে পারেন, করিয়া দ্বিজত্ব লাভ করিতে পারেন? কিরূপে দ্বিজাতির সহিত শূদ্র সমান হইতে পারেন ধর্ম্মশরীর পরিগ্রহ করিয়া। এই ধর্ম্মশরীর আভ্যন্তরিক বিষয়। কে ইহলোকে কিরূপ ধর্ম্মশরীর লাভ করিয়া দ্বিজাতির সহিত সাম্যলাভ করিয়াছেন, ভগবান পরজন্মে তাহা অবধারণ করিয়া দেন। শূদ্রের জাত্যন্তর পরিণাম হয়। শূদ্র একজাতি হইতে দ্বিজাতিত্বলাভ করেন। তদ্রূপ বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণও পরজন্মে শূদ্রত্ব লাভ বা ক্রমাবনতি লাভ করেন। জন্মজন্মান্তরে জাত্যন্তর পরিণাম হইলে এই সামাজিক পরিবর্ত্তন সম্পন্ন হয়। মনু যেমন বলেন, সর্ব্বলোকই অসমান এবং সমান,

মহাভারত সেই কথাই বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন:—

"জীব তীর্য্যক্ যোনি হইতে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া প্রথমতঃ পুকশ বা চাণ্ডাল যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শূদ্রতা লাভ করে। তৎপরে ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর অতীত হইলে তাহার বৈশ্যতা; বৈশ্যতা লাভের পর এক লক্ষ অশীতি সহস্র বৎসর অতীত হইলে ক্ষত্রিয়ত্ব এবং ক্ষত্রিয়ত্বলাভের পর একশত অশীতি লক্ষ বৎসর অতীত হইলে পতিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। তৎপরে সেই পতিত ব্রাহ্মণকুলে দ্বিশত ষোড়শ কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া অস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণের কুলে, তৎপরে চতুঃ ষষ্টি সহস্র অষ্ট শত কোটি বৎসর অতীত হইলে গায়ত্রীসেবী ব্রাহ্মণবংশে এবং পরিশেষে ঐ বংশে দুই শত উনষষ্টি লক্ষ বিংশতি সহস্র কোটি বৎসর পরিভ্রমণ কবি , শ্রোত্রিয় গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করে। ঐ শ্রোত্রিয় বংশে পরিভ্রমণের সময় হর্ষ, শোক, কাম, দ্বেষ, অ মান ও বৃথা বাগ্মিতা তাহাকে আক্রমণ করে। ঐ সময় যদি সে হর্ষ শোকাদি শত্রুগণকে পরাস্ত ক পার তাহা হইলেই তাহার সদ্গতি লাভ হয়

অনুশাসন

সাম্যনীতির এই সাধ
নিয়মে সর্ব্বসাধারণ জনগ
ন্তর পরিণাম দ্বারা এই স
ভারত সাম্যলাভের পক্ষে
বৎরের যোনিভ্রমণের কথা
ছেন, সেই যোনিভ্রমণের
প্রকার যোনিলব্ধ হইয়া
ক্ষত্রিয় একেবারেই ব্রাহ্ম
না। ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে ব্র
হয় ত লক্ষ লক্ষ যোনিভ্র
ক্ষত্রিয় যে স্থান হইতে অ
সেই স্থানে উপনীত হই
লক্ষ যোনির কর্ম্মভোগ
কর্ম্মফলভোগ শেষ হইলে
সেই স্থানে উপনীত হই

থাকে। এইরূপ নিয়ম সর্ব্ব বর্ণেই আছে। বর্ণের অন্তর্গত যে জাতিভেদ আছে, তন্ম ধ্যেও আছে। সামান্য দৃষ্টিতে এতত্ত্ব প্রতীত নহে। এ তত্ত্ব কেবল অলৌকিক জ্ঞানে প্রতীত। তাই ইন্দ্রের মুখ দিয়া মহাভারত এ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা যেস্থল উদ্ধৃত করিয়াছি, ইন্দ্র, মতঙ্গকে তাহা বলিয়াছিলেন। ইন্দ্র কে? ইন্দ্র দেবরাজ। যে লোকে দেবতারা অধিষ্ঠিত, সেই লোকের তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। সেই লোকের নাম স্বর্গলোক। যাঁহারা দেবত্ব লাভ করেন, তাঁহারা সেই লোকে যান। দেবত্ব কিসে লব্ধ হয়? সংযম ও আত্মশুদ্ধি দ্বারা। সেই স্বর্গলোকের শ্রেষ্ঠত্ব ও সেই সংযম ও শুচিতা দ্বারা লব্ধ। যেমন ইহলোকে নানা স্তরের দেবত্ব আছে, তেমনি স্বর্গলোকেও ‹ ‹ বত্বের তারতম্য আছে।
য় লোক সকল এক লোকে
` সালোক্য মুক্তি বা স্বর্গ
লই শুচিতার শ্রেষ্ঠত্ব হেতু
হয়েন। যে দেবতার শুচি-
ইন্দ্র। শচী প্রতি ইন্দ্রেরই
ক বিভিন্ন কালে বিভিন্ন
ছেন, কিন্তু দেবলোকের
ত্য প্রতিষ্ঠিত। একজন
ক্রমোৎকর্ষ লাভ করিয়া
গয়া সামীপ্য লাভ করেন।
মুক্ত হইয়া অন্য স্তরে
ক্ত। মনুষ্য যখন মনুষ্য-
ক্রম করিয়া দেবত্বের স্তরে
ত হয়েন, তখন তিনি
লাভ করেন বা স্বর্গীয়
নে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটুও
, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মনুষ্যত্বের হাত হইতে কেহ মুক্ত হইতে পারেন না। একথা বুঝাইবার নিমিত্ত আমরা পুরাণে দেখিতে পাই, অনেকে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছেন, অনেকের দেবলোক লাভ হয় নাই। এই দেবলোক লাভ কিসে হয়? দেহত্যাগের পর জাত্যন্তর পরিণামে এই দেবত্বলব্ধ হয়। যিনি ইন্দ্রত্ব পান, শুচিতার শ্রেষ্ঠত্ব হেতু তাঁহাতে দিব্যজ্ঞান পরিস্ফুট হয়। সেই দিব্যজ্ঞানে মনুষ্যের সমস্ত যোনিভ্রমণ সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। তাই, মহাভারত ইন্দ্রমুখে উক্ত অলৌকিক জ্ঞানের কথা দিয়াছেন।

আমরা স্বর্গে দেবত্বের তারতম্য অনুসারে যে সকল লোকের কথা বলিয়াছি, এই স্থূল মনুষ্য সমাজে ও তদ্রূপ লোক সকল(Circle of men) বিদ্যমান। সাম্যনীতি অনুসারে এই সকল লোক লব্ধ হয়। সমাজমধ্যেও যাহারা পশুত্ব অংশে বা মনুষ্যত্বাংশে সমান, তাহারা সমাজের এক এক লোক অধিকার করিয়া আছেন। এই লোকসকলেই সমাজের এক এক শ্রেণীবিভাগ এক এক জাতির circle,—যে circle (চক্র) বা লোক মধ্যে তাহারা আবদ্ধ। এই শ্রেণীবিভাগই সর্ব্বসমাজে জাতির সৃষ্টি করে। কিরূপে করে, বলিতেছি।

প্রথমে রাজবংশ ধরুন। যদিও এক দেশের রাজা এবং রাজবংশীয়গণ অন্য দেশের রাজা এবং রাজবংশীয়গণের সহিত এক স্থানে অবস্থিত নহেন, তাহাদের রাজ্য ও বসবাস অনেক দূরে দূরে। তথাপি, স্বধর্ম্মীয় হইলে তাহারা একই লোকে বাস করেন। বলিতে গেলে, একই ধর্ম্মসম্প্রদায়স্থ রাজগণ এক এক জাতীয় লোক। তাঁহারা এক স্বতন্ত্র জাতি। তাঁহারা এক জাতি

ও এক লোকে থাকেন বলিয়া তাঁহাদের লোক-লৌকতা সেই জাতি মধ্যেই নিবদ্ধ। যে লোকে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের সেই লোক অনুসারে লৌকতা হয়। রাজাদের বিবাহাদি ক্রিয়া-কাণ্ড সকলই রাজ-সংসারে আবদ্ধ। সমজাতীয়ের সহিত সমজাতীয়ের মিলন ও সদ্ভাব। তাঁহারা স্বভাবতঃই নীচ শ্রেণীস্থ জনগণকে অবজ্ঞা চক্ষে দেখেন। নীচ জাতীয়ের সহিত বড় মিশিতে চাহেন না। কাজ চালাইবার জন্যই কেবল তাঁহারা মন্ত্রিগণের সহিত সংসর্গ করেন। নহিলে তাঁহাদের প্রকৃত সংসর্গ ও আলাপ কেবল সমকক্ষ রাজবংশীয়গণের সহিত। তাহাদের সহিতই আহার, ব্যবহার, শিষ্টাচার ও মন খুলিয়া আলাপ পরিচয়। যদি বল বিবাদ বিসম্বাদ এবং যুদ্ধ বিগ্রহও ত তাহাদের মধ্যে বিলক্ষণ আছে। এক জাতীয় এবং স্বসম্পর্কীয় হইলেই পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। কুটুম্ব সাক্ষাতের সহিত এবং একজাতীয় লোকে পরস্পরের সহিতই কলহ-বিবাদ ঘটে। যাহার সহিত যাহার স্বার্থ এক, তাহাদের মধ্যে কলহ ঘটে। সুতরাং এই যুদ্ধ বিগ্রহ বরং একজাতীয়তাই সপ্রমাণ করে। রাজগণ সকলে একজাতি বলিয়া রাজকুলে জন্মলাভ করা সৌভাগ্য রূপে গণ্য হইয়া থাকে। জন্মজন্মান্তরে পুণ্য না থাকিলে রাজকুলে জন্মলাভ করা যায় না। সুতরাং জাত্যন্তর পরিণামেই এই রাজ জাতির সৃষ্টি হয়।

তৎপরে সম্ভ্রান্ত সমাজ। এই সম্ভ্রান্তগণই সর্ব্বদেশে রাজবংশের নিম্নশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত। সকল দেশের সম্ভ্রান্ত এবং জমিদারগণ যে একস্থানে বাস করেন, এমত নহে; কিন্তু এক স্থানে বাস না করিলেও তাঁহারা এক জাতিভুক্ত। রাজ-বংশীয়গণের মধ্যে যেরূপ সামাজিক নিয়ম প্রচলিত, সম্ভ্রান্তগণ মধ্যে ও ঠিক তাই। সম্ভ্রান্তগণ (Lords) কেবল অপর সম্ভ্রান্তগণের সহিতই মিলিয়া মিশিয়া থাকেন। এমত কি, সম্ভ্রান্ত বংশীয় নহিলে, ঠিক মিশ খায় না। একজন (Commoner) নীচ শ্রেণীস্থ লোক যদি কোন ক্রমে সেই জাতি মধ্যে প্রবেশ লাভ করেন, তবে সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণ তাঁহার সহিত ঠিক মিশিবে না, বরং তাহার বংশধরগণের সহিত মিলিবেন। সুতরাং সমস্ত সম্ভ্রান্তবংশীয় একলোকে বাস করেন ও একজাতীয় লোক। কেবল জন্ম ও জাত্যন্তর পরিণাম দ্বারাই এই জাতি মধ্যে প্রবেশ লাভ করা যায়।

যে নিয়মে সমাজ মধ্যে রাজবংশীয়
এবং সম্ভ্রান্তগণ পরিচালিত
নিয়মেই সমাজের (Merc
উচ্চ কুলস্থ বণিক ব্যবসায়ী
class) ক্ষত্রিয় ধর্ম্মীরা
থাকেন। তাহারাও সক
বাস করেন এবং এক জা
পরে দেখ, সমাজের কামার
তাঁতী প্রভৃতি লিঙ্গ ব্যব
সেই একই নিয়ম। তাহা
জাতীয় লোক। হিন্দু সমা
দেশীয় সমাজ মধ্যে "জ
প্রচলিত না থাকিলে যে ত
নাই,—তাহা যে শুদ্ধভাবে
করে না, এমত নহে। য
তাহা অবশ্যম্ভাবী। যাহা
গত, মনুষ্য সমাজ, তাহা
কিরূপে মুক্ত হইতে পারে

অতএব, দেখা যাইতেছে, দেবতারা যেমন একলোকে বাস করেন, মনুষ্যলোকে, সমাজস্থ জনগণও তদ্রূপ এক এক লোকে বা জাতিতে বিভক্ত। হিন্দু সমাজে "জাতি-ভেদ" প্রথা প্রচলিত থাকাতে, জন্মহেতু জাতিকুল বিভাগ সামাজিক নিয়মেই ঘটিয়া থাকে। অপরাপর সমাজেও জন্মহেতু জাতিকুল বিভাগ হইতেছে। সকল সমাজেরই জাতি বা লোক বিভাগকে এক এক চক্র (circlein which men of the same class move live) রূপে পরিগণিত করা যাইতে পারে। সেই চক্র মধ্যেই এক জাতীয়-গণ মিলি মিশিয়া কার্য্য করিয়া থাকে এবং সেই চক্র মধ্যেই তাহারা আবদ্ধ।

যে স্থলে এক জাতীয় জনগণের একত্র বাস সম্ভব, সে স্থলে তাহারা একত্র বাসও করিয়া থাকে। এই কলিকাতা নগরমধ্যেই ...ব, খ্রীষ্টানেরা এক স্থানে ... ব্রাহ্মেরা, মারওয়াড়ীরা, ...মানেরা এবং হিন্দুরা। এক ... দেখিতে পাইবে, সেখানেও ... পাড়া, অপর স্থানে ব্রাহ্মণ ...া প্রভৃতি পাড়ায় পাড়ায় ...হইয়া বাস করিতেছে। পল্লী গ্রামেও সেই নিয়ম। প্রতি পল্লীতে পাড়ায় পাড়ায় লোক বিভক্ত হইয়া বাস করিয়া থাকে। বিলাতে Yorkshire এবং Man-chester প্রভৃতি স্থানে কাহারা একত্র বাস করেন?

অতএব, সর্ব্বসমাজেই লোকবিভাগ বর্ত্তমান। এই লোকবিভাগই এক এক চক্র—যে চক্রমধ্যে সমধর্ম্মীয় এবং সমজাতীয় লোক একত্র মিলিত এবং আবদ্ধ। প্রতি মনুষ্যে ব্যক্তিগত বিভিন্নতা থাকিলেও জাতিগত সাদৃশ্য ও সাম্য বিলক্ষণ আছে। সেই সাম্যহেতু তাহারা এক লোকে আনীত ও আকৃষ্ট হয়। কেমন এক স্বাভাবিক টানে তাহারা একত্র আকৃষ্ট হয়। এই স্বাভাবিক সংস্কারই জাতিভেদ। জাতিভেদ জন্ম দ্বারাই প্রধানতঃ সম্পন্ন হয়। জাত্যন্তর পরিণাম বশতঃ জন্মলাভ হয়। চক্রীর চক্রানুসারে যেমন সংসার চলিতেছে, তেমনি সমস্ত লোকসমাজও চলিতেছে। তিনিই প্রতি ব্যক্তিকে ঠিক চক্রে আনিয়া জাত্যন্তর পরিণাম দ্বারা লোক সমাজের সহিত মিলিত করিয়া দেন। সমস্ত লোকসমাজ তাঁহারই চক্রে ভ্রাম্যমান।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

পাদ্য ...
অধিকারী ন...
আলোচনা ব...
কূটযুক্তি ও সূক্ষ্ম...
বুদ্ধি ব্যতীত ধারণ...
শুধু ধারণা করিলে...
সত্য গুলি প্রত্য...
হইতে হয়। ...
আবশ্যক। সে...
নাই।
সমস্ত দর্শনশাস্ত্র...
আর অদ্বৈতবাদ বে...

* বেদা...
...শাস্ক...

"জীবন সায়াহ্নে।"

...ব্রত অবসান—
...নরর খেলা শেষ;
...মান অভিমান,
...সুখ দুখ লেশ।
...ডুবে আলো রেখা
...মব মেঘ গায়;
...ছে বিহঙ্গ পাখা
...তে অনন্ত ছায়।

এস আজি বন্ধুগণ,
আজি শত্রু নাহি মোর;
সব ভাই প্রিয়জন
ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর।

আজি বড় সাধ মনে
তোমাদের বুকে ধরি,
বিজয়ার আলিঙ্গনে
শূন্য প্রাণ পূর্ণ করি।

ভুলে যাও, ক্ষমা কর,
বরিষ আশীষ শিরে,
অন্তিম মিনতি ধর
মুছে নাও আঁখি নীরে।

এত দিন বুঝি নাই
জীবনের মূল্য কত,
আজি অনুতাপে তাই
পুড়িতেছি অবিরত

স্বার্থ-সাধনের করে
তা'দের কোমল প্রাণে,
দারুণ বিরাগ ভরে
হানিয়াছি বিষবাণে।

অন্ধ হ'য়ে ভ্রান্ত মতি
আপনে ক'রেছি পর
ভাবি নাই কিবা গতি
হবে মোর অতঃপর।

যাহা দিনু আপনারে
তাই হ'ল অন্তরায়;
ঢালিনু যা পর দ্বারে
সেই আজি সঙ্গে যায়।

খ্যাতি, রূপ, ধন, মান,
সকলি রহিল পিছে;
আজি লভিয়াছি জ্ঞান
বুঝিয়াছি সব মিছে।

আমিত্বের গুণপণা
কিছু নয়—কিছু নয়;
ধরণীর ধূলিকণা
ধূলিতে মিশায়ে রয়!

আজি এ অন্তিম ক্ষণে
বুঝিয়াছি এই সার,
ধর্ম্ম শুধু এ জীবনে
থেকে যায় আপনার।

তোমরা জীবনপথে
নবীন পথিকগণ;
রেখে দিও প্রাণে গেঁথে
অভাগার এ বচন।

যদিও বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব
বিষময় করে প্রাণে;
প্রণয়ের মধু ছন্দ
বাজে তলে মৃদুতানে।

শুধু হেরি অন্ধকারে
উঠিও না শিহরিয়া;
আলোকের সুধা-ধারে
পুলকিত ক'রো হি ।

কত প্রেম, কত স্নে
চারিদিকে অগণন
তাহা না দেখিবে (
শুধু দেখ নির্য্যাতন
আপনার বন্ধু ভাই
শত্রু কর অকারণে
হৃদে তব ক্ষমা নাই
ক্ষমা কর পাপী জ

সকলেরে ভালবাস
সমুন্নত কর মন;
স্বার্থ নীচতারে নাশ
কর বিশ্ব আলিঙ্গন

প্রেম জীবনের শক্তি
কোমলতা মধুময়;
প্রেম জীবনের মুক্তি
অনন্তের পরিচয়।

প্রেম জীবনের জ্যোতি
প্রাণময় বারিধারা ;
প্রেম জীবনের গতি
প্রেমে হও আত্মহারা।

ধর্ম্মপ্রেম, প্রেম ধর্ম্ম,
ভেদাভেদ কিছু নাই
প্রেমের প্রকৃত মর্ম্ম
এই সবে জেনো ভাই।

মর যদি ভালবেসে
জীবন সে মৃত্যু নয় ;
প্রেমেতে বাঁচিবে শেষে,
প্রেম চির মৃত্যুঞ্জয়।

ওই ডুবে আলো রেখা
পশ্চিমের মেঘ গায় ;
মেলিছে বিহঙ্গ পাখা
উড়িতে অনন্ত ছায়।

রুদ্ধ হয় কণ্ঠ স্বর
বলিতে শকতি নাই ;
ডাকিছে মৃত্যুর চর
—বিদায়! চলিনু ভাই!!

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

বেদান্তদর্শন ও অদ্বৈতবাদ। (২)

বেদান্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিমত।

বেদান্ত শাস্ত্র বড় দুর্বোধ্য। ইহার প্রতি-
তত্ত্বগুলি বুঝা বড় কঠিন। উপযুক্ত
ন সেই জন্য বেদান্তশাস্ত্র
বিড়ম্বনা। দর্শনশাস্ত্রের
ত্ব সকল বিশেষ মার্জ্জিত
করা দুঃসাধ্য। * আর
ই যথেষ্ট হয় না। মূল
করিতে হয়—তত্ত্বদর্শী
হার জন্য বিশেষ সাধনা
াধনা এক্ষণে আমাদের

মধ্যে বেদান্ত শ্রেষ্ঠ।
নাস্তের চরম সিদ্ধান্ত।

দুঃখের বিষয়, আমরা এই বেদান্ত শাস্ত্রের অমূল্যত্ব বুঝি না। আমাদের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন বটে। কিন্তু আমাদের নিজের দর্শন শাস্ত্র আমরা আয়ত্ত করিতে অসমর্থ। আমাদের দর্শন শাস্ত্র আয়ত্ত করিতে যে আজীবন শিক্ষা ও গুরুর উপদেশ প্রয়োজন হইত, সে শিক্ষা ও সে উপদেশ আমরা আর পাই না।

সুখের বিষয়, অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত আমাদের দেশের দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বেদান্ত দর্শনের স্থান কত উচ্চে—তাহা তাঁহারা বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত জানিতে পারিলে আমাদের মধ্যে অনেকের বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়নে আস্থা জন্মিতে পারে। এই আশায় এস্থলে বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য কয়েকজন পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করা হইল।

। শাঙ্করভাষ্য সম্বন্ধে পণ্ডিত

arn you that his (Sanka
much more like the style
ok, is difficult to follow,
ame effort of attention
bestow on the intricate
stotle or Kant."
Vedant Philosophy, p 62.

ফরাসি দার্শনিক শ্রেষ্ঠ কুঁজে, তাঁহার কৃত দর্শন ইতিহাসে বলিয়াছেন —

"প্রাচ্য দেশের এবং প্রধানতঃ ভারতের কাব্য ও দর্শনের কীর্ত্তিস্তুপ ইউরোপে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেই সকল যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই, যে তাহাতে এত গভীর সত্য নিহিত আছে, ও তাহাদের তুলনায় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের গবেষণার ফল এত নীচ বলিয়া বোধ হয় যে, আমরা প্রাচ্য দর্শনের সম্মুখে অবনত হইতে বাধ্য হই, এবং মানবজাতির এই শৈশবলীলা-ক্ষেত্রেই সর্ব্বোচ্চ দর্শনের প্রকৃত জন্ম স্থান বলিয়া বুঝিতে পারি।" (১)

পণ্ডিতবর কুঁজে আর একস্থানে বলিয়াছেন যে, "ভারতের দর্শন শাস্ত্র এত বিস্তৃত যে, আমরা ইহাকে সমগ্র দর্শন ইতিহাসের সার সংগ্রহ মাত্র বলিতে পারি।" (২)

প্রসিদ্ধ, জর্ম্মান পণ্ডিত সেলিগেল বলিয়াছেন, —

"এমন কি, ইউরোপের যে সর্ব্বোচ্চ দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানের মায়াবাদ গ্রীসীয় দার্শনিকদিগের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও প্রাচ্য মায়াবাদের পূর্ণ আলোক ও তেজের নিকট, মধ্যাহ্ন সূর্য্য কিরণের পূর্ণ আলোক ও শোভার সম্মুখে সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।" (৩)

ইহার পর আমরা অতি প্রসিদ্ধ জর্ম্মান দার্শনিক পণ্ডিত সপেনহরের কথা উল্লেখ করিব। সপেনহরের স্থান জর্ম্মান দার্শনিকদিগের মধ্যে অতি উচ্চে। (৪) সুতরাং তাঁহার অভিমতের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। পণ্ডিতবর সপেনহর বলিয়াছেন—

"মানবজ্ঞানের ও বুদ্ধির চরম সীমায় আসিলে তবে বেদরূপ ফল লাভ হয়। সেই বেদের সারভাগ উপনিষদ্—এই শতাব্দীর (ঊনবিংশ শতাব্দীর) শ্রেষ্ঠতম উপহার স্বরূপ আমরা লাভ করিয়াছি।" (৫)

সপেনহর অন্য এক স্থলে বলিয়াছেন—

"বেদের পবিত্র ভাবে উপনিষদ্ কি সুন্দর ও পূর্ণ রূপে অনুপ্রাণিত। যিনি যত্ন পূর্ব্বক এই অতুলনীয় গ্রন্থ আলোচনা করিবেন, তাহারই অন্তঃকরণ ইহার ভাবে আমূল আলোড়িত হইবে। ইহাতে মন কেমন পবিত্র হয়। ইহুদী ধর্ম্ম এবং তৎপোষক দর্শন আলোচনাজাত কুসংস্কার উন্মূলিত হয়। এমন উপকারী ও পবিত্রকরী গ্রন্থ আর নাই,—আর জগতে থাকাও সম্ভব নহে। ইহা ইহ জীবনে আমাে

(১) When we read with attention the poetical and philosophical monuments of the East, above all, those of India, which are beginning to spread in Europe, we discover there many a truth, and truths so profound, and which make such a contrast with the meanness of the results at which the European genius has sometimes stopped, that we are constrained to bend the knee before the philosophy of the East, and to see in this cradle of the human race the native land of highest philosophy."

Cousin's History of philosophy vol 1, p 32.

(২) "The Indian Philosophy is so vast that we can literally say that it is an abridgement of the entire history of Philosophy."

Do. Do.

(৩) "Even the loftiest philosophy of the Europeans, the idealism of reason, as it is set forth by the Greek philosophers, appears in comparison light and vigor of orien a feeble Promethean flood of heavenly glory sun......"

(৪) এই সপেনহর সম্বন্ধে ও দর্শনাধ্যাপক পল ডিউসেন

"The stand point all contradictions has b main, we believe, by ma lism founded by Kant, to perfection by his deci ...." No Sculptor' hymn can worthily cele penheaur) for it."

Elements of Meta

পণ্ডিত মোক্ষমূলর সপে

"A philosopher, the with all the historical sy phy...... and certainly to deal in extravagant p losophy but his own."

Vedant philosophy

(৫) "Vedas—the fr human knowledge and of which has at last re Upanishads, the greatest tury."

দান করিয়াছে এবং মৃত্যু কালেও শান্তিদান করিবে।" (৬)

এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, পূর্ব্বে সম্রাট আকবরের সময়ে যে কয়েকখানি প্রধান উপনিষদের পারসি ভাষায় অনুবাদ হইয়াছিল, তাহা হইতে যে ফরাসি অনুবাদ হয়, তাহাই সপেনহারের সময়ে ইউরোপে প্রচারিত হইতেছিল। সপেনহর তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এই উপনিষদ অবলম্বনে রচনা করেন। (৭)

সে যাহা হউক, যে সকল নরদেবতা বা ঋষিদিগের নিকট বেদ ও উপনিষদের তত্ত্বসকল প্রথম স্ফুরিত হইয়াছিল—তাঁহাদের সম্বন্ধে এই মহাজ্ঞানী জর্ম্মান পণ্ডিত কি বলিয়াছেন, তাহাও আমাদের মনে রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলে পতিত আমরা সেই ঋষিদিগের প্রতি ভক্তি করিতে শিক্ষা পাইব। তিনি বলিয়াছেন,—

"প্রথম যুগে যাঁহারা মানব জাতির উৎপত্তি কালের অধিকতর নিকটবর্ত্তী ছিলেন, তাঁহাদের জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ শক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তাই তাঁহারা জগতের প্রকৃততত্ত্ব আরও সহজ ও পরিস্ফুট রূপে ধারণা করিতে সমর্থ ছিলেন। তাই তাঁহারা আরও ভালরূপে আধ্যাত্মিক জ্ঞান পিপাসা তৃপ্ত করিতে পারিতেন। তাই ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণ ঐ সকল তত্ত্বের অমানব ধারণা করিতে স্বতঃই সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং তাহা বেদের উপনিষদে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।"(১)

পণ্ডিত সপেনহর আরও একস্থানে বলিয়াছেন,—

"বেদের উপনিষদ্ রচয়িতা ঋষিগণ মানুষ ছিলেন না। এক্ষণকার অবনত মানবজাতি অপেক্ষা তাঁহারা আরও পরিষ্কার ও গভীররূপে বস্তুতত্ত্ব ধারণা করিতে সক্ষম ছিলেন।" (২) (শঙ্করাচার্য্যও ঠিক এইরূপ কথা বলিয়াছেন। তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।)

উপরি উদ্ধৃত অংশ হইতে উপনিষদ্ ও উপনিষদ্ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ সম্বন্ধে পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ সপেনহরের কি অভিমত, তাহা বুঝা যাইবে। প্রসঙ্গক্রমে এ স্থলে সাধারণত হিন্দু ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সপেনহরের কিরূপ অভিমত ছিল, তাহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

Schoupenheaur's world as Will and Idea, vol I, p 461

(৬) "How thoroughly does the Oupnekhat (Upanishad) breathe the holy spirit of the Vedas, and how does every one who by diligent perusal has familiarised himself with · · this incomparable book, feel himself stirred to his innermost, by that spirit, And Oh ! how the mind is here washed clean of all its early ingrafted Jewish superstition, and all philosophy servile to that superstition ! It is the most profitable, and the most elevating reading which is possible in the world It has been the consolation of my life, and will be the consolation of my death."

Schoupenheaur's Paregra vol. II. Sec 185.

(৭) সপেনহর তাঁহার "World as will and Idea" পুস্তকের মুখবন্ধে বলিয়াছেন—"If the reader has also received and assimilated the sacred primitive Indian wisdom, then he is best of all prepared to what I have to say to him ....Each one of the individual and disconnected aphorisms, which make up the Upanishads, may be deduced as a consequence from the thought I am going to impart."

(১) Yet in the Early ages, those who stood nearer to the beginning of the human race had both greater energy of the intuitive faculty, and a truer disposition of the mind, so that they were capable of a purer, more direct comprehensions of the inner being of nature, and were thus in a position to satisfy the metaphysical need in a more worthy manner Thus originated in the primitive ancestors of the Brahmans, *Rishis*, the almost superhuman conceptions which were afterwards set down in the Upanishads of the Vedas."

Schoupenheaur's world as Will and Idea, vol. II, p 362.

(২)...to those sublime authors of the upanishads of the Vedas, who can scarcely be thought of as mere men,... ..we must ascribe this immediate illuminations of their mind to the fact that these wise men standing nearer the origin of our race in time, comprehended the nature of things more clearly and profoundly than the already deteriorated race ····· is able to do."

Do. Do. vol. III, p 265.

তাঁহার মতে হিন্দুধর্ম্ম কুসংস্কার পূর্ণ নহে—ইহা সত্য ধর্ম্ম। (১) তাঁহার বিশ্বাস, ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। ভারতের দর্শনশাস্ত্রই ইউরোপে প্রচার হইয়া তথাকার জ্ঞান ও চিন্তাস্রোত ফিরাইয়া দিবে। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সফল হইতেছে। সপেনহরের কথার ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। (২) সে কথাগুলি মনে রাখিলে আমাদের বিশেষ উপকার হইতে পারিবে।

এই সপেনহর ব্যতীত আমরা আর এক জন জর্ম্মান পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করিব। ইঁহার নাম পাল ডুসেন। ইনি জর্ম্মানির কিল নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক। ইনি বেদান্তদর্শনের শাঙ্কর ভাষ্য জর্ম্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন—ও ভারতের দর্শনের ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন। (১) সুতরাং ইঁহার কথার গুরুত্ব কম নহে। ইনি বলিয়াছেন,—

"অতি প্রাচীনকাল হইতে ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে ভারতে পূর্ব্বাপর প্রচলিত যে কুসংস্কার বদ্ধমূল আছে, তাহা আধুনিক বিবৃত ও বিপ্লবকারী যুগধর্ম্মের

(১) পণ্ডিত সপেনহর বলিয়াছেন—

"Our krowledge of Hindu literature is still very imperfect Yet as we find their ethical teaching—variously and figuratively expressed in the Vedas Purans, poems, myths, legends, maxims we see that inculcates love of our neighbour, with complete renunciation of self love, —love generally not confined to mankind, but including all living creatures, benevolence even to the giving away of the hard earned wages of daily toil, unlimited patience towards all who injures us, the requietal of all wickedness however base with goodness and love, abstinence from animal food, perfect chastity and renunciation of all sexual pleasures for him who strives after holiness, the surrender of of all possessions, the forsaking of every dwelling place and of all relations, deep unbroken solitude spent in silent contemplation, with terrible pennance for the mortification of the will...............and yet even those precepts, whose origin reached back more than four thousand years, are carried out in practice, in some cases even to the utmost extreme—and this notwithstanding the fact that the Hindu nation has been broken up into so many parts: a religion which demands the greatest sacrifices and which has yet remained so long in practice in a nation, that embraces as many millions of persons cannot be arbitrarily invented superstition, but must have its foundation in the nature of man."

Schopenheaur's 'World as Will and Idea vol. I, p 502

(২) "Broken up as this noblest and most ancient nation is in may parts, this myth (of transmigration) yet reigns as the universal belief of the people, and has the most decided influence upon the life today, as four thousand years ago, Therefore Pythagoras and Plato have seized with admiration, at the no *plus ultra* of mythical representation, received it from India or Egypt, honored it, made use of it, and we know not how far relieved it

We on the contrary now send the Brahmans, English clergymen and evangelical linnenweavers to set them right out of sympathy, and to show that they were created out of nothing, and ought thankfully to rejoice in the fact But it is just the same as it we fired a bullet against a cliff In India our religions will never take root. The ancient wisdom of the human race will not be dispersed by what happened in Gallilee On the contrary Indian philosophy streams back to Europe, and will produce a fundamental change in our knowledge and thought"

Do. Do vol I, p 461.

(১) এই পালডুসেন সম্বন্ধে প্রফেসর মোক্ষমূলর বলিয়াছেন—

"Professor Deussen . the German professor, who did not shrink from the trouble of learning Sanskrit with the sole object of studying the Vedant philosophy ... ..a well schooled philosopher...deeply versed in Plato, Aristotle, Spinoza and Kant —did not think it waste of time to devote some of the best years of his life to the Vedanta, nay to make a journey to India in order to come in contact with the still living representations of the Vedant philosophy."

The Vedant Philosophy p. 120.

প্রভাবে উন্মূলিত হয় নাই। * * দীন ভারতের এই দুর্দ্দিনে এ কথা বড় শান্তিপ্রদ। কেন না, ইহকাল অপেক্ষা পরকালের অর্থ গুরুতর। আর উপনিষদ্ ও বেদান্তসূত্র ও কাণ্ট প্লেতোর সমকক্ষ শঙ্করকৃত তৎভাষ্য—এ সকলের প্রতিষ্ঠিত বেদান্তশাস্ত্র—নিত্যতত্ব অন্বেষণে মানব-প্রতিভা-জাত চেষ্টার সর্ব্বাপেক্ষা মহামূল্য ফল।" (২)

পরিশেষে পণ্ডিত মোক্ষমূলের অভিমত উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তাঁহার দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি ঋগ্বেদের প্রকাশক, প্রাচ্য ধর্ম্ম গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশক, তিনি বেদান্তদর্শন ও আমাদের ষড় দর্শন সম্বন্ধে ইংরাজীতে পুস্তক লিখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মত পণ্ডিতের নিকট সহজেই আমরা প্রকৃত কথা পাইবার আশা করি। কিন্তু ক্ষোভের বিষয়,তিনি স্বধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান বলিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিতে পারেন নাই। তিনি ভাষাতত্ব অনুশীলন জন্য সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছেন, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য ঋগ্বেদ ও প্রাচ্য শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। (৩) তাই তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন,—

"আপনারা (সাধারণ শ্রোতাগণ) মনে রাখিবেন যে, এই বেদান্তশাস্ত্র কখন গুপ্তবিদ্যা ছিল না। ইহাতে সকলেরই অধিকার ছিল। এই শাস্ত্র এরূপ লোকের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছিল—যাহারা শিক্ষা ও সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে এস্থলে সমবেত আমাদের প্রত্যেকের অপেক্ষা অনেক হীন ছিল। কৃষ্ণ চর্ম্মাবৃত ভারতবাসী দুই তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, তাহা কি এতই উচ্চ ও এতই গভীর যে, তাহা আমাদের আয়ত্বের অতীত হইবে?" (১)

যাহা হউক, এই পণ্ডিত মোক্ষমূলরই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,—

"গ্রীস দেশের, মধ্যযুগের ও বর্ত্তমান কালের দার্শনিক পণ্ডিতগণ অপেক্ষা ভারতের প্রাচীন দার্শনিকগণের আত্মতত্বজ্ঞান অধিক ছিল।" (২)

---

(২) In India the influence of this perverted and perversive spirit of our age has not yet overthrown in religion and philosophy the good traditions of the great ancient time.. ...The fact may be for poor India a great consolation for the eternal interests are higher than the temporary ; and the system of Vedanta as founded on the Upanishads and the Vedant sutras and accomplished by Sankara's commentaries on them—equal in rank to Peato, and Kant—is one of the most valuable products of the genius of mankind in its search for the eternal truth."

Paul Deussen's "Philosophy of the Vedanta."

(৩) মোক্ষমূলর নিজে বলিয়াছেন—

"Under these circumstances it was felt that nothing would be of greater assistance to the missionaries in India than an edition of the Rig Veda... ..

Chips from German Workshop, vol. I, p 309.

"It was for this very purpose, for the purpose of enabling the missionaries to study the religion of those whom we wish to convert, that I published a series of translations of the sacred books of the East, which now amounts to nearly fifty volumes. If Government sends out officers to explore the fortresses and to examine the strategic peculiarities of the frontiers of our neighbours would it not be well, that missionaries also, who are to conquer the whole world, should act as spies, should make themselves acquainted with the sacred books of their religions, the very fortresses of those whom they wish, if not to conquer, yet to convince and to convert."

Professer Max Muller's article in the Nineteenth Century, September, 1895.

(১) Remember that all this Vedant philosophy was never esoterie, but that it was open to all and was elaborated by men who in culture and general knowledge stood far below than any one of us here present......should the wisdom reached by the dark skinned inhabitants of India two or three thousand years ago be too deep or too high for us?

Vedant philosophy

(২) "The old Indian philosophers knew more about the soul than Greek mediæval or modern philosophers."

India, p. 9.

তিনিই বলিয়াছেন,—

"মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবার পক্ষে বেদান্ত দর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর দর্শন আর নাই।" (৩)

এই মোক্ষমূলরই অন্যস্থলে শাঙ্কর দর্শন সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"এই দর্শনে যুক্তিপরম্পরা এরূপ সুন্দর ভাবে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ আছে, এবং প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতি বরাবর এরূপ লক্ষ্য রাখিয়া সমুদায় সুমীমাংসা হইয়াছে যে, প্লেতার সময় হইতে কাণ্টের সময় পর্য্যন্ত কোন দর্শন শাস্ত্রে সেরূপ পাওয়া যায় না। (৪) শঙ্করাচার্য্যের যুক্তিপ্রণালী এরূপ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ও ন্যায় সঙ্গত যে, কি ভারতবাসী, কি ইউরোপীয় যে কোন বিরুদ্ধ মতবাদী দার্শনিকের মত খণ্ডন করিয়া তিনি তাঁহার নিজ মত সমর্থন করিতে সক্ষম ছিলেন।" (৫)

সে যাহা হউক, খ্যাতনামা পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের উল্লিখিত কয়েকটী অভিমত হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, বেদান্ত দর্শন সর্ব্বরূপে, কি প্রাচীন কি আধুনিক, সর্ব্বদেশের সর্ব্বদর্শনের শীর্ষস্থানীয়। অদ্বৈতবাদ তাহার চরম পরিণতি। এই বেদান্ত দর্শন ও অদ্বৈতবাদ আমাদের আলোচ্য। কিন্তু সে আলোচনার পূর্ব্বে অনেক আনুসঙ্গিক বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে ও এই উপক্রমণিকায় এই সকল বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

(৩) "If philosophy is meant to be a preparation of happy death or Eusthanasia, I know of no better preparation for it than the Vedant philosophy."

Ibid p 8.

(৪) "But while in the Upanishads these various guesses at truth seem thrown out at haphazard, they were afterwards woven together with wonderful patience, and ingenuity. The uniform purpose running through all of them, was clearly brought out ,and a system of philosophy was erected out of such diverse materials,which is not only perfectly coherent, but quite clear and distinct in almost every point of doctrine. Though here and there sutras admit of divergent interpretations, no doubt is left on any important point of Sankara's philosophy which is more than can be said of any system of philosophy from the days of Plato to the days of Kant."

Ibid p 35.

(৫) Sankara the author of the great commentary, knows how to reason accurately and logically, and would be able to hold his own against any opponent whether Indian or European."

Ibid p 45.

রাজতরঙ্গিণী (৭)

লৌকিকাব্দ ও শকাব্দ।

'রাজতরঙ্গিণী'র আরম্ভে কহ্লণ পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তিনি চতুর্ব্বিংশ লৌকিকাব্দে এবং ১০৭০ শকাব্দে 'রাজতরঙ্গিণী, রচনা করেন। ইহা হইতে কাশ্মীর এই উভয় অব্দ প্রচলনের বিষয় জানা যাইতেছে।

"লৌকিকেহব্দে চতুর্ব্বিংশে, শককালস্য সাম্প্রতং।
সপ্তত্যাত্যধিকং যাতং সহস্রং পরিবৎসরাঃ॥"(১৫২)

লৌকিকাব্দের অর্থ সপ্তর্ষি সংবৎসর। কলিযুগাব্দের ২৫ অব্দে সপ্তর্ষি সংবৎসরের কাল গণনা আরম্ভ হয়। লৌকিকাব্দের সহিত ২৫ যোগ করিলে, অতীত কলিযুগাব্দ পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত শ্লোক হইতে জানা যাইতেছে যে, লৌকিকাব্দের সহিত ৪৬ যোগ করিলে, অতীত শকাব্দ পাওয়া যায়। শকাব্দের ন্যায় লৌকিকাব্দের কাল গণনা প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে আরব্ধ হয়। চৈত্র মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদে বৎসরের গণনা আরব্ধ হয় এবং পূর্ণিমা তিথিতে প্রতিমাস শেষ হয়। লৌকিকাব্দের সহিত ৮১ যোগ করিয়া, অতীত বিক্রমাব্দ এবং ২৩—২৫ যোগ

করিয়া খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়*। লৌকিকাব্দে শত ও সহস্র গণিত হয় না।

(১) লৌকিকাব্দ + ২৫ = অতীত কলিযুগাব্দ।

(২) লৌকিকাব্দ + ৪৬ = অতীত শকাব্দ।

(৩) লৌকিকাব্দ + ৮১ = অতীত বিক্রমাব্দ।

(৪) লৌকিকাব্দ + ২৪। ২৫ = খ্রীষ্টাব্দ।

কলিযুগাব্দের ৩১৭৯ বর্ষে শকাব্দের; ৩১০১ বর্ষে খ্রীষ্টাব্দের এবং ৩০৪৪ অব্দে সংবতাব্দের কাল গণনা আরব্ধ হয়। একণে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক হইতে আমরা কি ফল পাইতেছি, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। ১০৭০ শকাব্দকে কলিযুগাব্দে পরিণত করিতে হইলে, তাহার সহিত ৩১৭৯ যোগ করিলে কলিযুগাব্দ পাওয়া যাইবে। উভয়ের যোগফল হইতে ২৫ অন্তর করিলে, লৌকিকাব্দ বা সপ্তর্ষি সংবৎ জানা যাইবে।

১০৭০	শকাব্দ
+ ৩১৭৯	
৪২৪৯	কলিযুগাব্দ
—২৫	
[৪২] ২৪	লৌকিকাব্দ
+ ২৪।২৫	
[১১]৪৮-৪৯	খ্রীষ্টাব্দ

রাজা ভীমগুপ্তের রাজত্বকালে পামপুরবাসী বিখ্যাত বৈয়াকরণ কৈয়টের রচিত 'দেবীশতকে'র টীকা ৪০৭৮ কলিযুগ অতীতাব্দে এবং ৫২ অতীত লৌকিকাব্দে রচিত হয়। অতীত ৫২ লৌকিকাব্দের অর্থ প্রচলিত ৫৩ লৌকিকাব্দ। ৫৩ সংখ্যার সহিত ২৫ যোগ করিলে ৭৮ হয়। ৪০৭৮ হইতে ৩১৭৯ বাদ দিলে, ৮৯৯ অতীত শকাব্দ পাওয়া যায়। ৫৩ + ৪৬ = ৯৯। ৫৩ + ৮১ = ১৩৪। ৫৩ + ২৪।২৫ = ৭৭-৭৮। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, দেবীশতকের টীকা কৈয়ট কর্তৃক প্রচলিত ৫৩ লৌকিকাব্দে, ৮৯৯ অতীত শকাব্দে, ৯৩৪ অতীত বিক্রমাব্দে এবং ৯৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ইহা হইতে মহাভাষ্যের 'ভাষপ্রদীপ' নামে টীকা প্রণেতা কৈয়টের সময় খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগ বলিয়া জানা যাইতেছে। ডাক্তার বালের তাঁহাকে খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর গ্রন্থকার বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

বসু মুনি গগনোদধি-সমকালে যাতে কালাস্তথা
লোকে।
দ্বাপঞ্চাশে বর্ষে রচিতেয়ং শাসতি ভীমগুপ্তনৃপে॥

অধ্যাপক কিল্‌হরণ সাহেব লৌকিকাব্দে লিখিত কতকগুলি হস্তলিখিত পুস্তকের সময় নির্ণয় করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মের সত্যতা দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

(১) বার্লিন রাজকীয় পুস্তকালয়ের একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ প্রচলিত সপ্তর্ষি সংবৎ ৬৯ (৪৮৬৯) অব্দে লিখিত হয়। তখন কলিযুগের (৬৯ + ২৫) ৪৮৯৪ অব্দ অতীত হয়। ৪৮৯৪ হইতে ৩১৭৯ বাদ দিলে, ১৭১৫ অতীত শকাব্দ পাওয়া যায়। (৬৯ + ৪৬ = ১১৫) এবং (৬৯ + ৮১ = ১৫০)। সেই সময়ে ১৮৫০ বিক্রম সংবৎ অতীত হয়। তখন ১৭৯৩—৯৪ খ্রীষ্টাব্দ প্রচলিত ছিল।

(২) সপ্তর্ষি সংবৎ ৪৯৬৫ অব্দের একখানি কাশ্মীরী পঞ্জিকা হইতে জানা যায় যে, সেই সময়ে কলিযুগের ৪৯৯০ অব্দ, শকাব্দের ১৮১১ এবং বিক্রম সংবতের ১৯৪৬ বর্ষ সেই সময়ে অতীত হয়। তখন খ্রীষ্টাব্দ ১৮৯০-৯১ প্রচলিত ছিল।

(৩) ডাক্তর ষ্টীনের সংগৃহীত একখানি

* Indian Antiquary, XX. 149

অতি প্রাচীন ও জীর্ণ পুঁথি ভূর্জ্জপত্রে কাশ্মীরে প্রচলিত সারদা অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। ইহার লিখন সময় সপ্তর্ষি সংবৎ ৪৩০০ অশ বতি (বদি) ১৩ শনৌ। তখন কলিযুগের ৪৩২৫ অব্দ, ১১৪৬ শকাব্দ এবং ১১৮১ বিক্রম সংবৎ অতীত হয়। অমান্ত মাসের হিসাবে ১১৪৬ অতীত শকাব্দের আশ্বিন বদি ১৩ শনৌ = ১২২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ অক্টোবর, শনিবার, এই পুস্তক সমাপ্ত হয়।

(৪) কবি শ্রীহর্ষের রচিত 'রত্নাবলী নাটিকা'র একখানি কাশ্মীরী পুঁথি ডাক্তর ষ্টীন্ সংগ্রহ করেন। ইহার শেষভাগে পুস্তক লিখার সময় "সংবৎ ৬৯, চৈত্র বদি একা দশ্যাং চন্দ্রবাসরে শ্রবণা নক্ষত্রে" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতে ডাক্তর কিল্‌হরণ পুস্তকের সময় ১২১৫ এবং ১৪১৫ অতীত শকাব্দ বলিয়া অনুমান করেন। তদনুসারে এই পুস্তক ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে ফেব্রুয়ারী অথবা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ, সোমবারে লিখিত হয়।

(৫) ডাক্তর হল্‌স্ সাহেবের সংগৃহীত একখানি পুঁথি লিখার সময় "সংবৎ ২৪ কার্ত্তিক বদি ত্রয়োদশ্যাং বুধে। শ্রীশক ১৫৭০ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তদনুসারে এই পুস্তক ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর, বুধবার লিখিত হয়।

(৬) ভিয়েনা নগরীর রাজকীয় পুস্তকাগারে সারদা অক্ষরে একখানি পুস্তকের শেষে বিক্রম সংবৎ, শকাব্দ ও সপ্তর্ষি সংবতের সহিত সম্রাট আরঙ্গজীবের প্রবর্ত্তিত অব্দের উল্লেখ দেখা যায়। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট সম্রাট্ আরঙ্গজীব সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক দিল্লীর সম্রাট বলিয়া আপনাকে বিঘোষিত করেন। এই কাশ্মীরী পুঁথির শেষে "শ্রীবিক্রমাদিত্যশাকাঃ ১৭৩২। শ্রীমচ্ছালিবাহনশাকাঃ ১৫৯৭। শ্রীমদ্ ঔরঙ্গ সাহশকে ১৮। শ্রীসপ্তর্ষিচারমতে ৫১ বৈ সুদি ১০ শনৌ" লিখিত আছে। তদনুসারে জানা যায় যে, এই পুঁথির লেখা ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল, শনিবার, সমাপ্ত হয়।

(৭) পুনা নগরের ডেকান কালেজে 'ধ্বন্যালোক' নামে গ্রন্থের একখানি কাশ্মীরী পুঁথি আছে। তাহা ৭৯৫১ সপ্তর্ষি সংবতের 'অশ্বযুজ কৃষ্ণ সপ্তমী মঙ্গলবাসরে' সমাপ্ত হয়। তখন কলিযুগের ৪৯৭৬ অব্দ, এবং ১৭৯৭ শকাব্দ অতীত হয়। তদনুসারে এই পুস্তক ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার লিখিত হয়।

(৮) পুনার ডেকান কলেজে 'বালবোধিনী' নামে কাতন্ত্র ব্যাকরণের একখানি বৃত্তি বিদ্যমান আছে। তাহার শেষভাগে লিখিত আছে যে, এই পুঁথি "শ্রীশাকঃ ১৫৯১। সংবৎসর ৪৫-ভাদ্রপদো মাসঃ—পক্ষ সিতেতরঃ—তিথি দ্বাদশী—বারঃ কাব্যস্যেতি" লিখিত হয়। এই নির্দ্দেশ মতে এই পুস্তক ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট, শুক্রবার লিখিত হয়।

(৯) পুনার ডেকান কলেজে কাশ্মীরী সারদা অক্ষরে "কাশিকাবৃত্তির" যে প্রতিলিপি আছে যে, তাহার লিখা সমাপ্তির কাল "শ্রীনৃপ বিক্রমাদিত্য রাজ্যস্য গতাব্দাঃ১৭১৭। শ্রীসপ্তর্ষিমতে সংবৎ ৩৬—পৌষবদি ৩ রবৌ তিষ্য নক্ষত্রে" "বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, এই 'কাশিকাবৃত্তি' ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর, রবিবার, সমাপ্ত হয়।

পূর্ব্বোক্ত হস্তলিখিত পুঁথি ভিন্ন তিনখানি প্রস্তর লিপিতে সপ্তর্ষি সংবতের উল্লেখ

দেখা যায়। চম্বা নগরে একখানি তাম্র-শাসন বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ কানিংহাম সাহেবের অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হয় *। তাহার প্রথম এবং সপ্তম পংক্তিতে যে সপ্তর্ষি ও বিক্রম সংবতের উল্লেখ আছে, অষ্টম ও অষ্টাদশ পংক্তিতে তাহারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। ইহা হইতে সপ্তর্ষি সংবৎ ও বিক্রম সংবতের ব্যবধান ৮১ বৎসর বলিয়া জানা যায়।

"শ্রীমদ্বিক্রমার্ক সংবৎসরে ১৯:৫। শ্রীশাস্ত্রসংবৎসরে ৩৪।" "শ্রীমদ্বিক্রমাদিত্য সংবৎসরে ১৩১৭। শ্রীশাস্ত্র সংবৎসরে ৩৬।

চম্বার আর এক প্রস্তরলিপি * আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে শকাব্দ, বিক্রম ও সপ্তর্ষি সংবতের উল্লেখ দেখা যায়। "শ্রীমন্নৃপতি বিক্রমাদিত্য সংবৎসরে ১৭১৭। শ্রীশালিবাহন শকে ১৫৮২। শ্রীশাস্ত্র সংবৎসরে ৩৬। বৈশাখ বদি ত্রয়োদশ্যাং বুধবাসরে মেষেষ্টক সংক্রান্তৌ—১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চ, বুধবার এই প্রস্তরলিপি লিখিত হয়। কাশ্মীর পর্য্যটন কালে ডাক্তার হুল্‌স্‌ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হরি পর্ব্বতে যে প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হন, তাহা "সং ৬০, শ্রাবদি প্রশুক্রে, মহম্মদ সাহ রাজ্যে" লিখিত হয়। সপ্তর্ষি সংবৎ ৬০ অব্দে ১৪০৬ শকাব্দ অতীত হয়। ইহা হইতে জানা যায়, মহম্মদ সাহের রাজত্ব কালে ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাই, শুক্রবার এই প্রস্তরলিপি লিখিত হয়।

পঞ্জাবের অন্তর্গত কাঙ্গরার কীরা গ্রামস্থিত বৈদ্যনাথ-মন্দিরে এক প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। † তাহা ত্রিগর্ত্তের রাজা জয়চন্দ্রের সময়ে ১১২৬ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্ল প্রতিপদে, রবিবারে, ৮০ সপ্তর্ষি সংবতে রাম শর্ম্মা দ্বারা রচিত হয়। কানিংহাম সাহেবের মতে এই প্রশস্তি ৭২৬ অতীত শকাব্দে রচিত হয়। কিন্তু কিল্‌হরণ সাহেব গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, ৬২৬ হইতে ১৪২৬ অতীত শকাব্দের মধ্যে কেবল মাত্র ১১২৬ অতীত শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ শুক্ল প্রতিপৎ রবিবারে সংঘটিত হইয়াছিল। ৭২৬ শকাব্দের বৈশাখ মাসের শুক্ল প্রতিপদ রবিবার ছিল। ইহা হইতে জানা যাইতেছে, এই প্রশস্তি ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে ২রা মে, রবিবার, উৎকীর্ণ হয়।

> "সংবৎসরে শীতিতমে প্রসন্নে,
> জ্যৈষ্ঠস্য শুক্ল প্রতিপৎ দিবৌচ।
> শ্রীমজ্জয়চন্দ্র নরেন্দ্র রাজ্যে
> রবেদিনে রামঃ ত' প্রশস্তি॥' ৩১।

ত্রিগর্ত্তের রাজা জয়চন্দ্রের পিতার নাম অমরচন্দ্র। এই অমরচন্দ্রের কন্যা লক্ষ্মণার সহিত কীরাগ্রামের রাজনক (শামন্ত) কহ্লণের পুত্র বিহ্লণের বিবাহ হয়। বিহ্লণের দুই পুত্রের মধ্যে রামচন্দ্র জ্যেষ্ঠ এবং লক্ষ্মণ চন্দ্র কনিষ্ঠ ছিলেন। এই লক্ষ্মণচন্দ্র হইতে সম্ভবত কাঙ্গরার রাজবংশ উদ্ভূত হন। ভবিষ্যতে কাঙ্গরার নরপতিগণ সম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা রহিল।

সপ্তর্ষি সম্বৎ অতি প্রাচীন কাল হইতে কাশ্মীর ও তৎসন্নিহিত অন্যান্য পার্ব্বত্য রাজ্য সমূহে প্রচলিত ছিল। 'রাজতরঙ্গিণী' রচনার সময়েও এই সপ্তর্ষি সম্বৎ কাশ্মীরে প্রচলিত ছিল। কহ্লণ পণ্ডিত লৌকিকাব্দ নামে এই অব্দ স্বরচিত গ্রন্থের আরম্ভে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে কলিযুগাব্দের ৬৫৩ অব্দে যুধিষ্ঠিরের

* Sir A. Cunningham's Archaeological Survey of India, XXI, 136-137.

† Epigraphia Indica I, 97.

রাজ্যাভিষেকের সময় শকাব্দের পূর্ব্বতন ২৫২৬ অব্দ যৌধিষ্ঠিরাব্দের কালগণনা এবং শকাব্দের পূর্ব্বতন ৩১৭৯ অব্দ হইতে কলিযুগাব্দের কালগণনা আরম্ভ হয়। কলিযুগাব্দের ২৫ অব্দে সপ্তর্ষি সংবতের প্রচলন আরম্ভ হয়। কহ্লন পণ্ডিতের গ্রন্থ হইতে এই চারিটী প্রাচীন অব্দের বিবরণ জনা যাইতেছে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

ব্রহ্ম ও জগৎ। (১৭)

বেদের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য একস্থলে বলিয়াছেন যে, "সমগ্র জগৎ প্রলয়কালে বিশীর্ণ হইয়া যায় এবং বিশীর্ণ হইয়া গিয়া, স্বীয় কারণীভূত মায়াতে বিলীন থাকে। প্রলয়াবসানে, পুনঃসৃষ্টির আদিতে, পূর্ব্বে যে মায়াতে পূর্ব্ব সৃষ্ট-জগৎ বিলীন হইয়াছিল, সেই মায়াকে অব্যক্ত বলে। পূর্ব্বজগৎ এই অব্যক্তে বিলীন আছে এবং এখনও পর সৃষ্ট-জগতের বিকাশ হয় নাই। এই অবস্থায় মায়াকে নিতান্ত অসৎ পদার্থ (no entity) বলা যাইতে পারেনা। কেননা, অভাব হইতে ভাব পদার্থের উৎপত্তি হইতেও পারে না। আবার এই মায়া ব্রহ্ম-চৈতন্যের ন্যায় সৎও (real) নহে। এইজন্য মায়া সৎ ও অসদাত্মক নহে এবং সুতরাং অনির্ব্বচনীয়"। সায়নের এই বর্ণনা অতীব পরিস্ফুট। অসৎ হইতে সৎ হইতে পারে, হিন্দুদর্শন একথা স্বীকার করে না। সাংখ্যদর্শনে কপিল এবং বেদান্তে শঙ্কর বহু আয়াস-সহকারে সৎকার্য্য-বাদ স্থাপন করিয়াছেন। "শক্ত্যবশেষমেব জগৎ প্রলীয়তে"। বারম্বার শঙ্করাচার্য্য একথা প্রমাণিত করিয়াছেন। আমরা সেই যুক্তি তর্কের পুনরুল্লেখ করিতে চাই না। এ প্রবন্ধে কেবল সিদ্ধান্ত পক্ষ মাত্র অবলম্বিত হইয়াছে। সেই যুক্তিগুলি কিরূপ অকাট্য, তাহা কৌতূহলী পাঠক মূল গ্রন্থে পড়িয়া দেখিবেন।

অতএব যদি একান্ত অসৎ হইতে বস্তুর উৎপত্তি অসম্ভব হইল, তবে জগৎসৃষ্টির প্রারম্ভেও মায়া বা যাহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা একান্ত অসৎ হইতে পারে না। অভাবাত্মক উপাদান কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। কার্য্য, উপদান কারণে বিলীন অবস্থায়,—অব্যক্ত-শক্তিময় অবস্থায়—নিগূঢ় থাকে। কেবল কারকব্যাপার দ্বারা তাহা ক্রমে ব্যক্ত হয়। সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদিকাল হইতে এইরূপে চলিয়া আসিতেছে। কোথায়ও ইহার আদি নাই। আদি স্বীকার করিলেই, ক্রিয়ার বিরাম স্বীকার করিতে হয়। ঈশ্বরকেও সুতরাং শক্তিশূন্য বলিতে হয়। কাজেই এই ক্রিয়ার আদি নাই, অন্ত নাই। প্রলয় কালেও ধারণাত্মক ক্রিয়া থাকিয়া যায়। এই ধারণাত্মক ক্রিয়ার সদ্ভাব প্রযুক্তই মায়াতে কার্য্যগুলি অব্যক্তাবস্থায় বিলীন থাকিতে পারে। পরে তাহা নূতন জন্মে না। কেবল নামরূপে প্রকাশ পায় মাত্র। কার্য্য, কারণেরই অবস্থার ভেদ মাত্র। পরে প্রকাশিত ফেনতরঙ্গাদি যেমন সাগরের জলে থাকে, তদ্রূপ পরে প্রকাশিত কার্য্য, তাহার উপাদানে বিলীন থাকে। নূতন কিছুই হয় না; অকস্মাৎ কিছুই প্রাদুর্ভূত হয় না। যাহা এক অবস্থায় ছিল, তাহাই অন্য অবস্থায় দেখা দেয়, এই মাত্র।*

"ন সতঃ [illegible] উৎ[illegible]তে, সদেব [illegible]নাব তিষ্ঠতে, যথা সর্পঃ কুণ্ডলী ভবতি। [illegible]

রাবস্থং ভবতীতি তদ্বৎ ;—মৃদাদি সংস্থানমাত্রং ঘটাদয়ঃ" (ছা, উ—শঙ্করভাষ্য।

অতএব প্রলয়ে, অব্যক্তেতে (মায়াতে) যে সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তি সমূহ বিলীন ভাবে সুপ্ত ছিল, তাহাই ঈশ্বরের নিয়োগে প্রকাশিত হয় মাত্র। জীবের সেই বিলীন ক্রিয়াশক্তি গুলিকেই "অদৃষ্ট" বা "কর্ম্মশক্তি" নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। যে যে জীব, যে যেরূপ ইন্দ্রিয়শক্তি ও বুদ্ধি বৃত্তিবশতঃ যে যে সমস্ত ক্রিয়া করিয়াছিল, সেই ক্রিয়াগুলিও, ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়শক্তি ও বৃত্তির সহিত মায়াতে বিলীন হইয়াছিল। তাহাই "অদৃষ্ট"। অতএব ইন্দ্রিয়াদি শক্তির প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের ক্রিয়া বা অদৃষ্টও প্রাদুর্ভূত হয়। ইহাই সৃষ্টিতত্ত্ব। যে যাহার কারণ, সে তাহাতেই ক্রমে লীন হয়। অতএব পঞ্চ স্থূলভূত, সূক্ষ্মভূতে এবং সূক্ষ্মভূত ও ইন্দ্রিয়শক্তি গুলি বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি মায়াতে যেরূপ ক্রমে প্রলয়ে লীন হয়, সৃষ্টির আদিতেও সেই রূপে ক্রমশঃ পর পর উৎপন্ন হয়। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে, প্রলয়ে, সমগ্র জীবের বুদ্ধিবৃত্তিগুলি বৃত্তিশূন্যাবস্থায় কেবল সত্তা বা বুদ্ধিরূপে মায়ায় লীন ছিল। পুনঃ সৃষ্টিতে সেই বৃত্তিবিবর্জ্জিত বুদ্ধিগুলির বৃত্তিরাশি ও ইন্দ্রিয়শক্তি গুলির প্রাদুর্ভাব হইল। ক্রমে তাহারা স্থূলাবস্থা পাইল। যাহা অব্যক্তাবস্থায় বুদ্ধিতে বিলীন ছিল, তাহাই প্রকাশিত হইল মাত্র। ঈশ্বর বা অব্যক্তোপহিত চৈতন্যই এই প্রকাশের প্রবর্ত্তক। অব্যক্তাবস্থায় স্থিত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তিগুলির সুতরাং তিনিই প্রবর্ত্তক। এইরূপে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম উপাধি যোগে সক্রিয় হইয়া পড়েন। এইরূপ [illegible] উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম অর্থাৎ বুদ্ধিতে প্রতিফলিত ব্রহ্মই ঈশ্বর বা সগুণ ও ঐশ্বর্য্যাত্মক ব্রহ্ম নামে পরিচিত। ইহাই বেদান্তের সগুণ ঈশ্বর। এবং এই অব্যক্ত বুদ্ধিই ঈশ্বরের প্রথম শক্তির বিকাশ। বুদ্ধির এই নিরবচ্ছিন্ন কেবল সত্ত্বময় অবস্থাটীও একরূপ বৃত্তি বিশেষ। কিন্তু ইহাই বুদ্ধির শেষ (final) বৃত্তি (Modification)। ইহাও বিলুপ্ত হইলেই, ব্রহ্মের সেই নিষ্ক্রিয়, উদাসীন, তুরীয় অবস্থা। সে অবস্থায় ব্রহ্মের আর শক্তির সহিত সংযোগ নাই।

অতএব এই স্থূল শরীরই সমষ্টিভাবে, অব্যক্তাবস্থায় "মায়া" নামে অভিহিত। অথবা ঠিক্ দার্শনিকভাবে বলিতে হইলে, মায়া যখন ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হয়, তখনই সত্ত্বগুণময় তাহার প্রথম বিকাশ হয়। ইহার অর্থ এই যে, ক্রমে জীবের স্থূলশরীর হইতে আরম্ভ হইয়া বিলীন হইতে হইতে, প্রলয়কালে জীবের চৈতন্য পর ব্রহ্মে এবং জীবের শরীর ও ইন্দ্রিয় "অব্যক্তে" লীন হয়। এ অবস্থায় কেবলমাত্র সত্ত্বাত্মক বুদ্ধিরূপে মায়া চৈতন্যে অবস্থিত থাকে। কেবল ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, কেবল প্রকৃতি বা মায়া নিষ্ক্রিয়। উভয়ের অনাদিকাল হইতে পরস্পর সংযোগ বশতঃই ক্রমে বুদ্ধ্যাদি ক্রমে শরীরাদির উদ্ভব হইয়াছে। অতএব এই শরীরেরই অবস্থান্তর অব্যক্তনামে অভিহিত, ইহা বুঝা যাইতেছে। ইহা কেবল সত্ত্বময়, কেননা তখন আর শরীরের কোন ক্রিয়া বা বুদ্ধির কোনই বৃত্তির ক্রিয়া নাই ; কেবল অব্যক্ত সত্ত্বা আছে মাত্র।

মায়া বা প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ ও তমঃ বা সুখ, দুঃখ, মোহ—এই ত্রিবিধ দ্রব্যময়ী। ইহারা Uniform বলিয়া, ন্যূনাধিক না থাকাতে,

তখন আর প্রকৃতির ক্রিয়া থাকে না। কিন্তু ব্রহ্ম অনাদিকাল হইতেই স্বীয় শক্তি বা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত। এই সংযোগ হইতে সর্ব্ব প্রথমে প্রকৃতিতে কেবল সত্ত্বগুণ প্রধান পরিণাম হয়। ইহাই মহত্তত্ত্ব। ব্রহ্মের শক্তির এই সর্ব্ব প্রথম বিকাশ ভাবী সৃষ্টির বীজ। ব্রহ্ম তখন 'ঈষৎ উপজাত প্রবৃত্তি'' হন। এই বাক্যোপস্থিত সৃষ্ট্যুন্মুখ শক্তি হইতে, উহাতে পূর্ব্ব প্রলয়ে বিলীন জীবনিবহের ইন্দ্রিয়শক্তি ও বুদ্ধির বৃত্তি সকল প্রাদুর্ভূত হয়। স্ব স্ব শক্তিনিহিত ক্রিয়া বা অদৃষ্ট বশতঃ, ঈশ্বর ভাবের [illegible] প্রবর্ত্তন করাইয়া থাকেন। এই জন্যই তাঁহাকে নিয়ন্তা বলে। অতএব বুদ্ধি হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত ২০ টী তত্ত্বকেই অব্যক্তাবস্থায় মায়া বলে। বেদান্তের মায়াবাদ এইরূপ। ইহা কল্পিত পদার্থ নহে। ইহা সত্য পদার্থ।

এই মায়া বা সৃজ্যশক্তি চিরকালই আছে; সৃষ্টিও চিরকাল আছে। কেবল স্থূলাবস্থায় ইহাকে আমরা স্থূলশরীর এবং ভোগভূমি নামে অভিহিত করি, এই মাত্র প্রভেদ। বাস্তবিক এই শরীরই—এই বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সমন্বিত স্থূলশরীর গুলিই—মায়া নামে অভিহিত। কেবল ইহার অবস্থার ভেদে, নামের ভেদের কল্পনা মাত্র। অব্যক্তা—বস্থায় এই মায়া ব্রহ্মেতেই অব্যক্তভাবে বিলীন থাকে। তাঁহার "সংকল্প" বশতঃ পরে তাহারই অবস্থাভেদ হইয়া থাকে। এইরূপে, জগৎ শক্তিতে লীন থাকিলেও, সেই শক্তি ব্রহ্মেরই;—সুতরাং জগৎ ব্রহ্মেতেই লীন থাকে। এইরূপে মায়া বাস্তবিক পক্ষে জগতের উপাদান কারণ হইলেও, ব্রহ্মই জগতের উপাদান। তিলে যেরূপ তৈল থাকে, মৃত্তিকাতে যেরূপ ঘট থাকে, জলে যেরূপ তরঙ্গ থাকে, অব্যক্ত ভাবে তদ্রূপ জগৎও ব্রহ্মেতেই অবস্থিতি থাকে। একেবারে জগৎ ধ্বংস হয় না। সেইজন্য শ্রুতিতে "অসদিবাসীৎ" বলা হইয়াছে। জগৎ একেবারে অসৎ হইয়া যায় না, নাম রূপ থাকে না বলিয়া, তাহা অসতের ন্যায় প্রতীয়মান হয় মাত্র। এইরূপে প্রতি প্রলয়ে জগৎ ব্রহ্মশক্তিতে, ও জীবচৈতন্য ব্রহ্মচৈতন্যে লীন হয়; পুন-রায় প্রলয়াবসানে সৃষ্টির প্রাক্কালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাবে বিকাশ হয়। যাহা অব্যক্ত ছিল, তাহারই সূক্ষ্মভাবে অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, এবং যাহা সূক্ষ্ম ছিল, তাহাই স্থূল ভাবে দেখা দেয়। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহা স্বীকার না করিলে বলিতে হয় যে, অভাবাত্মাকে পদার্থ হইতে ভাবা-ত্মক পদার্থ উৎপন্ন হইল। আবার এই মায়ার ত্রিবিধ অবস্থাতেই, তদুপহিত ও তৎপ্রবিষ্ট ব্রহ্মও, উপাধিযোগে, তদ্রূপ অবস্থাপন্ন হন। তখন নির্গুণ, বিশেষত্ব-বর্জ্জিত ব্রহ্ম চৈতন্য মনে করেন যেন তিনি মায়াময় বা কারণ স্বরূপ, তিনি যেন সূক্ষ্ম দেহময় এবং তিনি যেন স্থূলদেহময় হই-য়াছেন। তখন আর স্বরূপজ্ঞান থাকে না। স্বরূপজ্ঞান উপাধিযোগবশতঃ আবৃত হইয়া পড়ে।

ক্রমশঃ।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

প্রাচীন খ্রীষ্টীয় পূজা-বিধি।

বর্ত্তমান কালে খ্রীষ্টীয়মণ্ডলী সমূহে যে সমস্ত নিরূপিত পূজা বিধি ব্যবহৃত হয়, ঐ সমস্ত চারিটী [illegible] পূজা-বিধি হইতে গঠিত হইয়া [illegible] প্রায় [illegible]

তেছে। ১ম, ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী যে 'সেরাম্, পূজা-বিধি অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান পূজা-বিধি গঠিত করিয়াছেন, ঐটী এবং প্রাচীন ফরাশিস (গালিকান্) ও স্পানিশ (মোজারাবিক) পূজা-বিধি, এফিসাস্ পূজাবিধির রূপান্তর মাত্র। এই এফিসাস্ পূজাবিধি সাধু যোহন রচিত বলিয়া প্রাচীন মণ্ডলীতে গ্রাহ্য হইত। ২য়, রোমীয় পূজাবিধি, যাহা ক্রমান্বয়ে সাধু লিও, সাধু আম্ব্রোস্, সাধু জেলেসিয়স ও সাধু গ্রেগরি দ্বারা রূপান্তরিত হইয়াছে, উহা সাধু পিটার কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া আসিতেছে। ৩য়, মিসর ও আবিসিনিয়া দেশের প্রাচীন মণ্ডলী (কেপ্টিক্ মণ্ডলী) সমূহে ব্যবহৃত পূজা বিধি সাধু মার্ক রচিত বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া আসিতেছে। ৪র্থ, মালাবার উপকূলের ভারতবর্ষীয় প্রাচীন মণ্ডলীতে যাহা অবিকৃত ভাবে এবং গ্রীক্ ও রুশিয় মণ্ডলীতে যাহা সাধু বাসিল্ ও সাধু ক্রীসোষ্টম্ দ্বারা রূপান্তরিত হইয়া ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, উহা সাধু জেম্‌স্ রচিত বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া আসিতেছে। এই চারিখানি প্রৈরিতিক পূজা-বিধির মধ্যে সাধু জেম্‌সের পূজাবিধি সম্বন্ধে প্রাচীনতম সাক্ষ্য পাওয়া যায়। জাষ্টিন্ মার্টারের গ্রন্থে (১৪০ খ্রীঃ অব্দ) এই পূজা বিধির উল্লেখ আছে। তাঁহার সময়ে যখন এই পূজা-বিধি জেরুসালেমের প্রথম বিশপ্ এপস্‌ল্ জেম্‌স্ রচিত বলিয়া মণ্ডলী মধ্যে খ্যাত ছিল, তখন বস্তুতঃই এই পূজা-বিধি এপস্‌ল্ রচিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

প্রৈরিতিক পূজাবিধি চতুষ্টয় পাঠ করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, অতি প্রাচীন কালা-[illegible] বিভিন্ন [illegible] বিভিন্ন [illegible]

সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান। এই সৌসাদৃশ্যও প্রৈরিতিক উদ্ভবের একটী হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধ্যা বন্দনা বিধি(Matins and Evensong লিটানি, প্রভৃতি পূজা-বিধিগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। প্রাচীন পূজা-বিধি গুলি সমস্তই পুণ্য সহভাগ বা পরম প্রসাদ বলি উৎসর্গের আনুসঙ্গিক এবং এই পুণ্য বলি উৎসর্গই প্রাচীন কালে খ্রীষ্টীয় পূজা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইতিবৃত্তকার প্লিনি (খ্রীষ্টাব্দ ১০০) খ্রীষ্টীয়ানদিগের পূজাবিধি বর্ণনা করিতে গিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পুণ্য-সংস্কার উৎসর্গ ও সূর্য্যোদয়ের পরে একত্রে ভোজন প্রথা বর্ণনা করিয়াছেন। ক্রিয়া পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪২ চরণে এবং ধর্ম্ম-পুস্তকের অন্যান্য স্থলে বর্ণিত পূজা প্রথাও নিরূপিত পিষ্টক খণ্ডন ও নিরূপিত প্রার্থনাদি সম্বন্ধেই বর্ণিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সাধু যোহনের প্রকাশিত বাক্যের ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ে বর্ণিত স্বর্গীয় পূজা বিধির বর্ণনার সহিত গ্রীক মণ্ডলীর এবং অল্প বিস্তর তাবৎ খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর প্রকৃত পূজা-পদ্ধতির সৌসাদৃশ্য দেখিলে, বোধ হয়, সাধু যোহনের মৃত্যুর পূর্ব্বেই যেরূপ পূজাবিধি মণ্ডলী মধ্যে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, অদ্যাপিও প্রাচীন খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী সমূহে সেইরূপ পূজাবিধি প্রচলিত রহিয়াছে।

সুদূর ভারতবর্ষে প্রাচীন খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র (নূতন সংহিতা) ও প্রাচীন খ্রীষ্টীয় পূজা পদ্ধতি যে অদ্যাপিও অবিকৃত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা সামান্য সৌভাগ্য ও বৈচিত্রের কথা নহে। ডাক্তার ক্লথেজির কর্ত্তৃক অনুবাদিত মালাবার মণ্ডলীতে ব্যবহৃত নূতন সংহিতা পাঠ করিয়া দেখি, ইউরোপখণ্ডে

প্রচলিত নিউ-টেষ্টামেণ্টের সহিত ইহার সম্পূর্ণ ঐক্য রহিয়াছে। মালাবারের মণ্ডলী সমূহে প্রচলিত সাধু জেম্‌সের পূজাবিধির বঙ্গানুবাদ আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিলে প্রটেষ্টাণ্ট পাঠকের মনে হইতে পারে, "ইহারা রোমক ভ্রান্ত মত কোথা হইতে পাইল?" অথবা "ইহারাও যে দেখিতে পাই হাইচর্চ্চ! রোমীয়, ইংলণ্ডীয়, গ্রীক্ ও ভারতবর্ষীয় প্রাচীন মণ্ডলীগুলির পূজাবিধির মধ্যে যে সকল সামান্য ভাব দেখিতে পাই, সেগুলি কি বস্তুতঃই ভ্রান্তিমূলক? সেগুলি কি প্রকৃতই প্রৈরিতিক, খ্রীষ্টীয়, ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী ভাব নহে? প্রাচীন খ্রীষ্টীয় পূজাবিধি কি য়িহুদী পূজা বিধির অনুযায়ী হওয়া সম্ভব নহে? যে যাত্রা পুস্তকে ঈশ্বর পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, সেই যাত্রা পুস্তকেই কি প্রটেষ্টাণ্ট মতানুসারে পৌত্তলিক ভাবাপন্ন পূজাবিধির নিয়ম ঈশ্বর নিরূপিত করিয়া দেন নাই? ঈশ্বর যাহা এককালে প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, একালে সেই ভাবের পূজা কি ঈশ্বর মৃষা বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারেন? ঈশ্বরের পক্ষে বিশ্বাস ও জ্ঞানের হ্রাস বৃদ্ধি হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। যে যে সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয় পূজা য়িহুদীয় পূজার রূপান্তর, তাহাত ধর্ম্মশাস্ত্রেই বর্ণিত হইয়াছে। রক্তপাত করা পূজার অঙ্গ বলিয়া আর গ্রাহ্য নাই, মহাপ্রভুর রক্তপাত দ্বারা বলিদান পদ্ধতির সিদ্ধি হইয়া গিয়াছে, একথা ত শাস্ত্রেই বর্ণিত হইয়াছে। তাই বলিয়া বলি-উৎসর্গ ধূপ ও দীপ জ্বালন, রাজাধিরাজের সভায় উপস্থিত হইবার উপযুক্ত পুরোহিতদিগের পরিচ্ছদ, ইত্যাদি সমস্তই যে উঠাইয়া দেওয়া খ্রীষ্টের অভিপ্রায়, কে বলিল? (ইউসিবিয়সের ইতিহাস ৫।২৪)১৫০০ বৎসর ধরিয়া এপস্‌ল-গণ স্থাপিত মণ্ডলী সমূহে নিকৃষ্ট পূজাবিধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ প্রকৃষ্ট ও আধ্যাত্মিক পূজাবিধির আবিষ্কার হওয়া কি সম্ভব? খ্রীষ্ট ধর্ম্মের জন্য ৩০০।৪০০ বৎসর ধরিয়া যে সকল সাধু প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহারা ভ্রান্তির মধ্যেই মগ্ন ছিলেন, আর আমরা আলোক দেখিতে পাইয়াছি, ইহাই কি সম্ভব? জাষ্টিন্, মার্টার, টার্টালিয়ান্, ইউসিবিয়াস্, ইহারা এপসল্‌দের বিশ্বাস ও পূজা প্রণালী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, এ সমস্ত কল্পনা ও প্রবঞ্চনা মাত্র, আর আমরা আবিষ্কার করিয়া বসিলাম, এপস্‌ল্‌গণ কি মানিতেন ও কি করিতেন, এরূপ যুক্তি মানিতে গেলে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ভিত্তি পর্য্যন্ত উড়িয়া যায়। সাধুদের কল্পনা ও প্রবঞ্চনার উপর খ্রীষ্টমণ্ডলী গ্রথিত, ইহা অপেক্ষা খ্রীষ্টধর্ম্মের বৈরীগণের পক্ষে আর কি শুভ সম্বাদ হইতে পারে? নূতন সংহিতার সংশোধিত ইংরাজি অনুবাদ (ক্রিয়া ২।৪২)১ম করিন্থ ১৪।৪০; ১ম করিন্থ ১১।২, ১ম টিমথি ২।১ ক্রিয়া ২।৪২) পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এপস্‌ল্‌গণ, মণ্ডলী সমূহে নিরূপিত প্রার্থনার, নিরূপিত পূজাবিধির নিরূপিত শিক্ষা দিবার উদ্যোগ করিয়া গিয়াছিলেন। প্রাচীন খ্রীষ্টীয় ও অখ্রীষ্টীয় সকল লেখকগণই এই মতের সমর্থন করেন। নূতন সংহিতার পাণ্ডুলিপি গুলি যত প্রাচীন, সাধু জেম্‌সের পূজা-বিধি প্রভৃতি কয়েকখানি পূজা বিধির পাণ্ডুলিপি গুলিও তত প্রাচীন। চারি খানি সুসমাচারের মধ্যে যেরূপ ভাবের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, এই চারি খানি পূজা-বিধির মধ্যেও সেই রূপ ঐক্য। মহাপ্রভুর শিষ্যগণ কিরূপ

নিয়মে পূজা-পদ্ধতি ও খ্রীষ্টীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করেন, এই পূজা-বিধি চতুষ্টয় উহার সুন্দর সাক্ষ্য। পূজা-পদ্ধতি চতুষ্টয় পাঠ করিলে উহাদের মধ্যে এই কয়েকটী বিষয়ে ঐক্য লক্ষিত হয়।

১। শান্তি চুম্বন।

২। "তোমাদের অন্তঃকরণ উন্নত কর।" (Sursum corda)।

৩। "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র ইত্যাদি" (Tersanctus)

৪। পরম-প্রসাদের অনুষ্ঠান বিবরণ (Commemoration)।

৫। উৎসর্গ (oblation)।

৬। পবিত্র-আত্মার সাহ্বান (Invocation)

৭। জীবিত ব্যক্তিদের জন্য প্রার্থনা।

৮। মৃত ব্যক্তিদের জন্য প্রার্থনা।

৯। প্রভুর প্রার্থনা।

১০। উৎসর্গীকৃত দ্রব্যদ্বয়ের মিশ্রণ।

১১। সহভাগ।

১২। ধন্যবাদ দান।

আজিও পুরাতন মণ্ডলী গুলিতে পরম প্রসাদের উৎসর্গ ও পুণ্য সহভাগ গ্রহণই খ্রীষ্টীয় পূজার বিশেষত্বরূপে গ্রাহ্য হইয়া আসিতেছে। আমাদের সৎকার্য্য, বা প্রার্থনা বা অনুতাপ ঈশ্বরের নিকট ধরিবারই উপযুক্ত নহে। কেবল একটী মাত্র পদার্থ ঈশ্বরের নিকট ধরিবার উপযুক্ত। জীবিত ও মৃত সকল ব্যক্তিই কেবল সেই বলি-উৎসর্গের উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বরের সমক্ষে আসিতে সক্ষম, ইহাই খ্রীষ্টীয় পূজা-বিধির বিশেষত্ব।

যে সাধু জেম্‌স্ রচিত বলিয়া এই প্রাচীন পূজা পদ্ধতি খ্যাত হইয়া আসিতেছে, ইনি প্রভু "যীশু খ্রীষ্টের ভ্রাতা" অর্থাৎ নিকট সম্পর্কীয় বলিয়া নূতন সংহিতায় উক্ত হইয়াছেন। ইনি দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যস্থ নহেন। অথচ পুনরুত্থানের পরে প্রভু ইঁহাকে দেখা দেওয়াতে ইনি সাধু পলের ন্যায় এপস্‌ল্ বলিয়াই খ্যাত। সাধু জনের ভ্রাতা এপস্‌ল্ জেম্‌স্ হইতে ইঁহাকে পৃথক করিবার জন্য ইনি "ক্ষুদ্র" নামে অভিহিত হয়েন। ইনি প্রথম শতাব্দীর খ্রীষ্টীয়ান ও য়িহুদীর মধ্যে "ন্যায়পরায়ণ" নামেও খ্যাত হইয়াছিলেন। ইনি যে প্রভুর আত্মীয়, তাহা ইঁহার মুখাকৃতিতেই প্রকাশিত হইত। এই সৌসাদৃশ্য প্রযুক্তই দুরাচার জুডাস্ প্রভুকে শত্রু হস্তে অর্পণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার মুখ-চুম্বন করিয়াছিল। পাছে ভুলক্রমে রাত্রিযোগে শত্রু-সেনা প্রভুকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার আত্মীয় জেম্‌স্‌কে ধরিয়া আনে, এই কারণ জুডাস্ যে ব্যক্তির মুখচুম্বন করিবে, সেই যীশু,এই সঙ্কেত শত্রু-সেনাদের পূর্ব্ব হইতেই শিখাইয়া রাখিয়াছিল। জেম্‌স্ সম্বন্ধে আর একটী প্রাচীন কিম্বদন্তী ধর্ম্মশাস্ত্রে না থাকিলেও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। যীশু যে শুক্রবারে মৃত্যুক্লেশ সহ্য করেন, তাহার পূর্ব্ব রাত্রে আত্মীয় স্বজনদের সহিত নিশি-ভোজ করেন। সেই নিশি-ভোজের পরে জেম্‌স্ প্রতিজ্ঞা করেন যে, প্রভু মৃত্যু হইতে যতক্ষণ না পুনরুত্থিত হইবেন, ততক্ষণ আপনি আর কিছু ভোজন করিবেন না। জেম্‌স্ এইরূপে অনাহারে আছেন, এমন সময়ে প্রভু তাঁহার নিকটে রুটি লইয়া দেখা দিলেন, এবং ধন্যবাদ সহকারে রুটি ছিঁড়িয়া জেম্‌সকে দিয়া কহিলেন—"ভাই, এই তোমার রুটী, এখন খাও, নারায়ণ ত মৃত্যু হইতে উঠিয়াছেন।"

প্রাচীন ইতিহাসে বর্ণিত আছে—জেম্‌স্‌ ত্রিশবৎসর কাল জেরুসালেমের বিশপ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মৎস্য, মাংস, সুরা, এসকল কিছুই না খাইয়া অতি কঠোর নিয়মে থাকিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করিতেন। একদা পাসোভার যজ্ঞে জেরুসালেম লোকে লোকারণ্য হইয়াছে, এমন সময়ে ঈর্ষাপরবশ হইয়া য়িহুদীদের পুরোহিতগণ জেম্‌সের নিকট আসিয়া কৌশলে বলিল, "মহাশয়, আপনি নিতান্ত ন্যায়পরায়ণ ও সত্য বাদী, মশিহ সম্বন্ধে লোকের যে সকল ভ্রম ও সংশয় উদয় হইয়াছে, এ বিষয়ে আপনি যদি তাহাদিগকে এই সময়ে বুঝাইয়া বলেন, তবে বড় ভাল হয়।" এই বলিয়া ষষ্ঠ-নবতি বৎসরের শুভ্রকেশ বৃদ্ধকে লইয়া য়িহুদী-পুরোহিতগণ জেরুসালেমের প্রধান মন্দিরের একটী তোরণের উপরে রাখিয়া বলিল, "এই স্থল হইতে আপনি লোকদিগকে উপদেশ দিউন, এবং যে যীশু ক্রুশে হত হইয়াছেন, তাঁহাকে লোকেরা কেন পূজা করিতেছে, এই বিষয়ে বুঝাইয়া দিউন।" বৃদ্ধ সাধু জনতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া, শত্রুদের কৌশল বুঝিয়া, স্পষ্ট স্বরে চিৎকার করিয়া কহিলেন, "নারায়ণ যীশুর কথা তোমরা কি জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছ? তিনি স্বর্গে, সর্ব্বশক্তিমানের দক্ষিণহস্ত হইয়া উপবিষ্ট আছেন, এবং স্বর্গীয় মেঘমালার মধ্যগত হইয়া তিনি পুনরায় আসিবেন।" লোকেরা এই কথা শুনিয়া জয়-নিনাদে বলিতে লাগিল—"দায়ুদ-পুত্রের জয় হউক।" পুরোহিতগণ কৌশলের ফল বিপরীত ঘটিল দেখিয়া, বৃদ্ধ সাধুকে তোরণ হইতে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল। এত উচ্চস্থান হইতে পড়িয়াও সাধুর প্রাণ বিয়োগ হইল না। তিনি অতি কষ্টে উঠিয়া জানু অবনত করিয়া শত্রুদের অপরাধ ক্ষমার জন্য ঈশ্বরের নিকট ভিক্ষা চাহিতেছেন, এমন সময়ে চারিদিক হইতে তাঁহার উপর লোষ্ট্রবর্ষণ হইতে লাগিল, আর শেষে এক জন শত্রু অগ্রসর হইয়া গদার প্রহারে তাঁহার প্রাণনাশ করিল। প্রাচীন আলেখ্যগুলিতে সাধু জেম্‌স্‌ গদাধর রূপে চিত্রিত হইয়াছেন।

প্রাচীনমণ্ডলী সাধু জেম্‌স্‌ রচিত বলিয়া যে লিপিখানি নিঃসন্দেহ স্থির করিয়াছিলেন, সেই লিপিখানি নূতন সংহিতায় সন্নিবেশিত আছে। সৎকার্য্যের আবশ্যকতাই এই লিপির প্রধান শিক্ষা। এই প্রাচীন পূজা পদ্ধতিটীর অনুবাদ পরে প্রদত্ত হইবে, ইহা জেরুসালেমের মণ্ডলী ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রাচ্যমণ্ডলী সমূহে প্রচলিত ছিল বলিয়াও উহা জেরুসালেমের প্রথম বিশপ জেমসের নামধেয় হইতে পারে। অথবা এরূপ হওয়াও সম্ভব, জেম্‌স্‌ রচিত আর কোন পূজাপদ্ধতি ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া একশত বৎসরের মধ্যেই এই রূপান্তর ধারণ করিয়াছে। পূজাদি কার্য্য যে সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহিত হওয়া কর্ত্তব্য, এপস্‌লগণ যে পূজাদিকার্য্য প্রাচীন য়িহুদীজাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত নিয়মেই নিরূপিত করিবেন, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া স্তবগান, রুটী ছিন্ন করা, প্রার্থনা করা, সামগাথা গান করা, শিক্ষা দান, এই সকল কার্য্য যে প্রাচীন পূজাপদ্ধতি চতুষ্টয়ে নিরূপিত আকার ধারণ করিয়া এপস্‌লদের সময় হইতে চলিয়া আসিবে, ইহাই সম্ভব।

মালবার উপকূলের খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় যে প্রাচীন পূজাপদ্ধতি অবিকৃত ভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কি গ্রীক্‌, কি রোমান্‌

মণ্ডলী, কোন প্রাচীনমণ্ডলীই প্রাচীন পূজা পদ্ধতি সেরূপ অবিকৃত ভাবে রক্ষা করেন নাই। রোমান্ মণ্ডলীত ক্রমশঃই রূপান্তরিত হইয়া আসিতেছে, ইহা সর্ব্ববাদী' সম্মত। কিন্তু যে গ্রীকমণ্ডলী প্রাচীন পদ্ধতি সমস্ত অটুটভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, এই শ্লাঘা করিয়া থাকে, তাহার উপাসনা-পুস্তক পাঠে কি দেখিতে পাই—একই কথা, একই ভাব, বার বার ; বিশবার একই কথার ঈশ্বর-জননীর (Theotekos) এর আরাধনা। যেন আজিও নেষ্টোরিয় ধর্ম্ম বিপ্লব জগৎকে আলোড়িত করিতেছে, গ্রীকমণ্ডলীর পূজা-পদ্ধতি আলোচনা করিলে ইহাই বোধ হয়। বিশেষ কারণ বশতঃ বিশেষ আকারের পূজা-পদ্ধতি বিশেষ বিশেষ সময়ে মণ্ডলীর মধ্যে আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন পূজা-পদ্ধতি চতুষ্টয়ে, বিশেষ সাধু জেম্‌সের পূজা-পদ্ধতিতে এইরূপ শিক্ষার বিশেষত্ব জ্ঞাপক মন্ত্রাদি কিছুই নাই। যাহা ত্রৈপ্রিতিক ও প্রাচীন, ইহাই এই পূজা-পদ্ধতির মধ্যে সন্নিবেশিত। এ কারণ ইহা অতি বহুমূল্য গ্রন্থ।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

রাজা শশীশেখরেশ্বর বাহাদুর ও রাজকুমার কলেজ।

কিছু দিন হইতে রাজা শশীশেখরেশ্বর সালিসী সভার দ্বারা দেশের মামলা মোকদ্দমা করাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। মামলা মোকদ্দমায় যে দেশের অশেষ অনিষ্ট হইতেছে, তাহা অনেক দিন পূর্ব্বে আমি "মামলায় মরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। এবং সেই সঙ্গে যাহাতে দেশে সালিসী দ্বারা বিবাদের মীমাংসা হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত, তাহাও লিখিয়াছিলাম। তাহার পরে, পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে সালিসী দ্বারা বিবাদ মিটিত, এক্ষণে সেরূপ বিবাদ মিটে না কেন, তাহাও আর একটী প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। আমার সেই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতের সহিত যাঁহাদিগের মতের মিল আছে, তাঁহারা অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, রাজা শশীশেখরেশ্বর যে প্রণালীতে সালিসী সভার কার্য্য করিতেছেন, তাহা দ্বারা দেশের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। এবং এই কার্য্যে তাঁহার যে পরিমাণে ত্যাগস্বীকার ও চিন্তাশীলতা ও পরিশ্রম প্রকাশ পাইয়াছে, এই বিশাল ব্যাপারে সফল হইতে হইলে তাহার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক ত্যাগস্বীকার, চিন্তাশীলতা ও পরিশ্রম প্রয়োজন। রাজা বাহাদুর যদি এক মাত্র ব্রত পালনে তাঁহার সমুদয় জীবন উৎসর্গ করিয়া দিতে পারেন, যদি ঋষির পবিত্রতা, বীরের কষ্টসহিষ্ণুতা, সামাজিক সার্ব্বজনিকতা, এবং সৎসংস্কারকের অদমনীয় উদ্যম তাঁহার জীবনে একত্রীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি সফল হইতে পারিবেন। বস্তুতঃ এই কার্য্যে অর্থের প্রয়োজন তত নহে, যত হৃদয়ের প্রয়োজন ; রাজা মহারাজা উপাধির প্রয়োজন তত নহে, যত সূক্ষ্মদর্শী মেধার প্রয়োজন ; সাংসারিকতার প্রয়োজন তত নহে, যত প্রচারকের ধর্ম্মভাবের প্রয়োজন।

এই বৃহৎ ও কঠিন ব্যাপার সম্পন্ন করিতে না পারিতে পারিতেই, রাজা বাহাদুর আর একটী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া-

ছেন। প্রথম কার্য্যটী যে ভাল ও বিশেষ প্রয়োজনীয়, তৎসম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। ২য় কার্য্যটী আদৌ প্রয়োজনীয় কিনা, তৎসম্বন্ধে অনেক বুদ্ধিমান লোকের সংশয় রহিয়াছে।

প্রস্তাবিত রাজকুমার কলেজ কেবল অনাবশ্যক, তাহা নহে, ইহা অনিষ্টজনক, সুশিক্ষিত রাজা প্যারীমোহন প্রভৃতি জমীদারগণেরও এই মত।

বাঙ্গালী জমীদারদিগের জন্য স্বতন্ত্র কলেজের অসার প্রস্তাব সম্বন্ধে দেশের গণ্য মান্য সংবাদপত্রগণের মধ্যে অনেকেই তিক্ত ব্যঙ্গোক্তি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

আমাদিগের দেশে বস্তুত জমীদার এখন নাই। তাঁহাদিগের পূর্ব্বে যে ক্ষমতা ও সম্ভ্রম ছিল, তাহা আর নাই। তাঁহারা কর-সংগ্রাহক পেন্‌সন-ভোগী মাত্র। তাঁহাদিগের কোন ক্ষমতাই নাই। আইন আদালতের দ্বারে সামান্য প্রজাও যেরূপ, জমীদারও সেইরূপ। বরঞ্চ সামান্য প্রজার ও মধ্যবিৎ লোকের যে সকল ঝঞ্ঝাট ও অধীনতা নাই, জমীদারের সেই সকল ঝঞ্ঝাট ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। সাহেব বা বাঙ্গালী হাকিম জমীদারের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে জমীদারের পদে পদে বিপদ। ঠিক আইন মত কার্য্য হয়, এমন জমীদারী অতিশয় কম। গোমস্তাদিগের বেতন পাঁচ টাকা বা ১০৲ টাকা, নায়েব যিনি ৮ আট হাজার টাকার জামিন দিয়া কার্য্য করিতেছেন, আধ লক্ষ বা তাহারও অধিক টাকা আদায় তহসিল করিতেছেন, তাহার বেতন ২০৲। ৩০৲ টাকা বা ৪০৲। গোমস্তা ভদ্র সন্তান, তাঁহার উপার্জ্জন ৩০৲। ৪০৲ টাকা না হইলে চলেনা, নায়েব ৮ হাজার টাকার জামিন দিয়া অবশ্য ২০০। ১০০ টাকা না পাইলে চাকরী করেন না। "উপরি টাকা" কোথা হইতে আইসে? প্রজাদিগের নিকট হইতে। প্রজাগণ ন্যায্য খাজনা কষ্টে দেয়, তাহার উপর গোমস্তা ও নায়েব মহাশয় যাহা আদায় করেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অবশ্য একটু আধটু প্রজাপীড়ন করিতে হয়। হাকিম ও পুলিস সন্তুষ্ট থাকিলে এই প্রজাপীড়নে জমীদারের বিপদ নাই। কিন্তু যদি জমীদার একবার হাকিমের কোপে পড়িয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে একটা বে-আইনী কাজ খুঁজিয়া বাহির করা এবং তাঁহাকে বা তাঁহার নায়েবকে বা গোমাস্তাকে আসামী শ্রেণীভুক্ত করা কঠিন হয় না। সুতরাং মধ্যবিৎ শ্রেণীর লোকের যে ভয় নাই, জমীদারের সে ভয় বিলক্ষণ করিতে হয়।

এতৎসম্বন্ধে পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট একটা গল্প শুনিয়াছিলাম, তাহা মনে পড়িল। কোন গবর্ণরজেনেরেলের সহিত আমাদিগের দেশের অনেকগুলি রাজা মহারাজা মিলিয়া দিবসে একটা কার্য্যোপলক্ষে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের আবেদনের প্রত্যুত্তরে বড়লাট তাঁহাদিগের প্রতি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করেন। সেই দিনই রাত্রিতে বড়লাট ভবনে সেই সকল রাজা মহারাজাদিগের দরবারে বা (সান্ধ্য সম্মিলনে) নিমন্ত্রণ ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন যে, "আমি মনে করিলাম যে, রাজা ও মহারাজারা যেরূপ ভাবে দিবসে বড়লাটের দ্বারা তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়াছেন, বোধ হয়, আত্মসম্মান রক্ষা করিবার জন্য

তাঁহারা রাত্রিতে বড়লাটের নিমন্ত্রণে যাইবেন না। কিন্তু তাহার পর দিন প্রাতে শুনিলাম যে, তাঁহারা প্রায় সকলেই নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। আমি তখন এক খানি পাল্কিতে চড়িয়া একে একে রাজাদিগের বাটীতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি কল্য রাত্রিতে বড় লাটের ভবনে গিয়াছিলেন? সকলের নিকট একই উত্তর পাইলাম।" "কি করি,না যাওয়ার কোন কারণ দেখাইবার ছিল না, সুতরাং যাইতে হইয়াছিল।" বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন রাজা বাহাদুরকে বলিলেন, "কেন? বেশ কারণও বলিবার ছিল; বলিলেই পারিতেন, দিবসে জুতা প্রহারে গাত্রে বড় বেদনা হইয়াছিল,সুতরাং যাইতে পারিলাম না।" যাঁহারা অপমানিত হইয়াও তোষামোদ করিতে ছাড়ে না, তাহাদিগের প্রতি বিদ্যাসাগর একটী অতি ঘৃণাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলেন। আমি এই গল্পটী যেদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে শুনি, তাহার পর দিন একজন রাজা বাহাদুরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে আমি এই গল্পটী বলি। তিনি আমাকে বলিলেন—"সত্যই আমাদিগের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। মধ্যবিৎ অবস্থার লোকের অপেক্ষা রাজপুরুষদিগকে আমাদিগের সততই অধিক ভয় করিতে হয়।" হাকিম ও পুলিশের ভয়ে অনেক জমীদার তাঁহাদিগের জমীদারী ত্যাগ করিয়া সহরে বাস করেন। তজ্জন্যও আবার absentee Landlord (গরহাজির জমীদার) বলিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিন্দিত হন।

সতত ভয়ে ভয়ে থাকিয়া এবং রাজপুরুষদিগকে খোসামোদ করিয়া অনেক জমীদারের মনের অতিশয় বিকৃত অবস্থা হইয়া যায়। এবং উকীল প্রভৃতি স্বাধীনজীবি মধ্যবিৎ ব্যক্তিদিগের মনের যেরূপ তেজ, নির্ভীক ভাব দেখা যায়—জমীদারদিগের সেরূপ তেজ ও স্বাধীন ভাব প্রায় স্থলেই দেখা যায় না। সমাজের ভিতর এক্ষণে স্বাধীনজীবি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের নিকট জমীদারদিগের বিশেষ মানসম্ভ্রম নাই। ইহারা কার্য্য দ্বারা বাধ্য না হইলে জমীদারদিগের বাটীতে প্রায়ই পদার্পণ করেন না।

আর একটী কথা। পূর্ব্বে জমীদারদিগের ধর্ম্মশালা, অন্নছত্র, অতিথিশালা, বৃক্ষরোপণ, পুষ্করিণী খনন, অকাতরে বিত্ত, অন্ন ও বস্ত্র দান ইত্যাদি যেরূপ সৎকার্য্য ছিল, বর্ত্তমানে সে সকল সদনুষ্ঠান নাই। যাহা এক্ষণে দেখা যায়, তাহা প্রায়ই স্বেচ্ছাকৃত নহে, তাহা স্বার্থ-প্রসূত, রাজপুরুষদিগের নিকট সম্মান বা অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য করা হয়। যে সকল জমীদার এইরূপ স্বার্থসিদ্ধির জন্য দান করেন, এমন কি গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদিগকে মনে মনে ঘৃণা করেন, সাধারণ লোকের ত কথাই নাই।

সুতরাং এক্ষণকার জমীদারদিগের বিশেষ ক্ষমতা, বা মান সম্ভ্রম নাই। কোন কোনও বিষয়ে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের অবস্থা শোচনীয়, সুতরাং তাঁহাদিগের শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিধি ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। বরঞ্চ এইরূপ স্বতন্ত্র কলেজ করিলে তাঁহাদিগের উপকার না হইয়া অপকার হইতে পারে।

নিজের আমলা ও অনুজীবীদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া জমীদার ক্রমে প্রায় একটী অদ্ভুত পদার্থ হইয়া উঠেন, এবং স্বকীয় গৃহে আপনাকে ইন্দ্রতুল্য সম্রাট মনে

করিয়া স্বপ্নে জীবন যাপন করেন। বাল্য কাল হইতে দাস,দাসী ও আমলাগণ তাঁহাকে একটী ক্ষুদ্র ভূপতি বলিয়া মানিয়া, তাহার পদপ্রান্তে সতত প্রণত থাকে। জমীদার-দিগের অধিকাংশ আমলাগণ উদারশিক্ষা-হীন। যে অল্প বেতন পায়,তাহাতে উৎকোচ না লইলে এবং অবৈধ ভাবে অর্থ উপার্জ্জন (যাহাকে কেহ কেহ চুরি বলিয়া থাকেন, তাহা) না করিলে চলে না। জমীদার তাহাদিগকে নিতান্ত অল্প বেতন দেওয়ায় এক প্রকার বলিয়া দেওয়া হয়, তোমরা যাহা চুরি করিয়া লইতে পার, তাহা লইবে। এই সকল আমলাদিগের মধ্যে কেহ বা জাল করিতে পারেন, কাহাকেও বা মিথ্যা সাক্ষ্য বা মিথ্যা এফিডেভিট করার ভার প্রাপ্ত হইয়া চাকুরী বজায় রাখিতে হয়। সুতরাং এই সকল আমলাগণের সংসর্গ কিরূপ বিষময়, তাহা সহজে কল্পনা করিতে পারা যায়। গৃহের এই তোষামোদপূর্ণ দুর্নীতি-বিষময় আবদ্ধ আবিল বায়ু সেবন করিয়া, জমিদার-সুত বাল্যকালেই ঘোর নীতিচ্যুত অভিমানরূপ প্লেগে আক্রান্ত হইয়া জীবন্মৃত হইয়া থাকেন। এই ঘৃণিত অভি-মানের নাশক ও নিবারক ও disinfectant সাধারণ বিদ্যালয়ের মুক্ত নৈতিক বায়ু।

একটী কালেক্টর সাহেব কোন জমী-দারতনয়ের উদ্ধত দম্ভ লক্ষ্য করিয়া আমাকে একটী গল্প বলিয়াছিলেন—বিলাতের একটী সাধারণ বিদ্যালয়ে এক ডিয়ুকের (duke) পুত্র পাঠ করিত। সে যখন তখন গর্ব্ব করিয়া বলিত, "জান, আমি অমুক ডিয়ু-কের পুত্র।" একটী তেজস্বী মধ্যবিত্ত ছাত্র একদিন ডিয়ুক-তনয়কে পদাঘাত করিয়া বলিল—এই লও, এই উপহার (পদাঘাত) তোমার ডিয়ুকের জন্য লও।" সমপাঠীর এই পদাঘাতে গর্ব্বিত ডিয়ুক তনয় যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিল, সে তাহা জীবনে কখন ভুলে নাই।

সাধারণ বিদ্যালয়ে যখন কোনও ধনীর সন্তান তমোভাবে অতি স্ফীত হয়, তখনি তাহার সমপাঠী বালকগণ এইরূপ শিক্ষা দিতে সঙ্কুচিত হয় না। সাধারণ বিদ্যালয়ে ধনীপুত্র দেখে, তাহার এবং একজন দরিদ্র ছাত্রের মধ্যে কোন তারতম্য নাই। মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র লোক যে মানুষ, দরিদ্র ছাত্র চরিত্র ও অধ্যবসায় ও বিদ্যা-বুদ্ধিতে যে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও আদরণীয় হইতে পারে, তাহা কতকটা জমীদারতনয়ের অনুভব হয়।

প্রস্তাবিত রাজকুমার কলেজে বা জমী-দারের বিদ্যালয়ে এইরূপ স্বাস্থ্যজনক শিক্ষা হইতে পারিবে না। বরঞ্চ সেখানে কয়েকটী গর্ব্বিত জমীদারপুত্রের তমোভাব সম্মিলিত হইয়া ঘনীভূত ও পুষ্ট হইবার সম্ভাবনা। বাঙ্গালা দেশের জমীদারপুত্রগণ একেই অহঙ্কারী, তাহাতে তাহাদিগের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় হইলে তাহাদিগের মস্তক আরও ঘূর্ণিত হইয়া অধঃপাতে যাইবার অধিক সম্ভাবনা হইবে।

রাজাবাহাদুর বলেন, তিনি এক মাতাল মাষ্টারের নিকট পড়িয়াছিলেন। তাহাতে তিনি কি সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন, "যথা গুরু তথা শিষ্য," অথবা যেমন শিক্ষক তেমনি ছাত্র? অবশ্য ইহা প্রমাণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তবে তিনি যে একজন মদ্যপায়ী শিক্ষকের নিকট পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কি প্রমাণ করিতে চাহেন? তাঁহার শিক্ষক কেবল

মদ্যপায়ী ছিলেন না, তিনি ছাত্রদিগের নিকট মদ্য অথবা মদ্যের মূল্য এবং খানা ভিক্ষা করিয়া খাইতেন। রাজা শশীশেখরেশ্বর বলিতে চাহেন কি, সাধারণ বিদ্যালয়ের সমুদয় বা অধিকাংশ শিক্ষক এইরূপ? রাজা বাহাদুর যে জেলার শিক্ষকের কথা বলিতেছেন, তাঁহারা কেমন, আমি নিজে জানি না। তবে নদীয়া জেলা এবং ২৪ পরগণায় উভয় স্থানেরই বিদ্যালয়ে আমি পাঠ করিয়াছি। ঐরূপ মদ্য ও ভোজ যাচমান মহাশয় শিক্ষকের নিকট পাঠ করা আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। আমি যাঁহাদিগের নিকট পাঠ করিয়াছি, তাঁহাদিগের মধ্যে একজনও মদ্যপান করিতেন না, তাহা আমি বলিতেছি না। জগতে এমন কোন শ্রেণী নাই, যাহার মধ্যে দুই একটী মন্দ লোক নাই। আমার শিক্ষক অনুপযুক্ত হইলেও আমি তাঁহাকে শিক্ষক বলিয়া ভক্তি করি এবং তাঁহার দোষ ঘোষণা করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমার মতে প্রত্যেক হিন্দু ছাত্রের তাহাই করা স্বাভাবিক ও কর্ত্তব্য।

রাজা শশীশেখরেশ্বর যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কখনও কোন শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষকের নিকট পাঠ করিয়া বা তাহার উপদেশ মত চলিয়া তাঁহার জীবনে কোনও উপকার পাইয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। কোনও মদ্যপায়ী শিক্ষকের নিকট পাঠ করিয়া বোধ হয় আমাদিগের দেশের শিক্ষকশ্রেণীর উপর রাজার অনাস্থা হইয়া গিয়াছে। যদি তাহা হয়, শিক্ষকদিগের অদৃষ্ট মন্দ বলিতে হইবে।

রাজা বাহাদুর বিবেচনা করেন যে, শিক্ষকগণ জমীদারদিগের পুত্রগণকে খোসামোদ করিয়া থাকেন। শিক্ষক বিষয়ে রাজার অদৃষ্টও নিতান্ত মন্দ বোধ হয়। নদীয়া জেলায় সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশের রাজপুত্র ও দৌহিত্র এবং ঐ জেলার অন্য অনেকগুলি জমীদার পুত্রদিগকে কৃষ্ণনগর কলেজে পাঠ করিতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু শিক্ষকগণ কখন খোষামোদ করিয়াছেন, তাহা আমি দেখি নাই ও শুনি নাই। রাজার দৌহিত্র এবং এককালে সম্ভাবিত উত্তরাধিকারী আমার সহিত পড়িয়াছিলেন। শিক্ষক তাঁহার মনোরঞ্জন করিবার জন্য যত্নশীল, তাহা আমি কদাপি দেখি নাই এবং কাহারও মুখে শুনি নাই। যখন কৃষ্ণনগর কলেজ সংস্থাপিত হয়, তখন তৎকালীন বুদ্ধিমান মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর ঐ কালেজের জন্য এককালীন চাঁদা এবং অনেকখানি জমী এককালীন দান, করিয়াছিলেন যাহাতে এ দেশের রাজপুত্রগণ এবং মিথ্যা অভিমান ত্যাগ করিয়া পাঠকালোচিত বিষয় শিক্ষা করিয়া সাধারণ লোকের সহিত পাঠ করেন, তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য তাঁহার বড় পুত্রকে কলেজে পড়িতে দিয়াছিলেন। কালেজের (Principal) রাজপুত্রকে চেয়ার (Chair) দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহাতে মহারাজা বলিয়াছিলেন যে, চেয়ারে বসিয়া আমার পুত্রের উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই, বরঞ্চ তমোভাব জন্মাইয়া অপকার হইতে পারে। দরিদ্রের পুত্র কলেজে যে আসনে বসে, আমার পুত্রও কলেজে সেই আসনে তাহাদিগের সহিত একসঙ্গে বসিবে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রাচীন বংশোচিত এই উদারতার সহিত রাজা শশীশেখরেশ্বরের জমীদারদিগের জন্য স্বতন্ত্র

কলেজের প্রস্তাব তুলনা করিলে, উদারতা ও বুদ্ধি সম্বন্ধে উভয় ব্যক্তি মধ্যে কত অন্তর, তাহা অনুভব হইবে।

রাজা শশীশেখরেশ্বরের আরও একটী ধারণা আছে যে, জমীদারদিগের পুত্রগণের গৃহশিক্ষকগুলি প্রায়ই ছাত্রের মন যোগাইয়া কার্য্য করে। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণনগরে একটী গল্প প্রচলিত আছে। কৃষ্ণনগরের রাজপুত্রকে একটী শিক্ষক রাজবাটীতে পড়াইতেন। তাঁহাকে নীলমণি মাষ্টার বলিয়া লোকে জানিত। নীলমণি মাষ্টার পাঠকালীন রাজপুত্রকে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু প্রহার দিতেন। একদিন মাত্রা এত অধিক হইয়া গিয়াছিল যে,নীলমণি মাষ্টার তাহাতে একটু ভীত হইয়া রাজবাটী ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় মহারাজা তাঁহাকে উপর হইতে ডাকাইয়া তাঁহাকে অভয় দান করিয়া সেই দিনের মত বিদায় করিলেন। আমি যখন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে নদীয়া মহারাজা ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলাম, তখন নীলমণি মাষ্টার বিধবা ব্রাহ্মণী ষ্টেট হইতে মাসিক বৃত্তি পাইতেন। যদি তিনি জীবিত থাকেন, বোধ হয় অদ্যাপিও পাইতেছেন।

যেমন একজন মদ্যপায়ী শিক্ষকের দৃষ্টান্তে মহারাজ সাধারণ সমুদয় বা অধিকাংশ শিক্ষক মদ্যপায়ী, ইঙ্গিতে প্রমাণ করিতে চাহেন, সেইরূপ, অপূর্ব্ব যুক্তিতে তিনি তিনটী শিক্ষক তাঁহাদিগের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রের ম্যানেজার হইয়াছেন, তাহার দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, অধিকাংশ শিক্ষক ছাত্রদিগের জমীদারীর ম্যানেজার হয়েন এবং ম্যানেজার হইতে ইচ্ছুক। এইটী রাজার ভ্রমমাত্র।

জমীদারের পুত্রের শিক্ষক যদি সুশিক্ষিত হন, তাহা হইলে জমীদারের সরকারে কাজ করিতে বা তাহার ম্যানেজারি করিবার জন্য লালায়িত হন না। তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। (১) জমীদারী Selfishness, hypocrisy and intrigue এর ভিতর অনেক স্থলে পড়িতে হয়। (২) সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে জমীদারগণ প্রায়ই উপযুক্ত বেতন দিতে অসমর্থ বা কাতর। (৩) অধিকাংশ জমীদার নিজে সুশিক্ষিত নহেন, অথচ অহঙ্কারে পরিপূর্ণ, নিজের শিক্ষা সমীচীন ভাবে না হইতে হইতেই অন্যকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা সুশিক্ষিত, স্পষ্টবাদী, পরামর্শদাতা ম্যানেজারের সংসর্গ সহ্য করিতে পারেন না। (৪) আমাদিগের দেশের অধিকাংশ জমীদারগণ, জমীদারী কিরূপে উন্নত করিতে হয়, কিসে প্রজার অবস্থা ভাল করিয়া আপনার অবস্থা ভাল করিতে হয়, তাহা জানেন না ও ভাবেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধি খরচ করেন, তাঁহারা প্রায়ই কিসে নিরিখ বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, বা কি প্রকারে বলে, কৌশলে অধিক টাকা আদায় করা যায়, কিসে বা জমীর দখল বা দখলের প্রমাণ রাখা যায়, ইত্যাদি বিষয় লইয়াই বিব্রত থাকেন। এই জন্য তাঁহাদিগকে সকল সময়ই ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালতে যাইতে হয়। আদালত প্রমাণের উপর বিচার করেন। প্রমাণ, দুই, সাক্ষী আর দলিল। সাক্ষী ও দলিল সত্য হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। সমুদয় সত্য সাক্ষ্য ও সত্য দলিল দিয়া প্রায়ই মোকদ্দমাতে জয় লাভ হয় না। কোন্ মোকদ্দমায় কিরূপ প্রমাণ আবশ্যক, উকিলের নিকট

জানা হয়। কতকগুলি লোক আছে, তাহাদিগের ব্যবসা, যেখানে প্রমাণের অভাব, সেখানে মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করা—অর্থাৎ সাক্ষী শিখান প্রভৃতি। যেখানে মোকদ্দমা অধিক, সেখানে মিথ্যা সাক্ষী শিখান ইত্যাদি। জমীদারের ঘরে মামলা অধিক। মামলাতে যাহাতে জয়লাভ হয়, তাহা করা ম্যানেজারের একটা প্রধান কাজ। সুতরাং ম্যানেজার যদি সাক্ষী শিখাইতে অসম্মত হন, অথবা নিজে যদি মিথ্যা সাক্ষী না দেন, তাহা হইলে জমীদারের ঘরে তাহার পক্ষে কার্য্য করা কঠিন হয় এবং তিনি বিশেষ দক্ষ ও কার্য্যপটু হইলেও, যখনই কোন মিথ্যা মোকদ্দমায় তাঁহার সংস্রব ঘটিয়া যায়, তখনি তাঁহার মনে হয়,কি নরকে আসিয়াই পড়িলাম। সুতরাং সৎ শিক্ষক জমীদারের ম্যানেজারির জন্য লালায়িত নন। যেখানে তিনি ম্যানেজারি করেন, যতদিন পারেন, জমীদারীর বর্ত্তমান সাধারণ কার্য্যপ্রণালী সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন, জমীদারকে সেই পথে লইয়া যাইতে প্রয়াসী হন, অথবা দুই এক বৎসর মধ্যেই নিজে সৎপথ পরিত্যাগ করা অপেক্ষা পদত্যাগ করা শ্রেয়ঃ মনে করিয়া কাজ ছাড়িয়া দেন। সুতরাং এরূপ স্থলে সুশিক্ষিত শিক্ষক ম্যানেজারি পদে অভিষিক্ত হইবার জন্য রাজা শশীশেখরেশ্বর যেরূপ ব্যাকুল মনে করেন, তত ব্যাকুল নহেন।

বস্তুতঃ আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যেমন পুলিশে ভাল লোক কাজ করিলে দেশের একটা বিশেষ মঙ্গল সাধন হয়, জমীদারিতে যদি শিক্ষক শ্রেণীর সজ্জন কার্য্য করেন, তাহা হইলে রাজকুমার কলেজ সংস্থাপন অপেক্ষা অধিক উপকার হইতে পারে।

আমাদিগের দেশের অনেক অসার ব্যক্তি শিক্ষকদিগকে সম্মান করিতে জানে না। কিন্তু রাজা শশীশেখরেশ্বর আমাদিগের দেশের শিক্ষাবিভাগের সংস্কার করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন। তাঁহার মত ব্যক্তিকে শিক্ষকদিগের সম্বন্ধে ভ্রান্ত দেখিলে দুঃখের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। আমাদিগের দেশে বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষক বা গৃহ-শিক্ষকের প্রতি অধিকতর আস্থা ও শ্রদ্ধাবান হওয়া উচিত।

আমি প্রথমে গৃহশিক্ষকের কথা বলিব। ইউরোপে প্রথম প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত বা দার্শনিক বা সাধুজনকে গৃহশিক্ষকের কার্য্য করিতে দেখা যায়। আর যেখানে শিক্ষক বিদ্বান ও সজ্জন, (রাজা শশীশেখরেশ্বর তাঁহাদিগকে সম্মান করুন আর না করুন) ইউরোপে বা এদেশে ছাত্রগণ তাঁহাদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন।

ধর্ম্মতত্ত্বের সংস্থাপক Adam Smith দ্বাদশ বৎসর গ্ল্যাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করার পর, ইংলণ্ডের একটী প্রধান মনস্বী ব্যক্তির * অনুরোধে, তরুণবয়স্ক জমীদার Duke of Buccleugh এর শিক্ষক হইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে স্মিথের Theory of moral sentiment প্রকাশিত হওয়ায়,তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি একজন জমীদার পুত্রের শিক্ষকতার

* The Hon. Mr. Townsend "the cleverest fellow in England" at that time.

ভার লইয়াছিলেন। আর এই জমীদারটী চিরকাল তাঁহার শিক্ষকের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষকের বৃত্তি বা পেনসন নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং যত্ন করিয়া Adam Smithকে স্কটলণ্ডের Commissioner of the Custom নিযুক্ত করা পক্ষে সাহায্য করিয়াছিলেন। সাহিত্যজগৎ ইহাতে Adam Smith নবীন জমীদারের খোসামোদ করিয়াছিলেন, মনে করে নাই। আর Duke of Buccleugh যে তাহার ভূতপূর্ব্বক শিক্ষককে বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে, তাঁহাকে কেহ নির্ব্বোধ মনে করে নাই, বরঞ্চ তাহাতে তাঁহার নাম ইতিহাসে রহিয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডের কথা ছাড়িয়া ফরাসিদেশের একজন private tutor এর কথা উল্লেখ করি। তিনি Fenelon, (ফেনিলং) প্রসিদ্ধ টেলিমেকস-রচয়িতা। চতুর্দ্দশ লুইর পৌত্রের (Duke of Burgundyর) শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতি উচ্চ ও প্রসিদ্ধ প্রাচীন বংশে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতার নাম Count Pons de Salignac। Fenelon এর প্রসিদ্ধ উপন্যাস Telèmaque তাঁহার ছাত্রকে সরস ভাবে উপদেশ দিবার জন্য রচিত হইয়াছিল। তিনি শিক্ষকের কার্য্যে এরূপ বিশুদ্ধ ও উন্নত ভাবে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কাহিনী শুনিতে শুনিতে ভক্তিরসে হৃদয় পরিপ্লুত হয়। শশীশেখরেশ্বরের নিকটে Fenelon শ্রদ্ধার পাত্র কিনা, জানিনা। কিন্তু জানি, সুশিক্ষিত জগৎ এতাবৎকাল তাঁহাকে "as a man he is one of the greatest figures in a great time" এইরূপ মনে করিতেছে। এমন কি সাধু Channing বলিয়াছেন, "When we think of Fenelon in the palace of Louis XIV, it reminids us of a seraph sent on a divine commission into the abodes of the lost" চতুর্দ্দশ লুইর রাজপ্রাসাদ (was) 'Distinguished and disgraced by selfishness, hyprocrisy and intrigue." আমাদিগের দেশে অধিকাংশ জমীদারের বাটীতে কি প্রকার selfishness, hyprocrisy and intrigue দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করি।

ফেনিলনের কথা ছাড়িয়া বর্ত্তমান জর্ম্মান সম্রাটের শিক্ষকের কথা ধরুন। সম্রাট তরুণ বয়সে (Dr. Hinrzpeter) হিনটজ পিটারের নিকট পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহাকে এত মান্য করিতেন যে, তিনি সম্রাট হইলেও অনেক দিন তাঁহার বুদ্ধিতে চলিয়াছিলেন। ইহাও প্রকাশ, তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে যে সকল সৎকার্য্য ও সাধারণের হিতকার্য্য হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই এই শিক্ষকের দ্বারা প্রণোদিত।

এক্ষণে গৃহ-শিক্ষকদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের কথা আলোচনা করা যাউক। ইউরোপ হইতে উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। আমাদিগের দেশের লোকের কয়েকটী শিক্ষকের নাম করিলে যথেষ্ট হইবে। তাঁহারা সকলেই পূজনীয় ব্যক্তি। শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ সরকার, শ্রীযুক্ত রামতনু লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু, শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় চরিত্র ও শিক্ষা দ্বারা দেশের যে উপকার করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের

চরিত্রের স্মৃতি আজিও যে উপকার করিতেছে, তাহা আমাদিগের দেশে অন্য শ্রেণীর মধ্যে কয়জন ব্যক্তি করিয়াছেন? ঋষি রামতনু, ঋষি রাজনারায়ণ, জ্ঞানী ভূদেব, জ্ঞানী প্যারীচরণ—ইঁহাদিগের তুলনা কোথায় মিলে? জীবিত শিক্ষকদিগের নাম করিব না। তবে এই বলিতে পারি, তাঁহাদিগের মধ্যেও এমন লোক দেখিয়াছি, যাঁহাদিগের বিনয়, পাণ্ডিত্য, পরহিতব্রত, স্বাধীন প্রকৃতি দেখিলে রাজা শশীশেখরেশ্বর উপকার লাভ করিতে পারেন। ইঁহারা ধন, মান, পদাকাঙ্ক্ষা পায়ে ঠেলিয়া, মিছা গণ্ডগোল ত্যাগ করিয়া নীরবে কর্তব্য কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

আমাদিগের দেশে যদি কোন শ্রেণীর ভিতর মনুষ্যত্ব ও চরিত্র বল থাকে, তাহা শিক্ষকদিগের মধ্যে আছে।

শিক্ষক শ্রেণীর প্রতি রাজা শশীশেখরেশ্বর ইঙ্গিতে ও ভাবে যে অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য এতদূর লিখিতে হইল।

এক্ষণে প্রস্তাবিত রাজকুমার কলেজের শিক্ষক যে সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের অপেক্ষা ভাল হইবে, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইবে? শিক্ষক নির্ব্বাচনের ভার কাহার উপর থাকিবে? যদি গবর্ণমেণ্টের উপর থাকে, তাহা হইলে সাধারণ গবর্ণমেণ্ট কলেজের অপেক্ষা ভাল শিক্ষক নির্ব্বাচিত হওয়া সম্ভব নহে। যদি ম্যানেজিং কমিটির উপর এই ভার ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে এই কমিটির সভ্য নির্ব্বাচনের ভার কাহার উপর থাকিবে? তাঁহারা অনুরোধ বা আত্মীয়তায় মন্দ শিক্ষক নিযুক্ত করিবেন না, তাহার প্রমাণ কি? রাজা শশীশেখরেশ্বরের উপর যদি ভার থাকে, তিনি নিজে পাণ্ডিত্যে ও চরিত্রবলে এই গুরুতর ভার বহন করিবার উপযুক্ত, তাহারই বা কি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে?

অধিকাংশ লোকই স্তবে তুষ্ট। স্তব করিয়া রাজকুমার কলেজে মর্য্যাদাপ্রার্থী শিক্ষকও কার্য্য চাহিবে না, তাহার প্রমাণ কি?

রাজকুমার কালেজের জন্য টাকা কোথা হইতে আসিবে? যদি তাহা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া করার প্রস্তাব হয়, সেই টাকা অপব্যবহৃত হইবে না, তাহার প্রমাণ কি? আমাদিগের দেশে সাধারণের টাকা যখন ব্যক্তিবিশেষের হস্তে ন্যস্ত হয়, তখন অনেক স্থলেই কি নানা অবিশ্বাস বা অসন্তোষের কথা শুনা যায় না? অমুক বাটী সাধারণের সম্পত্তি, অমুক পরিবার ক্রমে তাহা দখল করিয়া নিজ সম্পত্তি করিয়া লইয়াছে। অমুক বিদ্যালয় সাধারণ সম্পত্তি, এক্ষণে ব্যক্তিবিশেষে তাহাকে নিজ সম্পত্তির ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন, অমুক ফণ্ডে এত টাকা ছিল, তাহা গেল কোথায়? অমুক ফণ্ডের কতকগুলি ট্রষ্টি ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে তেজস্বী কয়েক ব্যক্তি যখন মরিলেন, অমনি আর একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ফণ্ডের উপর একাধিপত্য করিতে লাগিলেন। যে সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে এইরূপ অসন্তোষজনক কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা সমাজের নগণ্য ব্যক্তি নহেন। সুতরাং রাজকুমার কলেজ যদি চাঁদার টাকায় চলে, সেই টাকার সুব্যবহার হইবে, তাহার প্রমাণ চাহি। অন্যের টাকা না লইয়া নিজের টাকায় এইরূপ কলেজ করিতে পারেন, এমন কোন রাজা (যেমন

দ্বারবঙ্গের বা বৰ্দ্ধমানের রাজা) ইহাতে ব্রতী হইলে অর্থ সম্বন্ধে কাহারও কোন প্রমাণ চাহিবার অধিকার থাকিত না।

তাহার পর, যদি এই কলেজে প্রধানতঃ ধনী লোকের সন্তান পাঠ করে; তাহাদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতার উৎসাহ কম থাকিবে। মধ্যবিত্ত লোকের পুত্রগণকে খাটিয়া খাইতে হইবে, তাহাদিগের ভবিষ্যতের উপজীবিকা ও মান তাহাদিগের পরিশ্রমের ও অধ্যয়নের উপর নির্ভর করে। সুতরাং তাহারা যত পরিশ্রম করে, আমাদিগের দেশের ধনীগণ তত শ্রম করে না। বাটীতে আমলাগণ ও স্ত্রীলোকগণ সতত বলিয়া থাকেন যে, "জমীদারের পুত্র লেখা পড়া না করিলে ক্ষতি কি, তাহার ত চাকুরী করিতে হইবে না"। জমীদার পুত্রও ভাবেন "ঠিক কথা, আমি জমীদারের ছেলে, সামান্য লোকের ছেলের মত শ্রম করিয়া পড়িবার দরকার কি?" সুতরাং প্রস্তাবিত রাজকুমার কালেজ স্থাপিত হইলে, তাহা একটী অলস, শ্রমপরাঙ্মুখ পরস্পরের আলস্য পরিপোষক সম্মিলনের স্থান হইবে। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে যে সকল জমীদার পুত্রগণ স্কুলে আসিয়া নিজে লেখা পড়া করিত না, অন্য ছাত্রকেও লেখা পড়া করিতে দিত না, তাহাদিগকে লইয়া একটা Babus class গঠিত হইত। প্রস্তাবিত রাজকুমার কলেজ একটা Babus' class বিশেষ হইবে। যে জমীদার পুত্রের প্রকৃত শিক্ষা চাহেন, তিনি মিথ্যা অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পুত্রকে রাজকুমার কলেজে না পাঠাইয়া সাধারণ কলেজে পাঠাইয়া দিবেন। এদিকে বোর্ডিং স্কুল না করিলে সমীচীন শিক্ষা হওয়া কঠিন। কিন্তু জমীদারের পরিবারের বিদেশে নিঃসম্পর্কীয় অপরিচিত ব্যক্তির হস্তে আদরের প্রাণের পুত্তলিকে ইচ্ছাপূর্ব্বক সমর্পণ করিবেন না। কোর্ট অব ওয়ার্ডস দ্বারা আমলাদিগের সংসর্গ হইতে দূরে রাখিবার জন্য কখন কখন নাবালককে দূরে পাঠান হয়। তাহাতে নাবালকের মাতা (বা অপর যিনি অভিভাবক থাকেন) বিশেষ আপত্তি করেন। উচিত ভাবে শিক্ষা দিতে যত্ন করায় কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিযুক্ত কোন কোন শিক্ষককে বড়ই লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে। এমন কি, আমি দুইটী শ্রদ্ধেয় "private tutor and guardian" মুখে শুনিয়াছি যে, পাছে নাবালকের মাতা বা মাতুল পক্ষ হইতে লোক নিযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে গুপ্ত প্রহার দেয়, তজ্জন্য সাবধান থাকিতে হইত। অতিলালিত জমীদার পুত্রকে তাঁহার পিতা বা মাতা যে বাল্যকালে রাজকুমার কলেজে বাস করিতে পাঠাইয়া দিবেন, তাহার ভরসা কম।

সংক্ষেপে, (১) জমীদারদিগের দেশে এমন বিশেষ মান সম্ভ্রম নাই, যাহাতে তাহাদিগের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ আবশ্যক। (২) রাজা শশীশেখরেশ্বরের এই বিষয়ের নিজের অর্থ সংস্থান নাই। (৩) ইহা যদি গবর্ণমেণ্ট কলেজ হয়, তাহা হইলে অন্য গবর্ণমেণ্ট কালেজ অপেক্ষা কি বিশেষ ভাল হইবার সম্ভাবনা, তাহা বুঝা যায় না। (৪) যদি সাধারণের চাঁদা লইয়া হয়, সাধারণের অর্থ সুব্যবহার হইবে, তাহার প্রমাণ আবশ্যক। (৫) সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক যে রূপে নির্ব্বাচিত হয়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাবে শিক্ষক নির্ব্বাচিত হইবার উপায় দেখান হয় নাই। (৬) পাণ্ডিত্যে বা অন্যগুণে রাজা শশীশেখরেশ্বর শিক্ষা-সংস্কারক হইবার

উপযোগী, বিশেষ প্রমাণ এতাবৎকাল পাওয়া যায় নাই। (৭) রাজকুমার কলেজ সংস্থাপিত হইলে শিক্ষার বিশেষ উপযোগী সময় অর্থাৎ বাল্যকালে সেখানে অনেক জমীদার পুত্র প্রেরণ না করিতে পারেন। (৮) এবং যাঁহারা সেখানে পাঠ করিবেন, তাঁহারা অলস ও দাম্ভিক হইবারই সম্ভাবনা। (৯) এবং এইরূপ কলেজ করায় জমীদার ও মধ্যবিৎ ব্যক্তিদিগের মধ্যে নিষ্প্রয়োজনে একটী ভ্রান্তিজনক ব্যবধান সৃষ্টি করা হইবে।

ভরসা করি, রাজা বাহাদুর এই নূতন সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া যাহাতে তাঁহার পুরাতন চেষ্টা "সালিসী পঞ্চ বিচার" সফল হয় এবং যাহাতে সেই কার্য্যটী বহ্বাড়ম্বরে লঘুক্রিয়া না হইয়া যায়, তৎপ্রতি যত্ন করেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

নিশা শেষে।

১

যামিনী পোহায়—
প্রাণময়ী সুখময়ী নিশা চলি যায়!
কত সুখ, কত প্রীতি, কত বিষাদের গীতি,
কত কি, সে বেঁধে নিল আঁচল-কোণায়;
আর সব যা'ক নিয়ে, মোরে শুধু যা'ক দিয়ে,
আমি যা' লভেছি পুণ্য চির সাধনায়।
অই যামিনী পোহায়।

২

যামিনী পোহায়—
ওগো! তুমি যাও দূরে, দিয়ে যাও প্রাণে পূরে,
আদর, মমতা, দয়া, দেহ যা' আমায়;
রাখিয়া প্রাণের সবি, যাঁও ত্রিদিবের কবি,
তোমার নন্দন বন ডাকিছে তোমায়!
অই যামিনী পোহায়।

৩

যামিনী পোহায়—
অই যে কনকাচলে, উষার মুকুট জ্বলে,
এখনি দেখিবে বিশ্ব চাহিয়া তোমায়;
সে চাহনি প্রীতি শূন্য, উদাস, অসূয়া পূর্ণ,
আমি তা, কেমনে স'ব, বুক ফেটে যায়!
অই যামিনী পোহায়।

৪

যামিনী পোহায়—
লহ লহ আঁখি তুলি, আমি এ জড়তা ভুলি,
আবার আসুক বল বিভল হিয়ায়;
যেন গো দাঁড়াতে উঠি, নাহি পড়ি মাথা লুটি
পুনঃ যেন রক্ত বহে শিথিল শিরায়!
অই যামিনী পোহায়।

৫

যামিনী পোহায়—
তুমি শুধু যাও রেখে, বুকে মেখে, প্রাণে মেখে
যা' দিয়েছ সারা নিশা, স্নেহ করুণায়—
প্রেমের সজীব স্পর্শ, সে সুখ, উল্লাস, হর্ষ,
সে যে কত, সে যে কি, তা বলা নাহি যায়!
অই যামিনী পোহায়।

৬

যামিনী পোহায়—
সে অমিয় মাখা চিত্র, সদ্য, স্নিগ্ধ, সুপবিত্র,
যেন গো জাগিয়া থাকে নিরালা হিয়ায়;
এমনি মন্দার-বাসে, যেন গো পরাণ ভাসে,
এ জাগ্রতি থাকে যেন আঁখির পাতায়!
অই যামিনী পোহায়!

৭

যামিনী পোহায়—
জগতে আসুক উষা, আমার অমূল্য ভূষা
এই নিশা—বেঁচে থাক্ দেবাশীষ প্রায়;

এ অমৃত করি পান, অমর হইবে প্রাণ,
কৈশোর, যৌবন রবে মরম তলায়।
ঐ যামিনী পোহায়।

৮

যামিনী পোহায়—
ঐ দেখ নিশা শেষ, ডাকে তোমা স্বর দেশ,
তোমার মিলন মাগে কত দেবতায়;
কুসুমিত পথ দেখে, বেলফুলে পদ রেখে,
ধীরে ধীরে যাও তব প্রিয় অমরায়;
শত বরষের শেষে, যাই যদি সেই দেশে,
এমনি এ হৃদি খানি দিব পুনরায়।
আর বেশী ক'ব কিবা, নিঠুর নয়নে দিবা,
এখনি এখনি বুঝি দেখিবে তোমায়!
যাও যাও পায়ে পড়ি, যামিনী পোহায়।

শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

নবম অধ্যায়।

"পরেশঃ প্রাপ্যতে শুদ্ধি ভক্ত্যেতি স্থিতমষ্টমে।
নবমে তু তদৈশ্বর্য্যমত্যাশ্চর্য্যং প্রপঞ্চ্যতে॥

অষ্টম অধ্যায়ে নাড়ীদ্বারে সগুণ ধরণা যোগ কথিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে কালান্তরে অর্চ্চিরাদি ক্রমে ব্রহ্মপ্রাপ্তি লক্ষণ অনাবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সেই যোগই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়, অন্য কোন উপায় নাই, পাছে তাহা হইতে এইরূপ আশঙ্কা হয়, এই জন্য এই অধ্যায় সাক্ষাৎ বা সদ্য মোক্ষপ্রাপ্তিসাধন ব্রহ্মজ্ঞান বা সম্যক্‌জ্ঞান—বাসুদেবই সব, আত্মাই সব, 'এক অদ্বিতীয়'- এই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে' (শঙ্কর)।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে মূর্দ্ধা (সুষুম্না মধ্যস্থ ব্রহ্ম বা চিত্রা) নাড়ী দ্বারে হৃদয় কণ্ঠ ভ্রু (পদ্ম) মধ্যে ধারণা সহকৃত সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দ্বার সংযমযুক্ত যোগে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উৎক্রান্ত প্রাণের অর্চ্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি, ও সেখানে সম্যক্‌জ্ঞান, লাভান্তর কল্পান্তে পরব্রহ্ম প্রাপ্তিলক্ষণ ক্রমমুক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু গীতায় অন্যত্র (৮ অধ্যায়েরই ১৪ এবং ২২ শ্লোকে) অনন্যভক্তির দ্বারা পরমপুরুষ প্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞান হইতে সাক্ষাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির বিষয় কথিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত ক্রমমুক্তির উপায় ক্লেশকর, কিন্তু ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান ও ভগবৎ ভক্তির দ্বারা সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি অনায়াসসাধ্য। নবম অধ্যায়ে সেই তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

সংক্ষেপে, অষ্টম অধ্যায়ে ধ্যেয় ব্রহ্ম নিরূপণ ও সেই ধ্যান নিষ্ঠের গতি উক্ত হইয়াছে, আর নবমে জ্ঞেয় ব্রহ্ম নিরূপণ ও জ্ঞান নিষ্ঠের গতি উক্ত হইয়াছে। (মধুসূদন)।

পরমেশ্বরতত্ত্ব ভক্তি দ্বারা সুলভ। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য ও ভক্তের অসাধারণ প্রভাব উক্ত হইয়াছে। (স্বামী, বলদেব)।

এই অধ্যায়ে ভক্তিরূপ উপাসনার স্বরূপ কথিত হইয়াছে। (রামানুজ)

ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি?—এই জ্ঞেয় ব্রহ্ম বিষয়ক প্রশ্নদ্বয় নবম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।(নীলকণ্ঠ)

সপ্তম অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে, এই অধ্যায়ে তাহাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। (মাধ্ব ভাষ্য)।

শঙ্কর ও মধুসূদনের ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায় যে, গীতায় দুইরূপ মুক্তির কথা উক্ত হইয়াছে। ক্রমমুক্তি, ও সদ্যমুক্তি। যোগ বা ব্রহ্ম ধ্যান দ্বারা ক্রমমুক্তি হয়, আর জ্ঞান বা ভক্তি সাধনা দ্বারা সদ্যমুক্তি হয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যা কতদূর সঙ্গত, বলা যায় না। একথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমেই আছে—যোগের দ্বারাই কেবল ভগবানকে সমগ্র বা সম্যকরূপে জানা যায়। সেই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানের কথা সপ্তম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। সেই অধ্যায়ে আছে—"নিত্যযুক্ত এক ভক্তিমান জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ," কেননা, বাসুদেবই সব এই জ্ঞান প্রকৃতরূপে লাভ করিয়া বহু জন্ম পরে জ্ঞানী ভগবানকে প্রাপ্ত হন। ঐ অধ্যায়ের

অসূয়া বিহীন তুমি, কহিব তোমারে
বিজ্ঞান সহিত এই জ্ঞান গুহ্যতম,
জানি যাহা, মোক্ষ পাবে অশুভ হইতে ॥১॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্য পবিত্র উত্তম
প্রত্যক্ষ গোচর ইহা, হয় ধর্ম্মযুত,
নিত্য আর আচরণে অতি সুখকর ॥২॥

শেষে উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা মোক্ষলাভ জন্য ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া যোগ করেন, তাঁহারাই সম্পূর্ণ রূপে ব্রহ্মকে জানিতে পারেন— অর্থাৎ ব্রহ্মের অধ্যাত্ম, অধিকর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ প্রভৃতি তত্ত্ব জানিতে পারেন, এবং মৃত্যু কালেও তাঁহার সে জ্ঞান অবিকৃত থাকে। এজন্য অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিয়া যে কলেবর ত্যাগ করে সে আমার ভাব প্রাপ্ত হয়, (৫ শ্লোক)। আর ব্রহ্মবিদ্জন অর্চ্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন (২৪ শ্লোক)।

সুতরাং গীতায় বিশেষতঃ এই অধ্যায়ে সদ্যমুক্তির কথা আছে, এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলা যায়না। পূর্ব্ব অধ্যায়ের (২৪ শ্লোকের) টীকায় দেখান হইয়াছে যে, ছান্দোগ্য উপনিষদ, প্রশ্নোপনিষদ, প্রভৃতিতে ও বেদান্ত দর্শনে কেবল এই ক্রমমুক্তির কথা আছে। কেবল বৃহদারণ্যকে (৪।৪।৬) "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" এই উক্তির দ্বারা সদ্যমুক্তির আভাস আছে। শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন প্রভৃতি অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণের মতে গীতার নবম অধ্যায়ে এই সদ্যমুক্তিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা যে ঠিক, তাহা বলিতে পারা যায় না। এই জন্য এই অধ্যায় সম্বন্ধে স্বামী, বলদেব, মাধবাচার্য্য, রামানুজ প্রভৃতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অধিক সঙ্গত বোধ হয়।

(১) অসূয়া বিহীন—দোষ দৃষ্টি হীন; ভগবৎ স্বরূপে উপদেষ্টা পুনঃ পুনঃ স্বমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন, এজন্য তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা বা দোষ দৃষ্টি সম্ভব থাকিলেও, যিনি তাঁহাতে দোষদৃষ্টি বিহীন (স্বামী)। গুণে দোষদৃষ্টি—অসূয়া; সর্ব্বদা আত্মৈশ্বর্য্য উপাখ্যান দ্বারা আত্ম-প্রশংসা হেতু উপদেষ্টার প্রতি দোষদৃষ্টি সম্ভব হইলেও যিনি এরূপ দোষদৃষ্টি বিহীন। ইহা দ্বারা আর্জ্জব সংযম প্রভৃতি শিষ্যগুণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে (মধুসূদন)।

বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান—(সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। অনুভবযুক্ত সম্যক সাক্ষাৎ মোক্ষ প্রাপ্তি সাধন জ্ঞান (শঙ্কর)। বিশেষ জ্ঞান, অর্থাৎ যাহা দ্বারা বিশেষ রূপে জানা যায়, সেই উপাসনাই বিজ্ঞান (স্বামী)। শব্দ প্রমাণক ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান, বিজ্ঞান সহিত অর্থাৎ ব্রহ্ম অনুভব পর্য্যন্ত (মধু)। উপাসনাগত বিশেষ জ্ঞানই বিজ্ঞান (রামানুজ)।

গুহ্যতম—অতি গোপনীয় (শঙ্কর, মধু)। "ধর্ম্ম জ্ঞান—গুহ্য, দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান—গুহ্যতর; আর পরমাত্মজ্ঞান, অত্যধিক রহস্যযুক্ত বলিয়া গুহ্যতম (স্বামী), অথবা দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান গুহ্য, ভগবানের ঐশ্বর্য্য বিষয়ক জ্ঞান,—গুহ্যতর, আর পরমাত্মজ্ঞান,—গুহ্যতম (বলদেব)।

অশুভ—সংসার বন্ধন (শঙ্কর, স্বামী, মধু) ভগবানকে পাইবার বিরোধী সমুদায়ই অশুভ (রামানুজ)।

(২) রাজবিদ্যা—বিদ্যার রাজা, (রামানুজ) সর্ব্ববিদ্যা অপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্যাই নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত ও শ্রেষ্ঠ (শঙ্কর) সর্ব্ব অবিদ্যা বিনাশক বলিয়া বিদ্যার রাজা (মধু)।

রাজগুহ্য—গুহ্যদিগের মধ্যে রাজা (শঙ্কর) গোপনীয় বিদ্যার মধ্যে অত্যন্ত রহস্যযুক্ত ও শ্রেষ্ঠ (স্বামী)। অনেক জন্ম সুকৃতসাধ্য বলিয়া অধিকাংশ লোকের অজ্ঞাত (মধু)।

রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য,—অর্থাৎ রাজাগণের বিদ্যা—রাজাগণের গোপনীয়। এরূপ অর্থও হইতে পারে (স্বামী)। যাঁহারা রাজাদিগের ন্যায় উদারচেতা ও স্বর্গাদি ভোগে নিস্পৃহ, যাঁহারা রাজাগণের মন্ত্রণা গোপনের ন্যায় এই ব্রহ্ম বিদ্যা গোপনে সাধন করেন, তাঁহাদের এই বিদ্যা (বলদেব)। রাজার ন্যায় মহামনাগণই এই তত্ত্ব জানিতে পারেন (রামানুজ)

উপনিষদ, বিশেষতঃ ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের অনেক স্থলে পাওয়া যায় যে, ক্ষত্রিয় রাজাদের নিকট হইতেই ব্রাহ্মণগণ অনেক স্থলে এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। আর গীতার চতুর্থ অধ্যায়

হইতে জানা যায় যে, এই গীতোক্ত ধর্ম্ম ভগবান প্রথম বিবস্বতকে বিবস্বত মনুকে ও মনু পরবর্ত্তী ক্ষত্রিয়-রাজাগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং এ ধর্ম্ম পূর্ব্ব হইতেই বরাবর ক্ষত্রিয় পরম্পরা চলিয়া আসিয়াছিল, ইহা গীতা হইতেই জানা যায়।

এই ব্রহ্ম বিদ্যা গোপনীয় কেন, তাহার কতকটা কারণ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২৬—২৯ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে।

পবিত্র, উত্তম—অত্যন্ত পূতকর, শুদ্ধিকর। শুদ্ধিকর যাহা কিছু আছে, সর্ব্বাপেক্ষা এই ব্রহ্মজ্ঞান উৎকৃষ্ট। কেননা, অনেক সহস্র জন্ম সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ কর্ম্ম মূল ইহা দ্বারা ক্ষণমাত্রে ভস্মীভূত হয়, (শঙ্কর) ও পুনর্ব্বার পাপ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব হয়।

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কোন একটী পাপ নিবৃত্ত হয়, নিবৃত্ত হইয়া স্বকারণে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে, পুনরায় সূক্ষ্মাবস্থা হইতে পুরুষেরা সেই পাপ বৃদ্ধি করেন। কিন্তু এই জ্ঞান অনেক সহস্র জন্ম সঞ্চিত সমুদায় স্থূল সূক্ষ্ম পাপ ও তৎকারণ অজ্ঞানকে সদ্য উচ্ছেদ করে, এইজন্য ইহা সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রকর। (মধু)।

প্রত্যক্ষ গোচর—(মূলে আছে) "প্রত্যক্ষাবগমং")। সুখাদির ন্যায় অনুভবযোগ্য (শঙ্কর)। যাহার স্পষ্ট অবরোধ হয়, যাহার ফল দৃষ্ট (স্বামী)। অবগম—অর্থাৎ বিষয়, যাহা প্রত্যক্ষের বিষয়। যে ভক্তিযোগে আমার উপাসনা করে, আমি তাহারই অন্তরে প্রত্যক্ষ হই (রামানুজ)। ইহা দ্বারা প্রত্যক্ষ জানিতে পারা যায়; অবগম—অর্থাৎ প্রমাণ; অর্থাৎ ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। অথবা প্রত্যক্ষ দ্বারা পাওয়া যায়—এই অর্থে অবগম, অর্থাৎ ফল; যাহার ফল প্রত্যক্ষ। এই জ্ঞান স্বরূপতঃ অন্তঃসাক্ষী-প্রত্যক্ষ—এই জন্য ইহার অবগম বা প্রমাণ-প্রত্যক্ষ; ফলেতেও ইহা অন্তঃসাক্ষীপ্রত্যক্ষ, কেননা আত্মা দ্বারা ইহা বিদিত হইয়াছে অর্থাৎ আমি ইহা জানিয়াছি, অতএব ইদানী ইহা ইষ্ট নহে-এস্থলে আমার অজ্ঞান রহিয়াছে, এইরূপ সর্ব্ব লোকের আত্মসাক্ষী অনুভব হয়।" (মধুসূদন)। অর্থাৎ এইরূপে সকলেই আপনার অন্তরে দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা আত্মার অনুভব করেন। কিন্তু এই আত্মানুভূতির দ্বারা পরমাত্মাকে অন্তরে প্রত্যক্ষ করার কথা এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

এই অধ্যায়ে যে ঈশ্বরতত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, সেই তত্ত্বজ্ঞান অপরোক্ষ অনুভবসিদ্ধ, অথবা অন্তঃপ্রত্যক্ষ সিদ্ধ বটে, কিন্তু কেবল "অধ্যাত্মভাব—উপলব্ধির দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় না। অধিভূত, অধিযজ্ঞাদি ভাবের অন্তরপ্রত্যক্ষ না হইলে সমগ্র জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় না।

ধর্ম্ম্যযুত—(মূল্যে আছে "ধর্ম্ম্য") ধর্ম্ম সঙ্গত। বৈদিক যজ্ঞ (যেমন শ্যেন যাগ) অনেক গুণযুক্ত হইলেও হিংসাদি জন্য—ধর্ম্মবিরোধী। কিন্তু আত্মজ্ঞান সেরূপ ধর্ম্মবিরোধী নহে। (শঙ্কর) যজ্ঞে পশু বলির ব্যবস্থা আছে। এই বলি অহিংসা ধর্ম্মের বিরোধী। কিন্তু যজ্ঞ দ্বারা অনেক অদৃষ্ট ফল লাভ হয়—তাহাতে শুভাদৃষ্ট লাভ হয়। অতএব বৈদিক কর্ম্ম হইতে ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ই লাভ হয়। এজন্য যজ্ঞফলে মুক্তি হয় না—স্বর্গভোগের পর সেই ধর্ম্মক্ষয়ে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু জ্ঞান সেরূপে কোন ধর্ম্মবিরোধী নহে। এজন্য ইহা সম্পূর্ণ ধর্ম্মসঙ্গত।

ইহা (অর্থাৎ এই জ্ঞান) দ্বারা বেদোক্ত সর্ব্ব ধর্ম্ম ফল লাভ হয় (স্বামী)। ইহা দ্বারা অনেক জন্ম সঞ্চিত নিষ্কাম ধর্ম্ম ফল লাভ হয় (মধু)। নিঃশ্রেয়সরূপ আত্যন্তিক আমার প্রাপ্তি সাধন (রামানুজ)।

নিত্য—ইহার ফল অক্ষয় (স্বামী, মধু), যে কর্ম্ম অল্পায়াসসাধ্য, তাহার ফল অল্প। যাহা দুষ্কর, তাহাতে মহতী ফল লাভ হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এই ধর্ম্ম আচরণে সুখকর হইলেও ইহাতে অনন্ত ফল লাভ হয়, কেন না, মোক্ষেও এই জ্ঞান থাকে। (শঙ্কর, মধু)।

আচরণে সুখকর—অনায়াস সাধ্য (স্বামী); ইহাতে কৃচ্ছ্র সাধনের প্রয়োজন নাই। শ্রবণ মনন দ্বারা গুরু দর্শিত উপায়ে বেদান্ত বাক্য বিচার দ্বারা সহজে লাভ করা যায়। ইহা দেশ কালাদি ব্যবধান অপেক্ষা করে না। প্রমাণ বস্তুপরতন্ত্র বলিয়া জ্ঞান এরূপ অনায়াসসাধ্য (মধু)।

শ্রুতিতে আছে "যোবা এতদক্ষরং গার্গ্য বিদিত্বাস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষ সহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতীতি।

এই ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন পুরুষ যাহারা
না লভি আমারে, তারা করে আবর্ত্তন
হে অর্জ্জুন, মৃত্যুযুত সংসারের পথে ।।৩।।
অব্যক্ত মূরতি—আমা দ্বারা আছে ব্যাপ্ত
এ জগৎ সমুদায়, আমাতে সংস্থিত
সর্ব্বভূত, নহে আমি তাহে অবস্থিত ॥৪॥
নহে পুন ভূতগণ আমাতে সংস্থিত,

---

(৩) এই ধর্ম্মে—আত্মজ্ঞানে (শঙ্কর, মধু); ভক্তি সহিত জ্ঞান লক্ষণ ধর্ম্মে (স্বামী); উপাসনাখ্য ধর্ম্মে (রামানুজ) ভক্তি লক্ষণ ধর্ম্মে (বলদেব, বিশ্বনাথ)।

শ্রদ্ধাহীন—আত্মজ্ঞান লাভের উপায়ে এবং তাহার ফলে শ্রদ্ধাবিরহিত নাস্তিক পাপকারী অসুরদের উপনিষদ্ হইতে দেহ মাত্র আত্মা এইরূপ দৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে। (শঙ্কর)

শঙ্করাচার্য্য এস্থলে ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের ৭।৮ খণ্ডের ইন্দ্রবিরোচন সংবাদ উল্লেখ করিয়াছেন।]

বিশ্বাস পূর্ব্বক শ্রদ্ধা যাহার নাই (রামানুজ)।

না লভি আমারে—ঈশ্বর প্রাপ্তিমার্গসাধন বেদ ও ভক্তি মাত্র না পাইয়া(শঙ্কর),আমার প্রাপ্তি জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া যত্ন করিয়াও আমার না পাইয়া (স্বামী)।

বেদ বিরোধী কুহেতু দর্শন দূষিত অন্তঃকরণ বশতঃ এই ধর্ম্মকে প্রামাণ্য বলিয়া অস্বীকারকারী আসুর সম্পদযুক্ত পাপী লোক স্বকপোলকল্পিত শাস্ত্র অবিহিত উপায়ে কথঞ্চিৎ সাধনা করিয়াও আমাকে পায় না। (মধু)।

ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন অর্থাৎ এই ধর্ম্মকে যাহারা শ্রদ্ধা করে না, বা বিশ্বাস সহকারে গ্রহণ করে না। (স্বামী)।

মৃত্যুযুত সংসারের পথে—নরক তির্য্যগাদি প্রাপ্তি মার্গে (শঙ্কর, মধু)।

(৪) অব্যক্ত মূরতি—করণ বা ইন্দ্রিয়ের অগোচর স্বরূপে (শঙ্কর); অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তিতে (স্বামী), সর্ব্বইন্দ্রিয়ের অগোচর, স্বপ্রকাশ, অদ্বয়, চৈতন্য, সদানন্দ রূপে (মধু)। অপ্রকাশিত স্বরূপে, অন্তর্য্যামীরূপে (রামানুজ)।

আমা দ্বারা—আমার শ্রেষ্ঠ ভাব দ্বারা (শঙ্কর); কারণভূত আমাদ্বারা(স্বামী); অন্তর্য্যামী আমা দ্বারা—অধিষ্ঠান পরমার্থসত্তাস্ফুরণরূপ আমা দ্বারা (মধু)।

আছে ব্যাপ্ত—শ্রুতিতে আছে,—

"স সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিশদিতি (স্বামী)।

যেমন রজ্জুতে সর্প—অজ্ঞানজ কল্পনা বলে ব্যাপ্ত, সেইরূপ ব্যাপ্ত (মধু)।

ঈশোপনিষদের প্রথমেই আছে:—"ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"

এ জগৎ সমুদায়—ভূত,ভৌতিক ও তৎকারণ রূপ দৃশ্যজাত আমার অজ্ঞান কল্পিত সর্ব্বজগৎ (মধু)।

সর্ব্বভূত—ব্রহ্মাদিস্তম্ভ পর্য্যন্ত সমুদায় (শঙ্কর); চরাচর (স্বামী); স্থাবর, জঙ্গম সমুদায় (মধু)।

আমাতে সংস্থিত—ব্যবহারিক ভাবে নিরাত্মক কোন ভূত কল্পিত হয় না, এজন্য তাহারা আত্মস্বরূপ আমা দ্বারা আত্মরূপে স্থিত (শঙ্কর)।

অন্তর্য্যামী রূপে স্থিত (রামানুজ) শ্রুতিতে আছে "যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরযময়তি যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো সময়তি ইতি।" অতএব ভগবান নিয়ামকরূপে জগতে স্থিত (রামানুজ)।

মূঢ় বুদ্ধিরাই বলে যে, সেই সকল ভূতগণের আমি আত্মা। এই জন্য আমি তাহাদিগের মধ্যে অবস্থিত। এইরূপ ধারণা নিবারণ জন্যই পরে বলা হইয়াছে, "নহে আমি তাহে অবস্থিত" (শঙ্কর)।

নহি অবস্থিত—আমি অমূর্ত্ত,ভূতগণের সহিত অসংশ্লিষ্ট,আকাশকেও আমি ব্যাপিয়া আছি, এই জন্য (শঙ্কর)। নিমিত্তকারণ মৃত্তিকা যেমন কার্য্যরূপ ঘটে অবস্থিত, আকাশের ন্যায় অসঙ্গ বলিয়া আমি সেরূপ অবস্থিত নহি (স্বামী)। পরমার্থতঃ আমি কল্পিত ভূতগণ মধ্যে অবস্থিত নহি, কেননা, কল্পিত ও অকল্পিত মধ্যে সম্বন্ধযোগ নাই (মধু)। জগতের স্থিতি আমার অধীন, কিন্তু আমার স্থিতি জগতের আয়ত্ব বা অধীন নহে (রামানুজ)।

(৫) নহে আমাতে সংস্থিত—যাহার কিছুরই সহিত সংসর্গ নাই, যাহা অসঙ্গ বা সম্বন্ধ বিরহিত, তাহা আধেয় ভাবেও থাকিতে পারে না, একারণ ভূতগণ আমাতে অবস্থান করে না, ইহা বলা যায়

হের মম ঐশ্বরীয় যোগ,—আত্মা মম
ভূতভর্ত্তা, ভূতপাতা—নহে ভূতেস্থিত ॥৫॥

(শঙ্কর)। যেমন জলতরঙ্গে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য বহুরূপে প্রতিভাত, সেইরূপ ভূতগণও আমাতে কল্পিত। পরমার্থতঃ তাহারা আমাতে অবস্থিত নহে (মধু)। যেমন জল ঘটে অবস্থিত, কিন্তু ঘট জলে অবস্থিত নহে (রামানুজ)।

হের—প্রাকৃত বা সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া দেখ (মধু)।

ঐশ্বরীয় যোগ—(মূলে আছে 'যোগৈশ্বর') ঈশ্বরের মাহাত্ম্য (শঙ্কর), অসাধারণ অঘটন ঘটনা চাতুর্য্য,যোগমায়া বৈভব (স্বামী, মধু)। আমি কিছুরই আধেয় নহি,আধারও নহি, তথাপি সর্ব্বভূত আমাতে ও আমি সর্ব্বভূতে অবস্থিত। ইহাই মহতী মায়া (মধু)। ব্রহ্মের সহিত জগতের এই সম্বন্ধ ব্রহ্মের সংকল্পজাত এই যোগ—অন্যত্র অসম্ভব, ইহা অসাধারণ (রামানুজ)

ভূতভর্ত্তা—(মূলে আছে 'ভূতভৃৎ') ভূতধারক (স্বামী), কার্য্যরূপ ভূতগণকে উপাদান স্বরূপে ধারণকর্ত্তা ও পোষণকর্ত্তা (মধু),।

ভূতপাতা—(মূলে আছে ভূতভাবন) ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি কর্ত্তা (শঙ্কর), ভূতগণের পালন কর্ত্তা (স্বামী), কর্ত্তৃত্ব হেতু সর্ব্বভূতের উৎপাদক (মধু)। এইরূপে অভিন্নভাবে ভূতগণের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। (মধু) আমি ভূতগণের ভর্ত্তা, কিন্তু ভূতগণ কেহই মমাকার নহে। আমার আত্মাই ভূতভাব; আমার মনোময় সংকল্পই ভূতগণের ভাবী পিতা ও নিয়ন্তা (রামানুজ)।

আত্মা মম—আমার পরম স্বরূপ (স্বামী), আত্মার অন্য আত্মা নাই।'রাহুর শিরের ন্যায় ইহা কল্পনা ষষ্ঠী। যেমন দেহধারী ও দেহপালক জীব অহঙ্কারবশে আপনাকে দেহ সংশ্লিষ্ট মনে করে, কিন্তু অহঙ্কারবিহীন বলিয়া আমি ভূতগণকে ধারণ ও পালন করিলেও আমি তাহাতে অবস্থিত নহি (স্বামী, শঙ্কর) পরমার্থ স্বরূপ; সচ্চিদানন্দঘন অসঙ্গ, অদ্বিতীয় স্বরূপ (মধু)।

নহে ভূতেস্থিত—পরমার্থতঃ ভূতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে—স্বপ্নে দৃষ্ট সম্বন্ধের ন্যায় সম্বন্ধযুক্ত

মহান সর্ব্বত্রগতি বায়ু যেইরূপ
আকাশে সংস্থিত, নিত্য; জানিও সেরূপে
সমুদায় ভূতগণ আমাতে সংস্থিত ॥৬॥

(মধু)। শ্রুতিতে আছে "অসঙ্গোহ যং আত্মা" সাংখ্য প্রবচনে আছে—"অসঙ্গোহ য়ং পুরুষঃ।'

(৬) সংস্থিত—সংশ্লেষ ব্যতীত অবস্থিত (স্বামী, মধু)।

সাগর সম্বিদৃত্তি রিদ্ধোর্ম্মিভাগঃ।
ক্ষুরাণি বায়ৌ স্মিন্থিহস্তা
গতযস্য রাম বিক্ষেহানস্থিত্রা: প্রভবন্তি মায়া॥

শাস্ত্রে আছে—'যথা চুর্ব্বেদবিদঃ মেঘোদয়ঃ

শ্রুতিতে আছে, এতস্য বা 'অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতা তিষ্ঠতঃ।'

অন্যত্র আছে—

"ভীষা স্মাদ্বাতঃ বহতে ভীষাদেতি সূর্য্যঃ
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চন্দ্র মৃত্যু র্ধাবতি পঞ্চম।'

অতএব ভগবানের সংকল্প হইতেই সকলের স্থিতি। (রামানুজ)।

নিত্য—সর্ব্বদা, উৎপত্তি, স্থিতি,সংহার কালেও প্রবাহিত (মধু)।

উল্লিখিত তিন শ্লোকে যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, ইহাই গুহ্যতম তত্ত্ব। বিজ্ঞান সহিত এই জ্ঞানই রাজগুহ্য বিদ্যা। সুতরাং এস্থলে এই তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। আমরা উল্লিখিত শ্লোক হইতে এই কয়টী তত্ত্ব পাইয়াছিঃ—

১। ভগবানের অব্যক্ত মূর্ত্তির দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত।

২। ভূত সকল তাঁহাতে স্থিত, আবার ভূত সকল তাঁহাতে স্থিত নহে।

৩। ভগবান—ভূতভর্ত্তা ও ভূতভাবন অথচ তিনি ভূত সকলে অবস্থিত নহেন।

একে একে আমরা এই সকল তত্ত্বের সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

১। ভগবানের অব্যক্ত মূর্ত্তির দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত। এই অব্যক্ত মূর্ত্তি কি কূটস্থ চৈতন্য ভাব? প্রায় সকল ভাষ্য ও টীকাকারগণ এইরূপ অর্থ করেন। কিন্তু এই "অব্যক্ত মূর্ত্তির অর্থ অন্যরূপ করা যায়। যাহা ব্যক্ত মূর্ত্তি নহে, যাহা manifest হয় না,

phenomenon রূপে যাহা প্রকাশিত হয় না, যাহা immanent নহে, যাহা noumenon, absolute, ummainfested, এক কথায় যাহা transcendental তাহাই এই অব্যক্ত মূর্ত্তি। এই জ্ঞানাতীত transcendent ভাবের অন্তর্গত জগৎ ও জীবের সহিত সম্বন্ধ হইতে যে পর্য্যন্ত আমাদের এই সীমাবদ্ধ জ্ঞানে জ্ঞেয়, অব্যক্ত ভাব—তাহা immanent। এই immanent অব্যক্ত ভাবই জীব ও জগৎ রূপে অভিব্যক্ত। অতএব জগৎ সমুদায় ব্রহ্মের immanent ভাব দ্বারা ব্যাপ্ত। আর সেই immanent ভাব transcedent ভাবের দ্বারা ব্যাপ্ত।

গীতায় সর্ব্বত্র এইরূপ কথাই আছে। গীতার সমস্ত অধ্যায় বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মের জড়-রূপা অপরা প্রকৃতি আর জীবরূপা পরা প্রকৃতি, জগতের যোনী। ইহাই মহৎ ব্রহ্ম, আদি শক্তিরূপে জগতের উপাদান কারণ। আর ব্রহ্মের পরম পুরুষ ভাব—Logos, idea—রূপে জগতের নিমিত্ত কারণ। শব্দ ব্রহ্মরূপে সেই idea গণের অভিব্যক্ত হয়। Logos এর ideas বীজ রূপে মহৎ ব্রহ্ম বা প্রকৃতি রূপা ব্রহ্মে নিহিত হইয়া তদনুসারে প্রকৃতিকে পরিণত করে। ব্রহ্ম পুরুষের সংকল্প বা ঈক্ষণ হইতেই শক্তিময়ী ব্রহ্মপ্রকৃতিতে এই জগতের বিকাশ হয়। আমরা জগৎ ও জীবের সহিত সম্বন্ধ বিহীন absolute, transcendent ব্রহ্মতত্ত্ব এই জ্ঞানে অর্থাৎ জ্ঞাতা-জ্ঞেয়রূপ দ্বৈতাত্মক জ্ঞানে জানিতে পারি না। কিন্তু জগৎ ও জীবের সহিত সংস্পৃষ্ট relative transcendet ব্রহ্মতত্ত্ব সাধনা-বলে বিজ্ঞান সহিত জানিতে পারি। আমাদের এই মায়াবদ্ধ অজ্ঞানাবৃত দেশকালসীমাবদ্ধ জ্ঞানে বলিতে পারি যে, ব্যক্তজগৎ অব্যক্ত ব্রহ্মের অতি ক্ষুদ্রতম অংশ। "পাদোঽস্য বিশ্ব-ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" অতএব আমাদের এই জ্ঞানে transcendent ব্রহ্মের অতি ক্ষুদ্র অংশ immanent ব্রহ্ম।

যাহা হউক, গীতা হইতে আমারা জানিতে পারি যে, ব্রহ্মের দুই ভাব। এক—পরম অব্যয় অনুত্তম (absolute, transcendental) ভাব। আর এক—অপর ভাব (immanent) যাহা ব্যক্ত বা manifest হয় (গীতা—৭।২৪।৮।১৮। যাহা পরম অব্যয় অক্ষর ভাব, তাহা এই অব্যক্ত ভাবের অতীত, সেই ভাব হইতে ভিন্ন, অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত সনাতন (৮।২০)। গীতাতে এই transcendental ব্রহ্মকেও পরম পুরুষ বলা হইয়াছে। ইতি অজ, অনাদি লোক মহেশ্বর (১০।৩)। ইনিই পরমব্রহ্ম, পরমধাম, পরমপবিত্র, শাশ্বত পুরুষ, নিত্যবিভু বলিয়া কথিত। ইনি কুটস্থ হইতে ভিন্ন (১৫।১৭) ইনিই immanent ভাবে সর্ব্বভূতাশয়স্থিত আত্মা, সর্ব্বভূত বীজ ও একাংশে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন (১০।১২) জীবভূত পরাপ্রকৃতি তাঁহারই একাংশ। বিরাট-রূপ ইহারই ব্যক্ত ঐশ্বরীয় রূপ (১১।৩)।

২। অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, জগৎ ও ভূত সকল অজ্ঞান কল্পিত। অজ্ঞান বশে যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান নিহিত—সেইরূপ ব্রহ্মতেই জগৎ জ্ঞান নিহিত। সুতরাং ব্যবহারিক ভাবে ভূতগণ ব্রহ্মে অবস্থিত, কিন্তু পরমার্থিক ভাবে জগৎ মিথ্যা বলিয়া ভূতগণ ব্রহ্মে অবস্থিত নহে। দ্বৈতবাদীরা বলেন, পদ্মপত্রে জলের ন্যায় ভূতসকল ব্রহ্মে স্থিত অথচ স্থিত নহে। অর্থাৎ স্থিত বটে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট নহে। ষষ্ঠ শ্লোকের আকাশ ও বায়ুর তুলনায় এই কথা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

অন্যত্রও এই কথা আছে—

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতে দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥
(গীতা ১৩।৩২)

সে যাহা হউক, উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে বলা যায় যে, transcendent ব্রহ্মের সহিত জীবের কোন সংস্রব নাইত, immanent ব্রহ্মেই তাহারা অবস্থিত। এই immanent ভাব সম্বন্ধেই গীতায় উক্ত হইয়াছে—

বহিরন্তশ্চ ভূতানাং অচরং চরমেবচ
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চতৎ।
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং
(১৩।১৫-১৬)

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।
(১৩।২৭)

ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
(১৮।৬১)

৩। উল্লিখিত কারণেই ব্রহ্ম immanent রূপে সর্ব্বভূতের আত্মা, তাঁহারই একাংশ জীবরূপে অভিব্যক্ত, সুতরাং তিনি ভূতভাবন ও ভূত ভর্ত্তা, কিন্তু—transcendent রূপে তিনি জগতে বা ভূত সকলে অবস্থিত নহেন--সে রূপে তিনি unrelated absolute.

আরও এক কথা বলা যায় যে, যাহা যাহার ব্যাপক সে তাহাতে অবস্থিত হইতে পারে না। অংশ কোন পাত্র মধ্যে থাকিলে, সেই পাত্রস্থ বায়ুকে সমগ্র বায় বলা যায় না। অতএব ব্রহ্মের সামান্য অংশ ভূত সকল হইলেও- ভূত সকলে সমগ্র ব্রহ্ম অবস্থিত হইতে পারেন না। নিষ্কল ব্রহ্মের অংশ কল্পনা ভ্রমাত্মক হইলেও অবিরোধ ভাবে এ সকল তত্ত্ব বুঝিতে হইলে একরূপ কল্পনা করিতে বাধ্য হইতে হয়।

যাহা হউক, এ বিষয়ের আর বিস্তারিত আলোচনার এস্থলে প্রয়োজন নাই। তবে আর একটা কথার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। এইস্থলে দেখা যায়, ব্রহ্মতত্ত্বে পরস্পর বিরোধী তত্ত্বের সামঞ্জস্য হইয়াছে। ব্রহ্ম, ব্যক্ত অথচ অব্যক্ত; ব্রহ্ম immanent অথচ transcendent, ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে অবস্থিত অথচ সর্ব্বভূতে অবস্থিত নহেন; ভূত সকল ব্রহ্মে অবস্থিত, আবার ভূত সকল ব্রহ্মে অবস্থিত নহে। ব্রহ্মতত্ত্বে এই সকল দ্বন্দ্বের বা thesis ও antithesis এর synthesis বা সামঞ্জস্য বা একীভূত করাই আশ্চর্য্য ঐশ্বরীয় যোগ। [জর্ম্মাণ পণ্ডিত সেলিং ও হেগেল হইতে—এই সামঞ্জস্য তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়।]

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

দ্বিজত্ব।

পূর্ব্বে এক প্রস্তাবে বলিয়াছি যে, হিন্দু-জীবনের আদ্যকালে, প্রায় ৬০০ বৎসর ব্যাপক সময়ে জাতিভেদ প্রথা ছিল না; কিন্তু ছিল আর্য্যানার্য্যের বিবাদ। রাজত্ব-লোভী শ্বেতকায় আর্য্যগণ কৃষ্ণকায় অনার্য্য-গণের দেশ, বাড়ী, ঘর বিধ্বস্ত করিয়া, গো, মেষ, মহিষ ও কৃষিজাত দ্রব্যসকল অপহরণ করিয়া আপনারা যত ক্ষমতাশালী ও লব্ধাধিকার হইতেছিলেন, অনার্য্যগণ তাঁহাদিগকে তত শত্রু মনে করিয়া প্রত্যেক সুবিধায় আক্রমণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। যে জাতি হইতে শ্যামবর্ণ লঙ্কেশ্বর রাবণের উৎপত্তি বলিয়া বর্ণিত, যে জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ দুর্য্যোধন উত্তর-ভারতের সিংহাসন শোভিত করিয়াছিলেন বলিয়া কল্পিত, বেদ-বর্ণিত সময়ে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে জ্ঞান, বুদ্ধি ও ক্ষমতায় নিতান্ত হীন ছিলেন, একপ বিবেচনা করা ভুল। তবে অল্প সংখ্যক জাপকর্ত্তৃক সেদিন আমাদের চক্ষের উপরে চীনগণ যেমন লাঞ্ছিত হইলেন, অল্প সংখ্যক ইংরেজ হস্তে যেমন মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল; অল্প সংখ্যক পাঠানেরা যেমন হিন্দু রাজত্ব বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তেমন অল্প সংখ্যক আর্য্যগণ বৈদিক সময়ে অনার্য্য ভারতে আপনাদের অধিকার বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ের চীনগণ যেমন জাপদিগের নিকট অস্পৃশ্য নহে, মোগলের পক্কান্ন যেমন ইংরেজদের অখাদ্য নহে, হিন্দুর হস্তে খাইলে যেমন পাঠানের জাতি যাইত না, সেই প্রকারে জিত অনার্য্য-গণের অন্নজল গ্রহণে জেতৃজাতি আর্য্যগণের জাত্যংশে কোন দোষ আসিত না। ফলে সেই সময়ে জাতি-ভেদ কুপ্রথার সৃষ্টি হয় নাই।

কিন্তু হিন্দুজীবনের প্রথম ৬০০ বৎসরের পরে জাতিভেদের কিঞ্চিৎ সূচনা হইল। নূতন দেশে অধিকার বিস্তার ও শ্রেষ্ঠতা কল-

শস্যের অপর্য্যাপ্ততা বশতঃ যখন সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন পূর্ব্বের অতি সরল উপাসনা পদ্ধতি বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞাড়ম্বরে পরিণত হইল। যে সকল আর্য্যগণ পূর্ব্ব কবিগণের ঋকগুলি অধিকতর অভ্যাস ও কণ্ঠস্থ করিতেন, সমাজে তাঁহাদের একটী বিশেষ শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিল; কেন না, তাঁহারাই আড়ম্বরপূর্ণ বৃহৎ যজ্ঞ সম্পাদনে অধিকতর যোগ্য বিবেচিত হইতেন। যোদ্ধৃবর্গকে অনবরত দেশ জয় ও দেশ রক্ষা করিতে হইত। কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবসায়িগণের দ্বারও উন্মুক্ত। তাঁহাদের শক্তিও সর্ব্বত্র প্রসারিত হইতে লাগিল। অনার্য্যগণ জিত হইলেও এই ত্রিবিধ সামাজিক শক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে প্রথমতঃ চারিটী শ্রেণীর রেখাপাত হইল। (১) পুরোহিত, (২) রাজকর্ম্মচারী ও যোদ্ধৃবর্গ, (৩) বাণিজ্য ও কৃষি-ব্যবসায়ীগণ, (৪) প্রত্যেক বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বী অনার্য্যগণ। ইহাদেরই শাস্ত্রীয় নাম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। কিন্তু এ সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র শ্রেণী বিশেষ (classes), কিন্তু পানাহারবর্জ্জিত জাতিবিশেষ (caste) নহে।

ভাবিয়া দেখিলে বর্ত্তমান সময়েও আমরা এইরূপ একটী শ্রেণীবিভাগের অন্তর্গত। যে অবস্থায় এদেশে একবার জাতিভেদের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল, আমরা ঠিক সেই অবস্থার সন্ধিস্থলে সম্প্রতি দণ্ডায়মান আছি। আজও দেশে জেতৃজাতি সেই শ্বেতবর্ণ আর্য্যগণের একটি শাখা; আর, অধুনা ভারতীয় যাবতীয় অধিবাসী জিত ও শতকরা ৭৫ জনেরও অধিক কৃষ্ণ বা তন্নিকটবর্ত্তি-বর্ণাঙ্কিত। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ের ভারতীয় জনসংখ্যাকে চারিভাগ করিলে, সেই প্রাচীন চারিভাগের সহিত অতি সুন্দর সাদৃশ্য স্থাপিত হয় এবং জাতিভেদের স্থূল মর্ম্ম বুঝিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হয়।

(১) ব্রাহ্মণ (Missionaries) বা জেতৃজাতীয় ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়।

(২) ক্ষত্রিয় (civil and military servants) শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারী ও যোদ্ধৃগণ।

(৩) বৈশ্য (Merchants and planters) বাণিজ্য ও কৃষি-ব্যবসায়ি জেতৃগণ।

(৪) শূদ্র (natives) সকল বিভাগে অল্প বিস্তর লব্ধ প্রবেশ ও শ্রমবিভাগের দেশীয়গণ।

সুতরাং আজ ইংরেজজাতি ভারতীয় অধিবাসী সম্বন্ধে যেরূপ সামাজিকাবস্থাপন্ন, সে সময়ের আর্য্যজাতিও অনার্য্যজাতি সম্বন্ধে সেইরূপ বরং তদপেক্ষা গাঢ়তর সামাজিকতায় আবদ্ধ ছিলেন। কেননা, ইংরেজ এ দেশে বিদেশীয়, কিন্তু আর্য্যজাতি উপনিবেশী, সুতরাং সম্পূর্ণরূপে বিদেশীয় ছিলেন না। দেখ, এই অল্পকালের মধ্যেই দুইশত বৎসর অতীত হইতে না হইতেই এবং অন্যত্র স্বজাতি ও বাসগৃহ থাকা সত্ত্বেও ইংরেজ কত বর্ণশঙ্কর উৎপন্ন করিয়াছেন। ভারতবাসিনীর গর্ভে যেমন ইংরেজের সন্তান উৎপন্ন হইতেছে, তেমন ইংরেজ-মহিলার গর্ভে ভারতবাসীর সন্তানোৎপত্তিও বিরল নহে। সুতরাং যখন আর্য্যজীবন ভারতবর্ষে ৬০০ বৎসর অতীত হইয়া গেল, তখন পূর্ব্বোক্ত গাঢ়তর সম্বন্ধ বশতঃ ভারতবাসী অনার্য্যগণের সহিত তাঁহাদের কিরূপ রক্ত-বিনিময় হইতেছিল, তাহাত সহজেই বুঝা যায়। এই প্রকারে দ্বিজত্বের সৃষ্টি।

বর্ত্তমান সময়ের ইউরোপীয় এবং ভারত-

বাসী কর্ত্তৃক ইংরেজ মহিলা গর্ভজাত সম্প্রদায় যেমন দেশীয়গণের সহিত না মিশিয়া জেতৃ বিদেশীয়গণের সহিত মিশিতেছেন, * সেই সময়ের অনুলোম ও প্রতিলোম দ্বিজগণও বর্ণভেদ না থাকায় এবং শ্রেণীভেদেরও প্রখরতা না থাকায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবিধ আর্য্যগণের সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন যে সকল শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের সমকক্ষ ছিলেন, তাঁহারা বর্ণভেদ প্রথা না থাকা বশতঃ তত্তৎশ্রেণীর সহিত যে আদান প্রদানে বিরত ছিলেন, তাহারই বা প্রমাণ কোথা? অতএব আদি শ্রেণী চতুষ্টয়ে (বর্ণভেদ প্রথা রীতিমত স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই) দ্বিজত্বের দুটী স্তর অনুভব করা যায়। (১) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শূদ্রের সহিত ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীত্রয়ের আদান প্রদান বশতঃ দ্বিজত্ব। (২) শঙ্করোৎপন্ন জনসংখ্যার সহিত মৌলিক শ্রেণী চতুষ্টয়ের সংশ্রবোৎপন্ন দ্বিজত্ব। প্রথম প্রকার দ্বিজের উত্তম উদাহরণ ব্যাসদেব। দ্বিতীয় প্রকার দ্বিজের উত্তম উদাহরণ অশ্বত্থামা। †

দ্বিজত্বই সকল অনর্থের মূল। ইহার প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যেই বর্ণভেদের সৃষ্টি। দ্বিজত্ব হইতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ক্রমশঃ বর্ণের গৌরবত্ব পরিহার করিয়া কৃষ্ণবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং শূদ্রগণও দ্রুতবেগে গৌরত্বাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন দেখা গেল যে, কৃষ্ণবর্ণের সহিত আদান প্রদান রহিত করিতে না পারিলে অচিরে আর্য্যগণের গৌরবর্ণত্ব একেবারেই বিলুপ্ত হইবে। এজন্য আর্য্যহৃদয়ে পৃথক থাকিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। বোধ হয়, এতাদৃশ ইচ্ছা হইতেই অহোরাত্র যজ্ঞোপবীত ধারণের ইচ্ছা অঙ্কুরিত হইল। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, অত্রি, ভরদ্বাজ, মধুচ্ছন্দ প্রভৃতি ঋগ্বেদীয় ঋষিগণ যে যজ্ঞোপবীত পরিহিত হইয়া গাত্রশোভা বিবর্দ্ধিত করিতেন, ইহার ত সম্পূর্ণই প্রমাণাভাব; তবে ইঁহাদের পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ রচনাকালে যজ্ঞোপবীত ব্যবহারের সূচনা হইয়াছে সত্য। শতপথব্রাহ্মণ (২।৪।২) এবং কৌষীতকী উপনিষৎ (২।৭) অনুসারে উপলব্ধি হয় যে, তখন যজ্ঞকালে যজ্ঞোপবীত ব্যবহারের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। * এই যজ্ঞোপবীত অহোরাত্র পরিধান করাই এক্ষণ অনার্য্য সংশ্রব হইতে পৃথক্ থাকিবার উপায় স্থিরীকৃত হইল। এই সময় যদি আর্য্যগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের গাত্রচর্ম্ম নিরবচ্ছিন্ন শ্বেত বা গৌর বর্ণ থাকিত এবং অনার্য্যগণের গাত্র চর্ম্ম নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণবর্ণ থাকিত, তবে সূত্রধারণ রূপ পার্থক্যের কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের কোন কারণ থাকিত না। যদি সুদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় ইংরেজগণ মাতৃদেশ

(*) ইউরোপীয়গণের-Imperial Anglo Indian Association নামক সভার উদ্দেশ্য যাহারা অবগত আছেন, তাঁহারা আমাদের কথা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

† মহাভারত পাঠে জানা যায়, দ্রোণাচার্য্য কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্বেতবর্ণ আর্য্যজাতি বিনা অনার্য্যসংশ্রবে কৃষ্ণবর্ণ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং অশ্বত্থামা শঙ্করজ সন্দেহ নাই।

* The Yajnopovita was worn in this ancient period by Brahmans, Kshatriyas, and Bisyas alike but only at the time of performing Yajna or vedic works or sacrifices.

Mr. Dutt's Ancient India, Book II, page 174.

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন এবং বর্ণ-প্রাধান্য রক্ষার জন্য অধুনা যে শ্রেণী চতুষ্টয় বিদ্যমান আছে, তদবলম্বনে বর্ণ-ভেদ প্রথার পুনরভিনয় করিতে প্রয়াস পান, তাহা হইলে অপ্রাপ্ত দ্বিজত্ব ও প্রাপ্তদ্বিজত্ব অর্থাৎ বৃটিশবর্ণ ও ইউরেশীয় সম্প্রদায় মিশ্রিত হইয়া দেশীয়গণ হইতে পৃথক্ থাকিবার জন্য যে গ্রীবাদেশে ফিতা-বন্ধন বা অন্য কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন না, ইহাই বা কে বলিতে পারে? ফলে সে সময়ে তাঁহাদের মধ্যেও দ্বিজত্ব নিবন্ধন কৃষ্ণবর্ণত্বের এত আধিক্য হইবে যে, নিরবচ্ছিন্ন শ্বেতবর্ণত্ব অবলম্বনে পৃথক থাকা সুবিধাসঙ্গত হইবে না। ঠিক সেই প্রকারে বর্ণভেদ-প্রথা রীতিমত প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই আর্য্য-রক্তে অনার্য্যরক্তের বিলক্ষণ প্রবাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এই প্রবাহ নিয়মিত করিবার উদ্দেশ্যে, কিন্তু নিবারিত করিবার উদ্দেশ্যে নহে, যত বর্ণভেদের সৃষ্টি।

কিন্তু ইহাও বড় সহজ কথা নহে। বর্ণ-ভেদের প্রস্তাবে কেবল শূদ্রগণ বিরক্ত হইলেন, এমত নহে। বৈশ্য, ক্ষত্রিয়েরও বিরক্তির যথেষ্ট কারণ ছিল। ঘোরতর আত্মকলহ উপস্থিত হইল। অধিকাংশ অনার্য্য জাতি এক পক্ষ হইলেন। দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় কোন কোন শ্যামবর্ণ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সহায়তা করিতে লাগিলেন। ভীষ্মের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় ও স্বার্থত্যাগী কোন কোন ক্ষত্রিয় অনার্য্যপক্ষ অবলম্বন করিলেন। কর্ণের ন্যায় দ্বিজসম্ভ মিশ্র-বর্ণের অনেকে শূদ্রপক্ষাবলম্বনই শ্রেয়স্কর মনে করিলেন। পক্ষান্তরে ধৌম্যের ন্যায় ব্রাহ্মণগণ ব্যাপ্টাইজ্ড (baptized) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে দীক্ষিত অনার্য্যগণ সহ কোন কোন ক্ষত্র-বিশের সহায়তায়, বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ১১:৭ এর অনুপাতে অনার্য্য ও আর্য্যপক্ষে ভারতবাসিসকল সজ্জিত হইল। বর্ণভেদের সূচনায় এই মহাসমর সংঘটিত হইল। ইহাকেই কুরুপাঞ্চাল-যুদ্ধ বা ভারত-যুদ্ধ কহে।*

এই যুদ্ধের ফলে বর্ণভেদ স্থাপিত হইল। যাহা শ্রেণী ছিল, তাহা জাতি হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিটী বর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইতঃপূর্ব্বেই দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অপ্রাপ্ত দিজত্ব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতে তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া লইবার উপায় থাকিল না। তাঁহাদিগকে কাজে কাজেই তত্তৎ বর্ণের সহিত মিশাইয়া লইতে হইল। দ্বিজত্ব প্রাপ্ত অনেক শূদ্র মৌলিক শূদ্রের সহিত জাতিবদ্ধ হইলেন। যাহা হউক, এই জাতিভেদের উদ্দেশ্য বর্ত্তমান জাতিভেদের ন্যায় পানাহার বর্জ্জিত করা নহে। ইহার উদ্দেশ্য অনার্য্য রক্ত পরিশ্রুত করিয়া আর্য্যদেহে ধারণ। এজন্য স্থিরীকৃত হইল, সবর্ণের মধ্যেই বিবাহ শ্রেয়স্কর; তবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কন্যা, ক্ষত্রিয় বৈশ্য কন্যা এবং বৈশ্য শূদ্র কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে। ইহার বিপরীত

* অনার্য্য কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রুক্মিণীর হরণ ও বিবাহ এবং মহাভারতোক্ত অন্যান্য বিবাহের বিবরণ পাঠে এবং যুধিষ্ঠিরের পাচক শূদ্র ছিলেন ইত্যাদি ঘটনা লক্ষ্য করিলে, ভারতীয় যুদ্ধের প্রাক্কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে শ্রেণীবিশেষই মনে করা যায়, আদান প্রদান রহিত ও পানাহার বর্জ্জিত জাতি বলিয়া মনে করা যায় না।

ভাবে বিবাহ নিন্দনীয় এবং তদুৎপন্ন সন্তান সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। ইহাতেও অনার্য্য রক্তের সহিত আর্য্য রক্তের বিনিময় চলিতে লাগিল; কিন্তু খুব নিয়মিত প্রকারে। মনে কর ক, খ, গ ও ঘ যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-জ্ঞাপক। গ, ঘয়ের কৃষ্ণবর্ণা কন্যা বিবাহ করিল এবং তাহাতে গয়ের এক কৃষ্ণবর্ণা কন্যা জন্মিল, সেই কন্যা খ বিবাহ করিল। তাহাতেও এক কৃষ্ণবর্ণা কন্যা উৎপন্ন হইল; তাহাকে ক বিবাহ করিল। সেই বিবাহে ক'য়ের যে কন্যা জন্মিল,তাহাও মাতৃ লক্ষণা-ক্রান্ত কৃষ্ণবর্ণা হইল এবং সেই কন্যাকে অন্য ব্রাহ্মণ বিবাহ করিলেন। এই প্রকারে অনার্য্যরক্ত আর্য্যত্বের উচ্চতম শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া অন্তঃসলিলা ভোগবতীর ন্যায় খেলিতে লাগিল। পক্ষান্তরে আর্য্য-রক্তও প্রতিলোম প্রণালী অনুসারে শূদ্র-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরিষ্কৃত করিতে লাগিল। এই প্রকারে দ্বিজত্বের আর একটী স্তর স্থাপিত হইল। ইহাই দ্বিজত্বের তৃতীয় স্তর।*

এই ভাবে কয়েক শতাব্দী চলিলে এদেশ বৌদ্ধবিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। প্রায় ১০০০ বৎসরের বৌদ্ধরাজত্ব ও ধর্ম্ম সংশ্রবে দেশের যে অনেক লোক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমা-দের সন্দেহ নাই। উক্ত ধর্ম্মে জাতিভেদ প্রথা না থাকায় ভারতের অনেক অধি-বাসী জাতি-বিযুক্ত হিন্দু মধ্যে পরিগণিত হইলেন; তবে জাতিযুক্ত হিন্দু যে ছিলেন না, তাহা নহে। কুমারিল ভট্ট হইতে আরম্ভ করিয়া শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম স্থাপয়িতৃগণের যত্নে দেশে পৌরা-ণিক হিন্দুধর্ম্মের উদ্ভব হইতে লাগিলে আবার নূতন করিয়া বর্ণভেদ করিতে হইল। এই বর্ণভেদের সময় পূর্ব্ব বর্ণভেদের রেখাপাতের চিহ্ন প্রায়শঃ বিলুপ্ত হইয়া-ছিল। সুতরাং ব্যবসায় অবলম্বনেই এই এই ভেদ করিতে হইল। যে শ্রমণ হয়ত পূর্ব্বে নাপিত ছিলেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ করিতে হইল; যে যোদ্ধা হয়ত রজক ছিলেন, তাঁহাকে ক্ষত্রিয়, কায়স্থ বা ছত্রীর সহিত মিশ্রিত করিতে হইল; যে ব্যবসায়ী হয়ত চুপড়ীবুনানের সম্প্রদায় হইতে জাত, তাঁহাকে বৈশ্য বা নবশাক করিতে হইল; এবং শ্রমজীবিগণকে ব্যবসায় অনুসারে অসংখ্য খণ্ডে খণ্ডীকৃত করা হইল। এই রূপ অসংখ্য খণ্ডকে চির পৃথক রাখা অর্থাৎ তন্মধ্যে আদান প্রদান রহিত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। এজন্য স্পর্শ-দোষ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া পানাহার বর্জ্জিত করা হইল। জাতি আর জাতি থাকিল না; অসংখ্য খণ্ডে খণ্ডীকৃত পুরুভুজের ন্যায় অসংখ্য স্বতন্ত্র জাতি হইল। ব্রাহ্মণ-গণ প্রাধান্য রক্ষার মানসে এই সহস্র সহস্র জাতিখণ্ডের সহিত খণ্ডীকৃত হইয়া অপ-দেবতার ন্যায় তত্তৎ খণ্ডের ঘাড় চাপিয়া বসিলেন। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা বর্ণ ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিলেন, জাতি সাধা-রণের অধঃপাতের সহিত তাঁহাদের অধঃ পাতেরও চরম সীমা অধিকৃত হইল। এই প্রকারে নব জাতিভেদ সময়ে মিশ্রিত

* সূত্র সাহিত্য দেখ। ঋগ্বেদীয় কল্পসূত্রের অন্তর্গত বশিষ্ঠের ধর্ম্মসূত্রের ১৮ শ অধ্যায়ে চণ্ডাল বৈণ, অন্ত্যাবসায়ী, রামক, পুল্কস, সূত, অম্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ এবং পারশব এই দশটী দ্বিজ বা শঙ্করজাতির উল্লেখ আছে।

জনসংখ্যাকে আবার যখন বিভক্ত করিতে হইয়াছিল, তখন যে দ্বিজত্ব বা শঙ্করত্বের আর একটী স্তরের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহাতে কি সন্দেহ হইতে পারে? সুতরাং বর্ত্তমান ভারতীয় হিন্দুজনসংখ্যার মধ্যে দ্বিজত্ব বা শঙ্করত্বের চারিটী স্তর অনুভব করা যায়।

(ক) আদি আর্য্যানার্য্য রক্ত-সংস্রব বশতঃ দ্বিজত্ব।

(খ) বর্ণভেদ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে শঙ্করগণের সহিত শ্রেণীচতুষ্টয়ের রক্ত-সংস্রব এবং সামান্য মিশ্রণ বশতঃ দ্বিজত্ব।

(গ) বর্ণভেদের পরবর্ত্তী সময়ে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহোৎপন্ন দ্বিজত্ব।

(ঘ) পৌরাণিক বর্ণভেদ কালীন সাধারণ মিশ্রণ বশতঃ দ্বিজত্ব।

এই প্রকারে হিন্দুর জাতীয় দেহ চতুর্ব্বিধ দ্বিজত্বের স্তরে সংগঠিত। ফলে বর্ত্তমান সময়ের হিন্দুত্বই দ্বিজত্ব ও দ্বিজত্বই হিন্দুত্ব।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

বিলাতী জীবন।

দাদা মহাশয় আর দিদিমাদের তাড়নায় বাড়ী থেকে বাহির হইবার সুবিধা হয় না। তাঁহাদের ভয়, সঙ্গ দোষে—অভিভাবক অভাবে ছেলে মেয়েদের চরিত্র দূষিত হইবে। এখানে গেলে গাধা হবে, ওখানে গেলে ছাগল হবে, সেখানে গেলে ভেড়া হবে। লেখা পড়া করা প্রায়ই বাড়িতে বা স্থানীয় পাঠশালাতে হয়; চাকুরিটাও গ্রামে পেলেই ভাল হয়। কিছু না পেলে, অগত্যা মা অন্নপূর্ণার সেবায় বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইতে হয়। এই সকল দোষ আমাদের দেশে প্রত্যেক স্থানেই, জাতীয় আচার, ব্যবহার, ভাব, জ্ঞান যুগযুগান্তর হইতে সম ভাবে প্রভাবিত করিয়া আসিতেছে। সেই কারণে আমাদের চরিত্রে অনেক স্থলে গুণ ও অনেক স্থলে সাধারণতঃ দোষ লক্ষিত হয়। গুণের মধ্যে স্নেহশীলতা, অনুরাগ, সদ্ভাব, আনুগত্য প্রধানতঃ লক্ষ্য হয়। দোষের মধ্যে বুদ্ধির সঞ্চার হয় না, বহির্জ্জগতের সঙ্গে ভাবের অদল বদল হয় না। কোন স্থলে চরিত্র বিনয় ও নম্রতার আদর্শ, কোন স্থলে সে মহাগুণে বঞ্চিত। যাঁহাদের জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, যাঁহারা শিক্ষা-পিপাসু তাঁহারা বিদেশ ভ্রমণে প্রচুর উপকার লাভ করেন। কিন্তু যাঁহারা স্বগৃহে মূর্খ বিশেষ, তাহাদের বিদেশ যাওয়া বহুরূপী সাজার মত। কেবল সং দেখিয়ে সকলকে আমোদিত করা মাত্র। "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে" যেমন আমাদের উপদেশ য়ুরোপেও ঠিক তাই।

নিজের দেশ, জনসমাজ বা তত্রত্য জ্ঞানে বীতরাগ হইয়া উন্নতির ইচ্ছায় বিদেশ গমন করা চঞ্চলতার লক্ষণ। বৃদ্ধ অভিভাবকেরা যে উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা অমূল্য। আমাদের জন্য তাঁহাদের ভীতির কারণ যথার্থ, তাঁহারা দূরদর্শী, ভুক্তভোগী, জ্ঞানী; আমরা বিদ্যার যতই বড়াই করি না কেন, তাঁহাদের বিদ্যার উপর কলম চালাইবার ক্ষমতা কাহারও হয় নাই। তাঁহাদের চরিত্র অপেক্ষা আমাদের চরিত্রের কতদূর উন্নতি হইয়াছে, তাহা প্রত্যহ লক্ষিত হইতেছে। দেশের কথা লিখিয়া হাস্যাস্পদ হইবার বাসনা নাই। কারণ সব কথা জানি না। বিলাতী ২।৪ কথা

লিখিবার বাসনা। আমার কথা অনেক বাদ দিয়া বিশ্বাস করিবেন। কারণ সব ঠিক বুঝিয়াছি, কিনা বলিতে পারি না। এবং যাহা বুঝিয়াছি তাহাও ঠিক বলিতে পারিব কি না, জানি না।

বিলাতে পুরাকালে যে আচার ব্যবহার ছিল, আমাদের দৈনিক আচার ব্যবহারের সহিত তাহার অনেক সাদৃশ্য আছে। খ্রীষ্টের চরিত্র আদর্শ করিয়া যাঁহারা চলিতেন, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে সচ্চরিত্র বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ধর্ম্মের কূট প্রশ্নের মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষমতা আমার হয় নাই। আমি সাধারণ সচ্চরিত্রতার যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা আমাদের দেশীয় উপদেশ হইতে পৃথক্ নহে। পোষাকে পরিচ্ছন্নতা আমাদের দেশীয়, পানাহারে পবিত্রতা আমাদের দেশীয়। সেবা, বিনয়, ত্যাগ, আচার, সভ্য অসভ্য সকল প্রকৃতিকে মধুর করে। কিন্তু প্রতিদিন সকল দেশেই তাহার বিপরীত দৃষ্টিগোচর হইতেছে। শিক্ষার ভাণ সভ্যতার ট্রেডমার্ক; সকলেই স্বার্থপর; ধর্ম্ম কাগজে কলমে, সময়ের অনটন। আমাদের দেশীয় বসন দেখিলে সাহেবেরা হাসেন, মেম সাহেবেরা মূর্চ্ছা যাইবার ভাণ করেন কিন্তু অদ্যাপি কোন চিত্রালয়ে কোন সুন্দর প্রতিকৃতি বিলাতী বসনে আচ্ছাদিত আমি দেখি নাই। সে কথা প্রকাশ করিলে মেম সাহেবেরা দুঃখিত হন, চিত্রকরদের ধিক্কার দিয়া শাস্তি ভোগ করেন। সকলে আমাদিগকে অপরিষ্কার বলিয়া তুচ্ছ করেন। কিন্তু ডাক্তারেরা বলেন যে, রোগীরা জুতা খুলিলে শ্রীচরণের দুর্গন্ধে গৃহে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু আমাদের দেশে সকলে দিন দুইবার স্নান করে, চারিবার গা ধোয়, সকালে বিকালে কাপড় ছাড়ে, অথচ বাড়ীর চেহারা দেখিলে স্বয়ং গৃহদেবতা গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন। এখানে অনেকে প্রত্যহ স্নান করে, অনেকে আবার আজীবনে ১২ বার মুখের উপর জল বুলান—আর ৫২ বার হাত প্রক্ষালন করা ভিন্ন অন্য প্রকারে পরিষ্কার থাকিতে চান না। পরিচ্ছন্নতা কমনীয়। বিলাতে পথের ভিখারীর সামান্য কুটীরও পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ভাবে সাজান। কখন কখন ঘরের মেজেটা কার্পেট মোড়া, কিন্তু খাটের নীচে জঙ্গল রাশীকৃত। মেম সাহেবেরা চীন দেশের মেয়েদের ঠাট্টা করে, তাহারা নাকি লোহার জুতা পরিয়া বাল্যাবধি পা ছোট করে। কিন্তু যদি কেহ সাহস করিয়া বলে, বিলাতী সভ্যতায় সরু বুট পরা সেই জন্য; অনেকের পায় ঘা হয়, অনেকে চলিতে পারে না; তাহা হইলে মেয়েদের কোপের পরিমাণ সহ্য করা আমাদের দুঃসাধ্য। প্রকাশ্যে অঙ্গের বর্ণনা করা অসভ্যতা।

আহার্য্য সামগ্রী প্রতি দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন মাংস খরচ কম হইলেও সকলে অতি মাত্রায় আমিষভোজী বলিয়া দন্তরোগের পরবশ। সকল সাহেব, মেম কৃত্রিম দন্ত বসাইয়া লয়েন। যত মাংস খরচ হয়, তাহার অধিকাংশ বিদেশ হইতে লবণে রক্ষিত হইয়া আসে, সে মাংস সস্তা, কিন্তু স্বাস্থ্যকর নয়। মাংস টাট্‌কা খায় না, কারণ টাটকা মাংস সুস্বাদ হয় না। ভাল মাংসের সের ১৸০। মাছের দামও তদ্রূপ। ফল, ফুল, শাক, সব্‌জী প্রচুর পরিমাণে বিদেশ হইতে আইসে। দেশে যা জন্ম, তাহা পর্য্যা-

গ্রামে নগর অপেক্ষা সস্তা নহে। উত্তম সামগ্রী লণ্ডনে প্রেরিত হয়। আজ কাল চাউল ও মুসুরীর ডাল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

পোষাক নানাবিধ। পুরুষের পোষাক বাঙ্গালীর পোষাকের মত কাছা আল্‌গা, কোঁচা লম্বা, হাত পা আঁটা নয়,মেড়ুয়াদের মত মালকোচা মারা। সকলেই সদা সর্ব্বদা শয়নকাল ভিন্ন প্রতি মুহূর্ত্তে বাড়ীর বাহির হইতে প্রস্তুত। চিত্রাদিতে পুরাতন পোষাকের যে ছাঁট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আজ কাল নাই। কোট আজানুলম্বিত চাই। মাথার উপর লম্বা ধামা না হইলে সভ্যতা হয় না। সচরাচর অন্য টুপীতে চলে। মেম সাহেবদের পোষাকেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। যুবতীরা বলেন, তাঁহাদের দিদিমারা কি মূর্খ ছিল। ওরূপ কুৎসিত পোষাক পরিধান করা অসাধ্য। কোন কোন পোষাকে ছাঁট আছে। কোন কোনটা বালিশের খোলের মত। আজ কাল সভ্য সমাজে মেয়েদের যে পোষাক ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা বর্ণনার অযোগ্য, কিন্তু রেশম মখমলের হইলে সভ্যতা বজায় থাকে। বিধবাদের পোষাক কাল, অন্য সকলের পোষাক সকল রঙ্গের চলে। বিলাতেও মেয়ে মহলে গহনার আদর আছে। কিন্তু দাম বড় বেশী। সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তথাপিও এক ছড়া চেইন হার,ঘড়ি, দু চারিটী আংটী ও একছড়া রূপার কোমরবন্ধ থাকা চাই। কেহ কেহ ইয়ারিং ব্যবহার করে। পোষাকে যত চক্‌চকে, তত সৌখীন। সে বিষয়ে ছোট বড়, বিধবা সধবা ভেদ নাই। আমাদের দেশের শাটিন, মসলিন বা রেশমের যে এখানে কত আদর বলিতে পারি না। স্বয়ং মহারাণী বড় বড় বিবাহাদিতে শাল উপহার দিয়া থাকেন। এখানে শাল বা মলিদার বড় আদর। ভেলভেটও ব্যবহৃত হয়। বড় বড় বাড়ীতে আমাদের দেশের বা তুর্কীস্থানের কার্পেট পাতা আছে। কিন্তু এ সকল জিনিস এত অধিক দামে বিক্রীত হয় যে, বড় লোক ভিন্ন লোক ক্রয় করিতে পারে না। অপরে দোকানে সে সকল জিনিসের সৌন্দর্য্য দেখিয়া হাহুতাশ করে। প্রদর্শনী, মিউজিয়ম ইত্যাদি স্থানে যাঁহারা আমাদের দেশের শিল্প বা স্বর্ণকারের কার্য্য দেখিয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যে বলেন, য়ুরোপীয় জিনিস কোন অংশে তাহাদের তুল্য নহে। পুরুষের মত breeches পরা, সার্ট গায়, তাহার উপর tie ও কোটপরা মেয়ে মহলে দিন দিন প্রসার পাইতেছে। এখনও অনেকের পছন্দ তত উন্নত হয় নাই, কিন্তু দেরীও নাই। টুপীটাও পুরুষের টুপী।

কিছু কাল পূর্ব্বে ছেলে মেয়েরা পিতামাতাকে দেবতার মত ভক্তি করিত। Sire ও governor বলিয়া সম্বোধন করিত। তখন পিতামাতা সন্তানবর্গের সঙ্গে পানাহার করিতেন, মধ্যে মধ্যে উপদেশ দিতেন তাঁহাদের মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিতে সন্তানেরা উৎসুক থাকিত, তাঁহারা উত্তম উত্তম পুস্তক পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইতেন, সুতরাং শিশুরা সচ্চরিত্র হইত। আজ কাল মধ্যবৃত্তি লোক এতই ব্যস্ত যে, ইচ্ছা সত্বেও ছেলেদের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে তাহারা পারে না। ছেলে মেয়েরা বাড়ীতে যৎসামান্য পড়ে। ৮।১০ বৎসর বয়সে পাঠশালে যায়। গরীবের ছেলেদের মাসহারা দিতে হয় না। সকলে ট্যাক্‌স দিয়া গরীবের শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলান করে।

স্কুলেই পাঠ দেওয়া ও শিক্ষা সম্পন্ন হয়। মাঝে মাঝে বাড়ী আসিতে পায়। শিক্ষকগণ ছাত্রদের সঙ্গে খেলা করেন। মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে তত্ত্বাবধান করেন। স্কুলেই ধর্ম্মশিক্ষা, চিত্রশিক্ষা, ইত্যাদি সকল প্রকার উপকারী শিক্ষা হয়। পরে বোর্ডিং স্কুলে যায়। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বাস করিতে পারে। ইচ্ছা করিলে শিক্ষকদের সঙ্গে বাস করিতে পারে। সেখানে শিক্ষা সমাপন হয়। দেশীয় বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। শিক্ষক ও ছাত্র পিতা-পুত্র রূপে কালযাপন করে। কিন্তু বোর্ডিং স্কুলে শিক্ষার খরচ অনেক বাৎসরিক খরচ ১০০।১৫০ পাউণ্ড। সকলের ভাগ্যে সে সুখ হয় না। সেই জন্য Public স্কুলে শিক্ষার পরেই ছেলে মেয়েরা বাড়ীতে শিক্ষা করে। সে শিক্ষা অনেক স্থলেই ভাল। যত উত্তম উত্তম শিক্ষাপ্রদ পুস্তক পাঠ করে। অনেক অনেক পুস্তক পড়ে মাত্র, অনুধাবন করে না। প্রশ্ন করিলে উত্তর দিতে পারে না। নভেল পড়া খুব প্রচলিত, তাহাতে শিক্ষার কিছুই নাই। Dickens বা Thackeray বা Shakespeare নভেলের মধ্যে গণ্য নহে। অনেকে এ সকল পুস্তকাদি পড়েন বটে, কিন্তু বিদ্যার জাহাজ কেহ নন্—কুটির পান্সী। আজ কাল ভাল বই প্রায় পাওয়া যায় না। অনেকে সে অভাব অনুভব করিতেছে। আজ কাল কার বই খুব চক্‌চকে, ছবি রাশীকৃত, কিন্তু কেবল প্রণয়-গল্প মাত্র। অনেক স্থলে ছেলে মেয়ের হাতে দিবার অনুপযুক্ত। এই সময় চাকরীর অন্বেষণ হয়। খরচ ভয়ানক। বাড়ী ভাড়া ভয়ানক। আমাদের উপযুক্ত একটী বাড়ী লণ্ডন হইতে ১৫ মাইলের মধ্যে মাসিক ভাড়া ৩০।৪০ পাউণ্ড বা পাঁচ ছয় শত টাকা। লণ্ডনের স্থান বিশেষে তিন হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন জলের ট্যাক্স, গ্যাসের ট্যাক্স, গরীবের স্কুলের ট্যাক্স, নিঃসম্বল লোকের ভরণ-পোষণের ট্যাক্স, সে সব যোগ দিলে প্রায়ই বাৎসরিক ট্যাক্স বাড়ী ভাড়ার এক তৃতীয়াংশ। খাই খরচ অনেক, সভ্য ভব্য পোষাকের দাম ২ পাউণ্ডের কমে হয় না। জুতা ১৫ শিলিং। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, গরীবের জিনিস অনেক সস্তায় পাওয়া যায়, সস্তা বা মহার্ঘ্য হউক, জিনিস গুলি সুশ্রী হওয়া চাই।

সচরাচর ট্রেন্ ভাড়া প্রতি মাইলে ৩য় শ্রেণীতে ১ আনা। ৩য় শ্রেণীর গাড়ীও গদি আঁটা। ছোট ছোট লাইনে পায়খানা নাই। রাজা রাম দেব ও গঙ্গারাম তেলী সহযাত্রী। এদেশে জাতি ভেদ নাই। পয়সা থাকিলে সকলে সমান সুখ পায়। গ্রীষ্মকালে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে যাতায়াত সচরাচর এক দিক্‌কার ভাড়ার অর্দ্ধেকেও চলে। পোষাক দেখিলে জমীদার বা চাকর ভেদ করা যায় না। পেটে অন্ন না থাকিলে কি হয়? পান খাওয়া চাই। "ঋণংকৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"

কুলি মজুরেরা কোন স্থলে ঘণ্টায় এক শিলিং উপার্জ্জন করে। দৈনিক আয় ২॥ শিলিংএর কম নয়। নকল নবিশেরা সপ্তাহে ১৫।২০ শিলিং আয় করে। বাড়ীতে ঘর খালি থাকিলে ভাড়া দেয়।

সচরাচর চাকরাণীদের মাহিনা বছরে ১৪।১৫ পাউণ্ড, তার সঙ্গে খাই খরচ পোষাক দিতে হয় না। চাকর রাখিতেও

ট্যাক্স লাগে। সেই সকল কারণে লোকে চাকর রাখিতে পারে না। বাড়ীর মেয়েরাই সকল কাজ করে। সময় সময় নিজেদের পোষাক তৈয়ারি করে। কটু কথা শুনিতে কেহ রাজি নয়। আজকাল বিদেশ হইতে চাকরাণীর আমদানী হইতেছে। এক চাকরাণীতেই সকল কাজ চলে। এক চাকরাণীও অতি বিরল। বাড়ীর কর্ত্তারা বাড়ী পরিষ্কার করিতে মেয়েদের সাহায্য করেন। বিলাতী চাকর বা চাকরাণী ইংরেজী ধরণে শিক্ষিত ও পরিষ্কার। কিন্তু আমাদের চাকরদের মত বাধ্য বা সেবক নয়। বিপদ আপদে নির্ভর করিতে পারা যায় না। বড় লোকেরা টাকা দিয়া ভাল চাকর পান না। নিঃস্বার্থ প্রভুপরায়ণ চাকর পাওয়া দুষ্কর। বিদেশী চাকরের উপর নির্ভর করিতে হয়। আমাদের দেশের শত শত লোক য়ুরোপের জাহাজে বাবুর্চ্চি বা নাবিকের কাজ করিতেছে। তাহারা ভাল খানসামা। জর্ম্মনীর মেয়েরা ভাল চাকরাণী।

ছেলে মেয়েরা বয়স বাড়িবার সঙ্গে ক্রমশঃ পিতা মাতা হইতে পৃথক হইতে আরম্ভ করে, ক্রমে এত পৃথক হয় যে, সম্পর্ক বুঝা যায় না। প্রধান প্রধান উৎসবে যথা বিবাহাদিতেও পিতা মাতার অনুমতি লইতে হয় না। সকলে স্বয়ংবর করেন। বিবাহের পর মনোমিলন না হইলে ঝগড়া কলহ করিয়া পৃথক্ হওয়া যায়। উভয় পক্ষ পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, কোন কোন স্থলে ২।৪ ঘণ্টার মধ্যে নূতন বিবাহ হইতে দেখা গিয়াছে। বিলাতে ভিক্ষা করা আইনবিরুদ্ধ। দরিদ্রদের জন্য কর্ম্মস্থল আছে। তথায় যৎসামান্য কাজ করিলেই অন্ন পাওয়া যায়। সাধারণ লোককে ট্যাক্স দিয়া এই সকল খরচ বহন করিতে হয়। অপর দিকে ধনীরা সদ্যজাত শিশুকে চাকর চাকরাণীদের হাতে সমর্পণ করেন। শিশুরা দাসদাসীদের সঙ্গে বাস করে। কচিৎ কখনও পিতা মাতাদের পদ্মপলাশলোচন আকর্ষণ করে। সপ্তাহে যদি একবার সুন্দর বেশভূষায় আচ্ছাদিত জনক জননীর বদনমণ্ডল অবলোকন করিবার অনুমতি পায়, কৃতার্থ হয়। অনেক স্থলে শিশুরা প্রকৃত পিতা মাতার পরিচয় পায় না। লেখা পড়াও দাস দাসীর কাছে, না হয় মাষ্টারের কাছে হয়; উপযুক্ত বয়সে স্কুলে প্রেরিত হয়। যৌবনে বিদেশে শিক্ষার্থ আদিষ্ট হয়। সুশ্রী বিলাতে প্রবেশ করে নাই, এ কথা বলিলে মেম সাহেবদের রাগ দুর্ব্বাসা মুনির রাগ অপেক্ষাও বেশী হয়। কিন্তু আমি কখনও কোন স্থলে ছবিতে বা পুস্তকে শ্রীর জন্য বিলাতী মেয়েদিগকে তুলিত হইতে দেখি নাই। সকল স্থলেই বিদেশী, অধিকাংশ স্থলে আসিয়ার মেয়েদের স্বদেশী পোষাকে রঞ্জিত দেখি। আজকাল ছেলেমেয়েরা যদি পিতামাতাদের Sir বা mother বলে, তাঁহারা ধন্য। এখানকার সুপুত্রের সদ্ব্যবহারে আমাদের মূর্চ্ছা হয়। পিতামাতার সঙ্গে সুরাপান বা তাম্রকূট সেবন করা দৈনিক ব্যাপার। অনেকে সুরাপান করে না, কিন্তু কাহারও মঙ্গল কামনায় সুরাপান করা অনেক স্থলে দোষের নয়। পিতামাতাদের হাস্যাস্পদ করা, তাঁহাদের প্রতিবাদ করা বা তাঁহাদের সহিত তর্ক করা দৈনিক ব্যাপার। বিলাতে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিবার জন্য অসংখ্য কাগজ বা মাসিক পত্র আছে। সুন্দর সুন্দর বিষয়ের আলোচনা শিক্ষিত লোকে করিয়া

থাকেন। উত্তম চিত্রে সে সকল কাগজ রঞ্জিত। ছোট বড় সকলে পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন। অল্প দামের কোন কোন কাগজে রসিকতার ছটা চমৎকার। সে সকল কাগজ শিশুদের প্রিয়; কাটতি অসংখ্য। কোন কোন কাগজের কাটতি লক্ষাধিক। মধ্যে মধ্যে যে সকল কুৎসিত রসিকতা সে সকল কাগজে দেখা যায়, তাহা সমাজের অযোগ্য। প্রতিদিন পরিবারের সকলে সে সকল রসিকতা আবৃত্তি করিয়া কালক্ষেপণ করে এবং মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণাদিতেও বন্ধুবান্ধব, পিতা মাতা, শিশু সকলে উৎসাহের সহিত সেরূপ রসিকতাতে যোগ দিয়া থাকেন। রসিকতার নমুনা যথা—জনৈক ভদ্রলোক মাংসের দোকানে গিয়া একটী বালককে বলিলেন "ওহে আমার একটী ভেড়া চাই।" বালক—"যে আজ্ঞে, বাবাকে পাঠিয়ে দেব, আপনি যান।" আর একজন আস্তাবলে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার গাধাটা কোথায়: শিশু উত্তর দিল "আপনি বসুন, বাবা এলেন বলে"। লোকে গাধার গাড়ীতে চড়ে। আর একটী মা ছেলেকে বুঝাইতেছেন—"দেখ যাদু, ঐ ভদ্রলোকটী আমার কাছে রোজ আসেন, তিনি আমার প্রেমে ধরা পড়েছেন; আমি তাঁকে বিয়ে ক'রব। তুমি তাঁকে বাবা ব'লে ডেক ইত্যাদি।

অনেক স্থলে বড় লোকের সমাজের মেয়েরা চুরুট পান করে। বিলাতে বদ্‌হজমী ও সর্দ্দি ইত্যাদি প্রধান রোগে—অনেকে ক্ষয়কাশে বা অজীর্ণ রোগে কষ্ট পায়। প্রত্যেক সহরে জনসমাজ দুই রাজনৈতিক দলে বিভক্ত। অনেক স্থলে স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা বেশী উৎসাহী। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক সহরে আরও অনেক সভা-সমিতি ইত্যাদি আছে। তাহাদের উদ্দেশ্যও মহৎ। মহারাণীও রাজকুমারগণ সে সকল কাজে উৎসাহের সহিত যোগ দেন। পুস্তকাগার সচরাচর সাধারণের ব্যবহারের জন্য স্থাপিত। পৃথিবীতে প্রধান প্রধান পুস্তকাগারে যত পুস্তক আছে, তাহার সংখ্যা এই—

British museum—2,000,000, volumes. Parish museum—2,500,000; St petersburg Imperial library—1,000,000; Munich library—1,000,000: Library of Congress washington—900,00; Berlin library—800,000; Public library Boston—600,000 volumes.

থিয়েটার ও সঙ্গীত সমাজ অসংখ্য। থিয়েটার অনেক স্থলে শিক্ষাপ্রদ। থিয়েটারের নায়িকাগণ অনেকেই সদ্বংশজাত। সঙ্গীত সমাজ প্রায়ই কুৎসিত—ভদ্র লোকের অযোগ্য। সকল স্থলেই প্রেমের গান বা চর্চ্চা হয়। মদের স্রোত, চুরুটের ফোয়ারা ও হাসির রোল ত ধর্ত্তব্য নয়। সকলে ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে না, এক একটী বেশ ভালও আছে। উত্তম উত্তম গায়কগায়িকারা দেশ প্রসিদ্ধ; বিদেশপ্রসিদ্ধ ম্যাডাম প্যাটি একজন প্রসিদ্ধ গায়িকা। তিনি স্পেন দেশীয় মহিলা, কিন্তু ইংরেজী আচার ব্যবহার। তাঁহার জীবনে ২৪বার এক রাত্রে ২৪০০ টাকা রোজগার করিয়াছেন। সৎস্বভাব অর্থে লেখাপড়া জানা চাই, অপরকে সম্মান করা চাই। পরস্পরকে বিপদে সাহায্য করা, অভিবাদন করা, ধন্যবাদ দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। মেয়েদের তোষামোদ করা সভ্যতা। কোন স্থানে একটী সুশ্রী যুবতী আসিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে মৌমাছির মত সকল পুরুষে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে। তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সকলে টক্কর দেয়,

অপর সকলে ত্যক্ত আমের আটীর মত পড়িয়া থাকে। কেহ কেহ বা পাড়ায় কুকুরের মত প্রত্যাশী। সুরূপ অর্থে মেয়েদের পক্ষে লম্বা হওয়া চাই, নাকটী উঁচু চাই, তাহার সঙ্গে যদি নম্রতা (যথার্থ বা ভাণ) থাকে দাম বড় বেশী। সেই সকল মেম সাহেবদের সেবা করার জন্য সকলে লালায়িত। পূর্ব্ব জন্মকৃত ধর্ম্মের বলে কেহ কেহ মেমসাহেবের রুমাল কুড়াইতে পারে, গ্রীষ্মে বাতাস করিতে পারে, তৃষ্ণায় গেলাশে মদ ঢালিতে পারে।

পূর্ব্বোক্তরূপে স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান দেখাইতে যাঁহারা প্রস্তুত, তাঁহারাই বিনয় নামক তকমাধারী পুরুষ। সেই টিকিটের খাতিরে তাঁহারা party ইত্যাদিতে নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। সেই সকল মেম সাহেবদের সঙ্গে নাচিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্য; বড় দুর্লভ। দেশে বসন্তের প্রত্যুষে দোয়েলের গানের মত কোন সমাজে যদি সুশ্রী সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত মহিলাগণ দুটী মৃদু কথা বলেন বা দৈবাৎ সঙ্গীত করেন, ভদ্র লোকদের হৃদয় শীতল হয়, সকলে পবিত্র হয়। তাঁহাদের অধরের মৃদুহাসি সকলের নিকট অন্ধকার নিশিতে চপলার মত, নাবিকের পক্ষে তরঙ্গায়িত সাগরে আলোক মঞ্চের মত। সে সৌভাগ্য দুর্লভ। খবরের কাগজে দেখা যায়, অমুক রমণী কাল কয়েক জনকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। তিনি আদর্শ। সে দিন খবরের কাগজে দেখিলাম, বাবু নগেন নাগ আগ্রাতে (wereless telegraply) বিনা তারে বৈদ্যুতিক সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে ঘটনা আমাদের দেশে নূতনী হইতে পারে। আমরা বিনাতারে সংবাদ প্রেরণ নিত্য দেখিতে পাই। বিলাতের ধর্ম্মভাবও পূর্ব্ববৎ বলবতী নহে। স্বাধীনতা ও উন্নতি যমজ ভাই। শিক্ষা উন্নতির প্রসূতী, মহত্ত্বের লক্ষণ, কিন্তু সকল বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকা চাই। দুঃখের বিষয় বিনয় নামে একটী জিনিস যে বিলাতে আগে ছিল, কেবল কবিদিগের মহিমায় আজ তাহা জগতে প্রসিদ্ধ। বিলাত সভ্য বলিয়া ঘোষিত। অনেকে শিক্ষিত, কিন্তু লোকে শিক্ষালাভ করিয়া কি অশিক্ষিত! ইহারা কি বর্ব্বর অপেক্ষা বিনীত বা নম্র হইয়াছে? ভূতপ্রস্থ অসভ্য জগতে যত বিনয় দেখা যায়, শিক্ষিত নামধারী লোকসমাজে তাহা কচিৎ দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকগণ আজ জগতের সর্ব্বত্র। অসভ্য, সভ্য, বর্ব্বর, নরমাংসাষী প্রভৃতি সকলেই তাঁহাদের গুণে মুগ্ধ। কিন্তু স্বয়ং বিলাতে ব্যাপার দিন দিন ঘনীভূত হইতেছে। সকলেই উচ্ছৃঙ্খল। আবাল বৃদ্ধ সকলে বয়স জ্ঞান তুচ্ছ করিয়া ছোট বড় সকল বিষয়ে তর্ক করিতেছে। মতদ্বন্দ্ব হইতে ক্রমে গৃহবিচ্ছেদ, ঝগড়া কলহ করিতেছে, সে সকল কি শিক্ষার লক্ষণ! তর্ক করা চাই। অনেক সময় তর্কের বিষয় কিছুই নাই। স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইয়া শিক্ষার ভাণ করিয়া খ্রীষ্টের এক মন্দির দুই ভাগে বিভক্ত হইল, ক্রমে দুই ভাগ হইতে ১০।১২ ভাগে বিভক্ত। বিভিন্ন মতাবলম্বিগণ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। নগণ্য বালক পর্য্যন্ত শুভ্র বেশ ধর্ম্মবীরগণের সহিত তর্ক করিতে প্রবৃত্ত। দিন দিন গৃহ বিচ্ছেদ বাড়িতেছে।

কেবল টুপী তুলিলে ও গুডমর্ণিং বলিলেই কি ভক্তি দেখান হয়? আমার ভয় হয় যে, লোকে প্রকাশ্যে সর্ব্বদা যেরূপে

মত লইয়া তর্ক করে, পরস্পরকে তাচ্ছিল্য করে, যদি তাহার সংশোধন না হয়, এজাতির পতনের বেশী দেরী নাই। অপরকে ঠাট্টা করিলে কি হইবে, নিজের চরিত্র সংশোধন করা চাই। আমাদের দেশের বেদপাঠের মত এখানেও আচার্য্যগণ সুর করিয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন। সময় সময় দুই ঘণ্টা-ব্যাপী উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু চার্চ্চের বাহিরে টুপী মাথায় দিলেই লোকের কান্ধে ভূত চড়ে।

প্রতি বৎসর পৃথিবীর বড় বড় রাজ্যে যত পুস্তক ছাপা হয়, তাহার তালিকা—

Germany—24000 ; France—13000 ; Italy—9,5000 ; Great Britain—7,500 ; United states—5,300; Netherlands—2,500 ;

কেবল পুস্তক ছাপাইলে উন্নতি হয় না। গ্রামে গ্রামে বৎসর বৎসর চার্চ্চের সংখ্যা বাড়িতেছে, কোন কোন চার্চ্চ গগনভেদী, স্বয়ং (St Paul) ৪•৪ ফিট উঁচু। যত-পুস্তক প্রতিবৎসর বিলাতে ছাপা হয়, তাহার অধিকাংশ অপাঠ্য প্রেমের লহরী। বিলা-তের বাৎসরিক নভেল সংখ্যা অপর দেশের নভেল অপেক্ষা ২, ৪৩৪, খানি অধিক।

সে সকল নভেলে উপকারী বিষয় অতি সামান্যই থাকে। লোকচরিত্র সে সকল পুস্তক পাঠে বেশ বুঝা যায়। কিন্তু সমা-জের উন্নতি হয় না। জর্ম্মানীতে সাহিত্য বিষয়ক পুস্তক প্রতিবৎসর ৫,৭৪২ খানি অন্যদেশ অপেক্ষা বেশী ছাপা হয়: বিজ্ঞা-নাদিতে ২,৯৩৪ খানি, পত্রাদিতে ২,৪৫৩ খানি এবং ভ্রমণ ইত্যাদিতে ১,১৩৯ খানি পুস্তক ইংরেজের দেশ অপেক্ষা অধিক সংখ্যা প্রতিবৎসর ছাপা হয়।

ফরাসীজাতি ইতিহাস-প্রিয়। তাহারা ইতিহাসে, ১,১৬৪ খানি পুস্তক প্রত্যেক বৎসর অপর দেশ হইতে অধিক সংখ্যায় ছাপায়। পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণের যে সব উৎ-সব করিত, আজকাল তাহার উল্লেখ পঞ্জিকা ভিন্ন অন্য স্থলে পাওয়া দুষ্কর। বড় দিন বা গুডফ্রাইডের নাম মাত্র বজায় আছে। বৃদ্ধ বৃদ্ধারা অনুতাপ করেন। তাঁহারা বলেন, যৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত তাঁহারা বন্ধু বান্ধব লইয়া সকল উৎসব আন্তরিক ভক্তির সহিত বজায় রাখিতেন। আজকাল কিছু দেখা যায় না। কোন কোন উৎসব আমাদের দেশের বড় লোকের বাড়ীর দুর্গোৎসবের মত। উচ্ছিষ্ট কলাপাতাই তাহার লক্ষণ। "মিষ্টান্ন মিতরে জনা"।

গ্রীষ্মকাল বিলাতে বড় সুখের। গ্রীষ্মের আধিক্য প্রায়ই অনুভব করা যায় না। ১৩,১৪ ঘণ্টাব্যাপী সূর্য্যরশ্মি পৃথিবী উজ্জ্বল করে। অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা সপরিবারে ভ্রমণে বাহির হন। দলে দলে যুবকযুবতীরা পার্কে বা পল্লিগ্রামে আসেন। সাইকেল অসংখ্য। অল্পখরচে ট্রেণে বিভিন্ন স্থানে দু এক দিনের জন্য যাওয়া চলে। সমুদ্রতটে নির্ম্মল বায়ু সেবন করা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু অপরা-পর সময় জল বায়ু অনিশ্চিত। বসন্তে আকাশ কখন কখন পরিষ্কার থাকে। কিন্তু প্রায়ই বৃষ্টি ও ঝড় হয়। কোন দিন ঠাণ্ডা লাগে, কোন দিন বা গরম লাগে। হেমন্ত কালও সেইরূপ। হেমন্ত ও শীত এই দুই ঋতু লোকেরা সতর্কে কাটায়। দিনের উত্তাপ ঠিক করা যায় না; সর্ব্বদা উত্তাপ পরিবর্ত্তিত হওয়াতে লোকে প্রায়ই জ্বর বা ইনফ্লুয়েঞ্জায় কষ্ট পায়। শীতকালে লোকে ভেকের মত সময় সময় মৃতপ্রায়

অবস্থায় বাড়ীতে বসিয়া থাকে। কর্ম্মজীবী লোকে বাহির হয়। সারাদিনরাত ঝড় বৃষ্টি লাগিয়া রহিয়াছে। মাঝে মাঝে শীতের প্রকোপ ভয়ানক হয়। পানীয় দুধ ও জল জমিয়া যায়; গ্যাসের পাইপ ফাটিয়া যায়। মাঝে মাঝে তুষারে পৃথিবী শ্বেতবর্ণ ধারণ করে।

তুষারপাতের সময় আকাশ নীরব, নিশ্চল, গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করে। সকল দিক অন্ধকার হয়। মুহূর্ত্তে তুষারপাত আরম্ভ হয়। তুষারপাত আমাদের দেশের শিমুল তুলা বৃষ্টির মত। বাড়ীর ছাদ, কর্ণিশ, গাছের ডাল পালা, পাতা প্রভৃতি সকল জিনিস তুষারে আবৃত হয়। ভূমি স্নিগ্ধ, শান্ত, প্রশস্ত সাগরের আকার ধারণ করে। ভূমিতে মাঝে মাঝে সাগরের লহরীর মত রেখা দৃষ্টিগোচর হয়। কলমের গাছ বা চারা গাছ সকল তুষারাবৃত হইলে চিনির মঠের আকার ধারণ করে। তুষার অনেক পরিমাণে ভূমি উৎকর্ষণে সহায় হয়; জমি উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয়। বিলাতে প্রচুর পরিমাণে শস্য বা শাক সব্জীর চাষ হয়। কিন্তু কৃষকেরা আমাদের দেশের কৃষক অপেক্ষা সুখী। ভূমিতে জল সেচন করিতে হয় না। বৃষ্টি বা হিমে সে অভাব পূর্ণ করে। তাহাদের সুখ দেখিলে আমাদের মনে হয়, যদি আমাদের কৃষকেরা সে সুখ পাইত, প্রতিবৎসর দুর্ভিক্ষে লোক মারা পড়িত না। শীতকালে ছেলেরা খেলিয়া নিজেদের প্রফুল্ল করে। প্রতিদিন বাড়ীতে বসিয়া থাকা চলে না। কখন কখন দিনের বেলা বাতি জ্বালিতে হয়। শীতের আধিক্যে জলাশয় জমিয়া গেলে স্ত্রীপুরুষ skating করিয়া পরম আনন্দ ভোগ করে। কিন্তু গত কয়েক বৎসর সে সুবিধা হয় নাই। শীতকালে অনেক ফল, মূল কৃত্রিম রূপে তাপ দিয়া পাকায়। সর্ব্ব দেশের প্রচলিত প্রথার মত বিলাতের লোক মিউসিয়ম ইত্যাদি স্থানে সচরাচর যায় না। বিদেশীরাই সে সকল স্থানের অনুরাগী। শিক্ষা-পিপাসুরা সে স্থানে অধ্যয়ন করে, কিন্তু সাধারণে যায় না। আমাদের বিশ্বাস, 'ফুরিয়া গেলে আর পাবিনা।' কিন্তু অধিবাসীরা সে বিষয়ে আমাদের দেশের তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার মত। কিন্তু অপর স্থানে থিয়েটার বা concert বা crystal palace এ বা কোন বক্তৃতা ইত্যাদিতে এত ভিড় হয় যে, সকলের স্থান হয় না। কোন প্রসিদ্ধ গান বা অভিনয় শুনিতে বা দেখিতে এত ভিড় হইবার সম্ভাবনা যে, ৪।৫ মাস পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণকে সেই বিশেষ বিষয়ের তারিখ জানান হয় এবং পর মুহূর্ত্ত হইতে পঙ্গপালের মত সকলে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য দৌড়ায়। কাগজের সংখ্যা ত কম নয়। প্রত্যেক সহরে, গ্রামে ২।৪ খানা কাগজ আছে। কাগজ সকল বিষয়ের বার্ত্তাবহ। দৈনিক সংবাদ, রাজনীতি আলোচনা, অপরাপর পাঠ্য বিষয়, সর্ব্বাধিকাংশে বিজ্ঞাপন। দৈনিক সংবাদ পত্রে জিনিসের দর জানা যায়। অনেক স্থলে সে দরের অধিক দরে জিনিস বিক্রয় করিবার অনুমতি নাই। পুলিশ পাহারা দিতেছে, খাদ্য দ্রব্য পরীক্ষা করিতেছে।

এদেশের ঘোড়া, মেষ, গাড়ী ও বলদ অতি সুস্থকায় ও বৃহদাকার। ঘোড়াই দেশের সকল কাজ করে। বাকী কাজ কলে চলে।

পৃথিবীতে জীবিত জন্তুর সংখ্যা এই—

ঘোড়া ১৬, ৫৩৭, ৫২৪

খচ্চর ২,০৮৬, ০২৭

গাভী ইত্যাদি—৪৩,৯০২, ৪১৪,

মেষ ৪১, ৮৮৩, ০৬৫।

গত বৎসর যে ঘোড়া ডার্বি ঘোড়া দৌড়ে বাজী জিতিয়াছিল,সে দিন সেটী ৩৬ হাজার পাউণ্ডে অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। ইংলণ্ডের অশ্ব-সংখ্যা ১৫১৭১৬০, গোমেষাদি—৬৬২২৩৬৪+২৬৭৪৩১৯৪; শূকর—২৪৫১৫৯৫।

বিলাতে অনেক শস্য জন্মে না। এবং বিলাতে উৎপন্ন অনেক শস্য ও ফল মূল প্রভৃতি সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য পরিমাণে অনেক কম। সেই জন্য প্রতিদিন বিদেশ হইতে জাহাজে নানাপ্রকার শস্য, উদ্ভিদ ফল, ফুল আমদানী করিতে হয়। নিম্নে সামান্য একটী তালিকা দেওয়া গেল।

শস্য	অপর সাধারণ রাজ্য হইতে আমদানী	ইংলণ্ডের অধিনিবেশ হইতে আমদানী।
১৮৯৮।গম—	৫০৪৬৫৮২০ হন্দর	১৭৭৬২১০০
মটর বড়বটী ইত্যাদি	৪১৪১৫৭০৮	৪১৪৯৫০৪
মাখন ইত্যাদি—	৩৭১৪০২৭	৩৯৫৭৪১
পণির—	৪৭২৫৫৫	১৪৭৭০৬২
ডিম—	১৬৪০৬২৬৫৬০ সংখ্যা;	৯০৩২৫৫৬০ সংখ্যা
মাংস	৭০৩০২৭১	৬৫৩২৫০
	২৪৫৪৮৬২	৬৪৫৯৫৯
	১৩৭৯৭১৮হন্দর	১৯৩৪২৪৩হন্দর
	৫৪৭৪৭২	১০১৩০
	১১৬৬২১৯	৩০৪৬৩৩

উপরোক্ত পরিমাণ মাংসের কতক প্রায় টাট্‌কা মাংস; কতক লবণে সিক্ত থাকে। দেশের কোন মাংস ৭।৮ বা তদধিক দিন না মজিলে রান্না করে না।

শস্য	অপর স্বাধীনরাজ্য হইতে আমদানা	ইংলণ্ডের অধিনিবেশ হইতে আমদানী।
১৮৯৮। আপেল (কাঁচা)	১৬১০৭৭০ টুকরী	১৮৪৮১৪৬ টুকরী।
পেঁয়াজ (কাঁচা)	৫৯২৪১৯৯	৭৮৩১৬
আলু	৫৪৯৯৩৫২ হন্দর	১২৫২২৯৬
মাছ	২৪৭৫১৮৯	৫০৫৯২৪

ইত্যাদি।

বিলাতে যে সকল খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়, তন্মধ্যে আটা ও আলু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দিন খরচ চালাইতে পারে। কিন্তু কোন জিনিসের পুঁজি ৩ মাসের অধিক ঠিকিবে না। সেই জন্য সকলে বিদেশের নিকট ঋণী। আজ যদি যুদ্ধ হেতু য়ুরোপের ২।৩ স্বাধীন রাজ্য ইংলণ্ড আক্রমণ করে বা কোন কারণ বশতঃ ইংলণ্ডে খাদ্য দ্রব্য চালান না করে, তাহা তাহা হইলে অচিরে সকলকে অন্ন কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। দেশের আয়তন ১২১১১৫ বর্গ মাইল। জন সংখ্যা ১৮৯৯ খৃঃ ৪০৫৫৯৯৫৪; ১৮৯৮ সালে জন্ম ১১৫৯১৯২; মৃত্যু ৭১২৮৯৬; বিবাহ ৩০৯৪৯২ জনের। দেশের অর্দ্ধেকেরও অধিক জমিতে চাষ হয়। আড়াই কোটী বিঘা জমিতে শস্য উৎপন্ন হয়। এক কোটী পঁচিশ লক্ষ বিঘায় শাক সবজী ও তরকারী জন্মে। সত্তর লক্ষ বিঘায় ফল বাগান। বাকী জমিতে গরু বাছুরের জন্য ঘাস রক্ষা করিতে হয়। কতক জমি জঙ্গলে আবৃত। তথায় হরিণ, শৃগাল প্রভৃতি জন্তু পাওয়া যায়। আমেরিকাবাসীদের অনেকে সে সকল জঙ্গলের অধিকারী। প্রতি বৎসর

শীতকালে জমীদারগণ,বন্ধু বান্ধব চাকর নফর সঙ্গে লইয়া এই সকল জঙ্গলে শীকার করিতে আইসেন। আমাদের গৌরবস্থল জগদ্বিখ্যাত ইংলণ্ডের নয়নতারা কুমার রণজিৎ সিংহজীও, কিছু জমি ক্রয় করিয়াছেন। শ্রীসুকুমারচন্দ্র রায়।

বেঙ্গল্ গেজেট্।

(সর্ব্বপ্রথম বঙ্গীয়-সমাচার-পত্রিকা)।

যে সমস্ত প্রতীচ্য পণ্ডিত-নিচয়, অতুলনীয় অধ্যবসায়-সহকারে ব্যবসায়-বাণিজ্যাদি লাভ-কর, চমৎকার-কারক ব্যাপার কিংবা আশ্চর্য্য-কার্য্যাদি-প্রদর্শনার্থে—কি, বিদ্যা-বিনিময়-সূত্রে বহু-দিবসাবধি ভারতবর্ষে সমুপস্থিত থাকিয়া,বঙ্গদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন—সেই সমুদায় পাশ্চাত্য-বিবুধ-মণ্ডলীর ঘোরতর, দৃঢ় মূল সংস্কার—ইংরাজজাতীয় সুধী সমূহ কর্ত্তৃকই, ভারতে য়ুরোপীয় সভ্যতার তাবৎ তত্ত্বই—বিদ্যা ও জ্ঞান, বোধ-শক্তি ও বাণিজ্য-কার্য্যাদি—অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বিষয় গুলি,—সুচারু নিয়মাবলীর সুসংযত, অচঞ্চল শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিল। কেবলই যে, পূর্ব্বতন সাহেবগণ, উক্ত মতে আস্থাবান্ ছিলেন, তাহা নহে। অধুনাতন প্রায় সকল সাহেব, ঐ সব অসম্ভব অভিমতিতে অতি-মাত্র প্রীতিমান্ ও আগ্রহবান্। এইখানেই যদি ঐ রহস্য-মূলক অভিনয়ের জবনিকা-পতন হইত, তাহা হইলেও, তাহাই কতকটা প্রবোধের বিষয় হইত না কি? সাহেব-সমূহের অভিপ্রায়ে সায় দেওয়ায়,যে বাঙ্গালী-গুলি, অত্যন্তই অভ্যস্ত,—তাঁহারাই, নির্ব্বিবাদে—অবিসংবাদে—উক্ত অভিমতের অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়াছেন। এমন কি, এখনও তাঁহারা, তত্তাবৎ ভ্রান্ত মতের অনুগমনের একান্ত পক্ষপাতী! প্রথমোক্ত বিষয় অপেক্ষা শেষোক্ত বিষয়, নিতান্তই মর্ম্মান্তিক নয় কি?

তাদৃশ অনুকরণে ভারতীয় আমরাও, বুঝি বা কতই উপকৃত! সুতরাং আমরা, সর্ব্ববিষয়েই যেন, না জানি,সম্যক্-প্রকারে কতই সমুন্নত! সকল য়ুরোপীয়ই যে, এই মতের প্রবর্ত্তক, সে কথার অবতারণা করা, এখানে আমাদের অভিপ্রায় নয়। য়ুরোপীয়—বিশেষতঃ,ইংলণ্ডীয় কতিপয় রাজপুরুষই, উল্লিখিত-মতাশ্রয়ী। কিন্তু এটী, একটী নিতান্ত ভ্রান্তিময় মত। যাঁহারা বিদেশীয়, বিজাতীয় বা বিধর্ম্মীয়—তাঁহাদের ভ্রম হওয়া, বরং সহজ কাজ (১)। তাহাদের উক্ত মত, কেন অভ্রান্ত নয়—সেই বিষয়টী,পশ্চাৎ যথা-স্থানে আমাদের কর্ত্তৃক অভিব্যক্ত হইবে।

এই কথাটী, আপাততঃ শুনিতে ও বলিতে, যেমন কতই সুন্দর প্রতিভাত হয়! কিন্তু সর্ব্ব-দেশীয় ও সর্ব্ব-কালীয় পুরাবৃত্ত, প্রাচীন ইতিবৃত্ত, প্রকৃত তথ্য, প্রত্নতত্ত্ব, যাঁহারা যত অবগত—তাঁহারা, কখনও ঐ আপাত-প্রতীত, মনোহর, ব্যাপার-বিষয়-নিচয়ে সায় দিতে কিছুতে সম্মত হইবেন না। যে কারণে, এই বৃত্তান্ত, এক্ষণে এখানে অবতারিত হইতেছে, তন্ন তন্ন ভাবে তাহার

(১) কিন্তু এতদ্দেশে জাত ব্যক্তি সমস্ত, বৈদেশিকগণের পথে পদার্পণ করিয়া, ভ্রান্তি-বিজড়িত হইয়া পড়েন, তাহা অপেক্ষা, কষ্টকর কাজ, আর কি আছে?

মূলানুসন্ধান করিতে গেলেই, প্রকৃত তত্ত্ব, আপনা হইতেই সুব্যক্ত হইয়া পড়িবে।

এই উপলক্ষ্যে এই প্রবন্ধের আনুষঙ্গিক আরও একটী বিষয়, এই খানেই বলিয়া লইতে চাহিতেছি।

য়ুরোপীয় পণ্ডিত-কুল, চিরকালই আপনাদিগকে সচরাচর সর্ব্ব-ব্যাপারের অভিজ্ঞান নিপুণ, কার্য্যকুশল ও প্রাজ্ঞ জ্ঞান করিয়া থাকেন। মানুষ, আপনাকে আপনি সর্ব্ব-ব্যাপার-বেত্তা, জ্ঞানবান্ জন জ্ঞান করিবেন,—এটী, কথনই বিচিত্র বিষয় নয়। মানব, স্বভাবতঃই স্বীয় অভাব-অনুভবে একান্তই অন্ধ। এটীই, মানব-স্বভাব। ইহাই, মানব-চরিত্রের মর্ম্ম। এইটী, মানবের একটী প্রাকৃতিক ধর্ম্ম।

আমরা অকপট অন্তরে অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত আছি—আজ আমাদের যে, এতাদৃশ অভ্যুদয়, ইংরাজ-রাজ, তাহার মূলাধার। বিজাতীয়-প্রথা-ক্রমে স্ত্রীশিক্ষা-ব্যবস্থা, ইংরাজি-বিদ্যা ধন বিধান, বিধবা-বিবাহ বিধি প্রবর্ত্তনেতে, ইংরাজের যুক্তিযুক্ত স্তুতি গীতি ইত্যাদির অসীম মহিমাই, সুব্যক্ত করিতেছে। এখানে অবনত মস্তকে আমাদিগকে ইংরাজ মাহাত্ম্য, স্বীকার করিতেই হইবে। আর, ইংরাজি সমাচার পত্র-প্রচারেও ইংরাজ-রাজের জয়-জয়কার। কিন্তু বাঙ্গালা-সংবাদ-পত্রিকার প্রচারে বাঙ্গালীই, কেবল অগ্রসর। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙ্গালী-সকলই, ঐ ভ্রান্ত মতে আস্থাবান্। তাঁহাদের ভ্রান্ত দৃষ্টান্তে অনেকেই, অত্যন্ত ভ্রমান্ধ। সুতরাং এ সব, সর্ব্বথা অতৃপ্তিকর।

সুতরাং সুস্পষ্টই সুব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে—"শ্রীরামপুরের" পাদ-রিপুঙ্গব (২) পুঙ্গের একান্ত যত্ন ছিল—তাঁহাদের সম্পাদিত ও পরিচালিত "সমাচার-দর্পণ"-পত্রই, বঙ্গদেশ প্রচারিত 'বঙ্গীয় প্রথম সমাচার-পত্রিকা'। কিন্তু ঐ কথার অন্যথাভাবপ্রদর্শন করিতে পারিলেই, "দর্পণের" প্রথমত্ব, অব্যাহত থাকিবে না। উহার প্রথমত্ব প্রণাশের সঙ্গেই, অন্যান্য বিষয়ে উহার প্রাধান্যের ব্যতিক্রমও, কেমন মনোরম,—পাঠক। দেখিতে চাহেন—না, শুনিতে চাহেন? সুতরাং সর্ব্বাগ্রেই সত্যাপালপ-কারকদিগের (স্বজাতীয় সুধী-সমূহের) বচন-পরম্পরায় উক্ত পাদবি-নিকরের বাক্যগুলি, অনৈক্য ও অসামঞ্জস্য দোষে দুষ্ট কি না, তৎ প্রদর্শনোদ্দেশে বদ্ধ-পরিকর হইতেছি। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বহু আড়ম্বর বর্জ্জন পূর্ব্বক আমরা, প্রমাণ-প্রয়োগে বলীয়ান্ হইতেছি। "বেঙ্গল্ গেজেট্" যে, বয়োজ্যেষ্ঠ—তাহাই আমাদিগকে বলিতে হইতেছে। "সমাচার দর্পণ" "বেঙ্গল্ গেজেটের" যথেষ্টই বয়ঃকনিষ্ঠ। প্রথমের বয়ঃক্রম, দ্বিতীয় অপেক্ষা কম নয়—বরং খুবই অধিক।

বাঙ্গাল-সমাচার-পত্রিকার প্রাথম্য-নির্ণয়-বিষয়ে দুইটী মত, প্রচলিত ছিল। অধিক কি, অধুনাপি তদ্রূপ মতামতই, বিদ্যমান থাকিতে দৃষ্ট হইতেছে। বাম দিকে ভ্রান্ত মত, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে, দক্ষিণ দিকে বিশুদ্ধ মতের প্রসঙ্গ, নির্দ্দেশিত হইতেছে। পাঠক-বর্গের সুবিধার নিমিত্ত পার্শ্বাপার্শ্বি ভাবে উভয় মতের বিষয়, এইরূপেই আলোচিত হওয়া সুবিধাজনক।

(২) "প্রকৃতি"-নাম্নী সাপ্তাহিক পত্রিকায় "পাদরিপুঙ্গব" শব্দ, এই প্রবন্ধ লেখক কর্তৃকই, বঙ্গসাহিত্যে প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল। তদবধি "হিতবাদী" প্রভৃতি পত্রে উহার প্রকৃষ্ট প্রচার চলিতেছে।

যে যে পত্রিকা, যে যে পুস্তক, যে যে ব্যক্তি, "সমাচার-দর্পণ"কে 'প্রথম বঙ্গীয় সংবাদ-পত্র' নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এখনও করেন, তাহার কাল-ক্রমিক তালিকা, নিম্নে নিবদ্ধ হইতেছে।

(1) "Friend of India" (Monthly Edition)—Form 1818 A. D. to 1820 A. D. (ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া অর্থাৎ 'ভারত-সুহৃদ্'(১২২৫ সাল হইতে ১২২৭ সাল) পর্য্যন্ত।

(2) "Friend of India" (Quaterly Edition)—Form 1821 A. D.—to 1836 A. D.

ফেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া—(ত্রিমাসিক সংস্করণ)—(১২২৮ সাল হইতে ১২৪৩ সাল)।

(3) "Friend of India" (Weekly Edition) 1837 A. D. ফেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া, (সাপ্তাহিক সংস্করণ,) ১২৪৪ সাল)।

(4) "History of Bengal, by John Clarke Marshman" (1st Edition), 1837 A. D.

বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত, জন্ ক্লার্ক মার্শমান্ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত (প্রথম সংস্করণ), ১২৪৪ সাল।

(৫) "সমাচার দর্পণ" ১৮৩১খৃঃ, ১১ই জুন (১২৩৮ সাল, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ)।—

ইহা, এই সময় হইতে দ্বিভাষিক পত্রিকা হইয়া চলিতেছিল।

(6) "Friend of India" (Weekly Edition) 13th Vol, 19th Sep, 1850 A D. ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া, ১২৫৭ সাল, ৪ঠা আশ্বিন।

(৭) "প্রথম-শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস"—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,এম্ এ বি এল্ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত (প্রথম সংস্করণ), ১৮৭৪ খ্রীঃ (১২৮১ সাল)।(৩)

গত বর্ষ (১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্রাকার পুস্তকের ৫৯শ (উনষষ্টিতম) সংস্করণ হইয়াছে। তাহাতেও ঐ বিষম ভ্রম, রহিয়া গিয়াছে। "অনুসন্ধান"-নামক পত্রে (১৩০৬ সাল, ৭ই অগ্রহায়ণে) উক্ত ভ্রান্তির উল্লেখ করিয়াছিলাম। তথাপি এখনও ঐ অশুদ্ধিই, রহিয়া যাইতেছে।

যে সমস্ত সংবাদ-পত্রিকা, যে সকল পুস্তক, যে যে ব্যক্তি—"বেঙ্গল্ গেজেট্কে" প্রথম সংবাদ-পত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তৎ-সমুদয়ের কাল-ক্রমানুসারিণী তালিকা, এই স্থানেই লিপিবদ্ধ করা গেল।

(১) 'বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের ইতিহাস' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, ১২৫০ সাল, ১লা বৈশাখ (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ, ১৩ই এপ্রিল।

(2) Descriptive Catalogue of Bengali Works, by (Rev J. Long, 1850 A. D.

(৩) 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব'—রামগতি ন্যায়রত্ন সঙ্কলিত, ১২৮১ সাল, ১১ই আষাঢ় (১৮৭৪ খ্রীঃ, ২৪শে জুন।

(৪) (ক) "বঙ্গীয় সংবাদ-পত্রের বিবরণ" ১২৮২ সাল, ২৮শে বৈশাখ (১৮৭৪ খ্রীঃ, ১০ই মে)।

(৪) (খ) "বঙ্গীয় সংবাদ পত্রের বিবরণ" ঐ বর্ষ (১২৮২ সাল), ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ [১৮৭৫ খ্রীঃ, ১৭ই মে]।

(৫) "বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্য-বিষয়ে বক্তৃতা" (বক্তা—শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার), ১২৮৬ সাল, আষাঢ় (১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ, জুলাই)।

(৬) "সমাচার চন্দ্রিকা" ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ, (১২৪১ সাল)।

(৭) "নবজীবন" দ্বিতীয় ভাগ। উহার সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিএ, বি এল্।

প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৪)।

(৮) "জন্মভূমি" ষষ্ঠ ভাগ, ১৩০৩ সাল, আশ্বিন মাস—(১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ, সেপ্টেম্বর)।

(৯) "বঙ্গীয় সংবাদ পত্র"।—"সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"—১৩০৪ সাল, ২৮শে শ্রাবণ

(৩) "পুরোহিত ও অনুশীলন" তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ৪৮পৃ, দ্রষ্টব্য। অথবা, মৎ-সঙ্কলিত "সন্দর্ভ সংগ্রহ" ভরদ্বাজ-গোত্র' প্রবন্ধ, ৪৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

(৪) ইনি স্বনামখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা। ইনি চতুর্থ সংবাদ-পত্রের ("প্রথম-বঙ্গদূতের")সম্পাদকের (নীলরত্ন হালদার মহাশয়ের) দৌহিত্র।

—(১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, ১২ই আগষ্ট)।—চতুর্থ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা।

(১০) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"—১৩০৫ সাল, ৫ম ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা। লেখক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

(১১) "অনুসন্ধান" (সাপ্তাহিক পত্র), ১৩০৬ সাল, ৭ই অগ্রহায়ণ (১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, ২২শে নবেম্বর)। প্রবন্ধের নাম—"বাঙ্গালার প্রথম সংবাদ পত্র"। লেখক—ঐ বিদ্যানিধি।

(১২) (ক) প্রবন্ধের নাম—"বাঙ্গালা-সংবাদ পত্র"। "দৈনিক সমাচার" (প্রাত্যহিক পত্রিকা), ১৩০৬ সাল, ৬ই চৈত্র। (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ, ১৯শে মার্চ্চ)। (লেখক—ঐ)।

(১৩) (খ) প্রবন্ধ-নাম—"বাঙ্গালা-সংবাদ-পত্র"—"দৈনিক সমাচার"—১৩০৬ সাল, ১৫ই চৈত্র (১৯০০ খৃষ্টাব্দ, ২৮শে মার্চ্চ)। (লেখক—ঐ)।

এই বাঙ্গালা-দেশই, ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের 'আকর'। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারিতে যে পত্রিকার উদ্ভব হয়, তাহার নাম—"হিকিজ্ গেজেট্" (Hickey's Gazette)। নাম শুনিলেই, বোধ হয়, উক্ত পত্রিকা-খানি, ইংরাজি-ভাষায় চালিত হইত। যাহা,বৈদেশিক ভাষার পত্রিকা,তাহার সঙ্গে আমাদের কোন প্রকার প্রয়োজন নাই। সুতরাং আমাদিগকে খাস্ বাঙ্গালা-পত্রিকার আসরে গিয়া পড়িতে হইতেছে।

এত ক্ষণের পর "বেঙ্গল্ গেজেটের" বৃত্তান্ত, লিপিবদ্ধ করিতে, আমরা অবসর প্রাপ্ত হইলাম। প্রথম ইংরাজি পত্রিকার নামের শেষাঙ্কের সহিত অভিন্নতা হেতু, "বেঙ্গল্ গেজেট্কেও" বিলাতী পত্রিকা মনে হইয়া,ভ্রান্তি সংঘটন হওয়া,সম্ভব। উল্লিখিত-জাতীয় বস্তুই, কিন্তু 'বঙ্গীয় প্রথম বার্ত্তাবহ।' বহু প্রাচীন কাল হইতে, এদেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তি ব্যূহের এই ভয়ঙ্কর ভ্রান্ত সংস্কার-মূলক মতই,বদ্ধমূল হইয়াছিল যে,শ্রীরামপুরের "সমাচার-দর্পণই" বঙ্গের প্রাচীন ও প্রথম পত্র। সুতরাং, উহাই, প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রিকা। এই ভ্রম-ময় ধারণা, বহু-কালাবধি কেন দৃঢ়-প্রোথিত মতে পরিণত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। বিশেষতঃ, ১২৩৮ সালে (১৮৩১ খৃষ্টাব্দে) ঐ মতই,অতীব বলবৎ ছিল। ঐ মতামত, এতই প্রচলিত ও প্রবল ছিল যে, তন্নিবন্ধন প্রকাশ্য-পত্রিকাতেও,তদ্বিষয়ের বিপুল বিতণ্ডা, সমগ্র বঙ্গভূমি অতিক্রম পূর্ব্বক ভারত-বিখ্যাত হইয়াছিল এবং তৎপরেই তাহাকে নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপক হইতে, শোনা গিয়াছিল বলিলেও, কোনও হানি হয় কি ?

আমাদের মৌখিক বা লিখিত উক্তিতে কাহারও আস্থা-স্থাপনের জন্য আমাদের কোনরূপ অনুরোধ নাই। অস্মৎ-প্রদত্ত প্রমাণ, সন্তোষ-জনক না হইলে, কাহাকেও তাহা,বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে বলিব না। সে অসঙ্গত মতে সায় দিবার নিমিত্ত, যত্ন বা প্রয়াস পাওয়া, সর্ব্বথা বৃথা—নিতান্তই নিস্ফল। বাক্যাড়ম্বরের আধিক্যে মনোনিবেশ, অশেষ প্রকারে না হউক—কিয়ৎ-পরিমিত মাত্রায়ও স্থল-বিশেষে অনাবশ্যক। এখন তাই প্রকৃত তত্ত্বে আমাদিগকে অভিনিবিষ্ট হইতে হইতেছে।

১২৩৮ সালের "সমাচার-দর্পণে" এক পত্রপ্রেরক মহাশয়, যে রূপে লেখনী ধরিয়াছিলেন—তাহারই মর্ম্ম, উপস্থিত ক্ষেত্রে বিনিবদ্ধ হইবার একান্ত উপযুক্ত। সেই প্রস্তাবিত বৃত্তান্ত, পশ্চাৎ লিখিত হইল।

'সমাচার-দর্পণের' ৬৮০ (ছয় শত আশী)

সংখ্যায় এক পত্রপ্রেরক, অনেক কথার অবতারণা করেন। তদনুষঙ্গিক তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"এই অপূর্ব্ব 'সমাচার দর্পণাবতারের' পূর্ব্বে প্রায় কাহারো কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল না যে, বাঙ্গালা-সমাচার-পত্র'-নামে কোন পদার্থ আছে। (৫)।

ঐ বর্ষের (১২৩৮ সালের) ৩০শে জ্যৈষ্ঠের ২। ৪ (দুই বা চারি) দিন পূর্ব্বে "সমাচার-চন্দ্রিকার" (৬) কোন পত্র-প্রেরক মহাশয়ও, ঐ প্রবন্ধ কারককে "বিজ্ঞতম" আখ্যায় শ্লেষ করেন।

তদ্ভিন্ন তিনি যে কয়টী কথা বলেন, তাহা এই,—

(ক) "সমাচার দর্পণ" আদিম অর্থাৎ বাঙ্গালা-ভাষায় লিখিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক 'সমাচার-পত্রিকা' নয়।

তিনি ইহাও বলিয়া ফেলিয়াছিলেন,—

(খ) "সমাচার-দর্পণের" উক্ত পত্র প্রেরক মহাশয়, বোধ হয়, কলিকাতা-বাসী নহেন। তাহার কারণ, রাজধানীর লোকেরাই—ভাল-মন্দ, হিতাহিত, ভদ্রাভদ্র, শুভাশুভ, পবিত্রাপবিত্র বোঝেন। অর্থাৎ সহরের সর্ব্বশ্রেণীস্থ লোকেরই মানস ও অভিলাষ, প্রয়াস ও প্রযত্ন, সংস্কার এবং ধারণা এই যে, যাহা স-ঠিক্ সংবাদ, তাঁহাদের মতে তাহারই সমাদরের দরকার।

(গ) তাহার পর "চন্দ্রিকার" পত্রপ্রেরক মহোদয়ের লেখা হইতে, আরও কি কি বিষয়, প্রাপ্তব্য,—তাহাও দেখুন।

(১) কোন্টী, বাস্তবিকই আদিম বঙ্গীয় বার্ত্তাবহ। অর্থাৎ সেই পত্রিকার কি নাম?

(২) সম্পাদকের নাম কি?

(৩) তিনি কোন্ জাতীয়?

(৪) সম্পাদকের অপরাপর প্রকৃত কোন পরিচয় পাওয়া যায় কি না?

(৫) তিনি কোন্ গ্রাম-স্থিত?

(৬) পত্রিকার মূল্য কত ছিল?

(৭) স্থায়িত্বই বা কত দিন?

(৮) অন্যান্য কথা। যথা,—প্রবন্ধাদির রচনা-প্রণালী। লেখার নমুনা কিছু কিছু উদ্ধৃতাংশ।

ক্রমশঃই আমাদিগকে এই কথাগুলির উত্তর দিতে হইবে।

১। "বেঙ্গল্ গেজেট্" প্রথম বাঙ্গালা-সংবাদ-পত্র।

২। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য, উহার সম্পাদকতায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু "চন্দ্রিকার" পত্রপ্রেরক, তাঁহাকে "গঙ্গাকিশোর" নামে পরিচিত করিয়াছিলেন। উহা, নিশ্চয়ই ভ্রান্তিময়ী উক্তি। সৎকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, লঙ্ সাহেব, রামগতি ন্যায়রত্ন, গঙ্গাচরণ সরকার প্রভৃতি, আমাদের উক্ত উক্তির সপক্ষীয় সাক্ষী।

৩। তিনি দ্বিজাতি—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ।

৪। কুলীন না হইলেও, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, মনোহরণ-কারক, মনীষী মনুষ্য।

৫। "বহড়া" গ্রামের তিনি অধিবাসী ছিলেন। এই 'বহড়া' শ্রীরামপুরের সন্নিকটস্থ। "বহড়া" গ্রামের বর্ত্তমান নাম বা সংক্ষিপ্ত নাম—'বড়া' (৭)।

৬। মাসিক ১৲ (এক) টাকার দর্শনীতে সর্ব্ব-সাধারণে "বেঙ্গল্ গেজেটের" সাক্ষাৎ-

(৫) "সমাচার-দর্পণ" —১৮৩১ খ্রীঃ, ৬৮০ সংখ্যা।

(৬) "সমাচার-চন্দ্রিকা" চতুর্থ বঙ্গীয় বার্ত্তাবহ। সময়ান্তরে তাহার প্রসঙ্গ বিবৃত হইবে।

(৭) সাধকপ্রবর, সুবিখ্যাত, সঙ্গীতরচক রসিকচন্দ্র রায় মহাশয়ও, এই গ্রামেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। সুতরাং সাহিত্য ও ইতিহাসের সংস্রবে স্বীকার করিতে হইতেছে—এই গ্রামের সুখ্যাতি, সম্যক্ প্রশংসনীয়।

কার করিতে পাইত। বার্ষিক দ্বাদশ মুদ্রা—১২্ [বার টাকা], উহার মূল্য। সুতরাং দর্শনীটী, একপ্রকার অকিঞ্চিৎকর বলা যায়। সম্ভবতঃ, উহা অগ্রিম দেয় মূল্য নয়। কারণ, তখনও খবরের কাগজের দর বা আদর, বরাবর তেমন সুবিধাজনক ছিল না।

৭। এক বৎসর বৈ উহার পরমায়ুঃ নয়।

'সংবাদ-পত্রিকার' ঐতিহাসিক তালিকায় নিম্নোক্ত ৫টী (পাঁচটী) বিষয়, সর্ব্বথা ও সর্ব্বদা স্মরণীয়।

(ক) "বেঙ্গল্ গেজেট্"—এই নামক সাপ্তাহিক পত্র।

(খ) উহার সম্পাদক "গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য।"

(গ) ঐ গেজেটের প্রকাশকাল—"১২২৩ সাল"। অর্থাৎ—

(ঘ) ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ।

(ঙ) সম্পাদকের নিবাস স্থল—"বহড়া" বা 'বড়া' গ্রাম।

(চ) প্রকাশ-স্থান—"কলিকাতা"।

এই উপলক্ষ্যে "বেঙ্গল্ গেজেট্" ও "গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য" এই নাম-দ্বয়, ১২২৩ সাল বা ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ, এই সময়টী; "বহড়া" ও 'কলিকাতা' (কার্য্যালয়); এই ছয়টী বিষয় প্রত্যেকেই—চিরস্মরণীয় ব্যাপার। গঙ্গাধরের নামের আনুষঙ্গিক বাঙ্গালী কর্ত্তৃক সমাচার-পত্রের সম্পাদকত্বও, সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

পৌরাণিক গঙ্গাধর, শঙ্কর। তিনিই শিব দাতা (মঙ্গল-বিধাতা)। তাঁহার সাহায্য বিনা ভগীরথের ক্ষমতায় মর্ত্তধামে মন্দাকিনীর অবতরণ-ব্যাপার ঘটিত না। মহাদেব, বিপুল-বিক্রমে মন্দাকিনীর বেগ ধারণে স্বীকৃত ও সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই, মর্ত্তলোক, গঙ্গা-মহাদেবীর পরম পূত বিমল সলিলে পবিত্র ও নির্ম্মল হইতে পরিয়াছে। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য, সমাচার-পত্রিকার সম্পাদন রূপ প্রথম কর্ম্মে, বঙ্গদেশের আর্য্য হিন্দু সমাজে, আজও পর্য্যন্ত মহামহিম-ময়। গঙ্গাধরের কেমনই নাম-মাহাত্ম্য! বার্ত্তাবহ-সমূহের প্রচারে কত দায়িত্বের প্রয়োজন, তাহা সমস্ত বঙ্গ, পরিজ্ঞাত না থাকুক,—সমাজ-রাজনীতি-বেত্তারা, সম্যক্-বিদিত। বঙ্গের অঙ্গে যখন দ্বিতীয় সংবাদ-পত্র (৮), শোভা পাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থা, অত্যন্ত ভয়াবহ ও আশঙ্কা সঙ্কুল। সেই ঘটনাটী, এই সূত্রে উল্লিখিত হইবার উপযুক্ত বিবেচনায়, এই স্থানেই তৎ-প্রসঙ্গ, বর্ত্তমান প্রতিপাদ্য ব্যাপারের প্রসঙ্গে বর্ণিত করিতে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মিতেছে। সেই প্রস্তাবিত বৃত্তান্ত, পাঠকদিগকে এবম্ভূত ভাবে বিস্মিত ও স্তম্ভিত, চকিত ও চমকিত, ত্রস্ত ও বিমোহিত করিয়া দিবে, যাহা ভাবিতে গেলেও, মানবের বুদ্ধি বৃত্তি, শুব্ধ হইয়া যায়। কিয়ৎকালের কারণ, তাহাতে সকলকে নীরব ও নিঃশব্দ করিয়া তোলে! আর বাক্যাধিক্যে আস্থাবান্ হইলে, চলিতেছে না। এখন প্রকৃত কথার (যথার্থ তথ্যের) অনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়াই, সর্ব্বোপায়ে শ্রেয়স্কর।

এ পর্য্যন্ত আমরা, যে সকল লিপির উপর নির্ভর করিয়া, এই সন্দর্ভ-সমূহের অনুষ্ঠানে করিতেছি, তাহার একটা তালিকা, বর্ত্তমান ক্ষেত্রের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সেই প্রবন্ধবলী, আমাদেরই লেখনী মুখ নির্গত। কিন্তু, তাই বলিয়া, এ-স্থলে কেবল পুরাতন কথারই আলোচনা করা যাইবে না। কারণ, চর্ব্বিতচর্ব্বণ, আমাদের লক্ষ্য নয়।

প্রতি-বারেই সচরাচর নূতন ঘটনা, নূতন বিবরণ, অভিনব সংবাদ ও নবীন তত্ত্ব-কথার সমাবেশে, আমাদের সেই সন্দর্ভ, এক দিকে

(৮) অর্থাৎ "সমাচার-দর্পণ"।

যেমন সুন্দর, অন্য দিকে প্রণালীর নূতনত্বে ও বিষয়-সমাবেশের বিবিধত্বে, তেমনই এক অপূর্ব্ব পদার্থ হইয়া উঠিয়াছে। উদাহরণ-প্রদর্শন না করিলে, আমাদের হৃদ্গত মতামত, বিজ্ঞাত হইবার পক্ষে হয় তো পাঠকদিগকে বিকট-বিভ্রাটে পড়িতে হইবে। সুতরাং,মনোগত কথা—সরল সুন্দর ভাষায়—হৃদয়-গ্রাহিণী প্রথায়—সুশোভন-বিবরণীতে—ব্যক্ত করিতে হইতেছে।

১৩০৩ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে 'জন্মভূমিতে' যৎকালে 'বেঙ্গল্ গেজেট্'-নিকটে আমরা, উপস্থিত হই,তৎকালে ঘটনার দৈন্যে আমাদের অগণ্য ও বিশেষ মানসিক ক্লেশেই, উহা লিখিত হইবার নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হই। সেই প্রবন্ধ, প্রথম অপেক্ষা, বহুল বিবিধ ঘটনা-সঙ্কুল। তাহার পর, যখন "অনুসন্ধান"-পত্রে সেই প্রস্তাবেরই আবির্ভাব হইল, তখন আমাদের অব্যর্থ অন্বেষণ-নিবন্ধন, অনেকানেক কত শত অজ্ঞাত-পূর্ব্ব বৃত্তান্তই, বিদিত হইয়াছিল! তৎপরে "দৈনিক সমাচার"-নামক প্রাত্যহিক সংবাদ-পত্রে উক্ত 'বেঙ্গল্ গেজেট্'-নামক প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রিকার তদপেক্ষাও অধিকতর সমাচার-বিষয়ক বিস্তর সুন্দর সুন্দর সামগ্রী, সম্যক্ নূতন ভাবে ও নব প্রথায়, প্রদত্ত হইয়াছিল। এখন দেখিতেছি, তাহাও, সম্পূর্ণাবয়ব নয়। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিস্তর সমাচারের, সুবিস্তর-রূপে তাহাতেও প্রচার হয় নাই। অগত্যা, অধুনা আমাদিগকে আবার সেই সমাচারের অধিক অংশকে, এই অন্তিম প্রস্তাবেই চরম ও চূড়ান্ত ভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইতেছে। এই নিষ্পত্তিটী, অতিশয় সুন্দর, মনোহর, চমৎকার-জনক। এখন পাঠকগণ,লক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে নয়ন নিয়োজন করিলেই, নিরীক্ষণ করিতে পারিবেন—আমাদের উক্তি, সারবতী—কি না।

অদ্য পর্য্যন্ত বঙ্গীয় বার্ত্তা-বিষয়িণী পত্রিকার ইতিবৃত্তের যত বৃত্তান্ত,অস্মদীয় লেখনী-মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে—তাহাদের একটা কাল ক্রমানুসারিণী তালিকায় পাঠকদিগকে প্রকৃষ্ট প্রথায় দেখাইব,—কত যত্নে অবিরাম কত শ্রমে,অশেষ অধ্যবসায়ে এতদ্বিষয়ে আমরা অভিনিবিষ্ট। মুখে বা লেখায়, আড়ম্বরের আবশ্যকতা কি? আমাদের কৃত কার্য্যেই, আমাদের কৃতকার্য্যতা, অনুভূত হউক। সেই গুরুতর ব্যাপার—আশ্চর্য্য কার্য্য—বিস্ময়োদ্রেক-প্রদায়ক ও চিত্তচমৎকারক। কঠোর কার্য্যে আর্য্য জাতিরই একান্ত যোগ্যতা। অতএব, আর বাগাড়ম্বরের দরকার নাই। প্রকৃত তত্ত্ব, এই খানেই এই ভাবেই লিপিবদ্ধ হউক।

(ক) জন্মভূমি—(মাসিক পত্রিকা), ১৩০৩ সাল, জ্যৈষ্ঠ।

(খ) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা—(ত্রিমাসিক পত্র), ১৩০৫ সাল। ৪র্থ ভাগ,৫ম সংখ্যা।

(গ) অনুসন্ধান—(সাপ্তাহিক পত্র), ১৩০৬ সাল, ৭ই অগ্রহায়ণ।

(ঘ) দৈনিক সমাচার—(প্রাত্যহিক পত্র), ১৩০৬ সাল, ৫ই চৈত্র।

(ঙ) দৈনিক সমাচার, ১৩০৬ সাল, ১৫ই চৈত্র।

বাঙ্গালা ভাষায় সমাচার-পত্রিকার আমলে আসিয়া পড়িতে গেলেই—উহার সূত্র ধরিতে চেষ্টা করিলেই—নিরপেক্ষ, নিরীহ, নির্ভীক পাঠকের চক্ষের সমক্ষে একেবারেই "বেঙ্গল্ গেজেট্কে" সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকটস্থ ও সন্নিকৃষ্ট দৃষ্ট হইবে। এটা, একটা—যে সে কথা নয়! এই প্রবন্ধের আনুষঙ্গিক কথার

সঙ্গে সঙ্গে, ইহা, অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, এই বঙ্গদেশই, ভারতের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা সাতিশয় সৌভাগ্যশালী। যে বাঙ্গালী জাতির গুণাবলীর কীর্ত্তনই, এখন অবনীর সভ্য অথচ অপক্ষপাতী জাতি সমুচ্চয়ের মহোচ্চ চিত্তের পরিচায়ক,—সেই জাতির প্রিয়তম জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশ, কেন অশেষ সুযশের আধার না হইবে, বল দেখি? ভারতভূমি, চির-দিনই বীরপ্রসূ। তবে বাঙ্গালা, কি কেবলই একেলা, শূন্য অথবা অসারত্বপূর্ণ গৌরবে মাতিয়া বেড়াইবে! আর, অন্তঃসার-রহিত আমরা, অম্লান-বদনে—স্ফূর্ত্তি বিহীন প্রাণে—স্বদেশের ও স্বীয় জন্মভূমির ব্যর্থ বাক্যাড়ম্বরে সগর্ব্ব হইব?

যে বঙ্গভূমিই, প্রথম ইংরাজী-পত্রিকার আকর—তাহার শ্লাঘার অভাব কি? কোন্ অনির্দ্দেশ্য সময়ে, বলিলেই চলে—বঙ্গের অঙ্গে "হিকিজ্ গেজেটের" আবির্ভাব, প্রাদুর্ভাব ও প্রচার হয়!—সেই কালে—সেইস্মরণাতীত সময়ে—ইংরাজ-রাজত্বের আদ্যাবস্থায়, "হিকিজ্ গেজেট" জন্মগ্রহণ করিয়াছিল!

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ-রাজত্বের সূত্রপাত! আর—১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে "হিকিজ্ গেজেট্" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং উহাদের অন্তরালে ৩৪ (চৌত্রিশ) বৎসরের অন্তর। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ, নিঃসন্দেহই, কেমন সুপ্রাচীন ক্ষণ,—তাহার আর সংশয় কোথায়! কেবল পুরাতন কালই বলি বা কেন? ঐ সাল, শুভ-সূচকও ছিল বটে। সে সাল, আমাদিগকে অভিনব উপাদেয় দ্রব্য দিয়াছে—ভাল ভাল আবশ্যকীয় অভাব-বিমোচন করিয়াছে—তাহার যদি যথাযোগ্য আদর-অভ্যর্থনা না হয়, তবে আর কিসের সমাদরের সম্যক্ এবং সমীচীন প্রয়োজন—তাহা উন্নতচিত্ত ব্যতীত অপরের বুদ্ধির অপায়—জ্ঞানের অগম্য, এ কথা আবার কি খুলিয়া বলিয়া দিতে হইবে?

ঐ ইংরাজি-সালের (১৭৯০ খ্রীষ্ট. অব্দের) ২৯শে জানুয়ারীতে উহার উদ্ভব হয় (৭)। কিন্তু উহা ইংরাজী খবরের কাগজ! একে-বিজাতির বস্তু, তাহার উপর বৈদেশিক ভাষায় তাহার প্রচার! এই দুই কারণ-নিবন্ধন তাহার সংসর্গ ত্যাগ করিতে হইতেছে। উপকারক পদার্থের সঙ্গ-ত্যাগে প্রথম প্রথম কিছু কিছু মনোভঙ্গের সম্ভাবনা হইয়া উঠে। যাহা হউক, যাহার সহিত অব্যবহিত সম্বন্ধ, সেই প্রকৃষ্ট-বিষয়ক প্রবন্ধই, উৎকৃষ্ট। সম্প্রতি অতিমাত্র প্রীতি, যত্ন এবং সমাদর-সহকারে বঙ্গীয় পাঠককুলের গোচরে উত্থাপিত করা যাউক না কেন?

এখন বঙ্গীয়-বার্ত্তাবহ নিবহের কাল-ক্রমিক তালিকা এবং তাহার আনুষঙ্গিক আখ্যায়িকাদি, নিবদ্ধ করিবার আমাদের কামনা। সেই তালিকায় আদিম বস্তুটীর নাম—"বেঙ্গল্ গেজেট।"

যৎকালে ভারতবর্ষের ৩য় গবর্ণর জেনেরেল্ লর্ড ওয়েলেস্লির আমল,—সেই সময়ে, এই পত্রিকা, জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে অনেক সুদূরবর্ত্তী কালের কথা। তখন ১২২৩ সাল (১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ), বিলক্ষণ প্রবল বেগে প্রচলিত ছিল!

কুপিত-কপিল-কোপানলে সৌর-কুলীয় সগর-বংশ, সবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাই তদ্বংশাবতংস (সূর্য্য-গোত্র-সম্ভূত), অষ্টাবক্র মুনির বর-পুত্র ভগীরথ কর্ত্তৃক মহীতলে গঙ্গানয়নের সম-কালে পরকীয় শুভদাতা অথচ সংহারকর্ত্তা, প্রকৃতি-পিতা ও বিশ্ব-

(৭) অন্যত্র ১৮ জানুয়ারি লিখিত আছে, উহা ভুল।

পাত্তা, দেবাদিদেব, মহান্ দেব, মহাশিব-প্রদাতা, মনোহর-বর-প্রদান-কারক শঙ্কর, স্বীয় জটাভ্যন্তর দিয়া মন্দাকিনীর প্রবল প্রবাহের স্রোতোবেগ ধারণ করিয়াছিলেন। তাই তদবধি তাঁহার নামান্তর হইয়াছে—গঙ্গাধর। মঙ্গলপ্রসূ ও স্বয়ম্ভু, শম্ভু ও শঙ্কর—গঙ্গাধর-সংজ্ঞায় সমধিক খ্যাতনামা ও সুন্দর। তাহা হইলেই,দেখিতে পাইতেছি, গঙ্গাধর,সৎ ও মহৎ, কঠোর বা সুন্দর, উৎকট অথচ উৎকৃষ্ট,কার্য্যের কর্ত্তৃত্বে অদ্বিতীয়।

"গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য"-নামক এক প্রধান ও প্রাচীন রাঢ়ীয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের গুণে বঙ্গদেশ, অশেষ ক্লেশ সহিয়াও,বঙ্গীয় সংবাদ-পত্রের নমুনা, বঙ্গ দেশের মধ্যে দর্শাইয়াছিলেন।

১। ইংরাজ-রাজের আজও পর্য্যন্ত যে সমস্ত কীর্ত্তি-কলাপ, অবলোকিত হইতেছে, শুভাবত্তের অপলাপ করা, কার সাধ্য? তাঁহাদের অনুষ্ঠিত বা প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম সকলের অধিকাংশ বিষয়ই, আমাদের আত্যন্তিক-হিত-সাধক। কিন্তু সেই সংশ্রবে একটা স্পর্দ্ধা ও আত্ম-শ্লাঘার কথা আছে। অধুনাতন সংবাদ-পত্র-সমূহের মূল-স্থল—য়ুরোপ-খণ্ড। সম্প্রতি-শ্রীবৃদ্ধি-সম্প্রাপ্ত "বঙ্গের" সেই অপরূপ মহাধনের মূল মালিক—খ্রীষ্টান-পাদরিগণ নহেন। উক্ত ঘটনার সংঘটনে এখানে এখন আমরা, একটী নিরীহ বন্ধুকে হিন্দুত্ব নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণকে দেখিতেছি।

২। উক্ত ব্যক্তি, সম্পাদকোচিত বিবিধ-গুণালঙ্কৃত,রাজনীতিক-কাণ্ডের পারাপারের উপযুক্ত কাণ্ডারী। অতি সুন্দর কার্য্যকারী কর্ম্মচারী, স্পষ্টবাদী অথচ মিষ্টভাষী, সদ্বক্তা ও সুলেখক তিনিই ছিলেন! তিনি প্রবাসী; কিন্তু রাজধানী, তাঁহার স্থিতি-স্থান। তিনি উপনগর-নিবাসী। কেন না, "বহড়া" গ্রামে তাঁহার বাস। কলিকাতায় সুন্দর বাস-স্থল ছিল। "বহড়া" চাতরা-শ্রীরামপুরের সান্নিধ্যে অবস্থিত। সুতরাং "বহড়া", কলিকাতার সহরতলী—সুন্দর উপনগর। ঐ ভট্টাচার্য্যকে যথাযোগ্য পাত্র বলিয়া অস্বীকার করিতে গিয়া দ্বিধা করিলে, চলিবে না। কতকগুলি রাঢ়ীয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের বিদ্যমানতা-সত্ত্বেও, এই বঙ্গীয় বিপ্র, বিবিধ গুণে কেবলই সৎসাহসী ছিলেন। তিনিই কেবল রাঢ়ীয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণের প্রশংসা-ভাজন নহেন। অপিতু, বঙ্গীয়-বার্ত্তাবহ-নিবহের প্রবর্ত্তক বলিয়াই তো, বাঙ্গালী-মহলে এই সুদূর কালেও—জঞ্জাল-জাল অথবা প্রত্যূহ-সমূহ প্রবিষ্ট হইতে পায় নাই!

৩। অধিকন্তু,কি শুভাদৃষ্টের বিষয় দেখুন, কোলাহল-কৌতুকের আকর, এই সুবিস্তার বাঙ্গালা মুলুকই, উক্ত সংবাদ-পত্রিকার ("বেঙ্গল্ গেজেটের") লীলা খেলার সুযোগ্য পবিত্র ক্ষেত্র। "বেঙ্গল্ গেজেটের" নিকট কোন, আগন্তুক কখন উৎকট ব্যাপার প্রকটনের প্রত্যাশা করিতেন না। উপর্য্যুপরি প্রকৃষ্ট পদ্ধতির প্রত্যাশাপন্ন হওয়াই,সন্নিকটস্থ অনাগন্তুক লোকদিগের পক্ষে স্বভাব-সঙ্গত কার্য্য। সুতরাং তাঁহাকে অদূরদর্শক ও অবিবেচক, অপ্রবীণ ও অনিপুণ বলা যাইতে পারে না। তাঁহাকে জনগণের সমীচীন ও সুযোগজনক কর্ম্ম-সম্পাদক, উপযুক্ত পত্রিকা সম্পাদক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে বিলম্ব ঘটনার সম্ভাবনাও নাই। দুরস্থদেরই যত দূর দুরবস্থা! তাহারাই বিকট বিস্তর বিষয়ে ব্যাকুল হইয়া থাকে।

"বেঙ্গল্ গেজেট্ই"প্রথম হইল। সুতরাং তদানুষঙ্গিক বাচিক ও আন্তরিক অকপট,

অগণ্য-প্রাধান্য-সম্পন্ন-ধন্তবাদ করিতে হয়। উহার অ-সম্পূর্ণত-সম্প্রদানে মিশনরিগণের প্রাণপণ যত্ন প্রমাণীকৃত করিতে, কিম্ভূত কিমাকার প্রভৃত তন্ময়ত্ব সহিত এবং সুপ্রচুর মধুর প্রয়াস পাইতে দেখা গিয়াছিল! সে সব, সম্পূর্ণই উপহাসাস্পদ—কৌতুকাকার! প্রোক্ত অদ্ভুত মত, এত কাল ব্যাপিয়া বরাবরই প্রচলিত ছিল। যথা,—

(ক) ১৮১৮ হইতে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। শেষ অব্দে উহার বিস্তব বিস্তর বিতণ্ডা চলিয়াছিল। তদর্থে কত শত মনীষীকে বিস্মিত করিয়া দিত। সেই অ-সুন্দর অবসরে প্রকাশ্য-পত্রিকাদিতেও, তুমুল কোন্দল-কোলাহল চলিয়াছিল।

(খ) মধ্যে শুদ্ধ ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডের ন্যায় হল্ল-ফল্ল লোক-সকলই, ঐ সব অসম্ভব ব্যাপারের রহস্যোদ্ঘাটন করিয়া দেন। তদবধি পাদরিরা, বেশ জব্দ। কেন না, এখানে পাদরিই (লণ্ড্ সাহেবই), অপরাপর পাদরিদের (মার্শমান প্রভৃতির) পৃষ্ঠ ভক্ষক।

অপর বারে "বেঙ্গল্ গেজেটের" অব-শিষ্টাংশ এবং "সমাচার-দর্পণের" আমূল বিবরণ-প্রকটনের প্রয়াস রহিল।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

সাহিত্য সম্বাদ।

জীব পর্য্যায়ে মৎস্য একটী পদস্থ জীব, কীট পতঙ্গের উপরে, পক্ষীর নিম্নে। অথচ মৎস্য শব্দহীন মূক জীব। পক্ষী গান করে, কীট পতঙ্গেও শব্দ করে। মৎস্যের উপরে সরীসৃপ, গোধা প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর সরীসৃপ শব্দ করিতে পারে, তক্ষকনামে এক শ্রেণীর গোধার শব্দে চমকিয়া উঠিতে হয়। কিন্তু হেলে, দাঁড়াস ও গোক্ষুর শ্রেণীর সর্পকে শব্দ করিতে শোনা যায় না। ইহাদের কি শব্দ করিবার শক্তি নাই? বাগযন্ত্র ব্যাবৃত হয় নাই? তাহাত নহে।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, পিপীলিকা শ্রবণ শক্তি শূন্য। অতি ক্ষীণ স্বরে এবং অতি উচ্চ স্বরে, সপ্তগ্রামে, শব্দ করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহারা শুনিতে পায় না। অথচ পিপীলিকার শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যাবৃত্তিশূন্য নহে। পিপীলিকা সোঁয়া বা শুঁড় দ্বারা কথাবার্ত্তা কহে বা ইসারায় মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাও ইহাদিগকে বধির বিবেচনা করিবার একটী কারণ। বস্তুতঃ এক শ্রেণীর পিপীলিকাকে শব্দ করিতে শোনা গিয়াছে। মনুষ্যের উচ্চারিত যে কোন শব্দ শুনিতে না পাইলেও পিপীলিকারা বধির নহে। ইহারা ইসারায় কথাবার্ত্তা অধিক কহিলেও ইহাদের ভাষা আছে।

মৎস্যও বধির নহে। মৎস্যের শ্রবণ শক্তি প্রখর। আমার মত যাহাদের মাছ ধরিবার বাতিক আছে, তাহারা সকলেই মৎস্যের শ্রবণ শক্তির পরিচয় পাইয়াছেন। মৎস্য বধির নহে, তবে মূক হইবে কেন? সম্প্রতি পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, মৎস্যদের ভাষা আছে। একজন বৈজ্ঞানিক পিঁজারার মধ্যে বসিয়া তাড়িতালোক সঙ্গে লইয়া ভূমধ্য সাগরের গর্ভে অবতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটী ফনোগ্রাফ যন্ত্র ছিল। সাগর গর্ভে নামিয়া সহসা তাড়িতালোক প্রজ্বলিত করিলে, জলচর

দিগের মধ্যে একটী কোলাহল উপস্থিত হইল। ফনোগ্রাফে সে শব্দগুলি লিপিবদ্ধ হইল। এখন বুঝা গিয়াছে, মৎস্যরাও কথা, বার্ত্তা কহিয়া থাকে। আমাদের বহুকালের পোষিত একটী ভ্রম দূর হইয়াছে।

মানুষের আর একটী ভ্রম সম্প্রতি দূর হইয়াছে। বরফ সাদা, এজন্য সাদা রঙ্গ ঠাণ্ডা বলিয়া সকলের ধারণা ছিল। কাল রঙ্গ গরম। তাই আমরা শীতকালে কাল রঙ্গের ও গ্রীষ্মকালে সাদা রঙ্গের বস্ত্র ব্যবহার করি। বস্তুতঃ ইহার বিপরীত যাহা তাহাই সত্য। জীবের আত্মরক্ষার্থ অবস্থা বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ব্যাবৃত হয়। মীসরে নীল নদের বন্যায় অনেক স্থান বৎসরের অধিকাংশ সময় জলে ভরিয়া থাকে। কাজেই শক্তি বিশেষ ব্যাবৃত না হইলে আহারাভাবে সেখানে পায়রাদিগের প্রাণান্ত হইত। নীলতটে পায়রার পায়ে হাঁসের পায়ের মত পাতা হয়। তাহার সাহায্যে নীলতটের পায়রারা হাঁসের মত জলের উপর সাঁতার দিয়া আহার সঞ্চয় করিয়া প্রাণ রক্ষা করে। শীত প্রধানদেশে শীতের আধিক্য হইতে প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য জীবজন্তু সকলেই শ্বেতবর্ণে আপনাদের দেহ আচ্ছাদন করে। এই কারণেই গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোকে কৃষ্ণবর্ণ হয়। এই কারণেই শ্বেতবর্ণ মনুষ্য গ্রীষ্মে অধিক কষ্ট পায়। ভিন্ন বর্ণের ভিন্ন উত্তাপ তাপমানে পরীক্ষিত হইয়াছে। শ্বেতপদ্মের উত্তাপ অপেক্ষা রক্ত পদ্মের স্বাভাবিক উত্তাপ অল্প।

বাওয়া ডিম কাহাকে বলে, যাহারা হাঁস কি পায়রা পুষিয়াছেন, তাঁহারা জানেন। যাঁহারা মৎস্যমাংস আহার করেন না, নিরামিষ আহারের নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা তিন চারিটী হংসী পালন করেন, তাহার মধ্যে একটীও হংস থাকে না। এই হংসীদিগের যে ডিম হয়, তাহাকে বাওয়া ডিম বলে। বাওয়া ডিমে সন্তান হয় না। সুতরাং বাওয়া ডিম খাইলে জীব হত্যা হয় না। সম্প্রতি পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কার্বোনেট অব ম্যাগিনেসিয়ার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলে বাওয়া ডিমেও সন্তান উৎপাদন করা যাইতে পারে। এই পরীক্ষা হইতে অনেক কথা কল্পনা করা যায়। মানব প্রকৃতি দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছিলাম, হরকোষ ও গৌরীকোষের মিলনে জীবোৎপত্তি ঘটে। হয়ত শত বৎসর পরে নূতন বৈজ্ঞানিককে এ কথা অসত্য প্রমাণ করিতে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না।

সঙ্গীত-সমাজ ভাঙ্গিয়া দুইটী হইয়াছিল। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দুইটী হইয়াছে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ সাহিত্য-সভার সারথী। সাহিত্য-সভার পত্রিকা সাহিত্য-সংহিতা বেশ চলিতেছে।

বুদ্ধদেবের একটী নাম "তথাগত"। তথাগত শব্দের অর্থ কি? আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা বলেন, যেরূপে পুনরাবৃত্তি না হয় সেইরূপে গত বা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত। শব্দটীর অর্থ এরূপ হইলে বুদ্ধদেবের জীবিতাবস্থায় কেহ তাঁহাকে এইরূপে সম্বোধন করিতে পারিত না। অথচ বুদ্ধদেবকে এই নামে অভিহিত করিবার শত দৃষ্টান্ত জাতক মালায় দেখিতে পাওয়া যায়। "অরি" শব্দের অর্থ কি? দেশীয় পণ্ডিতেরা বলেন ঋ ধাতু গমন করা, যে বিরোধ প্রাপ্ত হয়। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, পালীভাষায় অরি শব্দ অরণ্যবাসী অর্থে ব্যবহৃত হয়। অরণ্যবাসী বর্ব্বরেরা আর্য্যদিগকে সর্ব্বদা পীড়ন করিত। সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট অরণ্যবাসী ও শত্রু সমান অর্থ বাচক হইয়াছিল।

"পাজি" শব্দের অর্থ কি? গালাগালি দিতে শব্দটী ব্যবহৃত হয়। সিংহলে পাজ্জা পাজা বা পাজায়া শব্দে নীচ জাতি বুঝায়। সিংহল দেশীয়েরা ব্যাধদিগকে "পাজা" বা নীচজাতি বা চণ্ডাল বলে? পাদা শব্দ হইতে কি উহার উৎপত্তি হইয়াছে। মানব প্রকৃতি প্রথম খণ্ডে সিংহলের ব্যাধদিগের অনেক কথা লিখিত হইয়াছে; একটী কথা হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর পরিব্রাজকেরা উল্লেখ করিয়াছেন যে, যুদ্ধে কোন শত্রু পরাস্ত করিলে ইহারা তাহার নাক ও ঠোঁট কাটিয়া ছাড়িয়া দিত। উলঙ্গ হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিত ও বনফল ভক্ষণ করিত।

কিন্তু হরিণের মাংস ইহাদের প্রধান ও প্রিয়তম খাদ্য ছিল, সিংহলে মধুও যথেষ্ট জন্মিত। কোন প্রাচীন বৃক্ষের কোটরে ইহারা মধু সঞ্চয় করিয়া তাহাতে হরিণের কাঁচা মাংস টুকরা টুকরা করিয়া ডুবাইয়া রাখিত। অন্য আহার্য্যের অভাব হইলে এইরূপে রক্ষিত হরিণ মাংস আহার করিত। মধুর মধ্যে ডুবিয়া থাকাতে মাংস কোন প্রকারে নষ্ট হইত না। মধুর মধ্যে ডুবাইয়া এদেশ হইতে বিলাতে আম পাঠান হইতেছে। মধুর মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলে এক বৎসরেও আম পচে না।

পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ হিজিরা ৯৩২ অব্দে, শুক্রবার ঘটে। সে দিবস ৭ই রজব কি ৮ই রজব, এই লইয়া একটু মতভেদ হইয়াছে। সুলতান সুলেমান সে শুক্রবার ৮ই রজব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় মুসলমান ঐতিহাসিক ফায়েজী ৭ই শুক্রবার প্রাতঃকালে ঐ যুদ্ধ ঘটিয়াছিল বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয়, স্তাম্বুল অপেক্ষা এক দিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষে চাঁদ দেখা গিয়াছিল বলিয়া এই রূপ গোলযোগ ঘটিয়া থাকিবে।

পারস্য হইতে তাড়িত হইয়া পারশীরা যখন ভারতবর্ষে আশ্রয় পাইয়াছিল, তখন তাহারা সঞ্জানের হিন্দু রাজার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিল যে, তাহারা হিন্দুদের মত বেশভূষা করিবে এবং তাহাদের ধর্ম্মের বিরুদ্ধ না হইলে হিন্দু আচার ব্যবহারও অনুকরণ করিবে। পূর্ব্বে পারশীরা হিন্দুদের মত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিত। এখন বাল্য বিবাহ একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। আর বেশভূষায় হিন্দুত্বের লেশ মাত্র আছে বলিয়া বোধ হয় না। পারস্য দেশে থাকিবার সময় ছাগল বা কুকুরের ন্যায় পারশীরা শূকর পুষিত; ভারতবর্ষে আসিয়া শূকর ত্যাগ করিতে হয়। এখন শূকরের উপর হিন্দুর ন্যায় ঘৃণা পারশীদের আছে কি না, যাঁহারা ইহাদের সঙ্গে বোম্বাই নগরে একত্র বাস করিয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত আছেন।

যে পথে মৃতদেহ লইয়া যাওয়া হয়, সে পথের অপবিত্রতা ঘুচাইবার জন্য পারশীশাস্ত্রে বিধান করা হইয়াছিল যে, সেই পথে একটী চারিচক্ষু হরিদ্রাবর্ণের কুকুর লইয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে কয়েকবার ফিরিতে হইবে, সাদা বর্ণের কুকুরের কাণ দুটা হরিদ্রা বর্ণ হইলেও চলিত। টীকাকার বলেন, দুটী চক্ষুর উপর দুটী দাগ থাকিলে তাহাই চারিটী চক্ষু বলিয়া গণ্য হইত। যাহা হউক, ঐ প্রকারের কুকুর পাওয়া দুর্লভ বলিয়া পারশীরা এ ব্যবহারটী এখন পরিত্যাগ করিয়াছে।

কাহারও মৃত্যু হইলে চিৎকার করিয়া রোদন করা বা ব্রত পূজা উপলক্ষে উপবাস করা পারশী শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। মাংসের বদলে মাছ খাওয়াকেই পারশীরা উপবাস করা বলে।

মান্দ্রাজের সিউয়েল সাহেব বিলাতে যাইয়া এক খানি নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে তিন শত খ্রীষ্টাব্দ হইতে এ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যত চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছে, তাহার একটী তালিকা ও বার তারিখ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গ্রহণোপলক্ষে হিন্দুরাজাগণ মুক্তহস্তে দান করেন। এই তালিকা হইতে প্রাচীন দান পত্রের সন তারিখ নিরূপণ করিতে বিলক্ষণ সাহায্য হইবে।

বোমানজী বায়রামজী পাটেল পারশী প্রকাশ নামে গুজরাটী ভাষায় এক খানি ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে প্রবেশ সময় হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পারশী জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের একখানি ইতিহাস অদ্যাপি রচিত হইল না।

গত বৎসর বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাভারতের সংক্ষিপ্ত সার ইংরাজী কবিতায় অনুবাদিত করিয়া ইংলণ্ডবাসীদিগকে উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহার মহাভারত সর্ব্বত্র সম্মান লাভ করিয়াছিল। সম্প্রতি তাঁহার রামায়ণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজ সমালোচকেরা এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। আমরা গ্রন্থখানি পড়িয়াছি; যেমন ভাষা, তেমনি চিত্র। রমেশচন্দ্র ভারতের সুসন্তান।

কুবর পক্ষী কোন্ পক্ষী? ইহা লইয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিত মহলে একটু মতভেদ হইয়াছে। অভিধানকার ঈগল পক্ষী বলিয়াছেন।

"দেবীং ক্রৌঞ্চযানানাং কু রী মিবার্ত্তাম"
"ততো মামলস্ক্রঃ ক্রোশন্তীং কুররীমিব"

আমাদের দেশে কুবর "কোড়ল" পক্ষী নামে অদ্যাপি সুপরিচিত। ইহারা বিলের পার্শ্বে গাছের উপর বসিয়া থাকে, মাছ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে, আকারে চিলের অপেক্ষা বড়, বুক সাদা, ডানা কাল। ভয়ানক চিৎকার করিতে পারে। চিৎকারের শব্দ অনুসারে—"কোড়ড়"—ইহাদের নামকরণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহাদের চিৎকারে সফরীর জ্বর হয়, সেই প্রকারের জ্বরকে কুটজ্বর বলে। একথা কত দূর সত্য, আমি বলিতে পারিব না।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। মানব-প্রকৃতি। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম-এ প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ; ৬৪ নং অখিল মিস্ত্রীর লেন, হিন্দু-মেসিন প্রেসে শ্রীহরিদাস ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। এই একখানি পুস্তক লিখিয়া ক্ষীরোদ বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর হইয়াছেন। যদিও ইহা মৌলিক গ্রন্থ নহে, কিন্তু ভাষার লালিত্যে ইহা উপন্যাসের ন্যায় চিত্ত-আকর্ষক হইয়াছে। মানব প্রকৃতি ক্রম-বিকাশশীল, ডারুইন, ওয়ালেস্, স্পলি, রোমানিস্, মেন, লবক, স্পেন্সার, টাইলার, মিবার্ট, গালটন, হুইটলি, মোক্ষমূলর, সেইস প্রভৃতি মহা পণ্ডিতগণ যে বিষয়ের অভিব্যক্তির জন্য বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এই একখানি গ্রন্থে তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। এরূপ পাণ্ডিত্য এবং গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অতি বিরল। বহু দিন পর এইরূপ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হইল, ইহাতেই বাঙ্গালী পাঠকের মনের গতি বুঝা যায়। ক্ষীরোদ বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন পরম ভক্ত। ইহার উন্নতির জন্য তাই, এখনও, এরূপ পুরস্কার প্রাপ্তির পরও প্রভূত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতেছেন। ক্ষীরোদচন্দ্র আমাদের পরমবন্ধু, অধিক কথা লিখিতে তজ্জন্য কিছু সঙ্কুচিত। ক্ষীরোদ বাবুর ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন করেন, ইহা দেশের পরম সৌভাগ্য। মানব-প্রকৃতি বাঙ্গালা ভাষায় অমূল্য গ্রন্থ।

২। আদর্শ কবিতা। শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বসু, বি এ বিরচিত। মূল্য।০; সিটি-বুক সোসাইটী,—নবাভারত প্রেস, ১/৩ শঙ্কর ঘোষের লেন, শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত। আদর্শ কবিতায় মোট ত্রয়োদশটী বিষয় লিখিত হইয়াছে। আমরা সমস্ত পুস্তক খানি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি। বিষয় গুলি এমন প্রাঞ্জল ও সুললিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে যে, কেবল বালকগণ নয়, বালকগণের অভিভাবকগণেরও ইহা পাঠে উপকার হইবে। কেমন সুন্দর সুন্দর কবিতা ইহাতে আছে, দুই একটী স্থল হইতে নমুনা তুলিয়া দিতেছি।

অনাথনাথ—

"বরষার ঘন মেঘ ঘিরেছে আকাশ;
শন্ শন্ মহাবেগে বহিছে বাতাস।
ঝম ঝম বারিধারা ঝরে অবিরল;
কল কল খরস্রোতে ছুটিয়াছে জল।
মাঝে মাঝে কড় কড় গরজে অশনি,
বিদ্যুৎ প্রভায়, ঘন চমকে ধরণী।
এ হেন সময়ে, কোন বিজন কুটীরে
তৈলহীন দীপ এক জ্বলে ধীরে ধীরে।
রোগ-শয্যা'পরে, সেথা, নারী একজন
করিছেন অবিরাম অশ্রু বিসর্জ্জন
বিশুষ্ক মুরতি তাঁর, নেত্র জ্যোতিহীন,
রুক্ষ কেশ, ছিন্ন বেশ, বদন মলিন।

অষ্টম বর্ষীয় এক শিশু সুকুমার
পদতলে বসি তাঁর ফেলে নেত্রাসার।
সহজে সরল শিশু চিন্তা নাহি চিতে,
কেন যে কাঁদে মাতা না পারে বুঝিতে।
তথাপি মায়েরে তার হেরিয়া কাতর,
নীরবে নয়ন-ধারা ফেলে দরদর।"

বর্ণনা কেমন স্বাভাবিক, কেমন হৃদয়-স্পর্শী। অনাথ-নাথ পড়িবার সময় আমরা অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারি নাই।

যোগীন্দ্রনাথের স্কুল-পাঠ্য কবিতার ইহা দ্বিতীয় চেষ্টা। কবিতাপ্রসঙ্গ অপেক্ষাও ইহার অনেক স্থান ভাল হইয়াছে। স্কুল পাঠ্য হওয়ার সম্পূর্ণ উপযোগী। কর্ত্তৃপক্ষ এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক খানিকে সাদরে গ্রহণ করিয়া এদেশের বালক বালিকার উপকার করিবেন, আমরা আশা করি।

৩। ভারতবর্ষীয় ইষ্ট্যাম্প বিষয়ক ইং, ১৮৯৯ সালের ২ আইন। শ্রীগুরুগোবিন্দ পাট্টাদার, বি-এল উকীল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, ১/৩ নব্যভারত প্রেস, শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য ৸০। রাজবাড়ী, (ই বি-এস-আর) প্রাপ্তব্য। রয়াল আটপেজী ফর্ম্মার ৩০ ফর্ম্মায় পুস্তক খানি সমাপ্ত। অনুবাদ, টীকা, নজির প্রভৃতি সমস্ত এই সংস্করণে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গৃহীমাত্রেরই নিত্য প্রয়োজনীয় এই সুলভ আইন খানি সর্ব্বত্র আদৃত হইবে, আমরা আশা করি। গুরুগোবিন্দ বাবু এই সংস্করণ খানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন।

৪। ফুলের বাগান। শ্রীহারাণ চন্দ্র রক্ষিত প্রণীত ও সম্পাদিত, ১৭ নন্দকুমার চৌধুরীর লেন, কালিকা যন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত, মূল্য ১৲। হারাণ বাবু ... সহোদর ... বিহারী রক্ষিতের রচনার সম্মিলনে এই পুস্তক প্রকাশিত। আটটী গল্প, ...টী প্রবন্ধ এবং ২টী সমালোচনা-প্রবন্ধ এই পুস্তকে আছে। বিপিন বিহারীও তাঁহার জ্যেষ্ঠের ন্যায় সুকবি। এই গ্রন্থ গদ্যে লিখিত, কিন্তু তাহাতে কবিত্বের যথেষ্ট সমাবেশ হইয়াছে। পুস্তক খানি ভ্রাতৃ-যুগলের সাহিত্য-সেবার উজ্জ্বল কীর্ত্তি। পড়িয়া সুখী হইলাম।

৫। স্বর্গ ও নরক। শ্রীগিরীশ চন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত, রঙ্গপুর জয়যন্ত্রে শ্রীগোপাল চন্দ্র আচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত। ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। রচনা উচ্চদরের না হইলেও লেখক যে একজন ভাবুক ব্যক্তি, তাহার পরিচয় পাইলাম।

৬। ভবভূতি ও তাঁহার বাক্য। শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ প্রণীত, সান্ন্যাল এণ্ড সন্‌স, ২৩ডাক্তারের লেন। এই পুস্তক খানি বিশেষ যত্নের সহিত পাঠ করিলাম। নবোদিত সূর্য্যের কিরণের ন্যায় গ্রন্থকারের প্রতিভা-কিরণের উজ্জ্বল জ্যোতি এই পুস্তকে বিকীরিত হইয়াছে। গভীর গবেষণা, পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার বিশেষ পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রন্থকার বঙ্গীয় সাহিত্যে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করুন।

৭। শান্তিকুসুম। শ্রীশশিভূষণ মজুমদার প্রণীত, মূল্য।০। বরিশাল সত্য প্রকাশ যন্ত্র। ছাপা খারাপ, লেখাও নীরস। এ পুস্তক স্কুল-পাঠ্য শ্রেণী-ভুক্ত হইবার যোগ্য নয়।

৮। বীণা। শ্রীহরিদাস ঘোষ প্রণীত, মূল্য ১৲। হরসুন্দর যন্ত্র। পুস্তকের ছাপা এবং কাগজ অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু হইলে কি হয়, ইহাতে না আছে কবিত্বের সৌন্দর্য্য, না আছে ভাষার লালিত্য, না আছে ছন্দের পারিপাট্য—না আছে যতির পরিশুদ্ধি। মনোযোগ করিয়া সমস্ত পড়িলাম, কিন্তু মনে হইল যে, সমস্ত সময় বৃথা গেল।

রাবণের ধর্ম্মদীক্ষা।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাবণের চরিত্র অত্যন্ত উদ্ধত ছিল। জানকীর অপহরণ প্রয়াসই তাঁহার চরিত্রের প্রধান কলঙ্ক। আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে উক্ত কলঙ্ক বিমোচিত করিবার কোন চেষ্টা করিব না। বাল্মীকি স্বয়ংই জানকীকে লঙ্কানগরীতে বহুকাল অবস্থিতি করাইয়া এবং জানকীর চরিত্রের সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্কত্ব বর্ণন করিয়া রাক্ষসাধিপতি দশাননের চরিত্রের মাহাত্ম্য প্রকারান্তরে প্রকটিত করিয়াছেন। বাল্মীকির পরবর্ত্তী কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণও সীতার চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া সেই প্রসঙ্গে রাবণের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিয়াছেন।

আমি এস্থলে লঙ্কাবতারসূত্র নামক এক খানি প্রাচীন বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থের মত অবলম্বন করিয়া রাবণের ধর্ম্মদীক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহা পাঠ করিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন, লঙ্কাধিপতি বোধিসত্ত্ব রাবণ কিরূপ ধার্ম্মিক ও ভক্তিমান নরপতি ছিলেন।

এক সময়ে ভগবান বুদ্ধ সমুদ্রতীরবর্ত্তী লঙ্কানগরীর মলয়শিখরে বিহার করিয়াছিলেন। ঐ নগর বিবিধ রত্ন ও পুষ্প ইত্যাদি দ্বারা পরিশোভিত ছিল। তদানীং ভগবানের সহ এক মহৎ ভিক্ষুসংঘ অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা জ্ঞানী এবং বিবিধ বুদ্ধক্ষেত্র হইতে সমাগত। সেই সকল ভিক্ষু বোধসম্পন্ন ও মহাতেজস্বী। তাঁহারা অনেক প্রকার সমাধি, বশিতা, বল ও অভিজ্ঞা প্রভৃতিতে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাহারই এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভগবান বুদ্ধ সাগর নামধেয় নাগরাজের ভবন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কোটিসংখ্য নাগকন্যা দ্বারা সমাদৃত ও সমাহূত হইয়া লঙ্কাদ্বীপে আগমন করেন।

তিনি মলয়শিখর অবলোকন করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন :—

"সম্যক বোধসম্পন্ন ও পূজ্য পূর্ব্বতন অর্হদ্গণ এই লঙ্কাপুরীর মলয়শিখরে আসীন হইয়া ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। আমিও এই স্থলে রক্ষোযক্ষাধিপতি রাবণকে সম্বোধন করিয়া এই সকল বিষয় উদ্ভাবন পূর্ব্বক ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিব।"

এই সময়ে দশাননও ভগবানের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং বলিলেন:—

"আমি গিয়া প্রার্থনা করতঃ ভগবানকে লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করাই; দেবতা ও মনুষ্যদিগের প্রয়োজন, হিত ও সুখবিধানের নিমিত্ত আমার জীবন সুদীর্ঘ হউক।

অনন্তর যক্ষরাক্ষসাধিপতি রাবণ শুক ও সারণ নামক অমাত্যদ্বয়ের সহ সপরিবারে পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্ব্বক যেস্থলে ভগবান বিরাজিত ছিলেন, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। বিমান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সপরিবারে তিনবার ভগবানকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তূর্য্য প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদন করতঃ ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা উদ্ভাসিত দণ্ড হস্তে ধারণ পুরঃসর প্রবালখচিত ও উত্তম বসনে আচ্ছাদিত বীণা পার্শ্ব

দেশে স্থাপন করিয়া হর্ষসহকারে ষড়্জ প্রভৃতি পঞ্চবিধ স্বরে সংগীত আরব্ধ করিলেন।

"হে নায়ক! আপনি এখানে আমাদের চিত্ত স্বভাবকে বিনীত করিবার নিমিত্ত বিধি-সঙ্গত, বিরুদ্ধ-মত হীন ও নির্ম্মল ধর্ম্মনীতির উপদেশ প্রদান করুন। হে মুনে, আপনি লঙ্কায় গমন করিয়া নির্ব্বাণ ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করুন। এই লঙ্কানগরী পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুদ্ধগণ ও তাঁহাদের সন্তান সন্ততি দ্বারা অধিষ্ঠিত। হে নাথ, এখানে পরমধর্ম্মের উপদেশ করুন। বহুরূপধারী রক্ষোযক্ষগণ আপনার ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছে।

আমি দশগ্রীব রাক্ষসেন্দ্র রাবণ এখানে উপস্থিত হইয়াছি। অতএব হে প্রভো, লঙ্কায় আগমন করিয়া আমাকে আর এই সকল পুরবাসীকে অনুগৃহীত করুন।

পূর্ব্ববর্ত্তী সম্বুদ্ধগণ রত্নখচিত মলয়-শিখরে অবস্থিতি করিয়া লঙ্কাপুরে প্রত্যাত্ম-গতি-গোচর ধর্ম্ম প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ভগবান্ও সেই রত্নমণ্ডিত শিখরে জিন-পুত্রগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া বিরজঃ ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করুন। এই লঙ্কাপুরী দিব্যরত্নে বিভূষিত, ইহার পর্ব্বত সকল শীতল ও রমণীয়। হে ভগবন, রাগদ্বেষ-নির্মুক্ত প্রত্যাত্মগতিচিন্তক যক্ষরক্ষোগণ এখানে বাস করিতেছেন। কুম্ভকর্ণ প্রমুখ রাক্ষসগণ মহাযান ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছেন। হে মুনে, আমাদিগের প্রতি অনুকম্পা করিয়া জিনপুত্রগণের সহিত গমন করুন।

আমি বুদ্ধগণের ও জিনপুত্রদিগের আজ্ঞাকারী। হে মহামুনে, আমার এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আপনার দেয় নহে। আমার প্রতি আপনি অনুকম্পা করুন।"

ত্রিলোকেশ্বর ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন "হে যক্ষরাক্ষসেন্দ্র, অতীত নায়কগণ এই রত্নময় পর্ব্বতে প্রত্যাত্ম ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনাগত বুদ্ধগণও এই রত্নময় পর্ব্বতে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন। ইহা দৃষ্টধর্ম্মবিহারী যোগিগণের স্থান। হে যক্ষেন্দ্র, আপনি আমার ও অন্যান্য সুতগণের অনুকম্পার পাত্র।"

এই কথা বলিয়া ভগবান্ কিছুক্ষণ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর রাবণ কর্ত্তৃক আনীত রথে আরোহণ পূর্ব্বক রাবণ এবং অন্যান্য বিশারদ জিনপুত্রগণের সহ অপ্সরাগণের হাস্যনৃত্যগীতাদিতে আপ্যায়িত হইয়া লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিলেন। রাবণ প্রভৃতি যক্ষবর্গ, যক্ষিণী ও যক্ষকন্যাগণ রত্নাদি দ্বারা ভগবানকে পূজা করিলেন। রাবণ ভগবান বুদ্ধের এবং জিনপুত্রগণের মস্তক রত্নবিভূষিত হার দ্বারা সুশোভিত করিলেন। ভগবান্ জিনপুত্র-গণের সহ পূজা গ্রহণ করিয়া প্রত্যাত্মগতি-গোচর ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন।

অনন্তর দশানন কৃতাঞ্জলি পুটে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"ভগবন্, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কাহাকে বলে এবং কিরূপে জীব ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পর পারে গমন করিতে পারে?"

তখন ভগবান্ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন। রাবণ কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে বলিলেন, "ভগবন্, পূর্ব্ব বুদ্ধগণের নিকট আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ের কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। আপনার এই সুমধুর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। আমি আপনার শরণাগত

হইলাম। আজ হইতে আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের আশ্রয় লইলাম।" তদনন্তর রাবণ ভগবানের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ১০৮টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশ্নগুলি এই :—

(১) তর্কের প্রণালী কিরূপ?
(২) ভ্রান্তি কিরূপে উৎপন্ন হয়?
(৩) কাহারা তীর্থিকপদ বাচ্য?
(৪) জিনপুত্র কাহাকে বলে?
(৫) জীবন্মুক্ত ব্যক্তির পরিণাম কি?
(৬) সংসার বন্ধনে আবদ্ধ লোক কিরূপে মুক্তি লাভ করে?
(৭) ধ্যানের বিষয় কি? ইত্যাদি।

রাবণের প্রশ্ন সমূহ শ্রবণ করিয়া ভগবান্ পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে সমুদায় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন। রাবণের প্রশ্নমধ্যে দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই অন্তর্নিহিত ছিল। রাবণের প্রশ্ন সমূহ ও ভগবানের উত্তর পরম্পরা পাঠ করিয়া প্রাচীন ভারতের অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়।

এই লঙ্কাবতার গ্রন্থ কতকাল পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে। বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভগবান্ বুদ্ধ রাবণকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া লঙ্কাবতার সূত্র বিরচিত হইয়াছিল। চীনদেশীয় ইতিহাস পাঠে জানা যায়, লঙ্কাবতার গ্রন্থ তিন বার চীন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। ৪৪৩ খ্রীঃ অব্দে গুণভদ্র, ৫১৩ খ্রীঃ অব্দে বোধিরুচি এবং ৭০৪ খ্রীঃ অব্দে শিক্ষানন্দ নামক পণ্ডিত সংস্কৃত লঙ্কাবতার চীন ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনপরিব্রাজক হুয়েন্ সাঙ্ ভারত ও সিংহল দেশে পরিভ্রমণ করেন। তিনি স্বীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালে লঙ্কামলয় শিখরে আসীন হইয়া ভগবান্ বুদ্ধ লঙ্কাবতার সূত্রের উপদেশ প্রদান করেন।

৮ম শতাব্দীর শেষভাগে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তভাষ্যে লঙ্কাবতার সূত্রের মত উদ্ধৃত ও খণ্ডিত করিয়াছেন।

১৪শ শতাব্দীতে মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের বৌদ্ধ দর্শন পরিচ্ছেদে লঙ্কাবতার সূত্রের উল্লেখ ও ভগবান্ বুদ্ধের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

১২শ শতাব্দীতে উদয়নাচার্য্য আত্মতত্ত্ববিবেক বা বৌদ্ধধিকার নামক গ্রন্থে বৌদ্ধদর্শনের মত সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করিয়াছেন।

১৫শ শতাব্দীতে রঘুনাথ শিরোমণি নামক সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া মিথিলায় দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করেন। উক্ত নৈয়ায়িক শিরোমণি আত্মতত্ত্ব বিবেকের বিশদ ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন।

অনেকে বলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম ১০ম বা ১১শ শতাব্দীতে ভারত হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যদি চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বৌদ্ধগণের তাৎকালিক আচার ব্যবহার বর্ণন করিতে পারিতেন না। উদয়নাচার্য্যের সময়ে যদি বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে তিনি বৌদ্ধধিকার গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। বস্তুতঃ উদয়ন

ও মাধব বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে শেষ কুঠার নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন।

আমি তিব্বত হইতে "কাবাব ডুন্ দেন্" বা "সপ্ত আজ্ঞা পূরণ" নামক একখানি হস্ত লিখিত গ্রন্থ আনিয়াছি। উহা সুপ্রসিদ্ধ তিব্বতীয় লামা তারানাথ কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছিল। ইহাতে তান্ত্রিক ধর্ম্ম ও ভাবতের ইতিবৃত্ত উভয়ই লিপিবদ্ধ আছে। ইহা পাঠ করিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন, বুদ্ধদেবের প্রচারিত সুবিমল ধর্ম্ম কাল সহকারে কিরূপ কুসংস্কার পরিপূর্ণ ও হেয় হইয়া পড়িয়াছিল। এই গ্রন্থে ১১শ শতাব্দী হইতে ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম কালের পরিণামে নিম্ন শ্রেণীর লোকমধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। ডোম, ইষুকার প্রভৃতি জাতীয় লোকই এই ধর্ম্মের শেষ আশ্রয় স্থান। ত্রিপুরা, উড়িষ্যা, ধান্যকটক, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম বিরাজিত ছিল। এই গ্রন্থে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের যেরূপ ঘৃণিত ও পৈশাচিক ব্যবহার বিবৃত আছে, তাহাতে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন যে, কলুষিত বৌদ্ধধর্ম্মের সমূল সংহারই উক্ত উন্নত ধর্ম্মের গৌরবব্যঞ্জক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাশ।

পূজ্যপাদ ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রদত্ত উপদেশ।

হরিনাম,—"হরি" এই শব্দ মাত্র হরি নাম নহে। যে নামে যাহার পাপের হরণ হয়, তাহার তাহাই হরিনাম। দুর্গা, কালী, রাম, কৃষ্ণ, নারায়ণ,আল্লা, খোদা, বিশু,যিনি যে নামে বিশ্বাসী, তাই তাঁহার হরিনাম।

মানুষের স্বাধীনতা,—মানুষের স্বাধীনতা কিছু আছে। যদি একটা গরুর গলায় রজ্জু বাঁধা থাকে, দড়ি যতদূর লম্বা, গরু ততদূর ঘুরিতে ফিরিতে পারে। দড়ির পরপারে যাইতে পারে না। সেইরূপ মনুষ্য আপন প্রবৃত্তির বিষয় যতটুকু, ততটুকু স্বাধীন ভাবে চলিতে পারে। চক্ষুর দৃষ্টি, কর্ণের শ্রবণ,নাসিকার ঘ্রাণ প্রভৃতি শক্তি সীমাবদ্ধ। দৃষ্টি দেখে, কর্ণ শুনে, তাহার উপরে যাইবার ক্ষমতা নাই। নিজের ছেলেকে যেমন ভালবাস, অন্য ছেলেকে তেমন ভালবাসিতে পার না। হাজার চেষ্টা করিলেও অন্তরে তাহা আনিতে পার না। সুতরাং মানুষ বাঁধা গরুর মতন স্বাধীন।

মোহ অজ্ঞানতা যতদিন, ততদিন জীব আপনাকে কর্ত্তা মনে করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে। প্রত্যেক জীবের এক একটী কার্য্য আছে, সেই কার্য্য সাধনের জন্য যতটুকু স্বাধীনতার প্রয়োজন,তাহা আছে। দড়ি গাছ যতদূর লম্বা, গরু ততদূরই চলিতে পারে।

পাপ ও অনুতাপ;—কৃপা হইলে মুহূর্ত্তে পাপ নষ্ট হয়। ভোগ একদিন যাহা, শত বৎসরেও তাহা। সাধুর কৃপাতে পাপী যখন আপন পাপ অনুভব করে, তখন তাহার অনুতাপ এত প্রবল হয় যে, তাহার নিকট যন্ত্রণা তুচ্ছ। জগাই মাধাইয়ের পাপ গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভুর গৌরবর্ণ কালো হইয়া গিয়াছিল। পরে জগাই মাধাইয়ের রোদনে নবদ্বীপের পশুপক্ষী কাঁদিয়াছিল।

ক্রোধ ও তেজ ;—অভিমানজনিত হইলে ক্রোধ বলে। যদি ন্যায় ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য হয়, তবে তাহাকে তেজ বলে। তেজ মনুষ্যের ধর্ম্ম।

কলিযুগ ও শূদ্রজাতি ;—মহাপ্রভু ঈশ্বর-পুরীর নিকট দীক্ষা লইলেন, শিক্ষা লইলেন রায় রামানন্দের কাছে। লোক শিক্ষার জন্য এ সমস্ত করিয়াছেন। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। মহাপ্রভুর শিক্ষাতে আর প্রয়োজন কি ? কেবল লোক শিক্ষার উদ্দেশ্যে, জাতি গৌরব নষ্ট করিবার জন্য শূদ্র জাতির নিকট শিক্ষা লইলেন। মহাপ্রভুর নিকট কোনও ব্রাহ্মণ শিক্ষা লাভ করিতে গেলে রায় রামানন্দের নিকট পাঠাইতেন। কলিকালের নামই "শূদ্রযুগ।" এযুগে শূদ্র জাতি ধর্ম্মসাধন করিয়া মহৎ জীবন লাভ করিবে।

রথের কথা ;—রথ মনুষ্যদেহ, ইহার তিন তলা। উপর তলায় সহস্রদল পদ্মে শ্রীশ্রীবামনদেব অর্থাৎ জগন্নাথ বিরাজ করেন। বামন অবতারে ত্রিভুবন অধিকার করেন, এজন্য জগন্নাথ। এই রথে বামন-দেব দর্শন করিলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না।

মধ্য তলায় সমস্ত দেবদেবী এক এক পদ্মে ও কুটিরে বিরাজ করেন।

নীচের তলায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ-মদ, মাৎসর্য্য রিপুগণ তাহাদের পরিবার-গণের সহিত বাস করে।

বামনদেব রথে উঠিবামাত্র চারি দিকে শংখ, ঘণ্টা বাজিতে থাকে।

নীচের তলায় সিড়ি পড়ে, চারি দিক হইতে ভক্তমণ্ডলী আসিয়া ভিড় করেন। কাম, ক্রোধগণ সপরিবারে পলায়ন করে। তখন সত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গাছা প্রকাণ্ড কাছি বাঁধিয়া রথ টানা হয়। সুখ-দুঃখময় কালচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে ঠাকুর মন্দিরের নিকট হইলে কাছি খসিয়া যায়।

পরমহংসজী শ্রীরামকৃষ্ণ ;—ঢাকা হইতে কলিকাতায় গিয়া (পরমহংসদেবকে) দর্শন করিতে গেলাম। আমাকে বলিলেন যে, "তোকে নাম দিতে বলিলাম, কামিনী-কাঞ্চন হইতে তফাৎ থাকিবি, অর্থাৎ তোর স্ত্রী আছে, ব্যবহার করিবি না।" আমি বলিলাম, এখনও আমার কাম আছে। এই কথা শুনিয়া আমাকে উলঙ্গ করিয়া * * স্পর্শ করিলেন এবং বলিলেন, "যা সচ্চিদা-নন্দের আনন্দে ডুবে যা।" একি মানুষে পারে ? এসকল কথা বলিতে নাই, অপার দয়া। কেশব বাবুকে দেখিয়া আসিয়া বলি-লেন যে, "কেশব আমাকে পূজা করিয়াছে, কিন্তু ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে, উহার লোকেরা পাছে টের পায়। তা দরজা বন্ধ হইবে।"

তিনি (পরমহংসদেব) যখন বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সময় আমাকে বলেন যে, "লোককে নাম দাও।" আমি বলিলাম, আপনার নাম দিব ? তিনি বলিলেন "দিবে।" আমি ঢাকা আসিলাম, কেদার বাবুকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, "আমার নাম দিবে না, শাস্ত্রে যে সকল নাম আছে, তাহাই দিতে হইবে। যাহাকে যে নাম দিবে, আমি বলিয়া দিব।"

কাম, ক্রোধ দমন ;—যতদিন মনের কার্য্য থাকে, ততদিন স্ত্রী পুরুষের বা বিষয় বিষয়ীর আকর্ষণ থাকে। মন লয় হইলে কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকে, কিন্তু কার্য্য স্বতন্ত্র হয়, স্ত্রীলোকের সঙ্গে আকর্ষণ থাকে না। এ সম্বন্ধে আমি শাস্ত্রের কথা বলিতেছি না, আমি নিজে অত্যন্ত কামুক ও ক্রোধী

ছিলাম। এই দুই রিপু আমার অত্যন্ত প্রবল ছিল। ব্রাহ্ম সমাজে কত চেষ্টা করিলাম, গেল না। পরে সাধন লইয়াও অনেক চেষ্টা পাইলাম। সেবারে সমস্ত রাত্রি জাগিতে লাগিলাম, কেন জাগিতেছি। জানি না, শুইতে ইচ্ছা হয় না। একদিন বৃন্দাবনে ভোরে শুইয়াছি, আমার সমস্ত শরীর ছারপোকায় ধরিয়াছে, হাজার ছারপোকা; একি, আমার বোধ নাই কেন? তারপর হইতে দেখি, কাম, ক্রোধ নাই। একটা বেড়ার এক পার্শ্বে শ্রীধর, অন্য পার্শ্বে আমি, শ্রীধরের দিকে ছারপোকা নাই।

একজন ব্রাহ্ম-সাধন-প্রার্থীর প্রতি;—ব্রাহ্ম সমাজের প্রণালীতে উপাসনা এতদিন যাহা করিয়াছেন, তাহাতে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হইলে সেই প্রণালীতে যাঁহারা তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন, হঠাৎ অন্য সাধন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে, মহর্ষি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করুন।

কীর্ত্তনে নৃত্য;—কীর্ত্তনে ভাব তিন প্রকার হয়। সত্ত্ব ভাব উপস্থিত হইলে লোকের উপকার হয়। রজঃভাবে অন্য লোকের কখনও উপকার, কখনও অপকার হয়। তমঃ ভাবে উপস্থিত লোকদিগের উৎপাত বোধ হয়। কারণ তমঃগুণের নৃত্য অধিকাংশ বেতালা হইয়া হইয়া লম্ফ ঝম্ফ হয়। নৃত্যকারীর পা লাগিয়া অনেকে খোঁড়া হয়, ঘরের দ্রব্যাদি নষ্ট হয়, বালকগণ ভয় পাইয়া চিৎকার করে।

দলে থাকিলে ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত হয় না। অবিরত ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে সম্পূর্ণ ভগবানের অধীন হইয়া সত্যকে অকপটে গ্রহণ করিতে হয়, সংসারের যাহা ধর্ম্মপথের অন্তরায়, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। লোকনিন্দা, লোকপ্রশংসা অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

সত্যবাদী;—সত্যবাদী হইলে তাহাতে ১৩টী গুণ থাকিবে। ১। পরনিন্দা থাকিবেনা। ২। আত্মপ্রশংসা থাকিবে না। ৩। স্বার্থ থাকিবে না। ৪। ক্ষমা থাকিবে। ৫। শৌচ থাকিবে। ৬। অহিংসা থাকিবে। ৭। জীবে দয়া থাকিবে। ৮। ৯। পিতৃমাতৃ ভক্তি থাকিবে। ১০। সৌভ্রাত্র থাকিবে। ১১। ১২। প্রতিবেশী ও স্বদেশবাসীর প্রতি প্রেম থাকিবে। ১৩। ছলনা-রাহিত্য থাকিবে।

কয়েকটী অবস্থার কথা;—নাম করিতে করিতে যে অবস্থা হয়; অথবা যে দর্শন হয়, তাহা ধরিয়া রাখার নাম ধারণা।

হঠাৎ এক সময় কিছু খুলিয়া যাইবে না। ক্রমে লাভ হইবে। যথা প্রবল কাম কমিয়া গেলে, ক্রোধ কমিয়া গেলে, জীবে দয়া প্রকাশ পাইবে।

আত্মা প্রস্তুত হইলে তবে ভগবদ্দর্শন আরম্ভ হয়।

সংসার থাকিবে না, কাম, ক্রোধ, বাসনা এ সকল থাকিবে না।

ঈশ্বর দর্শনের পূর্ব্বে মহাপুরুষ ও দেবতা দর্শন হয়। তাহাতে হৃদয়ের বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হয় না। ভগবদ্দর্শনই লক্ষ্য।

বেদপুরাণ যত শাস্ত্র, এ সমস্ত কি ভাবে হইয়াছে, এই সকল প্রকাশ হইতে হইতেই মায়া চলিয়া যায়। তখন সমস্ত ব্রহ্মময় হয়। আবার সৃষ্টি মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন ভগবল্লীলা দেখা যায়।

জ্ঞানবান্ হইয়া যাঁর শিশুর ন্যায় অবস্থা, সেই পরমহংস।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সাবধানতা ;—স্বামী ও স্ত্রী একত্রে বসিয়া সাধন করিতে পারেন। অন্য পুরুষ স্ত্রী সেখানে থাকিবে না। অন্য স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া কখনই সাধন করিবে না। স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক স্থান থাকা উচিত। যদি একটী মাত্র ঘর হয়, তবে একটা পরদা দিয়া স্ত্রীলোক ও পুরুষের পৃথক স্থান করিতে হইবে। স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা সমস্ত সাধন ভজন নষ্ট হইতে পারে। ভাগবতে আছে :—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনে বসেৎ।
বলবান্ ইন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।

মাতা (বিমাতা প্রভৃতি) ভগিনী, কিম্বা দুহিতার সহিতও নির্জ্জনে একাসনে বসিবেনা। বলবান্ ইন্দ্রিয়গণ বিদ্বান্ ব্যক্তিকে ও আকর্ষণ করে।

একদণ্ডী ভগবানের এই বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিদ্বান্ ব্যক্তি কখনই ইন্দ্রিয়বশ হয় না। ঘটনা চক্রে ঐ দণ্ডীর আশ্রমে অন্ধকার রাত্রিতে একটী স্ত্রীলোক আশ্রয় লইয়াছিল। এবং সে গৃহান্তরে দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করিল। দণ্ডী রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রীলোকটীর অনেক সাধ্য সাধন করিল। কিন্তু রমণী কিছুতেই সম্মত হইল না। তখন দণ্ডী চালা ছিদ্র করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। কিন্তু দৈববশে ইহাতে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, ঘরের নীচেও নামিতে পারিল না, উপর হইতে বাহির হইতেও পারিলনা। প্রাতঃকালে সমস্ত লোক দণ্ডী স্বামীর ঐ দুরবস্থা দেখিয়া সকলেই বলিল "তুমিই ব্যাসের লেখা কাটিতে গিয়াছিলে?" এ অবস্থা সকলেরই ঘটিতে পারে। এজন্য সর্ব্বদা স্ত্রী পুরুষ সাবধানে থাকিতে হইবে।

কাম নিবৃত্তির একটী উপায় ;—পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিকে মানসিক দৃষ্টি রাখিয়া অন্তরে ভগবানের নাম করা। রাস্তায় মাটির দিকে চাহিয়া চলিবে এবং কর ধরিয়া নাম করিবে। ইহাতে মনোযোগ বাড়ে।

জন্মমৃত্যু ;—জন্মমৃত্যু জ্ঞান একটা মোহ। যখন জন্মমৃত্যুকে বৃক্ষপত্রের পতন ও গজানবৎ বোধ হইবে, তখনই যথার্থ আমি কি, বুঝিতে পারিবে।

জীবের ইচ্ছা ,—অনেক সময় নিজের ইচ্ছা দেখে এমন মনে হয়, উহা কিছুই নয়। যখন যাহা প্রয়োজন, ভগবদিচ্ছায় সম্পন্ন হয়। যথার্থ যদি শিশুর মতন থাকিতে পারি, তাহা হইলে মাতা সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন।

যখন চিকিৎসা করিতাম, মনে হইত, এই ঔষধটী দিলেই এই রোগ সারিবে। ক্রমে দেখিলাম, তাহা হয় না। এইরূপ দেখিতে দেখিতে বুঝিলাম যে, ঔষধ কিছুই নহে, ভগবানের কৃপা চাই। প্রচার করিতে গেলাম, প্রথমে যেখানে যাই, সমস্ত লোক একবাক্যে আমার কথা শুনে, সাহায্য করে। ক্রমে দেখি, লোকের সে ভাব নাই, আর আমার কথায় কিছু হয় না। তখন বুঝিলাম, আমার শাস্ত্রজ্ঞান ও বক্তৃতার ক্ষমতা কিছুই নহে; ভগবৎ কৃপাই সমস্ত। এইরূপ পুরুষকারে অর্থাৎ খাইয়া খাইয়া এখন বুঝিয়াছি, আমি কিছুই না, অসারের অসার। ভগবান্ই সর্ব্বময় কর্ত্তা, ঐহিক পারত্রিক বিধাতা।

আমার নিজের জীবন চিন্তা করিয়া দেখি, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই করি নাই। টোলে পড়িতাম, গোঁড়া হিন্দু ছিলাম। হঠাৎ সংস্কৃত কলেজে গেলাম। অজ্ঞাতসারে বৈদান্তিক হই-

লাম। পরে ব্রাহ্মসমাজে গেলাম। প্রচার করিলাম, চিকিৎসা করিলাম। আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি। নিজের ইচ্ছায় কিছুই হয় নাই। যতদিন পুরুষকার থাকে, ইচ্ছা না করিয়া পারে না, কিন্তু যাহা হইবার, তাহা হইবে।

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ;—সম্বন্ধ দুই প্রকার, দৈহিক ও আত্মিক। আত্মিক্ সম্বন্ধ সহজে হয় না। শোক মোহ দৈহিক সম্বন্ধ জনিত। দৈহিক শোক মোহ অনিত্য, অস্থায়ী। আত্মিক সম্বন্ধে শোক নাই, বিরহ আছে। সে বিরহ আশাজনক এবং নিত্য-কালস্থায়ী। এরূপ আত্মিক সম্বন্ধ হইলে মিলন হয়। দূরে থাকিলেও উভয়ের মধ্যে একটী সূত্রের বন্ধন থাকে, তাহাতে সর্ব্বদা মিলিত মনে হয়।

স্ত্রী পুরুষের ভগবৎ লক্ষ্য হইলে ইহারা সতী ও সৎ হয়। এই দুই ভাবের প্রেম বিশেষ ভাবে লাভ করেন। যেমন সাধুতে। সাধুতে, সেবকে সেবকে, বন্ধুতে বন্ধুতে। আত্মিক সম্বন্ধ অতি বিরল, যদি উভয় আত্মার একমাত্র লক্ষ্য হয়, তবেই আত্মিক সম্বন্ধ দাঁড়ায়; যেমন ভক্তে ভক্তে।

প্রশ্ন। জীবনের লক্ষ্য লাভ করিবার জন্য যখন বিবাহ উপায় নহে, তখন বিবাহ করায় লাভ কি?

উত্তর। লাভ কিছুই নাই, কিন্তু প্রয়োজন আছে, নিজের ভোগ কাটাইতে হইবে।

প্রশ্ন। বিবাহের পথে না যাইয়া যেদিক অবলম্বন করিয়াছি, সেই দিকে একটু মাত্রা বাড়াইয়া দেন, তবে ভাল হয় না?

উত্তর। কৃপাপ্রার্থী হওয়া বড় পরীক্ষার পথ। ভোগ করিয়া ভোগ ক্ষয় করা সহজ। কৃপার পথে একটু আসক্তি থাকিলে সে আসক্তি ছাড়িতে বড় লাগে। যদি আসক্তি না থাকে, তবে কষ্ট হয় না। (ব্যক্তি বিশেষের প্রতি) বিবাহ করিলে সাধনের ক্ষতি হইবে না, বরং না করিলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এখন শোক আছে, ইহা না থাকিলে শেষকালে নিজের প্রবৃত্তির সহিত সর্ব্বদা সংগ্রাম করা দুঃসাধ্য। এজন্য শাস্ত্র-কর্ত্তাগণ বলিয়াছেন যে,গৃহস্থাশ্রমই সাধকের দুর্গ। এখন শোকের সময়, এখন হঠাৎ (কর্ত্তব্য) স্থির করা কঠিন। বিবাহ করিলেই যে অনিষ্ট হইবে, এরূপ নহে, বরং অবস্থানুসারে বিবাহ করিলে উপকার হয়। নিজের যে বিষয়ের ভোগ আছে, তাহা না হইলে বিষয়ে পুনঃ পুনঃ টানে। এজন্য অনেক সন্ন্যাসী বহু বৎসর বনে, গুহায় অনাহারে তপস্যা করিয়াও পুনঃ সংসার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। নিজের চিত্ত বুঝা কঠিন। স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া সংসার করা পাপ নহে। সংসার ক্ষয় করিবার জন্য সংসার করিলে উপকার হয়।

স্ত্রীপুত্র,বিষয় কর্ম্ম থাকিলে ধর্ম্ম হয় না, তাহা নহে। তবে যদি বাস্তবিক বৈরাগ্য হয়, তাহাতে সমস্ত ছেদন করিয়া সন্ন্যাসের অবস্থা হয়। সে অবস্থা কর্ম্ম থাকিতে হয় না।

স্ত্রীর মৃত্যু হইলে বিবাহ করিতে নিষেধ নাই।

মতান্তরে বিচ্ছেদ;—মতান্তরে বিশেষ হৃদয়-বন্ধুর সহিতও বিরোধ হয়। বন্ধু শত্রু হন। বিরুদ্ধ মতকে ঘৃণিত করিবার জন্য সেই মতাবলম্বী লোকদিগের উপর লোকেরা মিথ্যা দোষারোপ করে, চরিত্রে কলঙ্ক দেয়, এজন্য খ্রীষ্টসমাজে কত নরহত্যা হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজেও অনেক ঘটনা হইয়াছে। এই

মতের ধর্ম্ম বিদায় না হইলে সত্য ধর্ম্মের শোভা বিস্তার হয় না।

শক্তি সঞ্চার ;—ঈশ্বরের শক্তি সকলের মধ্যেই আছে, একটী মহাপুরুষের প্রবল শক্তি দ্বারা সেই শক্তিকে (যাহাকে পরমাত্মা বা কুলকুণ্ডলিনী বলে) জাগরিত করিয়া দেওয়াকেই শক্তি সঞ্চার বলে। ঐ শক্তি সাধারণতঃ নিদ্রিতাবস্থায় থাকে। শক্তি সঞ্চার দ্বারা জাগরিত করিলেও পুনরায় উহা নিদ্রা যাইবার জন্য চেষ্টা করে। যাঁহারা অনবরত শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম করিয়া উহাকে আর ঘুমাইতে দেন না, তাহাদের শক্তি বেশ খেলিতে থাকে।

সমাধির মধ্যে ভক্তি ;—আম পঁচিলে কাটিয়া ফেলিয়া দেয়, কিন্তু আঁটিটী নষ্ট হয় না। কাঁচা আম পাকাইলে পঁচিয়া যায়। কিলাইয়া কাঁটাল পাকাইলে তাহা পোকায় ধরে, পঁচিয়া যায়। উজ্জ্বল নিশান উড়িয়াছে, ডঙ্কা পড়িয়াছে, শিশুদের কাজ ঘুম, ঘুম ভাঙ্গাইওনা, যেন তাহারা পুনরায় না ঘুমাইতে চায়।

সেবা অর্থ সাধু খাইয়া ফেলা ; হাড় খাওয়া,মাংস খাওয়া, যেমন খ্রীষ্ট বলিয়াছেন। খাওয়াইলে সেবা হয় না। "যাহারা প্রথম আসিয়াছে, তাহা পরে যাইবে, যাহারা পাছে আসিয়াছে, তাহারা আগে যাইবে।"

সাধনের প্রশস্ত সময় ;—মহাপুরুষেরা রাত্রি ১॥ টার সময় বাহির হন এবং ৪টা পর্য্যন্ত থাকেন। এই সময় রাত্রি জাগা অভ্যাস করা উচিত। এই সময় সাধনের প্রশস্ত সময়। দুই একবার প্রাণায়াম করিয়া নাম করিবে। কোন স্থানে বসিয়া কি মশারির মধ্যে বসিয়া করিলেও হয়। নাম করার সময় মহাপুরুষেরা কাছে আসিয়া দাঁড়ান এবং সাহায্য করেন। যাঁহারা এইরূপ সাধন করেন, তাঁহারা হয়ত কেহ বা গন্ধ, কেহ বা স্পর্শ,এক ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ করেন। আর যাহারা কুকাজ করে, তাহাদের নিকট হইতে মহাপুরুষেরা চলিয়া যান। যাহারা নিদ্রা যায়, তাহাদের নিকট হইতেও প্রস্থান করেন।

তমঃবৃদ্ধি ;—নিদ্রা যাইতে যাইতে তমঃগুণ বৃদ্ধি পায় এবং তমঃগুণে অহঙ্কার আনয়ন করে। অহঙ্কার সকলই নষ্ট করে। এই অহঙ্কার নষ্ট করার উপায় জীবের সেবা। পশু পক্ষীরও পায়ে নমস্কার করিতে হইবে। এমন কি,বিষ্ঠার পোকাকেও ঘৃণা করিবে না। যেমন নক্ষত্র ছুটিয়া পড়ে, তেমনি অহঙ্কারে যোগীদের হঠাৎ পতন হয়। ক্রমশঃ

ইতিহাস-ঘটিত বিচার।

আদিশূর দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে বেদবিহীন ও ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য দেখিয়া কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, লোকের মন হইতে এই ভ্রম দূরীকরণ পূর্ব্বক সত্য সংস্থাপনার্থ বিচার।

সপ্তশতী শ্রোত্রিয়।

চতুর্দ্ধাঃ শ্রোত্রিয়া জ্ঞেয়া সিদ্ধ সাধ্য স্থসিদ্ধকাঃ।
অরিরপ্যপরো জ্ঞেয়ো যথার্থং নামতঃ শৃণু ॥
সিদ্ধাঃ সিধ্যন্তি কালেন সাধ্যাঃ সিধ্যন্তি বানবা।
সুসিদ্ধা দোষরহিতা অরয়ঃ কুলনাশকাঃ ॥

বাচস্পতি মিশ্রকৃত কুলরাম।

ভাবার্থ।

ঘটকেরা যাঁহাদিগকে বর্ত্তমানে শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া বোধ করিলেন না, কিন্তু ভবিষ্যৎকালে সৎকর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারিবেন, এইরূপ বিবেচনা করিলেন, তাঁহাদিগকে সিদ্ধ শ্রোত্রিয়, এই সংজ্ঞা প্রদান করিলেন। আর যাঁহারা প্রথমে শুদ্ধ-শ্রোত্রিয় ছিলেন না, পরে সৎকর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারিবেন কিনা, যাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইল, ঘটকেরা তাঁহাদিগকে সাধ্য-শ্রোত্রিয় পদে অধিষ্ঠিত করিলেন। আর যাহাদিগের কন্যা-গ্রহণ করিলে এককালীন কুলীনের কুলধ্বংস হইয়া যাইবে, স্থির করিলেন, তাঁহাদিগকে কুলের অরি বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। পরন্তু ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানে যাঁহাদিগকে কখন দোষস্পর্শ করে নাই ও করিবেনা, যাহাদিগের প্রতি এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, ঘটকেরা সেই সকল স্বাভাবিক নিত্যশুদ্ধ ব্যক্তিকে সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয় পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

সন ১৩০৫ সালের ১০ই বৈশাখের এডুকেশন গেজেটে উল্লিখিত চারি প্রকার শ্রোত্রিয়ের মধ্যে সপ্তশতীগণ কুলীনগণের শিরোভূষণ বলিয়া বর্ণিত থাকায় এবং দোষ-রাহিত্য প্রযুক্ত তাঁহারাই সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয়। আর কুলীনগণের নিম্নে ক্রমশঃ অধোভাগে কুলপর্ব্বতের অঙ্গস্বরূপ যে সকল শ্রোত্রিয় আছেন, তাঁহারাই সিদ্ধ সাধ্য এবং অরি।

ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির শ্রোত্রিয় সন্তানগণ দোষরহিত হইলে কুলীনদিগের উপরি অবস্থান করিতে পারিতেন, না হয়, তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইতেন, অন্ততঃ কুল-পর্ব্বত-বর্ণন সময় তাহাদিগের মধ্যে কেহ সুসিদ্ধ-শ্রোত্রিয় পদে অধিষ্ঠিত হইতেন।

পুরাস্মিন বঙ্গদেশে সপ্তশতী সংজ্ঞকাঃ
কেবল সেক শ্রেণী সন্ত্যা ব্রাহ্মণা আসন।
মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ॥

সম্বন্ধ নির্ণয় নামক পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, আদিশূরের প্রভাবে যখন পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান হয়, তখনও সমস্ত বঙ্গদেশ মধ্যে সাতশত ঘরের অধিক ব্রাহ্মণ ছিল না।

প্রতিবাদ।

উপরি লিখিত সকল কথা গ্রন্থকার-দিগের স্বকপোল-কল্পিত ও অপ্রামাণিক। বাবণ রাজা আদিশূরের যজ্ঞের পূর্ব্বে এ দেশে ব্রাহ্মণেরা দশ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বেদপাঠ করিতেন, এই জন্য সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে বৈদিক বলিয়া জানিত। বৈদিক এই শব্দটী শ্রেণীবাচক নহে। যেমন তার্কিক, বৈদান্তিক প্রভৃতি বিদ্যাঘটিত উপাধি, বৈদিক শব্দটীও তদ্রূপ বিদ্যাঘটিত উপাধি। বৈদিক শব্দের অর্থ শ্রোত্রিয়। যেমন ব্রাহ্মণেরা রাজদত্ত গ্রাম প্রাপ্ত হওয়ায় সেই সেই গ্রামের নামানুসারে ব্রাহ্মণদিগের গাঞি হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পূর্ব্বে যিনি যে প্রদেশ হইতে রাঢ় বা বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তিনি সেই প্রদেশের নাম উল্লেখ করিয়া স্ব স্ব শ্রেণীর পরিচয় দিতেন, এইরূপে রাজা আদিশূরের যজ্ঞের পূর্ব্বে রাঢ়ে বঙ্গে দশ শ্রেণীর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিরাজিত ছিলেন।

প্রমাণ।

আদিশূরের যজ্ঞের পূর্ব্বাবধি যাঁরা,
এ দেশেতে বিরাজিল দশ শ্রেণীতে তাঁরা।

সে দশের নাম শুন শুদ্ধ বুদ্ধি-বল।
সারস্বত কান্যকুব্জ গৌড় উৎকল॥
মৈথিল বিন্ধ-উত্তর-দেশবাসী দ্বিজ।
পঞ্চেরে গণিল বিধি পঞ্চ গৌড় বীজ॥
কর্ণাট তৈলঙ্গ অন্ধ্র দ্রাবিড়ী গুর্জ্জর।
বিন্ধের দক্ষিণে পঞ্চ বিপ্রের নিভর॥
এ দশের সাধারণ নাম কান্যকুব্জ।
তারাই বেদপাঠ বৈদিক বিপ্র অজ্ঞ॥

নুলোপঞ্চানন কৃত ২য় কারিকা, দ্বাদশ প্রকার ব্রাহ্মণ বর্ণনা॥

পদে পদে সর্ব্বতোভাবে সপ্তশতীর গৌরব প্রদর্শন করায় নুলোপঞ্চাননকে অনেকে সপ্তশতী বিবেচনা করেন, এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ এই স্থলে নুলোপঞ্চাননের পরিচয় লিখিত হইল।

চট্টবংশাবতংস দিনকরের পৌত্র।
চৈতলীর পঞ্চানন শোত্রিয় দৌহিত্র॥
পঞ্চানন গোষ্ঠীকথা সবজাতি লয়ে।
বেঁচেছিল শতবর্ষ পরমায়ু হয়ে॥

কুলচন্দ্র ঘটকের কারিকা॥

উপকারিতা ও তেজস্বিতা।

যখন রাজা বল্লাল সেন রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ করেন, তখন রাঢ় দেশে ৭৫০ জন ব্রাহ্মণ এবং বরেন্দ্র দেশে ৩৫০ জন গণনাতে পাইয়াছিলেন। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কেবল সদাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে স্বরাজ্যে রক্ষা করিবেন, তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। তাহাতে বরেন্দ্র দেশ হইতে আড়াই শত ব্রাহ্মণ নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, রাঢ় দেশ হইতে একজনও নির্ব্বাসিত হয়েন নাই।

বরেন্দ্রে তু তদা সার্দ্ধ ত্রিশতান্যগ্রজন্মনঃ।
রাঢ়ায়ান্ত দ্বিজাশ্চাসন্ সার্দ্ধান্তোধি শতানি চ॥
বরেন্দ্র-বাসি বিপ্রাণাং মধ্যে চৈকশত দ্বিজাঃ।
বরেন্দ্রে রক্ষিতা রাজ্ঞা সদাচার পরায়ণাঃ॥

দ্বিশতাধিক পঞ্চাশদ্ বারেন্দ্রনাং দ্বিজন্মনাং।
পঞ্চাশন্মধ্যে ষষ্টি ভোটে ষষ্টিরভঙ্গকে॥
চত্বারিংশ দুৎকলে চ মৌড়ঙ্গেঽপি তথাষ্টকাঃ।
দত্তা নৃপতি না হষং বল্লালেন মহাত্মনা॥

গৌড়ে ব্রাহ্মণ পুস্তকের ৮৮ পৃষ্ঠা।

বল্লাল যবে করে রাঢ়ী বারেন্দ্র অংশ।
রাঢ়ী বারেন্দ্র হইল এগারশ বংশ॥
রাঢ়ী সাত শত সাড় বারেন্দ্র চারিশেন।
বারেন্দ্র সাড়ে তিনশ সাড়ে সাতশ রাঢ়ীগণ॥
রাঢ়ীমধ্যে কতক আদানে অপ্রদানী।
বারেন্দ্র পাতকী রাজদণ্ডে নির্ব্বাসনী॥

সম্বন্ধ নির্ণয়, ৩২২।৩২৩ পৃষ্ঠা।

নির্ব্বাসন কার্য্য সমাধা করিতে রাজা বল্লাল সেনের যে কয়েক বৎসর সময় অতীত হইয়াছিল, সেই সময়ের মধ্যে যখন কতকগুলি নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, আর কতকগুলি অবশিষ্ট ব্রাহ্মণের নির্ব্বাসিত হইবার উপক্রম ঘটিয়াছিল, তখন ঐ অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ সাতশতীর সহিত কন্যা আদান প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রমাণ।

মঘী মোড়ঙ্গ দেশে ত্রিশ মাত্র যায়।
নির্ব্বাসনে ঘটে এই রীতি ভাটে কয়॥
এরা (অবশিষ্টেরা) আদান প্রদানে সাতশতী-দলে।
মিশে বৈদিক বারেন্দ্রে আর উত্তরেতে বলে॥

সম্বন্ধ নির্ণয়, ৩২৩ পৃষ্ঠা কুলজ্ঞ কারিকা॥

এখন বল দেখি, নির্ব্বাসন সময়ে সাতশতীর সহিত কন্যা আদান প্রদানের ফল কি?

উত্তর।—মহাতেজস্বী সাতশতীর সম্পর্ক থাকিলে রাজভয় থাকে না। ক্ষিতীশাদির বংশোদ্ভব রাঢ়ী বারেন্দ্র উভয়ের সমান মান। তবে কেন রাঢ়ী সাড়ে সাতশত জনের মধ্যে কেহই নির্ব্বাসিত হইল না, একটী লোকও কি দোষী ছিল না? ইহা কে মনে বিশ্বাস করিতে পারে? বারেন্দ্র

সাড়ে তিন শত জনের মধ্যে আড়াই শত লোক নির্ব্বাসিত, এইরূপ যখন দেখা যাইতেছে, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, রাঢ়ীয়গণ সাতশতীর দৌহিত্র। এদিকে সাতশতীগণ মহাতেজস্বী। এমন কি, রাজা পর্য্যন্ত সকল লোকেই সাতশতীর নামে ভীত হইতেন। এই কারণে রাজা বল্লাল সেন রাঢ়ীয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল বারেন্দ্রগণকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। এই জন্য বলা গিয়া থাকে—

সাধে কি বল্লাল সেন রাঢ়ীগণ ত্যজে।
রাজদূত পলাইত সাতশতীর তেজে॥
নির্ব্বাসন হইতে রক্ষা সাতশতী করে।
জাতি, কুল, মান, প্রাণ সাতশতী করে॥

ফলতঃ সাতশতীর তেজস্বিতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে তদনুকূলে রাঢ়ী বারেন্দ্র সমস্ত কুলশাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সাতশতীগণ রাঢ়ীয় পঞ্চ গোত্রের কেবল মাতুল নহেন, অন্নদাতা, আশ্রয়দাতা বেদশিক্ষার গুরু ছিলেন। সেইজন্য রাঢ়ী কান্যকুব্জ সন্তান সমূহ রাজপূজ্য হইয়াছিলেন।

প্রমাণ।

যে সাতশতিকা বিপ্রা রাঢ়দেশ নিবাসিনঃ।
ছন্দোগা ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞা নীতিশাস্ত্র বিশারদাঃ॥
এভ্যঃ কন্যাঃ প্রদাস্যন্তু বিপ্রমুখ্যেভ্য এব তে।
এতেষাং নিগড়স্তেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
যদি প্রজাঃ প্রজায়েরন্ ভবেন্মম কীর্ত্তি-রক্ষয়া।
কান্যকুব্জ দ্বিজাগ্র্যাণাং বংশোঽস্মিন্ স্থাপিতো ময়া॥
নৃপাজ্ঞয়া দদুস্তেভ্যঃ কন্যাঃ সপ্তশতী দ্বিজাঃ।
রাঢ়ায়াং বহুধান্যায়াং শ্বশুরালয় সন্নিধৌ॥
নিবাসঃ রুরুচে তেভ্যঃ সমাদৃত্য স্বহৃজ্জনৈঃ।
সদৃশান্ জনয়ামাসুঃ তাসু পুত্রান্ কুমারিকাঃ॥
তেজস্বিনো গুণবতো দীপো দীপান্তরাৎ যথা।
ততস্তে ক্রমশো বিপ্রাঃ পরলোক মুপাগমন্॥

(পরে তৎসন্তানেরা মাতুল আশ্রয়ে বাস করিলেন)।

মাতুলাশ্রয়বাসাশ্চ মাতুলাশ্রয়বর্দ্ধিতাঃ।
মাতুলৈ রুপনীতাশ্চ ছন্দোগা অভবন্ তথা॥
সুনীতাশ্চৈব বিদ্বাংসঃ গৌড় রাজনমস্কৃতাঃ।

গৌড়ে ব্রাহ্মণ নামক পুস্তকে ৭১।৭২ পৃষ্ঠায় ধৃত কুলজ্ঞবচন॥

সন ১৩০৫ সালের ৩রা বৈশাখের এডুকেশন গেজেট হইতে উদ্ধৃত।

কুলশাস্ত্র সমালোচন।

সম্বন্ধ নির্ণয়ের ৪৯২ পৃষ্ঠায় সপ্তম পংক্তিতে অনুমান করা হইয়াছে, সাতশতীগণের বৈদিক ক্রিয়াতে জ্ঞান থাকিলে অন্ততঃ উত্তরকালে অর্থাৎ বল্লালের সময় সাতশতীগণের মধ্যে কেহ কৌলীন্য পদে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হইতেন। কিন্তু অনুমানে শাস্ত্রলোপ হয় না। অগ্রে জানা কর্ত্তব্য যে, কুলীনের মানে ও সপ্তশতীর মানে বিশেষ তারতম্য আছে কি না। যদি বিচারে কুলীনের মান অপেক্ষা সপ্তশতীর মানের হীনতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সপ্তশতীর কোনও কর্ম্মে দোষ ছিল, বলিতে হইবে। আর যদি কুলীন ও সপ্তশতী উভয়ের মান সমান হয়, তবে কুলীন না হওয়াতে সপ্তশতীর কোনও ক্ষতি নাই, স্বীকার করিতে হইবে। প্রথমতঃ কান্যকুব্জাগত রাঢ়ী শ্রেণী সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়ের মান কতদূর, তাহা জানা আবশ্যক।

সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়।

পাকড়াশী পালধি কাঞ্জারী শিমলাল।
কুশারি মাষচটক শিমলায়ী বটব্যাল॥
পৌণ ত্যজে শ্রোত্রিয় যে বসুর আলয়
কুলাচলে অষ্টবসু মেরু চূড়া কয়॥
সাধ্য মধ্যে বাপুলিই সর্ব্বের প্রধান।
কুশারি বদলে কভু সিদ্ধেপায় স্থান॥
কাঞ্জারী শিমলাল বাৎস্যো ত্রৈবিদ্য সিদ্ধ॥

পাকড়াশী পালধি শিমলায়ী তদ্ বিদ্য॥
বটব্যাল কুশারি মার চটক তেমন।
এ আট ঘর সিদ্ধ দানাদানে সুজন॥
প্রথম চারি মেল সাগর চতুষ্টয়।
সদা এদের প্রার্থনায় কাল করে ক্ষয়।
শ্রোত্রিয় সুমেরু বা কল্পতরু কায়।
কেহ পাদ, কেহ শির, কেহ মর্ম্মে যায়॥

পুতিতুণ্ড, কুলচন্দ্র ঘটককৃত পদ্য।

উল্লিখিত পদ্য সমূহে প্রকাশ পাইতেছে, কষ্টশ্রোত্রিয় কুলপর্ব্বতের পাদদেশ, মধ্যশ্রোত্রিয় মধ্যদেশ, সিদ্ধ শ্রোত্রিয় সুমেরুর চূড়া অর্থাৎ মস্তকদেশ। (শ্রোত্রিয়া মেরবো জ্ঞেয়াঃ কুলীনা দেবতা স্বয়ং) কুলশাস্ত্রীয় বচন অনুসারে তাহার উপরি সুরাই,মাধাই, চাঁদাই প্রভৃতি মেলের কুলীনরূপ সাধারণ দেবতাদিগের মধ্যে অতি উচ্চ সিংহাসনে ফুলিয়া আদি চারি মেল ও সাগর চতুষ্টয়— এই অষ্টমূর্ত্তি বিশিষ্ট কুলীনত্ব রূপ মহাদেব অধিষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহার চূড়ায় সপ্তশতীরূপ চন্দ্র অবস্থান পূর্ব্বক সকলের শোভা সম্পাদন করিতেছেন। চূড়াতে অবস্থান হেতু সপ্তশতীর মহিমার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। ইহা হইতে এ জগতে উচ্চ ও গৌরবান্বিত পদ নাই। ঘটক বিশারদ মুলোপঞ্চানন চন্দ্রের সহিত সপ্তশতীর তুলনা দিয়াছেন, যথা—

চন্দ্রশিবের মাথায় রহে তবু ক্ষীণ।
কপালগুণে আর তা নাহি হয় ভিন॥

ব্রাহ্মণ্য বিচার।

চন্দ্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ, সকলেই জানেন। পোনের কলা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে অবশিষ্ট এক কলা বিশিষ্ট হইয়া শিব-শিরোভূষণ হইয়া থাকেন, এই দৃষ্টান্তে স্থিরীকৃত হইল যে, মুলোপঞ্চাননের সময় সাত শত ঘর সাতশতীর মধ্যে পোনের ভাগ তিরোহিত হইলে অবশিষ্ট ক্ষীণ এক ভাগ মাত্র কুলাচল চূড়াস্থ কান্যকুব্জরূপ শিব-শিরঃস্থিত হইয়া যখন সকলের শোভা সম্পাদন করিতেছেন, তখন বল্লাল সেনের সময় পূর্ণ সংখ্যাবিশিষ্ট সপ্তশতীর প্রভা কতদূর ছিল, কে তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারে? ফলতঃ রাজা বল্লাল সেনের সময় কৌলীন্য পদ অপেক্ষা শ্রোত্রিয় পদের গৌরব অধিক ছিল; এই কারণে সুসিদ্ধ সপ্তশতীগণ পদ গ্রহণ করেন নাই।*

দেখা গেল যে, বিজ্ঞতম পণ্ডিতগণের লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের মধ্যে আদিশূরের যজ্ঞের পূর্ব্বে এ দেশে ব্রাহ্মণদিগের বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্য এবং কৌলিন্যের প্রশংসার চরম বর্ণনা রহিয়াছে, সুতরাং আধুনিক সমগ্র ভারতেতিহাসের সংক্ষিপ্ত সার নামক পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণে ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "আদিশূর বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে বেদবিহীন ও ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য দেখিয়া পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ সম্পাদনার্থ কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন," এই কথা নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিমূলক, অসার ও অসঙ্গত, তাহার আর সন্দেহ নাই।

শ্রীবনমালিবিদ্যাভূষণ।

"চেৎমীন নাথ!"।

পরের সামান্য পদস্খলন দেখিলে আমরা তাহার উপর কি প্রকার খড়্গহস্ত হই, তাহা সময় সময় নিজেরা দেখিতে পাই না, কারণ তুলনায় বিচারের সময় নিজের দিকে আদৌ তাকাই না—তাকাইবার ক্ষমতাও নাই,তাকাইতে কখন শিখিও

* সন ১৩০৫ সালের ১০ই বৈশাখের "এডুকেশন গেজেট" দেখুন।

নাই। "সংসার ভয়ানক স্বার্থপর," "সবাই পাপে ডুবিতেছে", ইত্যাদি প্রলাপবাক্য উচ্চারণকালে নিজেকে সন্তর্পণে দুনিয়ার বাহিরে কোন পবিত্র স্থানে বসাইয়া লই। কারণ সমগ্র সংসার যখন স্বার্থপর, পাপী, অত্যাচারী, তখন আমি বাদ যাই কি প্রকারে? আমিও ত সংসারের একজন—তাহা হইলে চলে কৈ? আমি যে বিচারাসনে উপবিষ্ট, আর আমি ছাড়া সবাই আমার আদালতের আসামী।

আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহাদের নিকট মত বিভিন্নতা মহাপাপ। আমার মতামতের সঙ্গে যদি তোমার ষোল আনা কড়ায় কড়ায় মিল না হইল, তুমি অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ, ঘোর অত্যাচারী। এই দারুণ রোগ আমাদের দেশে যে রূপ প্রবল, পাশ্চাত্য জগতে সেরূপ নয়। জগদ্বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিৎ ধীমান্ আগাসিজের সহিত বিবর্ত্তনবাদে মানবাত্মাসৃষ্টি সম্বন্ধে মহাত্মা দার্ব্বীনের যখন মতভেদ হইল, তখন আগাসিজ্ ইংলণ্ড পরিত্যাগ করত আমেরিকায় গমন করেন। আগাসিজ পরম ধার্ম্মিক ঈশ্বরপরায়ণ ভক্ত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, মনুষ্য সৃষ্টির সময় জড়দেহ সম্বন্ধে ক্রমবিকাশের নিয়ম অবলম্বিত হইলেও তাহার আত্মা প্রেরণ কালে ঈশ্বরের বিশেষ হস্ত ছিল। দার্ব্বীণ আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র একমাত্র বিবর্ত্তনবাদের নিয়মেরই প্রাদুর্ভাব দেখিতেন। যাহা হউক, আগাসিজ্ আমেরিকাতে সাদরে গৃহীত হইয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত কার্য্য করিতেছেন, এমন সময় তথা হইতে দুই জন পণ্ডিত ইংলণ্ডে উপনীত হইয়া দার্ব্বীণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা দার্ব্বীণকে অদ্বিতীয় পণ্ডিত গুণে তাঁহার সমক্ষে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করাতে বিনয়াবতার দার্ব্বীণ বলিয়া উঠিলেন "why? Aggassiz is three of us rolled into one"—আমার মত তিন জনকে একত্র করিলে যাহা হয়, আগাসিজ্ তাহাই। এখন পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাদের দেশে ওরূপ স্থলে এইরূপ কথাই হইত "হাঁ আগাসিজ পণ্ডিত বটেন, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, আমার সঙ্গে বরাবর কাজ করিয়া শেষটা বিবর্ত্তনবাদের অমূল্য সত্য সম্বন্ধে মহাভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।" অপরের মতামতের প্রতি সম্মান দিতে আমরা আদৌ শিখি নাই।

সকল মানুষই সমান পুঁজি লইয়া সংসারে আসিয়াছে, সকলেরই ধর্ম্মাধর্ম্ম, মতামত একরূপ ছাঁচে ঢালা হওয়া উচিত। যাঁহারা এরূপ বিশ্বাস করেন, তাঁহারা অপরের ত্রুটি বা দুর্ব্বলতা দেখিলে চমকিয়া উঠিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? বিশ্বলীলা কি ওরূপ ভাবে সম্ভব হইতে পারে? জন্মের পূর্ব্বে আমরা কে কোথায় ছিলাম, কে কি সম্বল লইয়া আসিয়াছি, কেন সকল বিষয়ে সংসারে এত বৈষম্য? এই সকল জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাঁহারা চেষ্টা পাইয়াছেন, তাঁহারা সংসার-রহস্য কিছু বুঝিয়া থাকিবেন। তাঁহারা হয়ত অপরের দুর্ব্বলতা উপেক্ষা বা ক্ষমা করিতে জানেন। জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফলে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে কতক আলো যেন পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যে এমন অনেক উদাহরণ নয়নগোচর হয় যে, অন্যান্য বিষয়ে খুব ভাল লোক হইয়াও কোন

বিশেষ স্থলে নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে অক্ষম হইলেন। এ সকল ক্ষেত্রে কর্ম্মফলবাদীরা নিঃসংশয়ে বলিবেন যে, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার বশত ইচ্ছা না থাকা সত্বেও অবশ হইয়া তাঁহার পতন হইল। বাস্তবিক কর্ম্মফল ভোগ সম্বন্ধে প্রকৃত নিয়মাবলী মানব বুদ্ধির অগোচর, তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, উহা বড়ই দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার।

পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মফলে যে অতি উচ্চ শ্রেণীর সাধু মহাত্মাগণেরও সাময়িক পতন অনিবার্য্য, তাহা দেখাইবার জন্য আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ পুরাণাদিতে বিস্তর বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বজন্মবাদ না মানিলেও ঐ সকল বিবরণ পাঠে যে বিস্তর জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? মানুষ যে কিরূপ অসম্পূর্ণ, দুর্ব্বল, ক্ষণভঙ্গুর জীব, তাহা বুঝিতে পারিয়া আমরা পরস্পরকে ক্ষমা করিতে শিখি, ইহাও কম লাভ নয়।

জন্মান্তরের কৃত কর্ম্মফলে হউক আর নাই হউক, এই সংসারে মোহের যে কি অনির্ব্বচনীয় প্রাদুর্ভাব, তাহা দেখাইবার জন্য অদ্য একটী আখ্যায়িকা পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। এই গল্পের দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতর সামান্য জীব আমরা কোথায় আছি, মহা মহা সাধু ব্যক্তিগণও সময়ে সময়ে দারুণ মোহের হস্ত হইতে রক্ষা পান নাই।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এক সম্প্রদায় সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহাদিগকে "গোরক্ষ" সম্প্রদায়ী বলে। মহাত্মা গোরক্ষনাথ হইতে এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। কথিত আছে যে, গোরক্ষ নাথের গুরু মীননাথ জীবন্মুক্ত জীব ছিলেন। তিনি কঠোর সাধন দ্বারা জীবন্মুক্তি লাভ করিলেও কতক সঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগ তাঁহার বাকী ছিল। একদা গুরু শিষ্যে কোন রাজার প্রাসাদে অতিথি হয়েন। এক দিন, দুই দিন, ক্রমে তিনি দিন রাজ-ভোগে কালাতিপাত করিয়া শিষ্য গোরক্ষনাথ দেখিলেন, গুরুর যেন রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা নাই। যোগবলে জানিতে পারিলেন, মীননাথকে কিছু দিন রাজ্য-সুখ সম্ভোগ করিতেই হইবে। জন্মান্তরের কর্ম্মফলে কিয়ৎকালের জন্য রাজ্যভার গ্রহণ তাঁহার অদৃষ্টে আছে। ব্যাপার অনিবার্য্য—

'লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্য,
দৈবোঽপি তদ্বারয়িতুং ন শক্তঃ।
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে,
ললাট লেখঃ ন পুনঃ প্রযাতি॥"

ভাবিয়া শিষ্য গোরক্ষনাথ গুরুকে সম্বোধন করত বলিলেন, "গুরুদেব! সন্ন্যাসীর পক্ষে এ প্রকারে রাজভোগে কালাতিপাত করা অন্যায়। তবে আপনি জীবন্মুক্ত নির্লিপ্ত পুরুষ, আপনার ক্ষমতা অসীম, আপনি অনায়াসে অনাসক্ত হইয়া এই সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে সমর্থ, আমার ন্যায় স্বল্পশক্তি জীবের পক্ষে এরূপ পরীক্ষা অশুভ ফলপ্রদ হইবার কথা। অতএব আপনার যদি রাজপ্রাসাদে এই ভাবে অবস্থিতি করা অভিপ্রেত হয়, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বিদায় দান করুন। আপনার সঙ্গে এ অবস্থায় থাকা আমার ক্ষমতার অতীত।" মীন নাথকে তখন মোহ বিলক্ষণ আচ্ছন্ন করিয়াছে; তিনি প্রাণপ্রিয় শিষ্য গোরক্ষনাথকে বিদায় দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। গোরক্ষনাথ প্রস্থান করিলে

রাজা ক্রমে মীননাথকে জটাবল্কল খসাইয়া দিব্য রাজবেশে সাজাইলেন। মীননাথ অতিসুপুরুষ ছিলেন, রাজভোগ ও রাজপরিচ্ছদে দ্বিগুণ সুন্দর হইলেন। অবশেষে রাজা তাঁহার নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিলেন; এবং শুভ দিন দেখিয়া তাঁহার এক মাত্র রূপ-যৌবন-সম্পন্না কন্যার সহিত সন্ন্যাসভ্রষ্ট মীননাথের বিবাহ দিলেন। অল্পকাল পরে রাজা জামাতাকে রাজ্যভার প্রদান করত পরলোক গমন করিলে মীননাথ পুত্র-কলত্রাদি সহ সুখে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। মীননাথ এখন সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত, পূর্ব্ব জীবনের কথা কিছুমাত্র মনে নাই, ঠিক যেন রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করিয়া আশৈশব রাজভোগে লালিত পালিত হইয়া উপযুক্ত সময়ে সিংহাসন লাভ করিয়াছেন। গোরক্ষনাথ মীননাথকে ত্যাগ করিয়া যাওয়ার পর, রাজার মনে আশঙ্কা হয়, পাছে ঐ ব্যক্তি আবার কোন সময় আসিয়া মীননাথকে বুঝাইয়া লইয়া যায়। এই জন্য তিনি আদেশ প্রচার করেন যে, কোন প্রকারের সন্ন্যাসী ফকির রাজপ্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করিতে যেন না পারে; মৃত্যু কালেও ঐ আজ্ঞা পুনঃপ্রচারিত করিয়া যান।

সংসারে দেবাসুরের যুদ্ধ প্রতিনিয়ত প্রত্যেক স্থানে চলিতেছে। জীবের কল্যাণের জন্য দেবগণ সর্ব্বদা যেরূপ উৎসুক্য ও আগ্রহের সহিত প্রয়াস পাইতেছেন, অপর দিকে মোহাবতার অসুরগণ তেমনি প্রবল পরাক্রমের সহিত দেবতাদিগের যত্ন পরিশ্রম পণ্ড করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া রহিয়াছে। অবশেষে সর্ব্বত্র সত্যের,পুণ্যের জয় হইতেছে ও চিরকাল হইবে, কিন্তু আপাতত দেখিলে যেন বোধ হয় যে, মায়া মোহের লৌহ-গ্রাস হইতে রক্ষা পাওয়া কোন মতেই সংসারের সাধ্য নয়। বুদ্ধদেবের জন্মকোষ্ঠী দেখিয়া পিতা শুদ্ধোদন যখন জানিতে পারিলেন, শিশু সংসারে থাকিলে মহারাজ চক্রবর্ত্তী হইবে, কিন্তু বৈরাগ্য আশ্রয় করত সন্ন্যাসী হইয়া ধর্ম্মজগতে একটা বিরাট ব্যাপার সম্পাদনই উহার অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ আছে, তখন তিনি চারিদিকে আঁটিয়া সাঁটিয়া এমন বন্দোবস্ত ব্যবস্থাপিত করিলেন,যাহাতে বিবেক বৈরাগ্যের কোন প্রসঙ্গ বালকের কর্ণে প্রবেশ করা দূরে থাকুক, কেবল চূড়ান্ত ভোগবিলাস ও আমোদ প্রমোদের বিপুল আয়োজন ভিন্ন আর কিছু তাহার নয়নগোচর হইবার উপায় রহিল না। এরূপ সুদৃঢ় মোহাসক্তির দুর্গ মধ্যেও দেবগণ এ প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইলেন, যাহাতে যুবরাজ শাক্যসিংহ অনায়াসে কঠোর বৈরাগ্যের সরল পথে উপনীত হইলেন। চরমে ধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে। মীননাথের ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। কালপূর্ণ দেখিয়া শিষ্য গোরক্ষনাথ মীননাথের রাজধানীতে পুনরাগত হইয়া রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে "চেৎ মীননাথ! গোর্খা আয়া।" বলিয়া চীৎকার করত টহল দিতে আরম্ভ করিলেন। রাজাজ্ঞাতে প্রাসাদের ফটক পার হওয়া উদাসীন সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষেধ, কাজেই তাঁহার আর অন্য উপায় নাই। কিছুদিন ক্রমাগত এই প্রকারে চীৎকার করিতে করিতে এক দিবস রাজার কর্ণে উহা যেন কোন পূর্ব্ব পরিচিত ব্যক্তির আওয়াজ বলিয়া বোধ হওয়ায় তিনি টহলদাতা সন্ন্যাসীকে সম্মুখে হাজির করিবার হুকুম দিলেন। গোরক্ষনাথ রাজসমীপে

উপস্থিত হইলে মীননাথ তাঁহার সচীৎকার টহলের মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করায় সন্ন্যাসী নিভৃতে রাজাকে উহার অর্থ জানাইতে পারেন, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। গোপনে দুইজনে কথাবার্ত্তা হইলে মীননাথের সমস্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ হইয়া চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হইল।

মীননাথ—গোরক্ষ! আমি ত বিষম বিপদে পতিত। এখন এ স্থান ত্যাগ ভিন্ন আর কোন উপায় দেখি না। পুত্র কলত্রাদির মায়া এড়াইয়া তাহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ ত আমার পক্ষে সহজসাধ্য নয়। এ ক্ষেত্রে নিশিযোগে সকলের অজ্ঞাতসারে পলায়ন করাই যুক্তিযুক্ত।

গোরক্ষ—দেখুন, যেরূপ ভাল বিবেচনা করেন। যে কোন প্রকারেই হউক, আপনাকে রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির করিতে পারাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। অনিবার্য্য কর্ম্মফলে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; এখন পুনরায় সনাতন ধর্ম্মপথে যাহাতে অগ্রসর হইতে পারা যায়, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। শিষ্যের কল্যাণ কামনা গুরুর যেরূপ কর্ত্তব্য, গুরুকে সকল প্রকার বিঘ্নবাধা হইতে রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করাও, তেমনই, শিষ্যের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উচিত, নচেৎ পতিত হইতে হয়।

মীননাথ—তবে, এক কাজ করিতে হইবে। পলায়ন কালে কতকগুলি বহুমূল্য মণিমাণিক্য সঙ্গে লইতে হইবে, যাহাতে অবশিষ্ট জীবন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ভাবিতে না হয়।

গোরক্ষ দেখিলেন, তখনও মীননাথের সাংসারিক বুদ্ধি বিলক্ষণ রহিয়াছে। রাজ্য ও রাজভোগ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, কিন্তু ভবিষ্যতের সম্বল সম্বন্ধে চিন্তা তাঁহাকে ছাড়ে নাই। অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া রজনীর মধ্যভাগে জহরাতের পুঁটুলি সহ উভয়ে জন্মের মত রাজভবন পরিত্যাগ করত পুনরায় সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের জন্য বাহির হইলেন। পথিমধ্যে অনেক বুঝাইয়া পুঁটুলিটী মীননাথের হস্ত হইতে গোরক্ষ গ্রহণ করিলেন।

মীননাথ—দেখিও গোরক্ষ! খুব সাবধানে পুঁটুলিটী রাখিবে; উহাই আমাদের উভয়ের জীবনের একমাত্র সম্বল, ওটী গেলেই সর্ব্বনাশ, অন্নভাবে মারা যাইতে হইবে।

(পাঠক দেখুন, তখনও মীননাথের কত মোহ!)

গোরক্ষ—গুরুদেব, আমি থাকিতে আপনি কোন দ্রব্য বহন করেন, এটা কি উচিত? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি এই রত্নগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত সঙ্গে রাখিব। রাত্রি অন্ধকারময়। গোরক্ষ গুরুর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতেছেন, আর পুঁটুলি হইতে এক এক খানি জহরাৎ এ দিক ওদিক ফেলিয়া দিতেছেন। মীননাথ ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করিতেছেন "কেমন গোরক্ষ! পুঁটুলি ত ঠিক আছে?" গোরক্ষ উত্তর দিতেছেন, "হাঁ, গুরুদেব সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।" পরে একবার পশ্চাতের দিকে তাকাইয়া গুরু দেখেন যে, গোরক্ষের হাতে পুঁটুলিটী নাই। অমনি অত্যন্ত কাতর হইয়া হাহাকার রবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন গোরক্ষ গুরুকে নানা প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া বিফল হওয়ায় একটী অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন—পথ পার্শ্বস্থ একটী প্রস্তরস্তূপের উপর

মূত্রত্যাগ করিয়া অমানুষিক শক্তিপ্রভাবে সে গুলিকে বহু মূল্য রত্ন খণ্ডে পরিণত করিলেন; এবং এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইয়া গুরুকে সম্বোধন করত গম্ভীর ভাবে বলিলেন "প্রভো! আপনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। আমি আপনার অধম শিষ্য, আপনার শিক্ষা ও উপদেশ গুণে আমার মূত্রের এত ক্ষমতা যে, উহার সংস্পর্শে সামান্য প্রস্তরখণ্ড এরূপ বহু মূল্যবান মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। আপনার পুঁটুলিটীতে কতই বা রত্ন ছিল, সম্মুখস্থ স্তুপের নিকট সে কয়টী কিছুই নয়। এখন আপনি স্মরণ করিয়া দেখুন, আপনি কোন্ শ্রেণীর জীব, আপনার ক্ষমতা কি পরিমাণ।" এই ঘটনা ও গোরক্ষের স্মারক বাক্য সমূহ দ্বারা মীননাথের আত্মবিস্মৃতি একেবারে ঘুচিয়া গেল। তখন শিষ্যকে আলিঙ্গন করিয়া মীননাথ কতই না কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন; এবং আদেশ প্রচার করিলেন যে, তাঁহার শিষ্যগণ ভবিষ্যতে গোরক্ষ-সম্পদায়ী বলিয়া পরিচিত হইবে।

বাস্তবিক, বিশ্বেশ্বরের সন্তান হইয়া, বিশ্বসাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া আমরা কি প্রকার অসহায় কাঙ্গালের মত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করি। পিতা আমাদিগকে কতই না ক্ষমতা দিয়াছেন, যে ক্ষমতার সদ্ব্যবহারে আমরা "as perfect as the Father in heaven" হইতে পারি। এ কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া নরকের কীটের ন্যায় আমাদের দুর্দ্দশা—সামান্য কয়টা দিনের সাংসারিক জীবনের জন্য কতই উদ্বেগ, কতই চিন্তা, কতই ব্যস্ততা, কতই উৎকণ্ঠা, কতই ব্যবস্থা, কতই আয়োজন, কতই বন্দোবস্ত!! হায়! হায়! কি শোচনীয় অবস্থা।

আখ্যায়িকাটীর সকল অংশ হয়ত অনেকে বিশ্বাস করিতে না পারেন, কিন্তু আসল জায়গায়, বোধ হয়, কাহারও আপত্তির কারণ নাই। মোহমুগ্ধ গুরু মীননাথকে যে কথা দ্বারা শিষ্য গোরক্ষ উদ্ধার করিয়াছিলেন, ঐ শব্দ কয়টী আমাদের নিকটও প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হইতেছে। আমরা সকলেই মীননাথ, সকলেই মোহাচ্ছন্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছি। আমরাও মধ্যে মধ্যে বেশ শুনিতে পাই, বিবেক আমাদিগকে সর্ব্বদা চেতন হইতে অনুরোধ করিতেছে—"জাগো ভাই, আর মোহনিদ্রায় অভিভূত থাকিও না; আমি আসিয়াছি, সাহায্য করিতে, উদ্ধার করিতে।" এ কথা বিবেক আমাদিগকে সর্ব্বদাই বলিতেছে। বিবেকবাণীকে অগ্রাহ্য করিয়া আমরা সবাই বিষয়-সুখ সম্ভোগে মত্ত রহিয়াছি। "চেৎ-মীন নাথ! গোর্খা আয়া" এই চারিটী কথাতে যে গভীর অর্থ নিহিত, তাহা যেন আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ থাকে; "ঘোর মোহান্ধকারে দিব্য জ্যোতির্বিকাশিনী" মা জগদম্বা সেইরূপ বল আমাদিগকে প্রদান করুন।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

অন্তঃশয্যায়।

(বুয়ার-সেনাপতি জুবেয়ারের উক্তি)

"একি মৃত্যু! অকস্মাৎ অনাহূত রূপে
কেন প্রবেশিছ মোর আনন্দ মন্দিরে?—
জরাগ্রস্ত দেহ মম, কিন্তু দেখ সখে,
হৃদয়ে বিরাজে সদা তরুণ যৌবন!—
সেই শক্তি, সেই শৌর্য্য, সে দর্প, উদ্যম,
আজিও বাড়িছে মোর—চন্দ্রকলা যথা
বাড়ে নিত্য সিত পক্ষে বিধাতার বরে।
একি হায়, কোথা হ'তে কালরাহু তুমি
আসিলে জন্মের মত গ্রাসিতে আমারে?
কেমনে মরিব আজি—বক্ষ বিদারিয়া
নয়নে ছুটিছে উৎস, মরিব কেমনে?
কেন এ সন্তাপ, মৃত্যু! জন্মি বীর-কুলে
মরণে কাতর আমি?—নহে তা কখন,
দেখ পরীক্ষিয়া মম ধমনী শিরায়
বহিছে আগ্নেয় স্রোত; সাগরের বুকে
যেমতি বাড়বানল!—চূর্ণিয়াছি আমি
বজ্রাধিক শত্রু-অস্ত্র, এই বাহু-বলে!
মরণে কাতর আমি?—জানেন দেবতা,
সহস্র মরণে আমি, দলিয়াছি পদে!
আছিল আকাঙ্ক্ষা মম, "পাই যদি কভু
বিংশতি মানব যোগ্য, স্বাধীনতা তরে—
মরতে ত্রিদিব-নিধি স্বাধীনতা আহা
মর মানবের!—আমি সেই ধন তরে
নিশ্চিত যুঝিতে পারি জগতের সনে।"
সে সাধ পুরা'তে বিধি ঘটাইলা আনি
প্রবল ইংরাজ রিপু; কেশরী যেমতি
যুঝে শার্দ্দূলের সাথে, তেমতি উদ্যমে
করিনু সংগ্রাম আমি প্রতিপক্ষ সনে!
সমরে বিজয়-লক্ষ্মী দিলা কতবার
জয়মাল্য গলে মম, সুযশ মুকুট
পরাইলা শিরোপরি, দয়াময়ী দেবী!
কাঁপিল বৃটিশ সিংহ, কাঁপিল বৃটনে
শ্বেত দ্বীপ অধীশ্বরী, বিস্ময়ে চাহিল
সমস্ত জগত ক্ষুদ্র "ট্রান্সভাল" পানে!—
মাতৃভূমি মম সেই প্রিয় ট্রান্সভাল!
অনন্ত যশের পুরী, রত্ন প্রসবিনী,
বীর নর নারী সেথা—ভ্রাতা ভগ্নী মিলি,
দেশের কল্যাণে করে আপনা প্রদান!
পুরুষ মুখের গ্রাস নিক্ষেপি ভূতলে
দেশ-বৈরী নাশে ধায়; সে দেশের নারী
ফেলিয়া কোলের ছেলে, সুকোমল তনু
বর্ম্মে ঢাকি, আগ্নেয়াস্ত্র ধরি পদ্ম করে
সমর প্রাঙ্গণে ছোটে; প্রতিজ্ঞা সবার
'জননী জনমভূমি, চির পূজনীয়া
যাবত শোণিত-কণা রহিবে শিরায়,
অধীনতা সে দেশের নারিব সহিতে।'
এ উচ্চ আশায় তারা দলিয়াছে পদে,
হীনতা, নীচতা যত, নির্ম্মল হৃদয়
বিশুভ্র দর্পণ সম! তাহাদের মাঝে
পবিত্র বন্ধন বদ্ধ, মরমে মরমে!
কি বলিব হে কৃতান্ত! সেই সেনাদলে
নায়ক আছিনু আমি, কি উচ্চ গৌরব!—
জীবনের সার্থকতা এর চেয়ে আর
কিবা আছে ভূমণ্ডলে! সে গৌরব-তরে
বৃদ্ধ জুবেয়ার যুবা! যুবার বিক্রমে
সংগ্রামে যুঝিনু আমি, কাল বহ্নি সম!
নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, তুমি হে শমন!
হেন অসময়ে আসি কেন আহ্বানিলে
স্বর্গে যাইবারে মোরে? প্রদীপ্ত অনল
অকালে নিবালে কেন—আকাঙ্ক্ষা তাহার
না মিটিতে, মহাশক্তি মিশিল অঙ্গারে!
কি সুখে হইব সুখী, স্বর্গধামে গিয়া,

স্বদেশের দাস আমি ?—ধিক্ শতবার
তোমারে, জাননা তুমি শত স্বর্গ সুখ
তুচ্ছ, অবজ্ঞেয়, মোর জন্মভূমি-কাছে!
শত্রু-হস্তে দেশ মম বিপন্ন বিষাদে,
সন্ত্রাসিত, প্রপীড়িত সহযোগিগণ ;
এ হেন দুর্দ্দিনে হায়, তা'সবা ফেলিয়া
কেমনে যাইব আমি ?—দাবানল যবে
পশে বনে, মৃগযূথ ফেলি তার মুখে
পলায় কি মৃগরাজ ? ভীষণ ভীষণ
স্বগ মন ; বুঝিলাম এতদিন পরে
মরণ নির্ম্মম কত! বুঝিলাম আর
মানবের বল, দর্প, দৈবের সকাশে
ক্ষুদ্র, তুচ্ছ—অণু কিম্বা পরমাণু সম!
মুহূর্ত্ত দাঁড়াও মৃত্যু! শেষ রক্ত মোর
দিয়া যাই মাতৃপদে আঁখি-জল রূপে!
যাই মা জনম ভূমি! অশক্ত এ দাস
ছিঁড়িতে মৃত্যুর-পাশ, কিছুই হ'ল না!
মুছিতে অদৃষ্ট-লিপি নহে শক্তিমান
ক্ষুদ্র নর, আর কিবা বলিব জননি ?
চল মৃত্যু! চল সখে! থাকুক আমার
জন্মভূমি হেথা ; আহা থাকুক বাঁচিয়া
যোগ্য পুত্র পুত্রী তার! তাহাদের প্রাণে
থাকুক আমার প্রাণ, অতৃপ্ত কামনা!
আর কি বলিব বেশী—থাকুক জগতে
ধর্ম্ম, ন্যায়, সত্য, পুণ্য, মহত্ত্ব সকলি ;
গেল শুধু হতভাগা জুবেয়ার আজি
ছিন্ন-জিহ্ব সিংহসম, ভাসি নেত্রজলে!"

শ্রীকনকাঞ্জলি রচয়িত্রী।

প্রাচীন খ্রীষ্টীয়পূজা-বিধি। (২)

সাধু জেমসের সাধারণ পূজা-বিধি।

প্রাচীন পূজা বিধিগুলির মধ্যে সাধু জেমসের পূজা বিধি সম্বন্ধে প্রাচীনতম সাক্ষ্য পাওয়া যায়, এবং পূজা-বিধিটী মালাবার উপকূলের খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর মধ্যে প্রথমাবধিই প্রচলিত, এই দ্বিবিধ কারণ বশতঃ, নমুনা-স্বরূপ এই পূজা-বিধিটীর বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

পূজাটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে ব্যবহার্য্য। দ্বিতীয় ভাগটী কেবল খ্রীষ্টীয় উপাসকদিগের সমক্ষে ব্যবহার্য্য। সমস্ত পূজা-বিধিটীই গান বা সুর করিয়া আবৃত্তি করার নিয়ম আছে।

প্রথম ভাগ।

পুরোহিত আপনার নিত্য ব্যবহার্য্য বস্ত্র ত্যাগ করিয়া, হস্ত প্রক্ষালনান্তর বেদীর সমক্ষে পরিধেয় বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া, পাপ মোচনের জন্য এবং উপস্থিত শুভ কার্য্যের উপযোগী অন্তঃশুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিয়া, সভাস্থিত লোকদিগকে স্বস্ত্যয়ন (intercede) করিতে অনুরোধ করেন।

পরে সন্নিকট হইয়া কহেন—

"আমি আলোহোর বেদীর নিকট, যিনি যৌবনে আমাকে আনন্দে রাখিয়াছেন, সেই আলোহোর নিকট আসিব' (সাম ৪৩।৪)। হে প্রভো, আপনার সিংহাসনের সমক্ষে উপস্থিত, আমার দিকে অবলোকন করুন।"

পরে দক্ষিণে, বামে ও মধ্যে বেদীর উপর তিন স্থানে প্রণিপাত করিয়া বলেন—"বেদী-শৃঙ্গের সহিত রজ্জু দ্বারা আপনি আমাদিগের উৎসব ডালি বন্ধন করুন।"

পরে আচার্য্য (Deacon) অনাবৃত মস্তকে বেদীর দক্ষিণ পার্শ্বের আলোক জ্বালিতে জ্বালিতে কহেন—"আপনার জ্যোতিতেই আমরা জ্যোতিষ্মান হইব ;"

এবং অপরটী জ্বালিতে জ্বালিতে দুই এক কথায় লোকদিগকে স্বর্গীয় জ্যোতির দিকে মন দিতে বলেন।

এই অবসরে পুরোহিত ধূপ-পাত্রে ধূপ দেন এবং উপস্থিত সকলে—"পবিত্র ত্রিমূর্ত্তির সকাশে ইহা যেন গ্রাহ্য হয়," এই বলিয়া প্রার্থনা বচন উচ্চারণ করেন। পরে পুরোহিত নৈবেদ্য পাত্র অনাবৃত করিলে, আচার্য্য পিষ্টক লইয়া পুরোহিতের সমক্ষে ধরেন। পুরোহিত উহার উপর ক্রুশ (+) চিহ্ন করিয়া এই প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করেন— "ঈশ্বর যেন বিশ্বাসী ব্যক্তিদিগের নৈবেদ্য গ্রাহ্য করেন।"

পরে বেদীর উপর উহা স্থাপন করিয়া উহাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া আইসেয়ার এই কথা আবৃত্তি করেন—"মেষ-শাবকের ন্যায় তিনি বধ্য স্থলে নীত হয়েন, এবং লোমচ্ছেদনকারীর নিকট মেষ যেরূপ নিস্তব্ধ থাকে, তিনি সেইরূপ রহেন।

পরে পান-পাত্র লইয়া কহেন—"আমি ত্রাণের পাত্র হস্তে ধারণ করিয়া প্রভুর নাম ডাকিব।"

এবং পাত্রে মধু ঢালিয়া কহেন—"আমাদের প্রভু যেশু-মশিহের পার্শ্ব হইতে যে শোণিত বাহির করা হইয়াছিল, ইহা উহারই প্রতিরূপ; পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মার নাম লইয়া আমি ইহা এই পাত্রে পাতিত করিলাম।"

এবং মধুর সহিত কিছু জল মিশাইয়া কহেন—"এই জল যেন, যেশু-মশিহের পার্শ্ব হইতেযে জল বাহির হইয়াছিল, সেই জলের প্রতিরূপ হইয়া মিশ্রিত হয়।"

পরেই শৃঙ্খলাবদ্ধ ধূপ পাত্র দোলাইতে দোলাইতে, এই গান গীত হয়—"আইস আমরা প্রভুর উদ্দেশে গান করি; আমাদিগের ত্রাণের বলে আইস আমরা হৃদয়ের সহিত আনন্দ করি। আইস আমরা ধন্যবাদ সহকারে তাঁহার সকাশে উপস্থিত হই, এবং সাম-যোগে, তাঁহাতে যে আমরা উল্লাসিত, ইহা প্রকটিত করি।

কারণ প্রভু মহান ঈশ্বর, সকল দেবতার উপর তিনি মহান রাজা।

তাঁহার হস্তে পৃথিবীর চতুষ্কোণ বর্ত্তমান, গিরি সমুদায়ের বল, তাঁহারই বল।

সমুদ্র তাঁহার, তিনিই উহার স্রষ্টা এবং তাঁহার হস্তদ্বয় শুষ্ক স্থলেরও রচনা করিয়াছে।

ওহে, আইস, আমরা পূজা ও প্রণিপাত করি এবং প্রভু যিনি আমাদের স্রষ্টা, তাঁহার সমক্ষে জানু অবনত করি।

কেননা, তিনি আমাদের প্রভু ঈশ্বর, এবং আমরা তাঁহার চরণ-স্থলের জীব ও তাঁহার হস্তের মেষ। আজ যদি তোমরা তাঁহার স্বর শুনিতে চাও, তবে যেমন তাঁহাকে রাগাইবার দিনে,—যেমন অরণ্যে প্রলোভনের দিনে, করিয়াছিলে; সেইরূপ তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন করিও না।

* * *

পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার মহিমা হউক।

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জগতের শেষ পর্য্যন্ত এই মহিমা স্থির থাকুক।

প্রভো, আমাদের প্রতি দয়া করুন।

হে খ্রীষ্ট, আমাদের প্রতি দয়া করুন।

প্রভো, আমাদের প্রতি কৃপা করুন।

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ; আপনার নাম পবিত্র হউক, আপনার রাজ্য আসুক, আপনার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন পালিত হয়, সেইরূপ পৃথিবীতেও হউক। অদ্য আমা-

দের অন্ন দান করুন; এবং আমরা যেমন আমাদের বিপক্ষে যাহারা অপরাধ করিয়াছে, তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করি, আপনিও সেইরূপ আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। আর আমাদিগকে প্রলোভনে না ফেলিয়া মন্দ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। যে হেতু আপনার রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা নিত্য নিত্য বর্ত্তমান।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার মহিমা হউক।

ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জগতের শেষ পর্য্যন্ত এই মহিমা স্থির থাকুক।"

এই স্থলে বিশ্বাসীগণের জন্য, আর আর সকলের জন্য, জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদের যাহা যাহা আবশ্যক, তজ্জন্য একটী প্রার্থনা হয়। *

এই প্রার্থনাবসানে উপস্থিত সকলে উচ্চৈঃস্বরে এই অবতরণ-স্তোত্র উচ্চারণ করেনঃ—

"উর্দ্ধেতে ঈশ্বরের মহিমা,
পৃথিবীতে শান্তি,
মনুষ্য সন্তানদের প্রতি প্রসন্নভাব।"

একটী গীত এই স্থলে গীত হয়। প্রায় কোন প্রাচীন সাধু-রচিত গীত নিরূপিত থাকে।

পরে আচার্য্য সংস্কারটী সম্বন্ধে এক উপদেশ পাঠ করেন। এই দিবসের জন্য নিরূপিত লিপি ও সাম-পুস্তকের কিয়দংশ এই স্থলে পঠিত হয়। পরে পূর্ব্বেকার ন্যায়—"উর্দ্ধেতে ঈশ্বরের মহিমা," ইত্যাদি স্তোত্রটী পুনরায় উচ্চারিত হয়।

পরে আচার্য্য স্বীয় ভাষায় সুসমাচারের কিয়দংশ পাঠ করিলে একজন উপাচার্য্য (Sub-deacon) স্থানীয় ভাষায় উহার অনুবাদ পাঠ করেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে আচার্য্য লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহেন—"তোমরা ঈশ্বরের বাক্যরূপ বীজমন্ত্র হৃদয়ে ধারণ কর; প্রার্থনা করি, যাহারা শ্রবণ করিলে, সকলেই যেন বাক্যের অনুগামী হও।"

এই সময়ে সাধারণ লোকদিগকে আচার্য্য এই বলিয়া বিদায় দেন—

"শ্রোতৃবর্গ, শান্তিতে তোমরা বিদায় হও, শান্তিতে গমন কর। এখন জল-সংস্কার প্রাপ্ত লোক সকল, তোমরা শান্তিতে অগ্রসর হও। * দ্বার রুদ্ধ কর।"

ইহার পরে—

"প্রভু রাজত্ব করিতেছেন, তিনি বৈভবে আচ্ছাদিত, তাঁহার জয় হউক!" ইত্যাদি স্তুতি সম্বলিত কয়েকটী শাস্ত্রীয় বচন আবৃত্ত হয়। জীবিত ও মৃত বিশ্বাসী ব্যক্তিদের জন্য প্রার্থনা এবং বিশ্বাস-সার এই স্থলে আবৃত্ত হয়।

* এই নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিটী সাধু জেম্‌সের পূজা-বিধির অতি প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটী যুক্তি স্বরূপ। প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগেই খ্রীষ্টীয় পূজা-বিধি এক কালীন বিধিবদ্ধ হয়। 'এপ্‌সল্' ও 'প্রকেট্'গণ পূজার নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে স্বেচ্ছা মত প্রার্থনা করিতে পাইতেন। সাধু জেম্‌সের পূজা-বিধিতে স্থানে স্থানে এইরূপ স্বাধীনতার লক্ষণ রহিয়াছে।

* এই পূজা বিধির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ইহাও একটী যুক্তি স্বরূপ। যে কালে ও যে দেশে কতক লোক খ্রীষ্টীয়ান ও কতক লোক খ্রীষ্টীয়ানদের আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিতেছে মাত্র, সেই কালেও সেই দেশে এই স্বীয় পূজা-বিধি রচিত হয়। যখন পবিত্র পরম প্রসাদের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য দ্বার রুদ্ধ রাখা আবশ্যক হইত, সেই কালে স্বীয় পূজা-বিধি রচিত হয়।

পরে পুরোহিত আর একবার হস্ত প্রক্ষালন করিয়া লোকদিগকে স্বস্ত্যয়ন করিতে অনুরোধ করেন।

দ্বিতীয় ভাগ।

পুরোহিত। হে আমাদের ঈশ্বর ও প্রভু, হে মানব-কুল বল্লভ, অপদার্থ যে আমরা, সেই আমাদিগকে এবং এই সকল লোকদিগকে, আপনি এই ত্রাণের উপযোগী করিয়া লউন; যেন সমস্ত কাপট্য ও শঠতা হইতে বিমুক্ত হইয়া, শান্তি ও প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া, আপনার অদ্বিতীয় পুত্র, আমাদের প্রভু, ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তা য়েশু-মশিহের দ্বারা আমরা পরস্পরকে পবিত্র ও স্বর্গীয় ভাবাপন্ন চুম্বন* সহ অভিবাদন করিতে পারি। তাঁহার দ্বারা, তাঁহার সহিত এবং আপনার পরমাত্মা কর্ত্তৃক, আপনার প্রতি মহিমা, সম্মান ও পরাক্রম আরোপিত হউক।

লোকগণ। তথাস্তু।

আচার্য্য তখন স্তোত্র ও প্রার্থনা সম্বন্ধে কর্ত্তব্যতা বিষয়ে একটী ক্ষুদ্র শিক্ষা দেন।

পুরোহিত। আপনার পবিত্র বেদী সমক্ষে অবনত স্কন্ধে যে সকল লোক উপস্থিত হইয়াছে, এই সকল লোকের প্রতি, হে একমাত্র দয়াল প্রভো, আপনি স্বকীয় প্রসাদ প্রেরণ করুন। স্বর্গ আপনার আবাসস্থল, কিন্তু সামান্য ব্যক্তিদের প্রতিও আপনার দৃষ্টি; আপনার একমাত্র পুত্র মশিহের প্রসাদ, সৌজন্য ও প্রেম হেতু আপনি উহাদের আশীর্ব্বাদ করুন। তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার সহিত আপনার মহিমা হউক।

লোকেরা। তথাস্তু।

পুরোহিত। হে পিতা ঈশ্বর, আপনি মনুষ্য জাতির প্রতি আপনার অপার ও অনির্ব্বচনীয় প্রেম হেতু জগতে আপনার পুত্রকে প্রেরণ করিয়া বিধান করিয়া দিয়াছেন যেন পথভ্রষ্ট মেষগণ পুনরায় সুপথে আইসে; আমরা যতক্ষণ এই গম্ভীর ও শোণিত-রহিত বলিদান কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিব, ততক্ষণ আপনি আমাদের প্রতি বিমুখ হইবেন না। কারণ আমরা আমাদিগের স্বকীয় পুণ্যের উপর নির্ভর না করিয়া আপনার দয়ার উপর নির্ভর করি। এ কারণ, আমরা আপনার প্রসাদ যাচ্ঞা ও ভিক্ষা করিতেছি, যেন এই নিগূঢ় কার্য্য, যাহা আমাদের পরিত্রাণের জন্য বিহিত হইয়াছে, আপনার লোকদিগকে দণ্ডার্হ না করিয়া, বরং ইহাদিগের পাপমোচন, অপরাধ মার্জ্জনা এবং আপনার অদ্বিতীয় পুত্রের প্রসাদ ও কমনীয় দয়া দ্বারা বরলাভের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। তাঁহা দ্বারা ও তাঁহার সহিত আপনার মহিমা হউক।

লোকেরা। তথাস্তু।

আচার্য্য। যে প্রেম ও ভক্তি ঈশ্বর সমক্ষে গ্রাহ্য, সেইরূপ প্রেম ও ভক্তি সহকারে, আপনারা পরস্পরে পরস্পরের নিকটস্থ ব্যক্তিকে অভিবাদন করুন। আসুন, আমরা সবিনয়ে, তদ্গতচিত্তে, সভয়ে ও

* নূতন সংহিতাতেও স্থানে স্থানে খ্রীষ্টীয়ানদিগের পবিত্র চুম্বন সহ অভিবাদন করিবার প্রথার উল্লেখ আছে। গ্রীক মণ্ডলীতে পুরোহিত ধর্ম্ম পুস্তকের উপর প্রত্যেকের চুম্বন গ্রহণ করিয়া মন্দিরে উপস্থিত সকল লোকের নিকট অগ্রসর হয়েন। ধর্ম্ম-পুস্তকের উপর ক্রুশার্পিত প্রভুর চিত্র বা মূর্ত্তিই সকলে চুম্বন করে। মালাবার মণ্ডলীতে ধূপের ধূম লইয়া একজন অন্য জনের মুখের সমক্ষে হস্ত ধারণ করে, এবং ধূপ-গন্ধযুক্ত হস্ত চুম্বন করাই এই মণ্ডলীর নিয়ম।

সকম্পে প্রার্থনা করিতে করিতে, সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান থাকি। স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে, এবং পবিত্র আত্মা এই নিগূঢ় পদার্থদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হইয়া উহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়াছেন। অহো! দেবগণ ও সুরগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া কি ভয়ানক স্থানে আমরা এক্ষণে দণ্ডায়মান রহিয়াছি! যে সকল দেবতা ও প্রেতাত্মা জ্বলন্ত অগ্নি সদৃশ, তাঁহাদের নিশি-পালনের ও পূজার সহচরত্ব ও ভ্রাতৃত্ব আমরা লাভ করিলাম! প্রত্যুত যে কেহ এই নিগূঢ় বস্তু গ্রহণ করিতে সাহস করিবে, তাহাকেই যে গ্রহণ করিতে আসিতে হইবে, এমন কিছু কথা নাই; কারণ তিরস্করিণী উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে, এবং যে কেহ শুদ্ধ অন্তঃকরণে ও পরিচ্ছন্ন বিবেকে প্রার্থনা করিতেছে, তাহারই উপর প্রসাদ প্রবাহিত হইতেছে এবং দয়া আপ্লুত করিয়া দিতেছে।

[এই সময়ে পুরোহিত তিরস্করিণী (পর্দা) উঠাইয়া দেন ও তিন বার লোকদিগের উপর লক্ষ্য করিয়া ক্রুশ চিহ্ন করেন, ও কহেন।]

পিতার প্রেম, পুত্রের প্রসাদ ও পবিত্র আত্মার আবেশ, তোমাদের সকলের সহিত বর্তমান থাকুক।

লোকগণ। তথাস্তু।

পুরোহিত। তোমাদের হৃদয় উত্তোলন কর।

লোকগণ। হৃদয় আমাদের উন্নত হইয়াছে।

পুরোহিত। আইস আমাদের প্রভু ঈশ্বরকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করি।

লোক। উপযুক্ত ও বিহিত।

পুরো [প্রণত হইয়া] আপনার মহিমা করা, আপনার কল্যাণ কীর্ত্তন করা, আপনাকে বন্দনা ও পূজা করা, আপনার প্রশংসা করা, সর্ব্বতোভাবে যোগ্য, বিধেয়, উপযুক্ত ও আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। যিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সকল প্রাণীর স্রষ্টা, স্বর্গ ও স্বর্গোপরি স্বর্গ ও তন্মধ্যগত শক্তিপুঞ্জ যাঁহাকে মহিমা করিয়া থাকে; সূর্য্য ও চন্দ্র ও তারকামণ্ডলী, পৃথিবী ও সমুদ্রচয় ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু, স্বর্গীয় যেরুসালেম, প্রথমজাতদের মণ্ডলী (যাঁহাদের নাম স্বর্গে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে) দেবতাগণ, প্রধান দেবতাগণ, রাজ্যধর, মাহাত্মান, সিংহাসনবাসী চক্রবর্ত্তী, আধ্যাত্মিক শক্তিপুঞ্জ, স্বর্গীয় বলবিন্যাস, সহস্রাক্ষ ও ষট্‌পক্ষ দেবগণ, যাঁহারা দুইটী পক্ষ দ্বারা আপনাদিগের আস্য এবং অপর দুইটী পক্ষ দ্বারা আপনাদিগের পদ আবৃত করিয়া, অপর দুইটী পক্ষ দ্বারা একত্র উড্ডীয়মান হইয়া, অনবরত উন্মুক্ত ওষ্ঠাধরে স্বর্গীয় অনর্গল বাক্যে, জয়নাদ, গরিমাধ্বনি ও স্তুতি গান করিয়া, উল্লাসিত স্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে কহেন—

লোকগণ। পবিত্র! পবিত্র! পবিত্র!

পুরোহিত। [প্রণত হইয়া] হে অনাদিরাজ, আপনিই প্রকৃতরূপে পবিত্র এবং পবিত্রতার বিধাতা; আপনার অদ্বিতীয় পুত্র আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তা যেশু-মশিহ ও পবিত্র; আপনার পবিত্র পরমাত্মা যিনি সকল বিষয়ের নিরীক্ষক, হে পিতা ঈশ্বর, আপনারও যিনি আভ্যন্তরিক নিরীক্ষক, তিনিও পবিত্র। আপনি সকলের আধার, সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলময়, এই জন্য আপনিই পবিত্র। আপনার পুত্র-সহ আপনি পবিত্র, যে পুত্রে আপ-

নার হস্তকৃত সামগ্রী মনুষ্যের জন্য নির্য্যাতনের সহভাগী হইয়াছিলেন। হে মঙ্গলময় ঈশ্বর, মনুষ্যকে আপনিই মৃত্তিকা হইতে গঠিত করিয়া আনন্দ-ময় মন্দারকাননে উহার আবাসস্থান স্থির করিয়া দিয়াছিলেন; আর ঐ মনুষ্য যখন পাপাচার দ্বারা পতিত হইল, তখন উহাকে ত্যাগ না করিয়া অতি কমনীয় কৃপার অধিষ্ঠাতা বলিয়া আপনি উহার হস্ত ধরিয়া পুনরায় উঠাইয়া লইলেন। বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা উহাকে আপনি আহ্বান করিলেন; দৈবজ্ঞগণ দ্বারা আপনি উহাকে পথ দেখাইয়া দিলেন; শেষে আপনার প্রতিকৃতি পুনঃস্থাপন করিবার জন্য আপনি জগতে আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে প্রেরণ করিলেন; যিনি অবতীর্ণ হইয়া পবিত্র আচার দ্বারা পুণ্যবতী চির-কুমারী ঈশ্বর-জননী * মারিয়ম হইতে দেহ ধারণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইলেন; যিনি মনুষ্য সন্তানদের সহিত বাক্যালাপ করিয়া যাহা কিছু মনুষ্যকুলের ত্রাণের জন্য আবশ্যক, বিধান করিলেন।

এই সময়ে পুরোহিত দণ্ডায়মান হইয়া পিষ্টক-খণ্ড লইয়া কহেন,—তাঁহার ঘোর ক্লেশ-কর মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস তিনি আপন পবিত্র হস্তে পিষ্টক লইয়া, হে প্রভু যেশুর পিতা, সকলের অধীশ্বর, তিনি আপনারই প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, আপনার স্তুতিবাদ করিয়া † ধন্যবাদ করিয়া † পাবন কার্য্য সহ † উহা বিভক্ত করিলেন, এবং শিষ্যগণকে দিয়া কহিলেন, লও, ইহা হইতে তোমরা সকলে আহার কর, কারণ

† ইহা আমার দেহ †

পরে পুরোহিত পরম-প্রসাদ পাত্রে স্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ-সহ পান-পাত্র উঠাইয়া লইয়া কহেন—এইরূপে নিশি-ভোজনাবসানে তিনি আপন পুণ্যহস্ত দ্বারা এই পান-পাত্র লইয়া, হে ঈশ্বর, আপনার স্তুতিবাদ করিয়া, † ধন্যবাদ সহকারে উৎসর্গ করিয়া, আপন শিষ্যদিগকে এই বলিয়া প্রদান করিলেন, লও, ইহা হইতে তোমরা সকলেই পান কর, কারণ ইহা নূতন সন্ধি সম্বন্ধীয় আমার রক্তের পাত্র (যাহা চিরদিবসের জন্য ধর্ম্মের নিগূঢ় বিষয়), যে রক্ত তোমাদের জন্য ও অনেকের জন্য পাপ মোচনার্থ পাতিত।

লোকেরা। তথাস্তু।

পুরোহিত। ইহা আমার স্মরণার্থ করিও; কারণ আমি যতদিন না পুনরায় আগমন করি, তত দিন যখনই তোমরা এই পিষ্টক ভোজন করিবে এবং এই পান-পাত্র স্থিত মিশ্রিত পানীয় পান করিবে, তখনই আমার মৃত্যু প্রচার এবং আমার পুনরুত্থান স্বীকার করা হইবে।

লোকেরা। হে প্রভো! আপনার মৃত্যু আমরা স্মরণে রাখিব।

* পূজা-বিধিটীর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এই আর একটী নিদর্শন। খ্রীঃ ৪০০ শতাব্দীতে কনষ্টাণ্টিনোপলের পেট্রিয়ার্ক প্রথমে যীশুখ্রীষ্টের মাতা ঈশ্বর-জননী নামে অভিহিত হইতে পারেন না, এই আপত্তি উত্থাপন করেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মালাবর খ্রীষ্টীয়ানেরা নেষ্টোরিয় দল হইতে বিশপ্ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইঁহারা পূর্ব্বেকার পূজা-বিধির কোন পরিবর্ত্তন করিলেন না। নেষ্টেরিয় মতের প্রতিকূল প্রাচীন মত এই স্থলে পূজা-বিধি সম্বলিত হইয়া থাকিয়া গেল। অথচ অদ্যাবধি মালাবার খ্রীষ্টীয়ানেরা নেষ্টোরিয় মতাবলম্বী বলিয়া কাথলিকদের দ্বারা নিন্দিত হইয়া আসিতেছে।

† এই এই স্থলে পুরোহিত ক্রশ চিহ্ন করেন।

পুরোহিত। হে প্রভো, এই ভাবে আপনার মৃত্যু স্মরণ করিতে করিতে, শমন সদন হইতে তৃতীয় দিবসে আপনার পুনরুত্থান স্মরণ করিতে করিতে, পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে আপনার অবস্থান স্মরণ করিতে করিতে এবং ভৈরব বিক্রমে ও মহিমাতে আপনার দ্বিতীয় আগমন,—যে আগমনে আপনি পবিত্রাত্মাদ্বারা জগতের বিচার করিয়া প্রত্যেক লোককে কর্ম্মানুসারে পুরস্কার দিবেন,—সেই আগমন স্মরণ করিতে করিতে, আপনার উদ্দেশে আমরা এক্ষণে এই ভয়ঙ্কর, অথচ রক্তপাত শূন্য, বলিদান উৎসর্গ করিতেছি। অতএব, হে প্রভো, আমাদের পাপানুসারে আপনি আমাদের সহিত ব্যবহার না করিয়া, আমাদের কদাচারানুসারে আমাদের প্রতিফল না দিয়া, আপনার অনুচরগণ, আপনার লোকগণ, আপনার প্রজাগণ, আপনার নিকট, আপনার দ্বারা, ও আপনার সহবর্ত্তী হইয়া, পিতার উদ্দেশে এই যে অনুনয় বিনয় করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন।

লোকগণ। হে ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান পিতা, দয়া করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন।

পুরোহিত। হে প্রভো, আমরা আপনার দুর্ব্বল ও কলুষিত দাসগণ আপনাকে ধন্যবাদ দান করিতেছি, সকলের জন্য ও সকলের হইয়া, আপনার স্তুতিবাদ করিতেছি।

লোকগণ। আমরা আপনার প্রশংসা, আপনার মহিমা, আপনার আরাধনা করিতেছি; আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি, আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হে প্রভো ঈশ্বর, আপনি আমাদের প্রতি কৃপা করুন, এবং আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন।

পুরোহিত। সাধুদের মধ্যে বিশেষরূপে আমরা পুণ্যবতী মহিমান্বিতা, চির কুমারী, ধন্যা, ঈশ্বর-জননী মারিয়ার স্মরণ কীর্ত্তন করিতেছি।

আচার্য্য। হে প্রভো, তাঁহার অকপট পবিত্র প্রার্থনা সমুদায় আপনি স্মরণে রাখিয়া, ঐ সকলের কারণ, আমাদিগকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন ও আমাদের কথায় কর্ণপাত করুন।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

প্রেম।

প্রবন্ধ প্রারম্ভে বিষয়ের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করায় লেখক ও পাঠক উভয়েরই সুবিধা দেখা যায়। লেখক প্রথম হইতে বিষয়ার্থ স্থিরীকৃত হওয়ায় ভিন্ন অর্থে একই শব্দ প্রয়োগ করেন না এবং পাঠকও তজ্জন্য আদ্যোপান্ত বেশ বুঝিতে পারেন। কিন্তু মনস্তত্ত্বালোচনায় দেখা যায়, আদি সাধারণ (Primary General Idea) ভাবগুলির সংজ্ঞানিরূপণ করা বড়ই কঠিন। কারণ অনেক সময়ে সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে হইলে জাতি ও বিশেষত্ব (Genus and differentia) নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু অদ্বিতীয় হওয়ায় তাহা সম্ভবে না। সেই জন্য অনেক সময় কেবল মাত্র গুণ বা কার্য্য বর্ণনা করিয়াই আমাদের ক্ষান্ত হইতে হয়। বলা বাহুল্য, নিম্নলিখিত প্রবন্ধের বিষয় প্রেম সম্বন্ধে উপরি উক্ত কথা প্রযুজ্য।

নিত্য বস্তুর প্রতি আত্যন্তিক অনু-

রাগের নাম প্রেম। চিৎবৃত্তি, প্রেমবৃত্তি ও কর্ম্মবৃত্তি মানবমনের বৃত্তিত্রয়ের নাম। জ্ঞান চিৎবৃত্তির কার্য্য, ধ্যান, ধারণা, প্রভৃতি ইহার কার্য্য প্রসূত। ভক্তি, ভালবাসা, আনন্দ প্রেমবৃত্তির কতগুলি রূপান্তর মাত্র। আর ইচ্ছা, পূজা অর্চ্চনা, যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মবৃত্তির অনুশীলন সম্ভূত।

সহজভাবে বুঝিতে গেলে কোনও ক্রিয়া বিশেষে দেখাইতে হয়। এই প্রবন্ধ শুনিলে অনেক বিষয়ের জ্ঞান হয়, তাহা চিৎবৃত্তির হেতু। আনন্দ বা তদ্বিপরীত ভাবের উদয় হয়, তাহাই প্রেমবৃত্তির কর্ম্ম এবং আরও শুনিবার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা জন্মে, ইহাই হইল তৃতীয় বৃত্তির কার্য্য।

জ্ঞানবৃত্তির অনুশীলনের কারণ অনুসন্ধানেচ্ছা এবং সন্দেহ, ফল নিশ্চয়তা। প্রেমবৃত্তির স্ফূর্ত্তির কারণ সৌন্দর্য্যাবলোকন, ফল শান্তি। কর্ম্মবৃত্তি অতৃপ্ত বাসনায় জন্মে, ফলে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়। মনস্তত্ত্বালোচনার ইহা স্থান নহে, সেই জন্য উল্লিখিত বিচার পরম্পরার অবতারণা করা গেল না। তবে ইহা স্বীকার করিতে বোধ হয় কাহার আপত্তি হইবে না যে,বিশ্বাসের উপর ভিত্তি স্থাপিত করিয়া প্রেমবৃত্তি মনের যথার্থ শান্তি প্রদান করিতে পারে। সম্বিৎ, হ্লাদিনী ও সন্ধিনী ভাব ভেদে ভগবানের শক্তিত্রয়ের নাম। ইহাদেরই আংশিক স্ফুরণ মানব মনে বৃত্তিত্রয়ের অস্তিত্বের কারণ।

প্রেম অভিন্ন পদার্থ হইলেও পাত্রভেদে ইহার দুইটী বিভাগ কল্পনা করিতে পারা যায়। পরা ও অপরা।

আত্যন্তিক ভগবৎপ্রেমের নাম পরা প্রেম।

কোন্ সময় হইতে মানব মনে এই প্রেমের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা এখন নির্ণয় করা বড়ই দুরূহ। মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশে যখন পার্থিব ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া মানব পূর্ণ মহত্ত্বের লীলা-বিলাসে আকৃষ্ট হইল, জগতের সেই এক মাহেন্দ্রক্ষণ। সে দিন মানব পৃথিবীর প্রাকৃতিক সুষমাহিল্লোলে অনন্ত সৌন্দর্য্যের আংশিক স্ফুরণ দেখিতে পাইল, সেইদিন যে জগতের অতি শুভদিন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মনুষ্যভাগ্যে কবে যে সুদিন ঘটিয়াছিল, তাহা এখন নিশ্চয় করিবার উপায় নাই। আর করিবার প্রয়োজনই বা কি? পুরাতত্ত্ব সমালোচনায় জ্ঞানবৃত্তির অনুশীলন ব্যতীত বিশেষ উপকার আর কি আছে?

এই ভাবকলিকা ক্রমে ক্রমে যে বর্দ্ধিত হইয়াছে, জগতের ইতিহাসে আমরা তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাই। স্থাবর জঙ্গমে, স্রোতস্বিনীর জল কলকলে সেই ভগবানের লীলা যে আমরা অনুভব করি, ইহাও ত তাহারই পরিচায়ক। বৈদেশিক মহা পণ্ডিতগণ এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আমাদিগকে মূর্ত্তিপূজক, প্রকৃতিপূজক প্রভৃতি নানা আখ্যা প্রদান করিলেও যথার্থতঃ এ সকল ভাব যে প্রেমপ্রবণতার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না।

আমরা ব্যাস প্রণীত বেদান্ত শাস্ত্রের দ্বৈতভাষ্যে ইহার অস্তিত্ব দেখিতে পাই। জড়, চেতন ও শ্রীকৃষ্ণ এখানে আদি পদার্থত্রয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন। যাহা হউক, নির্গুণ ও সগুণ ভেদে এই বিশ্বজনীন প্রেমের দুইটী বিভাগ কল্পনা করা যায়।

ধর্ম্ম শাস্ত্রে প্রেম ও ভক্তি প্রায় তুল্যার্থ জ্ঞাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে সামান্য পার্থক্যও আছে। প্রেমের

প্রতি অনুরাগের নাম ভক্তি। সমানের প্রতি প্রেম। ভক্তিতে কিছু যেন দূরত্ব, বা পরত্ব এবং সেই হেতু ভয় মিশ্রিত থাকে। প্রেমে সে টুকু থাকে না, তাই সে বড়ই মধুর, বড়ই সুন্দর। সেই নির্গুণ প্রেম-নিঃসৃত নির্গুণ ভক্তির লক্ষণ ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"মদ্‌গুণ শ্রুতি মাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে,
"মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ
"লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং।
"অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
৩ স্কন্ধ, ২৯ অ, ১০ শ্লো।

আমার গুণ শ্রবণ মাত্রে সর্ব্বান্তর্যামী যে আমি আমাতে অর্থাৎ পুরুষোত্তমে সমুদ্রগামী গঙ্গা সলিলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না ও ফলানুসন্ধান-রহিতা এবং ভেদদর্শন-বর্জ্জিতা মনের গতিরূপ যে ভক্তি, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ।

ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত এই প্রেমই শ্রেষ্ঠ প্রেম। যে প্রেমিক এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাঁহারা

"সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং নগৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ॥
৩।২৯।১৩

এইরূপ ভক্তি ও প্রেম সাধনের উপায় ভাগবতে ৩ স্কন্ধে, ২৯ অধ্যায়ে, ১৩শ শ্লোক হইতে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

এইরূপ ভক্তি স্পৃহনীয় হইলেও আয়াস-সাধ্য। সত্ত্ব, রজ ও তম ভেদে তিনগুণ। মানবমাত্রই এই ত্রিগুণাশ্রিত। বহু সাধনের বলে ও ফলে এই ত্রিগুণাতীত হইতে পারা যায়। ত্রিগুণাতীত না হইতে পারিলে নির্গুণ ভক্তির কল্পনা আকাশকুসুমবৎ অসম্ভব।

শ্বেত বা নীলবর্ণ সাত্ত্বিক গুণের লক্ষণ, জ্ঞান, শান্তি, ইহার কার্য্য; ইহা প্রকাশাত্মক। গীতায় সত্ত্বগুণের বিষয়ে লিখিত আছে—

"সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্"
গীতা—১৪ শ অধ্যায়, ৬ শ্লোক।

রজঃগুণ রক্তবর্ণ। রজোগুণ কর্ম্মাত্মক বা চেষ্টাত্মক; ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। গীতায় আছে "রজঃ কর্ম্মণি" (১৪শ), ৬ শ্লোক, কৃষ্ণবর্ণ তমোগুণ নিরোধাত্মক। মোহ ইহার লক্ষণ। মোহ সম্বন্ধেও লিখিত আছে—

"অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহএবচ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥
১৪শ, ১৩ শ্লোক।

যাহার যে গুণ প্রধান, তাহার ভক্তি তৎগুণানুমত বিভিন্ন হইবে। তাই শাস্ত্রে বলে—

"স্বভাবগুণ মার্গেণ পুংসাংভাবোবিভিদ্যতে।"
৩।২৯।৬

সূর্য্যরশ্মি এক বর্ণ বিশিষ্ট। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট দর্পণে প্রতিভাত হইয়া বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। তদ্রূপ সেই ভগবদ্‌প্রেমও একরূপ, নির্গুণ, সাত্ত্বিক। কিন্তু বিভিন্ন গুণাশ্রিত মানব মনে প্রতিভাত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রতীয়মান হয়।

গীতায় এই মর্ম্মের উক্তি দেখিতে পাই

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম।"
১৪শ অঃ, ৫শ্লোক।

এই সকলই সগুণ প্রেম এবং এই নিঃসৃত ভক্তিই সগুণ ভক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তামসিক গুণের লক্ষণ লিখিত আছে—

"অভিসন্ধায় যদ্ধিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্য মেববা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ।
৩।২৯।৭

হিংসা, দম্ভ বা মাৎসর্য্য করিয়া ক্রোধী পুরুষ ভেদ দর্শন পূর্ব্বক ভগবানে যে ভক্তি করে, তাহাই তামস ভক্তি এবং সেই প্রেমই তামস প্রেম। মোহ বা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত এইরূপ হইয়া থাকে। রাজস প্রেম নিঃসৃত রাজস ভক্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"বিষয়ান অভিসন্ধায় যশঃ ঐশ্বয্য মেববা
অর্চ্চাবর্চ্চয়েদ্যোমাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ।
৩।২৯।৮

ভগবানাতিরিক্ত অপর দ্রব্যে স্পৃহা বা যশঃ কিম্বা ঐশ্বর্য্য অভিসন্ধি করিয়া ভেদ দর্শন পূর্ব্বক প্রতিমাতে যে অর্চ্চনা করে, অর্থাৎ ভক্তি করে, তাহা রাজস।

কেহ যেন মনে না করেন যে, এখানে প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে কোনও কথা সূচিত হইয়াছে। ভগবান ব্যতীত অন্য সম্পদ আকাঙ্ক্ষা বা যশঃ আকাঙ্ক্ষা করিয়া প্রতিমা পূজাই দূষণীয়; অন্য ভাবে পূজা দূষণীয় নহে।

সগুণ উৎকৃষ্ট ভক্তিই সাত্ত্বিক ভক্তি, তাহার লক্ষণ লিখিত আছে—

"কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্যপরস্মিন্ বাতদর্পণং
যজেদ্‌যষ্টব্যমিতি বা পৃথবাভাবঃ সমাত্বিকঃ।
৩।২।৯।৯

আর কর্ম্মনিহার অর্থাৎ পাপক্ষয় বা ভগবৎপ্রীতিকাম হইয়া ভগবানেতে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া অথবা নিত্যবিধি প্রাপ্ত প্রযুক্ত অবশ্যই যজ্ঞ করিতে হইবে, ইত্যাদি বিধি উদ্দেশ করিয়া ভেদদর্শন পূর্ব্বক যে ব্যক্তি যজ্ঞ করে অর্থাৎ ভক্তি করে, তাহাই সাত্ত্বিক প্রেম প্রণোদিত সাত্ত্বিক ভক্তি।

এই উপরি বর্ণিত ত্রিবিধ সগুণ ভক্তিরই একটী বিষয়ে ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই ত্রিবিধ ভক্তিতেই "পৃথকভাবঃ" ভিন্ন দর্শন আছে। তবে অবস্থা বিভাবে কাম্যের প্রভেদ আছে। অহেতুকীভক্তি যাহা পূর্ব্বে নির্গুণ ভক্তির লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ফলাভিসন্ধান আদৌ নাই। ইহাতে তাহা বর্ত্তমান আছে। সাত্ত্বিক ভক্তিরও স্তর আছে। যথাক্রমে পাপক্ষয় উদ্দেশে, ভগবৎ প্রীতি, বা বৈধ আচরণ উত্তম। অর্থাৎ যে কেবল "বৈধ কর্ম্ম করিতেছি" এই ভাবে ভক্তি করিতে পারে, সে শ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিক। যে "ভগবানের প্রীত্যর্থ" এই ভাবে করে, সে মধ্যম এবং যে "আমার পাপক্ষয় হউক" এই ভাবে ভক্তি করে, সে অধম সাত্ত্বিক। যেমন "শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘণ" বিধি, সেইরূপ সাধনও শনৈঃ কর্ত্তব্য, অন্যথা অসম্ভব।

এইরূপে ত্রিবিধ ভক্তিই উত্তমাধম মধ্যম ভেদে এবং শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্ত্যঙ্গভেদে একাশীতি প্রকার বিভিন্নভাবে কল্পিত হইয়া থাকে, বাহুল্য ভয়ে এখানে অবিচারিত রহিল।

মানবের প্রায়ই দেখা যায়, একটী না একটী ভাব প্রবল। যাহার যে ভাব প্রবল, হিন্দুশাস্ত্র তাহার জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কারণেই জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ত্রিবিধ মার্গের অবতারণা। ভক্তি বা প্রেমমার্গের আবার বহু বিভাগ আছে। যে ভাবে যে সাধন করে, সেই ভাবেই সে গন্তব্যস্থানে যাইতে পারে। হিন্দুশাস্ত্রে সকল ভাব সাধনেরই ব্যবস্থা আছে। সম্পর্কভেদে প্রেম সাধনেরও অষ্টবিধ কল্পনা করা যাইতে পারে, মাতৃভাবে, পিতৃভাবে, ভ্রাতৃ বা সখ্য ভাবে পত্নীভাব, উপপত্নীভাব, দাস্যভাব, বাৎসল্যভাব, এবং শত্রুভাব। শাক্তেরা মাতৃভাবে, শৈবেরা পিতৃভাবে, অর্জ্জুন, শ্রীদাম প্রভৃতি সখ্যভাবে, সত্যভামা কুব্জা পত্নীভাবে, ব্রজাঙ্গনারা উপপত্নীভাবে, হনুমান

দাস্যভাবে, নন্দযশোদা বাৎসল্যভাবে এবং রাবণ, হিরণ্যকশিপু শত্রুভাবে সাধন করিয়া, ছিলেন। তাই বলি, হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় এমন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম আর নাই। ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ভেদ দৃষ্ট হইলেও অন্তরে ভেদ নাই। শুদ্ধ প্রস্থানভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে মাত্র। যে ভাবেই সাধন করা যাউক, গন্তব্য একই, একই শান্তির শীতল ছায়া সকলেরই শেষ বিরামস্থল। নানা নদ-নদী যেমন নানাদিকেশ "সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা" করিয়া শেষে একই সমুদ্রে মিলিত হয়, মানবগণও সেইরূপ নানা মার্গে নানা রূপ সাধন করিয়া নানা সম্পত্তি লাভ করতঃ শেষে একই শান্তিময়ের পদপ্রান্তে চিরবিশ্রাম লাভ করে।

মহিম্নস্তবে এই ভাবটী কেমন সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে, শুনুন—

"ত্রয়ী সাংখ্যংযোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
"প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি,
"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল নানা পথজুষাং
"নৃণামে কোগম্যস্ত্বমসি পয়স অর্ণবইব।"

বেদত্রয়, সাংখ্য, যোগশাস্ত্র, পশুপতিমত (শৈব), বৈষ্ণব মত ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থানে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। কিন্তু স্রোতস্বিনীর ঋজু, কুটিল নানা পথ দ্বারা সমুদ্রগমনের ন্যায় রুচি বৈচিত্র্যময় মানবমণ্ডলীর বিভিন্ন পন্থাদ্বারা তুমিই একমাত্র প্রাপ্তব্য।

যে ভাবেই হউক, প্রেম সাধনের সাধারণ উপায় এবং সাধকের লক্ষণ গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে কেমন সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সুবিধার জন্য অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত হইল।

"ইষ্টভাবে হৃষ্ট নহে যাহার অন্তর,
"অনিষ্টে বিদ্বেষ নাই সম নিরন্তর,
"ইষ্টনাশে শোক নাহি করেন যে জন
"লাভের বিষয়ে যাঁর লোভশূন্য মন
"শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান যিনি
"নিঃসংশয় ধনঞ্জয় মম প্রিয় তিনি।
"শত্রু মিত্রে, সুখে দুঃখে মান অপমানে
"সমভাবে থাকে যাঁর অনাসক্ত মনে
"স্তুতিনিন্দা সমজ্ঞান অল্প কথা কন
"নামান্তে সন্তোষ পূর্ণ সর্ব্বদা যেজন
"অতুল ঐশ্বর্য্যে থাকি গৃহশূন্য যিনি
"স্থিরমতি ভক্তিমান মম ভক্ত তিনি॥"

পরা প্রেম স্পৃহনীয় হইলেও সর্ব্বদা মানব জগতে উহার প্রাধান্য দেখা যায় না। আমরা দেখি, মানব কি মোহিনী ডোরে মানব ও অমানব বস্তুতে বদ্ধ, এই মায়া কত মূর্ত্তিতেই বিরাজিত। এই অনিত্য বস্তুর প্রতি অনুরাগই অপরাপ্রেম। জগতে ইহার আধিপত্য অতি প্রবল। উপকারিতা যে আদৌ নাই, তাহাও বলিতে পারি না। মানবজীবন এমনই প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত যে, যে বিষয় কখনও বহিঃ বা অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূতা না হইয়াছে, তাহার লৌকিকজ্ঞান আদৌ হয় না। অপরা প্রেমের ইহাতেই উপকারিতা কল্পিত হয়। বাৎসল্য ভাব সাধনের পূর্ব্বে গুরু শিষ্যকে জগতের বালকমাত্রই বাল-গোপাল মূর্ত্তিতে ভগবানের অবতার এই শিক্ষা দিলেন, শিষ্যও তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া সাধন করিতে লাগিল। সুতরাং দেখিতেছি, এখানে অপরাপ্রেমই পরা প্রেমের সোপান্। তাই বলি, নিকৃষ্ট হইলেও অপরাপ্রেমের উপকারিতা আছে।

উপরেই দেখিয়াছি, দুই বিভাগে ইহাকে বিভক্ত করা যায়। মানবে মানবে এবং মানব ও মানব বস্তুতে।

এই মানবীয় প্রেমের মধ্যে উপজাতি

করা যাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই জগতে নরনারী কি এক মোহিনী ডোরে বদ্ধ। উভয়ের চরিত্রগত পার্থক্য দেখিলে কতই বিভিন্নতা দেখিতে পাই। এই সকল জাতিবিভাগ করিতে কত মার্জ্জিত মস্তিষ্ক পণ্ডিত জগতের আদিকাল হইতে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন।

চরিত্রগত পার্থক্য হইতে আমরা প্রধানতঃ দুইটী বিভাগ কল্পনা করিতে পারি।

প্রথমতঃ বিরুদ্ধ সভাবসম্পন্ন (Complementary character) ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে যে প্রেম। তোমার কোনও গুণ আছে, আমার তাহা নাই। তোমাতে আমাতে প্রেম হইবে। কথাটী একটু বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইবে। এক জন গায়ক অপর একজন সঙ্গীতানভিজ্ঞ। উভয়ে প্রণয় হয়। বৈষম্যনিয়মে বা অনুকরণেচ্ছায় এই প্রণয় সঞ্জাত হয়, তাহা আমরা অবগত নহি। যাহাতেই হউক, সে আকর্ষণ যে মহাবলবান, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ প্রেম প্রায়ই শীঘ্রই সঞ্জাত হয়।

দ্বিতীয় সমভাবাপন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে যে প্রেম। আমার কোনও গুণ আছে, তোমার তাহা অধিকমাত্রায় আছে, তোমায় আমায় প্রেম হইবে। বোধ হয় সমভাবাপন্নতা বশতঃ সহানুভূতিই এ প্রেম উৎপাদনের কারণ। এ প্রেম সঞ্জাত হইতে কিছু বিলম্ব লাগে। কারণ কোনও গুণ বিশেষের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা এবং তাহার আপেক্ষিক আধিক্য (relative greatness) নির্ণয়ে সময় লাগা স্বাভাবিক। Tennyson এর Æuoch Æarden যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, এই তত্ত্ব উহাতে কেমন প্রকটিত হইয়াছে। Æuoch এবং Annic পূর্ব্বভাবের প্রণয়ী, Annic এবং Philip শেষ প্রকারের।

বাঙ্গালায় "মাধবীকঙ্কণে" রমেশ বাবু কতকটা ঐ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বাঙ্গলার ছাঁচে ইংরাজী যতটা ঢালা চলে, রমেশ বাবু উহাতে তাহার প্রয়াস পাইয়াছেন। উহাতে হেমলতা ও নরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বভাবের প্রণয়ী, হেমলতা ও শ্রীশচন্দ্র শেষ প্রকারের, আর জেলেখার নরেন্দ্রনাথের প্রতি ভালবাসা বুঝি উভয়ের সংমিশ্রণ।

চরিত্রগত এই দুই বিভাগের প্রত্যেকটী আবার গুণজ রূপজ ভেদে দুই প্রকারের হইতে পারে।

প্রথমতঃ জ্ঞান মূলক বা (reason based) প্রেমিকের গুণাবলী জ্ঞানবৃত্তির দ্বারা যথাযথ বিচারিত হইয়া তাহার মধ্যে উত্তমাধম স্থিরীকৃত হইয়া যে প্রেম সঞ্জাত হয়, তাহাই জ্ঞানমূলক ভালবাসা। ইহা সঞ্জাত হইতে বিলম্ব হয়। কারণ গুণাবলীর অস্তিত্ব প্রভৃতি উপলব্ধি হইতে সময় লাগা স্বাভাবিক। তাহার পর জ্ঞানবৃত্তির পরিচালন দ্বারা উত্তমাধম বিচার, শক্তি ও সময় সাপেক্ষ।

দ্বিতীয়তঃ ইহা না হইয়া অনেক সময়ে কেবল মাত্র কোনও গুণের প্রথম জ্ঞান মাত্র বা শারীরিক রূপলাবণ্য দর্শন মাত্র ভালবাসার ন্যায় আকর্ষণে মানব আকৃষ্ট হয়। রূপবতীর রূপজ মোহ এই প্রকারের। এই তরল ভাবে মূলক বা (or feeling based) প্রণয় প্রায়ই ক্ষণস্থায়ী। নবীনার নবযৌবন তরঙ্গ ভঙ্গের চারু সুষমানিঃসৃত আনন্দহিল্লোল যৌবন পরিপুষ্ট অঙ্গের পরিণতির সহিত হ্রাস হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই ভালবাসারও

হ্রাস হয়। কিন্তু গুণ বিচার পূর্ব্বক যে প্রেম তাহার হ্রাস সম্ভবে না। বরং ব্যবহারে গুণাবলীর অধিকতর জ্ঞান জন্মে এবং তৎসহিত ঐ প্রেম বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এ বিষয়ে বঙ্কিম বাবু বিষবৃক্ষে বলিয়াছেন:—

"মনের অনেক গুলিন্ ভাব আছে, তাহার সকলকেই লোকে ভালবাসা বলে। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায় অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্ম সুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হই, তাহাকেই প্রকৃত ভালবাসা বলে। "স্বতঃ প্রস্তুত হই" অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান বা পুণ্যাকাঙ্ক্ষায় নহে। সুতরাং রূপবতীর রূপভোগ লালসা ভালবাসা নহে * * * এ বৃত্তিও জগদীশ্বর প্রেরিতা। ইহার দ্বারাও সংসারের ইষ্ট-সাধন হইয়া থাকে এবং ইহা সর্ব্বজীব মুগ্ধকারী * * কালিদাস, বায়রণ, জয়দেব ইহার কবি * * * প্রেম বুদ্ধি বৃত্তি মূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণসকল যখন বুদ্ধি বৃত্তির দ্বারা পরিগৃহীত হয় হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকর্ষিত এবং সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মায়। ইহার ফল সহৃদয়তা এবং পরিণামে আত্ম বিস্মৃতি ও আত্ম বিসর্জ্জন; সেক্ষপীয়র, বাল্মীকি, মাদাম্ দেস্তাল ইহার কবি।"

"বিষবৃক্ষে" এ তথ্যটী সুন্দর রূপে দর্শিত হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখীর প্রেম গুণজ প্রেম, সেই জন্য চিরস্থায়ী। নগেন্দ্র নাথ ও কুন্দর প্রেম নগেন্দ্রনাথের পক্ষে রূপজ মোহ, সেই জন্য শীঘ্রই বিকার জন্মিয়াছিল।

অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, অনেক স্থলে রূপজমোহ হইতে যথার্থ প্রণয় জন্মে। রূপজ মোহে আকৃষ্ট হইয়া সঙ্গ করিতে করিতে ক্রমে হয় ত গুণাবলী বিদিত হইতে পারা যায়, তখন রূপজ আকর্ষণ, প্রণয়ে পরিণত হয়।

প্রেমের জাতি বিভাগ যেরূপেই করা যাউক, আমরা দেখিতে পাই, একটা না একটা গুণের অযথা পক্ষপাত প্রেমের একটা বিষম দোষ। প্রেমিক একটী কোনও গুণ বা বিশেষ গুণাবলীর উপর অযথা প্রয়োজনীয়তা আরোপ করেন। যেন সেই একটী গুণ হইলেই যথেষ্ট হইল। অদৃষ্ট বশে সেরূপ হইলে সুখের হয়, কিন্তু অনেক সময়ে বৈপরীত্য ঘটে।

"দীনবন্ধু বাবুর" কমলেকামিনী যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাইবেন। শিখণ্ডি কাব্যে নীলাম্বুজ নয়নার কথা পড়িয়াছেন, তাই তিনি আযৌবন নীলাম্বুজ নয়নার পক্ষপাতী। তাই যখন রণকল্যাণীর সহিত তাঁহার প্রথম দর্শন হইল, তখন তিনি অন্য কিছু দেখিলেন না, কেবল দেখিলেন।—

"ইন্দীবর বিনিন্দিত বিশাল নয়ন
সুখ সুখ সরোবরে ভাসিছে কেমন।"

ইংরাজিতে যে বলে Hero is blind, কথাটা পূর্ণ সত্য না হইলেও অনেকাংশে ঠিক। আমাদের বোধ হয়, প্রণয় একদেশদর্শী, ইহারই কথা উপরে উক্ত হইয়াছে। যথার্থ প্রেমে স্থান, কাল, অবস্থা বা পাত্রাপাত্র বিচার থাকেনা। প্রেমে প্রেম চাহে অর্থ বা অন্য বিষয়ে যথার্থ প্রেমের লক্ষ্য থাকে না। সামাজিক জাতি বর্ণভেদ যথার্থ প্রেমে নাই। বিল্ব মঙ্গল ঠাকুরে এ তথ্যটী প্রকটিত দেখিতে পাই।

প্রেম সহজাত বৃত্তি হইলেও পরিপুষ্টির জন্য অনুশীলন প্রয়োজন। আবাল্য সংসারে এই বৃত্তির অনুশীলন অলক্ষিত ভাবে হইতে থাকে। যেখানে শৈশবে অনুশীলন না হয়, সেখানে হৃদয় অবর্দ্ধিত রহিয়া যায়। "কপালকুণ্ডলায়" আমরা এ বিষয়টী বেশ বুঝিতে পারি।

প্রকৃতিপালিতা কপালকুণ্ডলা আবাল্য কখনও সংসারী মানবকে ভালবাসিতে পায় নাই। তাই সে যৌবনে ভালবাসিতে পারিল না। তাহার ভালবাসা বৃত্তি মুকুলে শুকাইয়া গিয়াছিল। তাই সে নবকুমারের সঙ্গে থাকিয়াও সেই বন-শোভা ভুলিতে পারিল না; তাই যখন শ্যামাসুন্দরী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে বলিল যে, সে পূর্ব্বের ন্যায় মুক্তভাবে প্রকৃতি-শোভা উপভোগ করিতে পারিলে সুখী হয়।

এই মানবীয় প্রেমেও রাজসিক, তামসিক ও সাত্ত্বিক ভেদ দৃষ্ট হয়। প্রেমের সহিত অস্থিরতা, দারুণ হিংসা, ঈর্ষা, অতৃপ্ত-প্রেমে বৈরনির্য্যাতন ইচ্ছা রাজসিক প্রেমের লক্ষণ। মাধবীকঙ্কণে জেলেখার প্রেম এই শ্রেণীর।

প্রেমে মোহ, কার্য্যনাশ, চিত্তবিক্ষেপ, এ সকল তামসিক প্রেমের লক্ষণ। সীতারামের শ্রীর প্রতি আকর্ষণ বুঝি এই পদবাচ্য। আর শান্ত নিরুদ্বিগ্নচিত্তের ভালবাসা, প্রেমের জন্য স্বার্থত্যাগ সাত্ত্বিক প্রেমের পরিচায়ক। পাঠক উপমা চান ত একবার চন্দ্রশেখরের শেষ দৃশ্য স্মরণ করুন। শবরাশির মধ্যে মুমূর্ষু প্রতাপ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন; অনুসন্ধান করিতে করিতে রামানন্দ স্বামী গিয়া পৌঁছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রতাপ তুমি কি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে? উত্তর কবির মুখেই শুনুন।

"সুপ্তসিংহ যেন গর্জ্জিয়া উঠিল। বলিল, কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসী আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসি * * * * আমার ভালবাসার নাম আত্মবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা" হিংসা বা মোহে এ আকাঙ্ক্ষা উদ্ভূত হয় নাই, পরমমঙ্গলার্থ স্বার্থবিসর্জ্জনেচ্ছায় এ ইচ্ছা সঞ্জাত হইয়াছিল।

অন্যত্র বঙ্কিম বাবু যে বলিয়াছেন, "সুখ আত্ম প্রতিষ্ঠায় নহে, আত্মবিসর্জ্জনে," সে সুখ সাত্ত্বিক পদবাচ্য, রাজসিক, বা তামসিক নহে।

যথার্থ সাত্ত্বিক প্রেমে বিকার জন্মিতে পারে না। ভোগে অন্যস্থলে তীব্র আসঙ্গলিপ্সা জন্মে, সাত্ত্বিক প্রেমে ক্রমে শান্তি উপজিত হয়। অবসাদ যথার্থ প্রেম-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। যথার্থ প্রেমে সঙ্গলিপ্সা কখনও মিটে না। তাই শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন,

> "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
> নয়ন না তেরপিত ভেল।"

যথার্থ প্রেমিক কখনও দেখিয়াই তৃপ্ত হইতে পারেন না। ভালবাসার বিকার ত দূরের কথা।

এই সমস্ত স্থলে অপরা প্রেম পরা প্রেমের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

গত শতাব্দীতে ফরাসী পণ্ডিত কোমৎ প্রেমের উপর ভিত্তি স্থাপিত করিয়া সমাজ সংস্করণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মাতাকে ভালবাস, পূজা করিতে শিখ, স্ত্রীকে ভালবাস, পূজা করিতে শিখ, ক্রমে স্বপরিবারে ভালবাসা নিবদ্ধ না রাখিয়া স্বসমাজ, স্বদেশ, ক্রমে পৃথিবীকে আপন পরিবার ভাবিতে এবং সেইরূপ ভালবাসিতে শিখ। কোমতের আশা, এইরূপে ক্রমে ভবিষ্যতে আদর্শ সমাজ গঠিত হইবে। পূর্ণ মনুষ্যত্বকে ভগবদ্ভাবে পূজা করিতে শিখিলে সমাজ আদর্শের সর্ব্বোচ্চ স্তরে উথিত হইবে। এই সমাজে আর অপর ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই।

মনুষ্যত্বই ঈশ্বর। ঈশ্বরস্থানে মনুষ্যত্বকে রাখিয়া ঈশ্বরত্ব লোপ করিয়া কোমৎ যে দর্শনের বীজ বপন করিয়া গেলেন, কালে তজ্জাত বৃক্ষে কুফল ফলিল। লোকে নাস্তিক হইল।

এক শতাব্দ পরে, বিলাতে হার্ব্বার্ট স্পেন্সর আবার স্বার্থ হইতে বিবর্ত্তন নিয়মে নিঃস্বার্থতার উৎপত্তি দেখাইয়া প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইলেন। পার্থিব জড়বস্তুগত বিবর্ত্তনে অপার্থিবভাব সঞ্জাত হইতে পারে কিনা, তদ্বিষয় আলোচনা করিবার ইহা সময় নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, অনেকের মতে তিনি প্রতিপাদ্য বিষয় অপরের অজ্ঞাতসারে মানিয়া লইয়াছেন।

এ সমস্ত বিরোধ যেরূপে ভঞ্জন করিতে পারা যায়, ভাগবতের ৩ স্কন্ধে কপিল দেবহুতি সংবাদে ২৬ অধ্যায়ে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ উহা পাঠ করিবেন। তবে ইহার মূল কথা এক—

"সর্ব্বভূতেষু আত্মানং সর্ব্বভূতানিচাত্মনি।"

এখানে আত্মন্ শব্দ সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয় ভাবে ব্যাখ্যা করিলেই সমস্ত বিবাদের ভঞ্জন হইতে পারে। সমষ্টি ভাবে আত্মা ঈশ্বর, আর ব্যষ্টিভাবে মানব। অতএব সর্ব্বভূতে ভগবান আছেন। সর্ব্বভূত আমাতুল্য, আমার প্রিয় বা ভগবান তুল্য আমার প্রিয়, এইরূপে প্রেম করিতে শিখিলে আর সমাজ বা ধর্ম্মের বিরোধ কোথায় থাকিতে পারে?

পৃথিবীতে একটা নিয়ম দেখিতে পাই যে, কোন বিষয় একদেশগমন দোষে দূষিত হইলে প্রতিকার্য্য দ্বারা ভিন্নদেশগমন করে। কিন্তু ঘাতপ্রতিঘাত নিয়মের বশীভূত হইয়াই হউক বা কোনও প্রাকৃতিক নিয়মবলেই হউক, সেই নূতন কার্য্যও প্রায়ই ক্রমে একদেশগমন দোষে দুষ্ট হয়। অদ্বৈতবাদের প্রভাবে যখন ন্যায়ের কূটতর্কে নাস্তিকতার স্রোতে হিন্দুধর্ম্ম ডুবিয়া গেল, তখন প্রেম-যোগের আবির্ভাব হইয়া "প্রলয় পয়োধি জল" নিমজ্জন হইতে তাহাকে রক্ষা করিল। ক্রমে তাহারও অপব্যবহার হইল এবং প্রেমযোগ অনেক স্থলে কেবল মূর্খজনোচিত অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হইল। অবশ্য ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে।

জীবিত ও মৃতের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক আছে, তাহা মানবের নিজস্ব সম্পত্তি। নিম্ন প্রাণীদের মধ্যে ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে। স্মৃতিরূপে বিরাজিত এই মধুর ভাব বড়ই প্রাণময়ী। অতীতের শান্তিময় অঙ্ক হইতে কত অর্দ্ধ-বিস্মৃত মধুর ভাব আনয়ন করে। কতকাল পূর্ব্বে কোনও মহাত্মা গতায়ু হইয়াছেন, আমরা এখনও কেমন তাঁহার জন্য প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকি। প্রেমের অবিনশ্বরত্বের আর প্রকৃষ্টতর প্রমাণ কি হইতে পারে?

অপরা প্রেমের মধ্যে মানবে মানবে যে প্রেম, তাহার বিষয়ে দুই এক কথা আলোচনা করা হইল। ইহাদের বিশেষত্ব এই, এখানে অনেক সময়ে আদান প্রদান উভয়ই হইয়া থাকে। এই আদান প্রদানই জগতের সুখের কারণ। বঙ্কিম বাবু কপালকুণ্ডলার এক স্থলে বলিয়াছেন, "আদান প্রদানই জগতে সুখের কারণ" দ্বিতীয় কারণ নাই। মানব ও অমানব বস্তুর সহিত যে ভালবাসা জন্মে, তাহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এখানে প্রদানই আছে, আদান নাই। প্রাণ ভরিয়া কোনও বস্তুকে ভালবাসিলাম, সেত তাহাঁর প্রতিদান করে না।

প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সৌন্দর্য্যে আমরা বিমোহিত হই। প্রাণের ভাষায় যাহা পাঠ করি, হৃদয়ের ভাষায় তাহা বর্ণনা করিতে প্রয়াস করি। তাহারই ফলে কবিতার সৃষ্টি।

শারদী-জ্যোৎস্না-বিধৌত যমুনার স্বচ্ছ তরঙ্গ-ভঙ্গে পূর্ণ সুধাংশুর অংশুমালা কত রঙ্গে নাচিয়া বেড়ায়; তাহা দেখিয়া কত প্রেমিক হৃদয় নাচিয়া উঠে। নীলাচলে চন্দ্রকর সমুজ্জল বীচিবিক্ষেপে কৃষ্ণপ্রেমের লীলা দেখিয়া ভগবান গৌরাঙ্গদেব বিভোর হইয়াছিলেন। বাসন্তী রজনী শেষে দুরন্ত স্রোতস্বিনীর জলকলকলের মলয়-সমীর-বাহিত অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি সুপ্তোত্থিত প্রবাসীর হৃদয়ে কিবা ভাব-মন্দাকিনীর ধারা ঢালিয়া দেয়। আজীবন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আমরা বিমোহিত হই, কিন্তু কৌমুদীস্নাত তরঙ্গের বা জলকলনিনাদের সহিত আনন্দের কি সম্বন্ধ আছে, তাহা কি আমরা নিশ্চয় করিতে পারি? সত্য বটে, মনের অবস্থা বিশেষে ভাবের তারতম্য হইয়া থাকে। মৃতপুত্রা জননীর যে তরঙ্গভঙ্গ নিনাদে মৃত পুত্রের "আধভাষ" মনে পড়ে, প্রেমিকের প্রাণে তাহা হয়ত কোনও পরিচিত প্রেমাস্পদের ভাবময়ী সঙ্গীতের অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি বলিয়া বোধ হয়। তাহা হইলেও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যাবলীর সহিত হৃদয়ের এই সমস্পন্দনে কত যেন জন্মান্তরীণ স্থির সৌহার্দ্যের কথা আমাদের মানসপথে উদিত হয়। তাহা অস্বীকার করিতে পারি না।

এই সমস্পন্দনের কারণ নির্ণয় করা দুরূহ। বিশ্বজনীন প্রেম মানবের সহজাত নিজস্ব সম্পত্তি। আমাদের বোধ হয়, জগতের এই সকল দৃশ্যপটে আমরা বিশ্বজনীন প্রেমের আধারভূত ভগবানের সৌন্দর্য্য অঙ্কিত দেখিতে পাই। তাই জড় প্রকৃতিও এত আনন্দের উৎপাদনে সমর্থ হয়।

কেহ কেহ এই ভাবে মাতোয়ারা হইয়া, প্রেমই একমাত্র পদার্থ মনে করেন। বিলাতী কবি শেলী বুঝি এইরূপ প্রেমের লীলাবিলাস পার্থিব বস্তুমাত্রেই দেখিতেন। "মহিলা" নামক কাব্য রচয়িতা তাহার উক্ত কাব্যের উপক্রমণিকায় প্রেমের উপর ভিত্তি স্থাপিত করিয়া কেমন জগতের বিবর্ত্তন দেখাইয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

যথার্থ প্রেম হইতে প্রেমময় ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সুন্দর পদার্থ আমরা ভালবাসি। এই ভালবাসা মনুষ্যের সহজাত বৃত্তি। পাত্রভেদে ইহার দুই পক্ষ—যে ভালবাসে এবং যাহাকে ভালবাসে। মানব ভালবাসে, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। তবে ভালবাসার পাত্র কে, সে বিষয়ে মতবিরোধ হইতে পারে। অনিত্য পরিবার, সমাজ প্রভৃতি সমস্তই শাস্ত্রোল্লিখিত পঞ্চবিধ ক্লেশ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি নানা-দোষ-দুষ্ট, কাজেই যথার্থ প্রেমের পাত্র হইতে পারে না। কেবল সেই নিত্য পূর্ণ সুন্দর ঈশ্বরই যথার্থ প্রেমের পাত্র।

শাস্ত্রে ঈশ্বরের লক্ষণ আছে,—

"ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষঃ ঈশ্বরঃ।" পতঞ্জলি, ১ পাদ সূ-২৪।

উপরোক্ত দোষ এই পুরুষে নাই, তাই দোষাভাব হেতু তিনি অনিন্দ্যসুন্দর; সেই হেতু যথার্থ প্রেমের পাত্র।

জাতি, উপজাতিগত অনেক কথাই উক্ত হইল। এখন জিজ্ঞাস্য, বাস্তবপক্ষে প্রেমের বিভিন্নতা আছে কিনা? অর্থাৎ কাহারও সন্তান অবলোকনে মনের হর্ষ এবং অর্থ

লাভ-জনিত আনন্দ, উভয়ে বাহ্যবস্তু সম্বন্ধ বশতঃ পার্থক্য বাদ দিলে শুদ্ধ প্রেমাংশে কোনও পার্থক্য থাকে কিনা? ইংরাজী দার্শনিক বেন্থাম (Benthem) প্রেম বা ভাল-বাসার ষড়্‌গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের সংঘাত বশতঃ পার্থক্য কল্পনাও করিয়াছেন। অনেকের মতে মানসিক বৃত্তি বা ভাবের নাম যে প্রেম, তাহাতে কোনও পার্থক্য নাই। তবে বাহ্য বস্তু বিশেষের সহিত আধার আধেয় ভাবে নিবদ্ধ হওয়ায় প্রেমের জাতিগত বিভিন্নরূপ কল্পনা করিতে পারা যায়। আমাদেরও ইহাই সমীচীন বোধ হয়।

আসুন পাঠক, প্রবন্ধশেষে সেই প্রেমময় ভগবানকে প্রণাম করি।

যাঁর প্রেমডোরে বাঁধা
এই বিশ্ব চরাচর।
যাঁর প্রেমে রবিশশী,
ভাতিছে পৃথ্বী অম্বর॥
যাঁর প্রেম, মায়ারূপে
ভাব মন্দাকিনী চিতে।
যাঁর প্রেম, কর্ণধার
ভবজলধি তরিতে॥

শ্রীহেমচন্দ্র বসু।

রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য।

রামকৃষ্ণ বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত গ্রন্থকার। তাঁহার পিতা রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার নবদ্বীপের সুবিখ্যাত স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সমসাময়িক। রঘুনন্দন ও রামভদ্র উভয়েই রামভদ্রের পিতা শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহা হইতে অনুমিত হইতেছে যে, রামভদ্রের পুত্র রামকৃষ্ণ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নবদ্বীপে বর্ত্তমান ছিলেন। রামকৃষ্ণের রচিত স্মৃতিগ্রন্থগুলি "কৌমুদী" নামে পরিচিত। রামকৃষ্ণের প্রপিতামহ শ্রীকর আচার্য্য খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মিথিলা হইতে আগমন করিয়া, ভাগীরথীর তীরস্থিত নবদ্বীপে বাস করিতে থাকেন। এই শ্রীকর বিজ্ঞানেশ্বর ও জীমূত বাহনের উল্লিখিত প্রাচীন মৈথিল পণ্ডিত শ্রীকর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যক্তি। প্রাচীন শ্রীকর খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে মিথিলায় আবির্ভূত হন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে শ্রীকর মিথিলা হইতে আগমন করিয়া, বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হন, তিনি দায়াধিকার সম্বন্ধে এক খানি পুস্তক রচনা করেন। ইহাতে শ্রীকর জীমূতবাহনের দায়ভাগ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে রাজকুমার বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জীমূতবাহন খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন * !! রাজকুমার বাবুর এই মত অসার ও অমূলক বলিয়া 'জীমূতবাহন' প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকর আচার্য্য প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি "ব্যাখ্যামৃত" নামে অমরকোষের টীকা রচনা করেন।

শ্রীকর আচার্য্যের পুত্র শ্রীনাথ। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি চৈতন্য দেবের গুরু বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সমসাময়িক। শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি জীমূতবাহনের রচিত 'দায়ভাগের' প্রাচীনতম টীকাকার। তাঁহার রচিত 'স্মৃতিতত্ত্বার্ণব,' 'প্রায়-

* R. K. Sarvadhikari's *Tagore Law Lectures for 1880, p. 400.*

শ্চিত্তবিবেক,' 'শুদ্ধিবিবেক,' 'কৃত্যকাল-বিনির্ণয়,' 'কৃত্যতত্বার্ণব' ও 'নৈষধপ্রকাশ' বিদ্যমান আছে।

শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির কৃত 'স্মৃতি-তত্বার্ণব' ও 'কৃত্যতত্বার্ণব' গ্রন্থের অনুকরণে, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাবিংশতি 'স্মৃতিতত্ব' রচিত হয়। স্বরচিত 'দায়ভাগ-টিপ্পনী' গ্রন্থের আরম্ভে শ্রীনাথ আপনাকে 'প্রাচীরত্ন' উপাধিতে পরিচিত করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টাক্ষরে জানা যায় যে, বঙ্গদেশে তাঁহার জন্ম হয়। মিথিলা শ্রীনাথের জন্মস্থান নহে। তিনি মৈথিল স্মার্ত্ত পণ্ডিত হইলে, স্বদেশ-প্রচলিত 'মিতাক্ষরার' টীকা নালিখিয়া, তদ্বিরোধী দায়ভাগের 'টিপ্পনী' লিখিতে যাইতেন না।

"নব্য-নিরধর-নীলমুলসচ্চঞ্চলা-রুচিরমেদুরাম্বরং।
নৌমি বাঙ্-মনসয়োরগোচরং চিন্ময়ং মুরহরাহ্বয়ং মহঃ
জীমূতবাহন-নিবন্ধমধ্যে বিরুদ্ধ-
-প্রায় প্রসিদ্ধ-মুনি বৃদ্ধ-বচঃ-সমাধি
দুর্ব্বোধমত্র বিষয়ে নিতরাং যয়াতৎ
ব্যাখ্যায়তে হশিত মতি-প্রতিবোধ-হেতোঃ॥
শ্রীকরাচার্য্যপুত্রেণ প্রাচীরত্নেন ধীমতা।
টিপ্পনী দায়ভাগস্য শ্রীনাথেন বিধীয়তে॥" (দায়ভাগ-টিপ্পনী)

"শ্রীকরাচার্য্য পুত্রেণ শ্রীনাথেন সতাং মুদে।
বিবেকঃ শুদ্ধিবিষয়ে ক্রিয়তে পরমাদরাৎ॥"
(শুদ্ধিবিবেক)

প্রণম্য কামদং রামং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং।
প্রায়শ্চিত্ত বিবেকোহয়ং শ্রীনাথেন বিধীয়তে॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীকরাচার্য্য-সূনু-শ্রীনাথাচার্য্য-বিরচিত প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ সমাপ্তঃ।"
(প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

'কৃত্যতত্বার্ণব' অতি বিস্তীর্ণ গ্রন্থ। ইহাতে কালাকাল ও বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠেয় বিবিধ কার্য্য-কলাপের বিবরণ বিস্তারিত ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

"শ্রীগোবিন্দ-পদাম্ভোজ দ্বন্দ্ব মদ্বন্দ্ব সাধনং।
বন্দে বৃন্দারক-ধুনী-মকরন্দ-মনোহরং॥
শ্রীকরাচার্য্য পুত্রেণ শ্রীমচ্ছ্রীনাথ শর্ম্মণা।
প্রীতয়ে বিদুষাং চক্রে কৃত্যকাল বিনির্ণয়ঃ॥
বিচার্য্য বাচো মুনিপুঙ্গবাণাং
নিবন্ধজাতঞ্চ মহার্ণবাদ্যং।
ময়া কৃতঃ কালবিনির্ণয়োহয়ং
সদা বুধানাং মুদমাতনোতু॥
কৃত্যতত্বার্ণবো নাম নিবন্ধো রচিতো ময়া।
প্রীয়ন্তামত্র বিবুধা ব্যবস্থা-রত্নরাশিভিঃ॥"
(কৃত্যতত্বার্ণব)

শ্রীনাথ আচার্য্যের রচিত নৈষধ কাব্যের প্রথম সাত সর্গের টীকা মিথিলার অন্তঃপাতী দারভাঙ্গা জিলায় মুজোনা গ্রামে বাবুলাল পাঠকের গৃহে বিদ্যমান আছে।

"শ্রীমন্নারায়ণং নত্বা কাব্যে শ্রীহর্ষনির্ম্মিতে।
প্রকাশনং যথাপ্রজ্ঞং শ্রীনাথেন বিধীয়তে॥
প্রণম্য মৌলিনা বন্দ্যান্ সম্প্রদায়বিদঃ সতঃ।
ত্যাজ্যং ত্যাজ্যং অসম্বাক্যং সদল্পমপি লিখ্যতে॥
যে মদর্থমজানন্তো বৃথাবচনবিস্তরৈঃ
দূষয়ন্তি কবেঃ কাব্যং ধিক্ তান্ পণ্ডিতমানিনঃ॥"
(নৈষধপ্রকাশ)

এই শ্রীনাথ আচার্য্য সম্ভবতঃ "কোষ্ঠী-প্রদীপ" রচনা করেন। তিনি গঙ্গাতীরে বাস করিতেন। এই পুস্তিকার আরম্ভে তিনি আপনাকে শ্রীনাথ ভট্ট নামে পরিচিত করিয়াছেন। 'শূলপাণি' প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শূলপাণি কোথায়ও আপনাকে ভট্ট এবং কোথায়ও ভট্টাচার্য্য উপাধিতে স্বরচিত পুস্তকে পরিচিত করিয়াছেন। নবদ্বীপবাসী শ্রীনাথ আচার্য্যও এই গ্রন্থে আপনাকে 'ভট্ট' উপাধিতে পরিচিত করিয়া থাকিবেন।

"তচ্চিন্তামণিমাত্রস্য প্রভাবাৎ প্রভবিষ্ণবে।
সর্ব্ববেদার্থতত্বায় কস্মৈচিৎ শ্রেয়সে নমঃ॥
তত্রাপি যত্নেন বিমৃষ্য ভূয়সা
শুভপ্রভাবোজ্জ্বল সার কল্পনং।

শ্রীনাথভট্টঃ সুরনিম্নগাতটে
কোষ্ঠীপ্রদীপং বিদধে বিচক্ষণঃ ॥" (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির পুত্র রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার। তিনিও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সমসাময়িক গ্রন্থকার। রামভদ্র 'দায়ভাগ টীকা' ও 'দায়ভাগ-সিদ্ধান্ত-কুমুদচন্দ্রিকা' রচনা করেন। রাজসাহী জিলার বরিয়া গ্রামে পণ্ডিত মধুসূদন শিরোমণির গৃহে ১৬২৮ শকাব্দের (১৭০৬ খ্রীঃ) লিখিত এক খানি 'দায়ভাগ সিদ্ধান্তকুমুদচন্দ্রিকা' বিদ্যমান আছে।

"আলোচ্য তাতনির্ম্মিত-নিবন্ধমারাধ্য বিশেশ্বরং।
আযচার্যা শ্রুতে বিবৃতিমিমাং দায়ভাগস্য ॥ ..
শ্রীরামভদ্ররচিতাং পাণৌ সংস্থাপ্য দীপিকামেতাং।
জীমূতবাহনকৃতের্গভীরার্থং বিদন্তু বিদ্বাংসঃ ॥
ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায় শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণি তনুজ-শ্রীরামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতা দায়ভাগ-টীকা সমাপ্ত।" (দায়ভাগটীকা)

সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক রামভদ্রের নাম পাওয়া যায়। নবদ্বীপের সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির পুত্র রামভদ্র সার্ব্বভৌম পিতার নিকট অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া, ন্যায়-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বহুতর গ্রন্থ রচনা করেন। এই রামভদ্রের পুত্রের নাম হরিরাম তর্কবাগীশ। হরিরামের ছাত্র গদাধর। গদাধরের ছাত্র জয়রাম তর্কালঙ্কার। জয়রামের ছাত্র বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন। জগদীশ তর্কালঙ্কারের পুত্র রুদ্রেশ্বর রামভদ্র সিদ্ধান্ত বাগীশের পিতা।

অপর এক রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার যশোহরের রাজা সীতারাম রায়ের মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন *। এই রামভদ্রের পুত্রের নাম শ্রীরামবাচস্পতি এবং পৌত্রের নাম মহাদেব ন্যায়বাগীশ। অনুমান ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে সীতারাম রায়ের জন্ম হয়। ১৭১৪ খ্রীঃ বঙ্গের নবাবের সেনাপতি সংগ্রাম সিংহ (সিংহরামসাহা), নাটোরের বিখ্যাত রঘুনন্দন ও দয়ারাম রায়ের সাহায্যে সীতারামকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করেন! এই কারাবাসে ভূষণার রাজা সীতারামের মৃত্যু হয়। সীতারামের পিতার নাম উদয় নারায়ণ বিশ্বাস। লক্ষ্মীনারায়ণ নামে সীতারামের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। সুরনারায়ণ ও শ্যামসুন্দর নামে সীতারামের দুই পুত্র জন্মে। 'বিশ্বাসখাস'নামক অতি হীন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থবংশে সীতারামের জন্ম হয়। সীতারাম দশভুজা দেবী, হরেকৃষ্ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ নামে তিনটী বিগ্রহ বিভিন্ন-দেবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৬২১শকাব্দে (১৬৯৯ খ্রীঃ) দশভুজা, ১৬২৫ শকাব্দে (১৭০৩ খ্রীঃ) হরেকৃষ্ণ, এবং ১৬২৬ শকাব্দে (১৭০৪ খ্রীঃ) লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির সীতারামের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইহা হইতে সীতারাম রায়ের সময় নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হইতেছে। সুরনারায়ণের পুত্রের নাম প্রেম নারায়ণ এবং পৌত্রের নাম রাধাকান্ত রায়।

"মহীভুজ-রস-ক্ষৌণী-শকে দশভুজালয়ং। (১৬২১)
অকারি শ্রীমতা সীতারামরায়েণ মন্দিরং॥"

"বাণ-দ্বন্দ্বাঙ্গ-চন্দ্রৈঃ পরিগণিত-শকে কৃষ্ণতোষাভিলাষী (১৬২৫)
শ্রীমদ্বিশ্বাস-খাস-কুলোদ্ভবঃ, কুলকমলোল্লাসকো ভানুতুল্যঃ।
অজস্রং সৌধযুক্তং রুচিররুচি-হরেকৃষ্ণগেহং বিচিত্রং
শ্রীসীতারামরায়ো যদুপতিনগরে ভক্তিমান্‌সৃজৎসমজ্ঞ ॥"

"লক্ষ্মীনারায়ণ-স্থিত্যৈ, তর্কাঙ্গিরস-ভূ-শকে। (১৬২৬)
নির্ম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থং, সীতারামেন মন্দিরং॥"

মুনিরাম রায় ঢাকা ও মুরশিদাবাদে নবাব দরবারে সীতারাম রায়ের পক্ষে উকীল নিযুক্ত ছিলেন। এই মুনিরামের পিতার

* নব্যভারত (১২৯৬), ৭। ৩২৭ দেখুন।

নাম রামভদ্র। মুনিরাম ১৬১০ শকাব্দে (১৬৮৮ খ্রীঃ) ধুলজুড়ী গ্রামে কৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। যশোহর জিলার অন্তঃপাতী মহম্মদপুরের দুই ক্রোশ উত্তরে ধুলজুড়ী গ্রামে এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। মুনিরামের প্রপৌত্র প্রাণনাথ রায়ের মুখে শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার এই শ্লোকটী শ্রবণ করেন *।

"স্বর্ণ চন্দ্ৰৈরসেন্দৌ শকে কৃষ্ণচন্দ্রস্য মন্দিরং।
অকারি মুনিরামেণ রামভদ্রস্য সূনুনা॥"

দায়ভাগের টীকাকার রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের কৃত "বিদ্বন্মোদিনী" নামে 'রঘুবংশ' কাব্যের টীকা এবং "অভিজ্ঞান শকুন্তল" নাটকের 'শকুন্তলা-বিবৃতি' নামে টীকা বর্ত্তমান আছে। এই রামভদ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণ "কৌমুদী" নামে বহুতর স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পুত্রের নাম রাধাবল্লভ। এই রাধাবল্লভের পুত্র কাশীরাম বাচস্পতি স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দনের প্রণীত "স্মৃতিতত্ত্বের" টীকা রচনা করেন। রামকৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামেশ্বর "তন্ত্র প্রমোদ" এবং রঘুমণি 'আগমসার' নামে তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। †

"ক্ব কালিদাস-কবিতা কাহং মন্দমতি র্বটুঃ।
নির্ম্মিতো মধুচক্রস্য ন পতঙ্গঃ প্রভুর্ভবেৎ॥"

ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায়-রামভদ্র-কৃতা অভিজ্ঞান-শকুন্তলা বিবৃতিঃ-সমাপ্তা। (শকুন্তলা-বিবৃতি)

"বিনায়কং নমস্কৃত্য সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনং।
রঘুবংশ-মহাকাব্য টীকাং কর্ত্তুং সমারভে॥
ব্যাখ্যায়তে যথাশক্তি নির্ম্মৎসরাধিয়া ময়া,
এতেন প্রীয়তাং নিত্যং পরাত্মা রঘুনন্দনঃ॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীরামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য বিরচিতায়াং বিদ্বন্মোদিন্যাং রঘুবংশ টীকায়াং দ্বাদশসর্গঃ।" (বিদ্বন্মোদিনী)

এই প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের নিম্নলিখিত বংশাবলী প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শিত হইল। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এবংবিধ প্রামাণিক বংশপত্রিকা সচরাচর পাওয়া যায় না।

শ্রীকর আচার্য্য
|
শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি
|
রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার
|
রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার — রামেশ্বর — রঘুমণি
|
রাধাবল্লভ
|
কাশীরাম বাচস্পতি

রামেশ্বর রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি শত পটলে "তন্ত্রপ্রমোদ" রচনা করেন। রঘুমণি রামভদ্রের ষষ্ঠপুত্র বলিয়া স্বরচিত "আগমসারে" আপনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

"যো জাতঃ পৃথিবীতলে দ্বিজকুল-স্রোতস্বতী-নায়কে
রাকা-নির্ম্মল-শর্ব্বরী পতিরিব শ্রীরামভদ্রঃ কৃতী।
ব্রাহ্মণ্যাজ্জব শৌর্য্যবীর্য্যনিচয়ৈ র্মহ্যাং মহীয়ানসৌ
বিদ্যাভিঃ প্রতিবাসরং কলুষিত-প্রত্যর্থি বিদ্বদ্গণঃ॥
ন্যায়ালঙ্কারনামা সুবিদিত সুকৃতাম্ভোধি ভূকীর্ত্তিপূর্ণ
প্রক্ষীণাঙ্ক-ত্রিযামাকর কর-নিকরো দিক্ষু সর্ব্বাসু
যোহয়ং।
ভট্টাচার্য্যঃ প্রসিদ্ধো নিখিলজনপদে জহ্নুকন্যা-প্রতীরে
শ্রাদ্ধঃ শ্রেষ্ঠাসবাঙ্ঘ্রি-দ্বয়-সরসিরুহধ্যান-ধামৈকবন্ধুঃ॥
দানৈ র্দৈন্যদরৌঘ-দারণ-পটু র্যো ভূমি নাকৌকসাং
খ্যাতশ্চ ক্ষিতিমণ্ডলেশ্বরগণৈঃ সংসেবিতাঙ্ঘ্রিদ্বয়ঃ।
জ্ঞাত্বায়ং ক্রিয়তে ক্রিয়তেহখিলাগম-মতং, তস্য
দ্বিতীয়াত্মজ-
শ্রীরামেশ্বরশর্ম্মণা সুবিদুষা তৎপ্রমোদঃ শুভঃ॥
রামেশ্বর ভূমিসুর-কৃতে তন্ত্রপ্রমোদাখ্যে।
সংক্ষেপ-দীক্ষণবিধিঃ সপ্তমঃ পটলোগতঃ॥" (তন্ত্রপ্রমোদ)

* নব্যভারত (১২৯৮), ৫।৪৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† Dr. R. L. Mitra's *"Notice of Sanskrit Mss.,"* VII. 257, VIII 267, III. 103 and 139—141.

'তন্ত্রপ্রমোদে' রামেশ্বর আপনাকে রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের দ্বিতীয় পুত্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। 'আগমসারে' রঘুমণি আপনাকে রামভদ্রের ষষ্ঠ পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিম্নে 'আগমসারের' দুইটী অনুপ্রাসপূর্ণ শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

"নাবদ্য-দ্রুম-দান-দ্রুত দলিতত-পসদ-বিদ্য বিদ্বৎ সমুদ্যদ্
দারিদ্র্য দ্রাবিতারিক্রম বিল-বিলসৎ-সৎপ্রতাপৈ
বিসর্ব্বঃ।
ন্যায়ালঙ্কার-বিত্তি বিবিধ-বুধবর ব্রাত দুর্বোধ-বিদ্যা-
ব্যাখ্যানাব্যগ্রবুদ্ধি ব্যথিত-দিবিষদাচার্য্যকো রামভদ্রঃ।
ভট্টাচার্য্যস্য তস্য স্বগুণগণ রবিগ্লান গোত্রাম্বু-ষাঢ়-
ষ্মাদস্থঃ স্বান্তান্ত-শান্তেন্দ্রিয় বিবৃতি-বশী যঃ সুতঃ ষষ্ঠ
আসীৎ॥"

রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য নানা বিষয়ে ব্যুৎপন্ন প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'কৌমুদী' নামে নানাশাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মৈথিল দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্রের 'শাঙ্খ্যতত্ত্ব-কৌমুদী'র অনুকরণে, "শাংখ্য-কৌমুদী" রচনা করেন।

"কৃষ্ণং প্রণম্য পুরুষাৎ প্রকৃতেশ্চ পরং বিভুং।
তন্যতে রামকৃষ্ণেণ রম্যেয়ং শাংখ্য কৌমুদী।"
(শাংখ্যকৌমুদী)

রামকৃষ্ণ মীমাংসা দর্শন সম্বন্ধে 'অধিকরণ কৌমুদী' বেদান্ত বিষয়ে 'ভাগবতকৌমুদী' এবং বাদার্থ সম্পর্কে 'শাব্দবোধপ্রক্রিয়া' রচনা করেন।

"নন্দসুনুং নমস্কৃত্য সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরং।
নিরূপ্যতেঽধিকরণং রামকৃষ্ণেণ বিশ্রুতং॥"
(অধিকরণ কৌমুদী)

"প্রণম্য পরমং ব্রহ্ম দুরুহার্থ স্বরূপিনং।
তন্যতে রামকৃষ্ণেণ শ্রীভাগবত কৌমুদী॥"
(ভাগবত কৌমুদী)

"শ্রীরামং সানুজং নত্বা রামকৃষ্ণো বশংবদঃ।
প্রক্রিয়াং শাব্দবোধস্য কুর্ব্বে মতানুসারতঃ॥"
(শাব্দবোধ প্রক্রিয়া)

'মন্ত্রকৌমুদী' গ্রন্থে বিবিধ বৈদিক মন্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে। 'আগম কৌমুদী' ও 'আগমচন্দ্রিকা' পুস্তকে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত মন্ত্রাদি দানের ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে, রামকৃষ্ণর 'আগমচন্দ্রিকা' ১৪৪৭ শকাব্দে (১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিত হয়। ইহা হইতে জানা যাইতেছে, রামকৃষ্ণ ও রঘুনন্দন একই সময়ে নবদ্বীপে আবির্ভূত হন।

"নমস্কৃত্যাখিলৈ মন্ত্রৈর্বোধ্যং শ্রীপরমেশ্বরং।
তন্যতে রামকৃষ্ণেণ রম্যা শ্রীমন্ত্র কৌমুদী॥"
(মন্ত্রকৌমুদী)

"সর্ব্বমন্ত্র সমারাধ্যং কৃষ্ণংস্তস্য হৃদাম্বুজে।
তন্যতে রামকৃষ্ণেন শ্রীমদাগম কৌমুদী॥"
(আগম কৌমুদী)

"প্রণম্য গুরুপাদাব্জং মুনি-বেদ-নৃপে শকে।
শ্রীরামকৃষ্ণঃ সংক্ষিপ্ত তনোত্যাগমচন্দ্রিকা॥"
(আগম চন্দ্রিকা)

"বিরোধভঞ্জনী" নামে মহাভারতের খণ্ডিত টীকা রামকৃষ্ণ রচনা করেন। আদি, সভা, আরণ্যক, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রাস্থানিক, স্বর্গারোহণ, ও হরিবংশ পর্ব্বের টীকা রাজসাহী জিলার বরিয়া গ্রামে মধুসূদন শিরোমণির গৃহে বর্ত্তমান আছে। ইহার মধ্যে কোন কোন টীকা ১৫৭৮ শকাব্দে (১৬৫৬ খৃঃ) লিখিত হয়।

"শ্রীকৃষ্ণায়ং নমস্কৃত্য মহাভারতবোধিনী।
বিরোধভঞ্জনী রামকৃষ্ণেণ তন্যতে॥"
(আদিপর্ব্বটীকা)

"প্রণিপত্য হরিংভক্ত্যা সর্ব্বলোকৈকপালকং।
তন্যতে রামকৃষ্ণেণ সভাপর্ব্ব প্রকাশিনী॥"
(সভাপর্ব্ব)

"প্রণিপত্য হরিং ভক্ত্যা নীলেন্দীবর সুন্দরং।
ক্রিয়তে রামকৃষ্ণেণ ব্যাখ্যারণ্যক-পর্ব্বণঃ॥"
(আরণ্যক)

"ভগবন্তং নমস্কৃত্য ভক্তকাম্যপ্রদং হরিং।
বিরাটপর্ব্বব্যাখ্যানং রামকৃষ্ণেণ তন্যতে॥
(বিরাট)

ভগবন্তং নমস্কৃত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহং।
উদ্যোগ পর্ব্বব্যাখ্যানং রামকৃষ্ণেণ তন্যতে॥
(উদ্যোগ)

"নারায়ণং নমস্কৃত্য ভক্তাভীষ্ট ফলপ্রদং।
তন্যতে রামকৃষ্ণেণ ব্যাখ্যানং ভীষ্মপর্ব্বণঃ॥
(ভীষ্ম)

"চক্রপাণিং নমস্কৃত্য সর্ব্বদা ভক্তপালকং।
তন্যতে রামকৃষ্ণেণ ব্যাখ্যা সপ্তমপর্ব্বণঃ॥ (দ্রোণ)

"অর্জ্জুনাশ্বনিয়ন্তারং নমস্কৃত্য হরিং প্রভুং।
তন্যতে রামকৃষ্ণেণ ব্যাখ্যানং কর্ণপর্ব্বণঃ॥ (কর্ণ)

"শ্রীকৃষ্ণ-চরণাম্ভোজে নিবেশ্য স্বায়-ষট্পদং।
তন্যতে রামকৃষ্ণেণ ব্যাখ্যানং শল্য পর্ব্বণঃ॥
(শল্য)

"প্রণম্য কৃষ্ণং বরদং বিশ্বকাম্যদ নামকং।
ব্যাখ্যানং দানধর্ম্মস্য রামকৃষ্ণেণ তন্যতে। (শান্তি)

"নারায়ণং নমস্কৃত্য কিরীটিজ্ঞানদীপকং।
পর্ব্বাশ্বমেধিকব্যাখ্যা রামকৃষ্ণেণ তন্যতে॥
(অশ্বমেধ)

"নারায়ণং নমস্কৃত্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং।
ব্যাখ্যানং মোক্ষধর্ম্মস্য রামকৃষ্ণেণ তন্যতে॥
(শান্তি)

"ভগবন্তং নমস্কৃত্য ধৃতগোপাললক্ষণং।
আশ্চর্য্যপর্ব্ব ব্যাখ্যানং রামকৃষ্ণেণ তন্যতে॥
(হরিবংশ)

বর্দ্ধমান জেলায় বৈঁচির সন্নিহিত নিসিড়াগড় গ্রামে পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যারত্নের গৃহে মহাভারতের 'অর্থসংগ্রহদীপিকা' নামে পুস্তকের আদিপর্ব্বের টীকা বর্ত্তমান আছে। ইহা ঈশান মিশ্রের পুত্র অর্জ্জুন মিশ্রের রচিত। সত্যবোধের শিষ্য সন্ন্যাসী দেববোধের রচিত মহাভারতের তাৎপর্য্য দীপিকার আদিপর্ব্ব কলিকাতা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের গৃহে বিদ্যমান আছে। অর্জ্জুন মিশ্র দেববোধের শিষ্য বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি দেববোধের টীকা দর্শন করিয়া, স্বরচিত 'অর্থসংগ্রহদীপিকা' রচনা করেন। গ্রন্থারম্ভে অর্জ্জুন মিশ্র বেদব্যাস, বৈশম্পায়ন, দেববোধ, বিমলবোধ, সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণ, ভট্ট শাণ্ডিল্য, মাধব ও নিজের পিতা ঈশান মিশ্রকে নমস্কার করিয়াছেন। ১৬০০ শকাব্দের মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষে বৃহস্পতিবার দুর্গরাম শর্ম্মা এই আদিপর্ব্বের টীকা নকল করেন। দেববোধ ও অর্জ্জুন মিশ্র খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর গ্রন্থকার বলিয়া অনুমিত হয়।

"যস্যৈকরেণু পরমাণুরপি ক্ষণেন
ধাতুর্দদাতি বিপুলং শমমীপ্সিতেষু।
তন্নো হরেরবতু পাদসরোজযুগ্মং
প্রাবিসিত প্রতিহতাবজিতশ্চিরায়॥

বেদব্যাস বৈশম্পায়ন দেববোধ বিমলবোধ সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণ ভট্টশাণ্ডিল্য মাধব পিতৃপাদেভ্যো নমঃ।

শ্রীদেববোধ পাদাদিমতমালোক্য যত্নতঃ।
ক্রিয়তেঽর্জ্জুন মিশ্রেণ ভারতার্থ প্রদীপিকা॥...

ইতি ভারতচার্য্য পাঠকরাজ শ্রীমদীশানতনয় ভারতাচার্য্য মিশ্রার্জ্জুনকৃতৌ মহাভারতার্থদীপিকায়াং টীকায়াং আদিপর্ব্ব সমাপ্তং। শকাব্দা ১৬।

মাসে নভসি কৃষ্ণাখ্যে পক্ষে গুরুদিনে মুদা।
টীকেয়ং লিখিতা যত্নাৎ শ্রীদুর্গারামশর্ম্মণা॥"
(মহাভারতার্থ সংগ্রহদীপিকা)

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেও নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞের পরে অর্জ্জুন মিশ্র আবির্ভূত হন। নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ 'মন্বর্থবিবৃতি' নামে মনুসংহিতার সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রচনা করেন। ইহাতে তিনি গোবিন্দরাজের মনুভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং পূর্ব্বতন টীকাকারদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন। অধ্যাপক বুলারের গবেষণায় ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দের লিখিত নারায়ণের একখানি টীকা পাওয়া গিয়াছে।

নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ভারতে সম্ভবতঃ আবির্ভূত হন। *

"শ্রীনারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ-কৃতিবৃত্তির্মনুস্মৃতেঃ।
কুনিবন্ধকৃতব্যাখ্যামিয়ং দূরে নিরস্যতে॥"

(মন্বর্থ-বিবৃতি)

নীলকণ্ঠ মহাভারতের বিখ্যাত টীকাকার। মহাভারত ভিন্ন ভগবদ্গীতা ও দেবী ভাগবতের টীকা নীলকণ্ঠের দ্বারা রচিত হয়। তিনি শ্রীধর স্বামীর পরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণ ভারতে আবির্ভূত হন। শ্রীধর স্বামী মহারাষ্ট্রদেশে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হইয়া, মাধব প্রতাপ, রামবিজয় ও হরিবিজয় কাব্য সংস্কৃতে রচনা করেন। এই শেষোক্ত হরিবিজয় ১৪৯৩ শকাব্দে (১৫৭১ খ্রীঃ) সমাপ্ত হয়। † এই সকল মূল গ্রন্থ ভিন্ন শ্রীধর স্বামী ভগবদ্গীতা, ভাগবতপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণের টীকা রচনা করেন। নীলকণ্ঠ এই শ্রীধর স্বামীর শিষ্য ছিলেন। স্বপ্রণীত দেবীভাগবতের টীকার আরম্ভ নীলকণ্ঠ যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, কাশীনাথ নামে তাঁহার আর এক গুরু ছিলেন। নীলকণ্ঠের পিতার নাম রঙ্গনাথ এবং মাতার নাম লক্ষ্মীদেবী। স্বরচিত বেদান্তভাষ্যে নীলকণ্ঠ বিখ্যাত রামানুজ আচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। নীলকণ্ঠের শিষ্য হরদত্ত খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পশ্চিম ভারতে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি আপস্তম্ব ও গৌতম স্মৃতির ভাষ্য ভিন্ন কালিকাবৃত্তির 'পদমঞ্জরী' নামে টীকা রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে মিত্র মিশ্র হরদত্তের "উজ্জ্বলা" ও "গৌতমীয় মিতাক্ষরা" হইতে নানা স্থান স্বরচিত 'বীরমিত্রোদয়ে' উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"নমঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্য পাদাব্জায়োকারিণে।
যস্য প্রত্যুপকারায় নম ইত্যেব কেবলং॥
শ্রীমল্লক্ষ্মবতীং লক্ষ্মীং মাতরং দেশিকোত্তমাং।
পিতরং রঙ্গনাথাখ্যং দেশিকোত্তমমাশ্রিয়ে॥
কাশীনাথং গুরুং নত্বা শ্রীধরাখ্যং গুরুংতথা।
অন্যে যে সন্তি গুরব স্তান্ সর্ব্বানভিবাদ্য চ॥"

(দেবীভাগবত টীকা।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের রচিত "স্মৃতিকৌমুদীর' অন্তর্গত 'সঙ্কল্পকৌমুদী', 'প্রায়শ্চিত্ত-কৌমুদী,' ও 'ব্রতোদ্যাপনকৌমুদী' পাওয়া গিয়াছে। শূলপাণি ভট্টের কৃত "প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক" অবলম্বনে রামকৃষ্ণ 'প্রায়শ্চিত্তকৌমুদী' রচনা করেন।

"প্রণম্য রাধিকাকান্তং ভক্তাভীষ্ট প্রবর্ত্তকং।
তন্যতে রামকৃষ্ণেণ রম্যেয়ং স্মৃতিকৌমুদী॥"

(স্মৃতিকৌমুদী)

"প্রণম্য কমলাকান্তং দেববন্দ্যপদাম্বুজং।
তন্যতে রামকৃষ্ণেণ রম্যা সঙ্কল্পকৌমুদী॥"

(সঙ্কল্পকৌমুদী)

বিখ্যাত স্মার্ত্তকার হেমাদ্রির সংগৃহীত 'চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণির' অন্তর্গত 'ব্রতখণ্ড' অবলম্বনে, রামকৃষ্ণের "ব্রতোদ্যাপনকৌমুদী" প্রণীত হয়।

"প্রণম্য সারদাং দেবীং শরচ্চন্দ্র সম প্রভাং।
ক্রিয়তে রামকৃষ্ণেণ ব্রতোদ্যাপনকৌমুদী॥
হেমাদ্রিব্রত খণ্ডোক্ত-ব্রতানি কানিচিৎ খলু।
সমাদৃতানি গৌড়েষু, তানি বক্ষ্যামি যত্নতঃ॥"

(ব্রতকৌমুদী)

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপের বিখ্যাত স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এবং বারাণসীর স্মার্ত্ত পণ্ডিত রামকৃষ্ণ ভট্টের সমসাময়িক ছিলেন। এই রামকৃষ্ণ ভট্টের পুত্র বিখ্যাত

*Dr. J. Jolly's *Tagore Law Lectures for 1883*, p. 9-10

† Journal of Bombay branch of Royal Asiatic Society, 1, 6.

কমলাকর ভট্ট সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রদত্ত হইবে।

রামকৃষ্ণের পুত্র রাধাবল্লভ ভট্টাচার্য্য স্মৃতি অপেক্ষা সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই রাধাবল্লভের পুত্র ও রামকৃষ্ণের পৌত্র কাশীরাম বাচস্পতি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া, রঘুনন্দনের রচিত "স্মৃতি তত্ত্বের" টিপ্পনী রচনা করেন। কাশীরামের চরিত দায়, উদ্বাহ, একাদশী ও মলমাস তত্ত্বের 'টিপ্পনী' পাওয়া গিয়াছে। এই শেষোক্ত গ্রন্থের অন্তে কাশীরাম আপনার পরিচয় দিয়াছেন।

"যং প্রাসূত সমস্তশাস্ত্রনিপুণঃ শ্রীরামকৃষ্ণাত্মজঃ
শ্রীরাধোত্তর বল্লভাখ্যঃ সুকৃতী সঙ্গীতচূড়ামণিঃ ॥
তেন শ্রীমতা কাশিরামকৃতিনা যত্নেন নিষ্পাদিতা
টীকা নাতিসুশৃঙ্খলাপি কৃতিভিঃ সানুগ্রহৈ
দৃশ্যতাং॥" (মলমাসতত্ত্ব টিপ্পনী)

কাশীরাম বাচস্পতির ন্যায় রাধামোহন গোস্বামী বিদ্যাবাচস্পতি, চিন্তামণি ন্যায়ালঙ্কার, এবং বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্তবাগীশ, স্মার্ত্ত-শিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের রচিত স্মৃতিতত্ত্বের টীকা প্রণয়ন করেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

বেদান্ত দর্শন ও অদ্বৈতবাদ।

দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিস্তার।

দর্শন শাস্ত্রের প্রথম উৎপত্তি-স্থান ভারতবর্ষ। এদেশে কেবল যে বেদান্ত প্রভৃতি ষড়্দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা নহে। যত প্রকার মূল দার্শনিক মত হইতে পারে, সে সমুদায়ই এই দেশে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল। তবে এই সকল বিভিন্ন দার্শনিক মত কোন সময়ে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, এবং কত দিন হইতে প্রচলিত আছে, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। সাধারণতঃ আর্য্যপণ্ডিত মাত্রে বিশ্বাস করেন যে, এই সকল বিভিন্ন মত অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত। তবে ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সেই সকল বিভিন্ন মত বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এবং যিনি যে মত প্রথম সংকলন বা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাঁহার নামেই সেই মত প্রচলিত হইয়াছে। এ কথা কতদূর সঙ্গত, তাহা এস্থলে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বেদ ও উপনিষদ মধ্যেই সকল প্রকার দার্শনিক মতের আভাষ পাওয়া যায়।(১) আস্তিক দার্শনিক মাত্রেই বেদের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া নিজ মত স্থাপন করিয়াছেন। এমন কি, বৌদ্ধদর্শনও এই উপনিষদ্‌ ভিত্তির উপর স্থাপিত। (২) অতএব সকল প্রকার

(১) "The beginning of philosophical speculation goes back to a very remote age. Even in the songhita of the Rik we find hymns of high degree of reflection..."

Weber's History of Sanskrit Literature, p. 232.

(২) পণ্ডিত মোক্ষমূলর বলিয়াছেন,—

His (Buddha's) hostility towards the Brahman's is much exaggerated, and we know by this time that most of his doctrines were really those of the upanishad's.

Vedant Philosophy, p. 113.

পণ্ডিত Rhys David তাঁহার Buddhism নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

It is certain that long before Goutama's time the Brahmans had paid great attention to the deepest questions ontology and Ethics, and were divided into different schools, in one or other of which most of Goutama's metaphysical tenets had previously been taught. (p. 34).

তিনি ঐ পুস্তকের অন্যত্র বলিয়াছেন,—

Goutama was born and brought

দার্শনিক মতই এদেশে অনাদি বা স্মরণাতীত কাল প্রবর্ত্তিত, ইহা বলা যাইতে পারে।

সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ হইতে পাওয়া যায় যে, ভারতে এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ ঊনবিংশতি বা বিংশতি প্রকার প্রধান দর্শনিক মত প্রচলিত আছে। এই সকল বিভিন্ন মত ব্যতীত দর্শন শাস্ত্রে আর বড় নূতন মূল মত সৃষ্টি হইতে পারে না। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, ফরাসি দার্শনিক কুর্জে স্বীকার করিয়াছেন যে, "ভারতের দর্শন শাস্ত্র এত বিস্তীর্ণ, যে আমরা যথার্থই বলিতে পারি যে, ইহা সমগ্র দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাসের সার সঙ্কলন মাত্র।"

ভারতে এই সকল দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তির পূর্ব্বে অন্য কোন দেশে যে দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ নাই। যতদূর জানা যায়, তাহাতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, ভারতের পূর্ব্বে অন্য দেশে প্রকৃত দর্শন শাস্ত্রের প্রচলন আদৌ ছিল না। ভারতে যখন দর্শন শাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা হয়, তখন অন্য কোন দেশে এই শাস্ত্রের আলোচনা ছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কথিত আছে, মিসর ক্যালডিয়া প্রভৃতি কোন কোন দেশে পুরোহিতগণ গুপ্ত বিদ্যা পরিজ্ঞাত ছিলেন। এরূপ হইতেও পারে যে, ঐ সকল দেশের লোক কতকাংশে ধর্ম্মের মূল সত্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা দর্শন শাস্ত্রের আদৌ আলোচনা করেন নাই। অন্ততঃ এরূপ আলোচনার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অনেকে হয়তঃ মনে করিতে পারেন যে, অতি প্রাচীন কালে মিসর, ব্যাবেলিন, টায়র প্রভৃতি দেশের অবস্থা অত্যন্ত উন্নত হইয়াছিল। এখনও মিসরের পূর্ব্বউন্নতির সাক্ষ্য পিরামিড্ রহিয়াছে। প্রাচীন ইতিহাসেও ঐ সকল জাতির উন্নতির কথা জানা যাইতে পারে। কিন্তু ইতিহাসে এইমাত্র জানা যায় যে, ইহারা বাণিজ্য, শিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতি বিদ্যার উন্নতি করিয়াছিল মাত্র। ভারত ব্যতীত অন্যত্র যে দর্শন শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা পূর্ব্বে হইয়াছিল, ইহা বলা যায় না। অনেকে বলেন, এই জগত কত দিনের কে বলিতে পারে? পৃথিবীর স্তরসংস্থান হইতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, প্রায় কোটী বৎসর পূর্ব্বে এ পৃথিবীতে মানুষ বিদ্যমান ছিল। পঞ্চাশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানুষ যে কতকটা সভ্য ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। (৩) তাহা হইলে

and lived and died a Hindu. He was not an enemy to Hindusm There is not much in the metaphysics and psychology of Goutama which cannot be found in one or other of the orthodox systems, and great deal of his morality could be matched in earlier or later Hindu books (p. 84).

জর্ম্মনি পণ্ডিত ওয়েবার (Weber) সাহেব বলিয়াছেন,—

"Buddhistic doctrine was originally identical with Sankhya system .....The doctrine promalgated by Jagyabalka in Brihadaranyaka are also completely Buddhistic as also that of the Atharva Upanishad of the Joge system."

Weber's History of Sanskrit Literature, p. 252.

সুতরাং বৈষ্ণব বা শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ন্যায় বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশ্বজনীন সনাতন ধর্ম্মের অন্তর্গত। উপনিষদে পাওযাযায যে, "অসদেব সৌম্য ইদমগ্রে আসীৎ।" এই শ্রুতির উপর বৌদ্ধদের শূন্যবাদ প্রতিষ্ঠিত।

আর বৌদ্ধদিগের মতে গৌতম বুদ্ধই শেষ বুদ্ধদেব। তাহার পূর্ব্বে অনেক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং গৌতম বুদ্ধের বহু পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধ দার্শনিক মত সকল প্রচলিত ছিল—ইহা বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন।

(৩) জায়েন, লাবক প্রভৃতি প্রায় সকল আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের এইরূপ মত। ১৮৮৫ সালের

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে যে দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা হয় নাই, এবং ভারত ব্যতীত অন্য দেশে যে দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা হয় নাই, তাহা বলা যাইতে পারে না। আমরা এই সম্বন্ধে এই মাত্র বলিব যে, এই রূপ অনুমান নিষ্ফল। ইহা অবলম্বন করিয়া কেহই বলিতে পারেন না যে, আমাদের দেশে দর্শনালোচনার পূর্ব্বে অন্য কোন দেশে দর্শনালোচনা হইয়াছিল—অথবা সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বরং আমাদের দেশের অতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতেই দেখা যায় যে, অনাদি বা স্মরণাতীত কাল হইতেই এ দেশে বেদের প্রচার ছিল, ও বিভিন্ন দার্শনিক মতের প্রচলন হইয়াছিল। আমাদের দেশের শাস্ত্রই কেবল পৃথিবী বা মানব জাতির কাল নির্ণয় প্রভৃতি সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে। তাই শাস্ত্রের কথা একেবারে অবিশ্বাস না করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, ভারতের বেদ যেমন আদি পুস্তক, তেমনি ভারতের দর্শনই আদি দর্শন শাস্ত্র ও ভারতেই দর্শন শাস্ত্রের প্রথম উৎপত্তি।

যখন ভারতে প্রথম জ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ হয়, তখন পৃথিবীর প্রায় অন্য সকল দেশ ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। সে সকল দেশের লোক অশিক্ষিত, অসভ্য বা অর্দ্ধ শিক্ষিত ছিল। নগ্ন দেহ, আমমাংসভোজী, পশুতুল্য আণ্ডামানবাসী জাতি হইতে, পরকাল ও আত্মচিন্তা বা দর্শনশাস্ত্রআলোচনানিরত জাতিতে পরিণত হইতে হইলে সভ্যতার কত বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়, ও তাহার জন্য কতযুগের সাধনা ও চেষ্টার প্রয়োজন হয়, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। পুরাকালে ভারত ব্যতীত যে সকল দেশ উন্নতি সোপানে অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কোন জাতি যে সকল স্তরগুলি অতিক্রম করিয়া ভারতের ন্যায় উন্নতির শেষ স্তরে আসিতে পারিয়াছিল, তাহার কোন রূপ প্রমাণ নাই।

মানুষ ও সমাজের উন্নতির নিয়ম কতকটা একরূপ। 'বাঙ্গালীর অবনতির কারণ' শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থলে লিখিত হইয়াছিল,—

"আদিম অবস্থায় মানুষের জ্ঞানে দুইটী বিষয় প্রতিভাত হয়—আপনি ও জগৎ। তখন মানুষ বাহ্যজগতের দ্বারা চারি দিক হইতে বিপর্য্যস্ত হয়। বাহ্য জড়শক্তির সহিত তাহাকে অবিরত সংগ্রাম করিয়া কোনরূপে জীবন রক্ষা করিতে হয়। সংগ্রাম করিয়া মানুষ ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়ে। শেষে সে জড় শক্তির আশ্রয় লয়। কখন বা দেবতা ভাবিয়া জড় শক্তিকে পূজা করিয়া, তাহাতে আত্মসমর্পণ করতঃ কোন রূপে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করে। এই আত্মরক্ষার জন্য ক্রমে আদিম মানুষ পরস্পর সমাজবদ্ধ হয়। ইহাই সমাজের প্রথম সূচনা। পরে বাহ্য জগতের সহিত সংগ্রাম করিয়া, বাহ্য জড় শক্তিকে নিয়মিত করিয়া, সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষ

সেপ্টেম্বর মাসের 'নাইন্‌টিন্‌থ সেঞ্চুরি' পত্রিকায় পণ্ডিত মোক্ষমূলরও এই কথা স্বীকার করিয়াছেন বা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আর এই কথা স্বীকার করিয়াই তিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে, বেদের সৃষ্টির বহু পূর্ব্বে যে ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চা ছিল না, বা কোন পুস্তক রচিত হয় নাই, তাহা বলা যায় না। মোক্ষমূলর আরও বলেন, কোন দর্শনশাস্ত্র বা ধর্ম্মগ্রন্থ অতি প্রাচীন বা সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, একথা কোন গৌরবের কারণ নহে।

আপনার কথা—অন্য কথা ভাবিতে অবসর পায়। তখন সে আপনাকে—জগৎকে বড় নিয়মিত—বড় সীমাবদ্ধ দেখিতে পায়। এই সসীমের ধারণা হইতে ক্রমে অসীমের বা ঈশ্বরের ধারণা করিতে সমর্থ হয়। এই সময়ই তাহার জ্ঞানে ধর্ম্মবীজ প্রথম উপ্ত হয়।" (নব্যভারত পৌষ, ১৩০১ সাল)

যখন সমাজ এত দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়, তখন তাহার জ্ঞান বিকশিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন তাহার ভাবিবার বিষয় হয় তিনটী—আপনি, জগৎ ও ঈশ্বর। তাহার পর দর্শন আলোচনার সময় উপস্থিত হয়। কিন্তু সমাজ উন্নতি সোপানে এতদূর আরোহণ করিবার পূর্ব্বে, তাহাকে আরও কতকগুলি সোপান বা স্তর অতিক্রম করিতে হয়। সমাজ যখন বাহ্য প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া, তাহাকে কতকটা আয়ত্ত করিয়া লয়, তখন সে সমাজে শিল্প ও বাণিজ্য আলোচনার সময় হয়, অর্থাৎ তখন সে সমাজে শিল্প ও বাণিজ্যের বিশেষ চর্চ্চা আরম্ভ হয়। পরে সমাজ যখন দৃঢ়বদ্ধ হইতে থাকে, লোকে স্বার্থবৃত্তি সংকীর্ণ করিয়া পরার্থ বৃত্তির অনুশীলন করিতে থাকে, সেই সময় রাজনীতির উন্নতি হয়। ইহা সমাজের দ্বিতীয় স্তর। জগৎতত্ত্ব আরও একটু অধিকতর আয়ত্ত হইলে, সে সমাজে প্রকৃত বিজ্ঞানের চর্চ্চার সময় উপস্থিত হয়। ইহা সভ্য সমাজের তৃতীয় স্তর। অবশেষে চতুর্থ স্তরে আসিয়া সমাজ বাহ্য জগতের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া, অথবা তাহাকে আয়ত্ত করিয়া লইয়া, তবে ইহকালের কথা ছাড়িয়া পরকালের বা ধর্ম্মের কথা বিশেষরূপ ভাবিতে পারে। সমাজ উন্নতির শেষ স্তরে না আসিলে দর্শন বা তত্ত্ব আলোচনার প্রকৃত সময় হয় না। (৪)

সকল জাতিকেই উন্নতির এই বিভিন্ন স্তর দিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে হয়। দেশকাল এই উন্নতিতে সাহায্য করে মাত্র। যে দেশে প্রকৃতি অনুকূল নহে, যেখানে অনেক দিন ধরিয়া অবিরত প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, সে দেশে সমাজ বহুকাল পর্য্যন্ত প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিতে পারে না। যতদিন না পারে, ততদিন অসভ্য অবস্থায় থাকে—সভ্যতার স্তরে আসিতে পারে না। প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিলে তবে সে জাতির

(৪) ফরাসী দার্শনিক পণ্ডিত কুঁজে, তাঁহার কৃত দর্শনের ইতিহাসে সমাজের অবলম্বনীয় এই পাঁচটী বিষয়ের কথা বলিয়াছেন, -

"Five elements of a nation's life are—industry, state, art, religion, and philosophy. Humanity gets hold of the five following ideas, viz, the useful, the just, the beautiful, the devine and the true.
The above five elements are based on these five ideas ....

কিন্তু ইঁহার মতে, এই পাঁচটী বিষয়ের একটী না একটীকে—কোন এক বিশেষ সমাজ অবলম্বন করিয়া উন্নত হয়। তাঁহার কথা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"Every nation is called into existence to represent an idea and it progresses towards the accomplishment of this idea. The different nations of the same epoch represent the different ideas. The nation which represents the idea must in accordance with the general spirit of the Epoch is the nation called to domain. When the idea of a nation has served its time, that nation disappears."

Cousin's History of Philosophy vol II, p. 151.

সুতরাং ইঁহার মত অনুসারে এক এক বিশেষ যুগে এক এক ভাবের প্রাধান্য থাকে। সেই রূপ এক এক জাতি এক এক বিশেষ ভাব লইয়া উন্নতি পথে অগ্রসর হয়। যতদিন পৃথিবীতে সেই ভাবের প্রাধান্য থাকে, তত দিন ঐ ভাবেঅনুপ্রাণিত জাতিরই অন্য সকলের উপর আধিপত্য থাকে। যে যুগে যে ভাবের আধিপত্য থাকে না, সে যুগে ঐ জাতির অবনতি হয়, অথবা ধ্বংস হয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এগুলি উন্নতির বিভিন্ন স্তর মাত্র।"

মধ্যে প্রধানতঃ শিল্প ও বাণিজ্যের চর্চ্চা অধিক হয়—শেষে বিজ্ঞানের উন্নতিও হইতে পারে। যে দেশের অবস্থানবিশেষ বশতঃ সেখানকার লোকের পার্শ্ববর্ত্তী জাতির সহিত সর্ব্বদা সংঘর্ষণ সম্ভব, সেখানে রাজনৈতিক উন্নতি অধিক হয়। কেবল যে দেশের প্রকৃতি মানুষের অনুকূল, যেখানে প্রকৃতি জননীর ন্যায় আপনি সকলের অভাব সহজে মোচন করিয়া দিতে ব্যস্ত—যেখানে কঠোর জীবন-সংগ্রাম নাই, নিজের নিতান্ত অভাব মোচন করিবার জন্য সারা জীবন ব্যস্ত থাকিতে হয় না—সেই দেশই ধর্ম্ম ও তত্ত্ববিদ্যা আলোচনার অনুকূল। সেই দেশেই সমাজ উল্লিখিত কয়টী স্তর অতিক্রম করিয়া শীঘ্র উন্নতির শেষ স্তরে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই স্তরে আসিলে তবে সমাজ স্থায়ী হয়, সমাজের আর উন্নতি হয় না; কেন না, ইহাই উন্নতির চরম সীমা। এস্থলে এ তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ভারতের বিশেষতঃ সিন্ধুনদের নিকটবর্ত্তী প্রদেশের অবস্থান ও প্রকৃতি আর্য্যসমাজের উন্নতির বিশেষ সহায় ছিল। ভারতের ন্যায় পৃথিবীর আর কোন দেশেই প্রকৃতি, মানুষের উন্নতির পক্ষে এরূপ অনুকূল নহে। এই জন্য ভারতবাসী আর্য্যগণ সকল জাতি অপেক্ষা সর্ব্বাগ্রে উন্নতির চরম সীমায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারাই সেই অন্য সকল জাতির পূর্ব্বে দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। টায়র, ব্যাবিলন, সিডন্, মিসর প্রভৃতি কোন দেশে কোন জাতি এত দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

অতএব এই সকল যুক্তি হইতে আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি যে, ভারতেই সর্ব্ব প্রথম দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। শুধু যে ভারতেই সর্ব্বপ্রথম দর্শন শাস্ত্র চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা নহে; ভারতবর্ষ হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই দর্শন শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল। দর্শন শাস্ত্ররূপ মহাবৃক্ষের মূল ও স্কন্ধ এই ভারতবর্ষে, আর ইহার শাখা প্রশাখা অন্য সকল দেশে ব্যাপৃত হইয়াছে। আমরা এই কথা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

ভারতের পরেই মিসর (Egypt) দেশ উন্নত হইয়াছিল। তাহারও প্রকৃতি উন্নতির পক্ষে অনেকটা অনুকূল ছিল। ইহা ব্যতীত ভারতের সহিত মিসর দেশের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও ছিল। তথাপি মিসর দেশে যে পূর্ব্বে দর্শন চর্চ্চার সময় হইয়াছিল, ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ভারতের সহিত সম্পর্ক জন্য হউক অথবা জাতীয় উন্নতি শক্তির ক্রম বিকাশ নিয়মেই হউক, পূর্ব্বে মিসরে ধর্ম্ম চর্চ্চার অনেক উন্নতি হইয়াছিল। মিসরবাসীদের ধর্ম্মের সহিত আমাদের ধর্ম্মের অনেক সাদৃশ্য ছিল। মিসরীদের পুরোহিতগণ ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব (গুপ্ত বিদ্যা) জানিতেন। এই মিসরবাসীদের নিকটই বোধ হয় ইহুদীগণ তাঁহাদের ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মিসরীগণ জন্মান্তর বিশ্বাস করিত। তাহাদের মধ্যে একেশ্বরবাদও প্রচলিত ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু মিসরীগণ প্রকৃত দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করে নাই। তবে দুই চারিটী দর্শন তত্ত্ব ভারত হইতে গ্রহণ করিয়াছিল। উক্ত জন্মান্তরবাদ তাহার দৃষ্টান্ত। প্রাচীন চীন, পারস্য, ব্যাবিলন, সিডিয়া, ক্যাল্ডিয়া প্রভৃতি দেশ সম্বন্ধেও

কতক পরিমাণে এইরূপ কথা বলা যাইতে পারে।

তাঁহারা সকলেই স্বীকার করেন যে, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ ব্যতীত যদি অন্য কোন দেশে দর্শনের প্রকৃত চর্চ্চা হইয়া থাকে,তবে সে গ্রীস বা উনানিদেশে। অধিকাংশ দর্শন তত্ত্বই উনানি পণ্ডিতগণ আলোচনা করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিত মাত্রেই উনানী দেশকেই দর্শনশাস্ত্রের প্রথম উৎপত্তি স্থান বলিয়া স্বীকার করেন। উনানি দেশ হইতেই ইউরোপে অন্য সকল দেশে দর্শন শাস্ত্রের প্রচার হইয়াছিল। এই উনানী দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল, তাহা আমাদের প্রথম দেখিতে হইবে।

সার উইলিয়ম জোন্সের পূর্ব্বে অন্য কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত ভারতীয় দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা করেন নাই। এদেশের শাস্ত্রের কথা তাঁহারই নিকট ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রথম জানিতে পারেন, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার পূর্ব্বে দুই চারি জন জর্ম্মান বা ফরাসী পণ্ডিত যদিও সংস্কৃত সাহিত্য বা শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ইউরোপে এ দেশীয় শাস্ত্র প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেন নাই। এই সার উইলিয়ম জোন্স বলিয়াছেন,—

যে ছয় প্রকার দর্শনিক মত (আর্য্য) দর্শন শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে,(প্রাচীন উনানিদেশের) ষ্টোয়া ও লাইসিয়মের সকল প্রাচীন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতই তাহার অন্তর্গত। আর বেদান্ত শাস্ত্র ও তন্মতপোষক অন্যান্য সুন্দর গ্রন্থ পাঠ করিলে এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইতে হয় যে, ভারতীয় ঋষিগণের সহিত এক উৎস (উপনিষদ) হইতেই পিথাগোরস বা প্লেটো তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন।' (৫)

পণ্ডিতবর সপেনহরও বলিয়াছেন যে, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি তত্ত্ব প্লেটো ও পিথাগোরাস ভারতবর্ষ বা মিসর দেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। (৬) ঐতিহাসিক পণ্ডিত হেরোদোতাস্ ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ইহা ব্যতীত ভারতীয় ন্যায় দর্শন হইতে যে উনানি পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ আরিষ্টটেল তাঁহার ন্যায়শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, (৭) তাহা সার উইলিয়ম জোন্স প্রমাণ

(৫) "The six philosophical schools whose principles are explained in the Dursana Sastras, comprise all the metaphysics of the old academy, the Stoa and the Lyceum, nor is it impossible to read the Vedanta or the many fine compositions in illustration of it, without believing that Pythagoras and Plato derived the i sublime theories from the same fountain with the sages of India."

(Works of Sir W Jones vol. I. p 28

সার উইলিয়ম জোন্স অন্য একস্থলে বলিয়াছেন,—

"The fundamental tenet of the Vedantic school consisted......in contending that it (matter) has no essence independent of mental perception that existence and perceptiblity are convertible terms, that external appearances and sensations are illusory and would vanish into nothing if the divine energy which alone sustains them were suspended but for a moment,—an opinion which Epicharmus and Plato seem to have adopted and which has been maintained in the present century with great elegance, but with little public applause."

Work of Sir W. Jones vol I. p. 155-166.

(৬) "Therefore Pythagoras and Plato have seized with admiratioon the *ne plus ultra* of the mythical reprsentation (transmigration of soul), received it from India or Egypt honored it made use of it and we know not how far believed it."

Schopenheaur's World as Will and Idea, vol I. p. 46.

(৭) কূটবুদ্ধি আরিষ্টটেল, লোকে পাছে এইরূপ সন্দেহ করে, এই জন্য "ঠাকুর ঘরে কে? না,

করিয়াছেন। তিনি বলেন, আরিষ্টটেলের ভাগিনেয় ক্লিস্থেনিস্ এদেশ হইতে ন্যায় দর্শন সংগ্রহ করিয়া আরিষ্টটেলকে পাঠাইয়া দেন। তাহা হইতেই আরিষ্টটেল তাঁহার প্রসিদ্ধ ন্যায় দর্শন সংগ্রহ করেন। (৮)

প্রসিদ্ধ স্কচ্ দার্শনিক ডুগাল্ড্ ষ্টুয়ার্ট ঐ কথা বলিয়া তাহার পোষক প্রমাণ স্বরূপ বলেন, যে আরিষ্টটেলের 'ন্যায়' গ্রন্থ পড়িলেই বুঝা যায় যে, ইহা কোন প্রাচীনতর ন্যায় শাস্ত্র হইতে সংগ্রহীত হইয়াছে।(৯)

(Weber) ওয়েবার সাহেব বলিয়াছেন, ষড়দর্শন মধ্যে ন্যায়দর্শন সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক সেই ন্যায় বা আন্বিক্ষিকী দর্শন বুদ্ধদেব শিক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা ললিত বিস্তার হইতে পাওয়া যায়। সুতরাং ন্যায় দর্শন আরিষ্টটেলের সংগ্রহ করা অসম্ভব নহে।

এইরূপ অধিকাংশ নিরপেক্ষ দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মতে উনানী দার্শনিক পণ্ডিতগণ প্রায়ই তাঁহাদের মূল মত সকল ভারতবর্ষ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগতআছেন যে,অতি প্রাচীন কাল হইতেই বাণিজ্য সম্বন্ধে ভারতের সহিত মিসর, সিডন,টায়র, প্রাচীন রোম প্রভৃতির ঘনিষ্ঠতা ছিল। কতকাল পূর্ব্ব হইতে এই সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল,তাহা বলা যায় না। তবে আলেকজাণ্ডারের সময় হইতে গ্রীক্ ও ভারতবাসীগণের সম্বন্ধ যে ক্রমে ঘনিষ্টতর হইয়া আসিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। (খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ অব্দ) আলেকজাণ্ডারের সিন্ধুদেশ আক্রমণের কিছুদিন পরে, গ্রীক্ বীর সিলুকাস্ চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে বারবার পরাজিত হইয়া, চন্দ্রগুপ্তের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া খৃীঃ পূঃ(৩১২ অব্দ) সন্ধি স্থাপন করেন। মিগাস্থেনিস্ এই চন্দ্রগুপ্তের সভায় বরাবর থাকিতেন। পরে অশোকের সহিত গ্রীকদিকের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য নানা দেশে যে সকল ভিক্ষু প্রচারক পাঠান, তাঁহাদের মধ্যে দুইজন গ্রীকের নাম পাওয়া যায়। তখন ভারতের বৌদ্ধ প্রচারক এসিয়া মাইনরেও ধর্ম্ম প্রচার জন্য গিয়াছিল। 'মিলিন্দা-প্রমাণ' নামে যে বৌদ্ধ গ্রন্থ আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে ভারতের নিকট গ্রীকগণ অনেক উপদেশ লই য়াছিলেন। এই গ্রন্থে মিলিন্দা ও বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা আছে, তাহা হইতেই এরূপ বুঝা যায়। আলেকজাণ্ডারের সহিত হিন্দু

আমি ত কলা খাই নাই'—এই ন্যায় অবলম্বন করিয়া তাঁহার ন্যায়গ্রন্থের উপসংহারে বলিয়াছেন,—"আমার এ গ্রন্থ মৌলিক, কাহারও অনুকরণে লিখিত নহে।' এই কথাটা বড় সন্দেহজনক। তাঁহার কথা এই,—

"We have had no works of predecessors to assist us in this attempt to construct a science of reasoning our own labors have done it all. * * * You will show.....some gratitude for the discoveries it contains."

(Qouted by G. H. Lewis in his Biographical History of Philosophy p. 247).

(৮) সার উইলিয়ম জোন্সের কথা এই,—

"Kallisthenes found a complete system of Logic among the Indians, and sent it to his uncle Aristotle Asiatic Researches Vol. IV, p. 163).

(৯) "On the other hand it must be acknowledged that this part of Aristotle's works contains some intrinsic evidence of aid borrowed from a more ancient School. Besides that imposing appearance which it exhibits of systematical completeness in its innumerable details; and which we can scarcely suppose that it could have received from the original inventor of the art, there is a want of harmony or unity in some of its fundamental principles, which seem to betray a combination of different and discordant theories."

(Stewart's Philosophy of the Human Mind p. 564).

দণ্ডীর কথোপকথনের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন।

ভারতবাসী হিন্দুগণ অবশ্য গ্রীস্‌দেশে যাইতেন না। কিন্তু গ্রীকগণ ভারতে তখন প্রায়ই আসিতেন। তাহারা কোন সময়ে ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপনও করিয়াছিলেন। দুই জাতির মধ্যে এইরূপ সংস্রব জন্য আমরা দেখিতে পাই যে,গ্রীকদিগের নিকট, ভারতবাসীগণ শিল্প ও স্থপতি বিদ্যা কতক লইয়াছিলেন। গ্রীকদিগের জ্যোতিষ হইতে অনেক নূতন মতও আর্য্য পণ্ডিতগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই সময় বা তাহার পূর্ব্বে গ্রীক বা যবনগণ হিন্দুর নিকট যে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন,তাহা বলিতে পারা যায়।

গ্রীকদিগের দর্শন শাস্ত্র অধিক পুরাতন নহে। থেল্‌স গ্রীসদেশের সর্ব্বপ্রথম দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি খ্রীঃ পূঃ ৬৪০ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিথাগোরাস্‌ প্রায় ইঁহার সমসাময়িক। তিনি খ্রীঃ পূঃ ৫৮২অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সক্রেটিস্‌,প্লেটো, আরিস্‌টটেল প্রভৃতি গ্রীসের প্রধান দার্শনিক পণ্ডিতগণ খ্রীঃ পূর্ব্ব চারি শত বৎসর অগ্রে জীবিত ছিলেন। সুতরাং বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরে গ্রীসদেশে দর্শন শাস্ত্র চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বুদ্ধের জন্মের বহু পূর্ব্বে ভারতে সকল প্রকার দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সুতরাং গ্রীক বা যবন দর্শনশাস্ত্র আমাদের দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক আধুনিক,তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, গ্রীস দেশের প্রথম কালের দার্শনিক পিথাগোরাস্‌ই অনেক ভারতীয় মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে তিনি সেই সকল মত একেবারে ভারত হইতে পাইয়াছিলেন, কি মিসর হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন,তাহা ঠিক বলা যায় না। (১০) ঐ সময়ে মিসর দেশে বিদ্যা চর্চ্চার বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। তাহার কিছু দিন পরে আলেকজাণ্ডার মিসর জয় করিয়া আলেকজাণ্ড্রিয়া নগর স্থাপন করেন, ও সেখানে তাঁহার গুরু আরিষ্টটেল ও সেনাধ্যক্ষ টলেমি সোটার খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দে এক পুস্তকাগার স্থাপন করেন। সেই পুস্তাকাগারে দেশ বিদেশ হইতে লক্ষাধিক গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে অনেক দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ছিল, সন্দেহ নাই। সুতরাং ঐ সময়ে যে ভারতীয় দর্শনাদি গ্রন্থ সমুদায় সে স্থানে নীত হইয়াছিল এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে উহার আলোচনা করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অতএব খ্রীঃ পূঃ ৩০০ বৎসরের পর হইতে, ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের জুনানীদেশে ও আলেকজাণ্ড্রিয়ায় রীতিমত চর্চ্চা ছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রীস দেশে যখন খ্রীঃ পূঃ ৬০০ বৎসর হইতে দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চা আরম্ভ হয়, তখন গ্রীসদেশের সহিত ভারতের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কতকগুলি বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা তাহা স্থির করিতে পারি। আমাদের

(১০) এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত নানারূপ যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন যে, এই গ্রীক্‌ দার্শনিক পিথাগোরাস গৌতম বুদ্ধেরই নামান্তর মাত্র। গ্রীসে পিথাগোরাস বলিয়া কেহ ছিল না। বুদ্ধদেবের মতই পিথাগোরাসের নামে সেখানে প্রচলিত ছিল। এই পিথাগোরাস স্বয়ং বুদ্ধ বা তাঁহার কোন কৃতী ভিক্ষু প্রচারকই হউন, বৌদ্ধ দার্শনিক মতের সহিত যে তাঁহার মতের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। (Weber's History of Philosophy'র ২৫ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।)

দেবদেবী কল্পনার সহিত গ্রীকদের দেবদেবী কল্পনার অনেক সাদৃশ্য আছে। দেবদেবী সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যানের সহিত গ্রীকদের দেবদেবীর উপাখ্যানের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। আমাদের দেশের লৌকিক ধর্ম্মের সহিত দার্শনিক তত্ত্বের যে পার্থক্য আছে, গ্রীক্ দেশেও সেইরূপ পার্থক্য আছে। আমাদের দেশের চলিত সংস্কৃত উপাখ্যানের সহিত গ্রীক্‌দিগের উপাখ্যানের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। (১১) একটী আর একটীর অনুকরণ না হইলে এরূপ হয় না। তাহার পর আমাদের দর্শন শাস্ত্রের সহিত গ্রীক্‌দিগের দর্শন শাস্ত্রের সাদৃশ্য অত্যন্ত অধিক। পীথাগোরাসের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীক দার্শনিক দিগের বায়ু, অগ্নি বা জল ভূত হইতে জগৎ-সৃষ্টিবাদ, পীথাগোরাসের জন্মান্তরবাদ, ইলিয়াটিক্ প্রভৃতি গ্রীক্ দার্শনিকদিগের অদ্বৈতবাদ, ডিমক্রিটস্ প্রভৃতি দার্শনিকগণের পরমাণুবাদ, সফিষ্টদের গৃহীত বিভিন্ন বৌদ্ধবাদ, আরিষ্টটেলের ন্যায়মত, প্লেটোর জন্মান্তর, নাম, রূপ, ও সারূপ্য মুক্তিমত, আরিষ্টিপাসের চার্ব্বাক মত, ষ্টোইক্‌দিগের পরিণামবাদ,—ইহাদের সহিত আমাদের দর্শনের বিভিন্ন মত ও বাদের এত সৌসাদৃশ্য আছে যে, একটী অপরটীর অনুকরণ বা সম্প্রসারণ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। (১২)

তাহার পর আর এক কথা বিবেচনা করিতে হইবে। দুই কি উর্দ্ধসংখ্যা আড়াই শত বৎসর মধ্যেই, গ্রীসের ন্যায় ক্ষুদ্র একটী জনপদে এই সকল দর্শনের এতদূর চর্চ্চা ও উন্নতি হইয়াছিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে অন্য জাতির সহিত সংস্রব ব্যতীত স্বাভাবিক জাতীয় পরিণতির নিয়মানুসারে এরূপ চর্চ্চা ও উন্নতি সম্ভব নহে। আজি পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কোন দেশে কোন সময়ে দর্শনশাস্ত্রের এরূপ স্বতঃ উন্নতি হয় নাই। ভারতে এই দর্শনশাস্ত্রের পূর্ণ বিকাশ হইতে কত সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। অন্ততঃ বেদান্তের সময় হইতে বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব কাল পর্য্যন্ত (অর্থাৎ দুই সহস্র বৎসর) যে অতীত হইয়াছিল, তাহা বলা যাইতে পারে। তাহার পর আমাদের দেশে দর্শনের যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল, গ্রীসে সেরূপ হয় নাই। আর আমাদের দর্শনশাস্ত্র স্থাপনের জন্য বেদ উপনিষদ রূপ যে অতি প্রাচীন মহাভিত্তি ছিল, গ্রীকদিগের সেরূপ কোন ভিত্তি ছিল না। ধর্ম্মের পূর্ণস্ফূর্ত্তি না হইলে দর্শনশাস্ত্র আলোচনার সময় আসে না। গ্রীস দেশে দর্শনশাস্ত্র আলোচনার পূর্ব্বে ধর্ম্মের সেরূপ বিকাশ হয় নাই। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে, সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন, যে আমাদের দর্শনশাস্ত্র অব-

(১১) এ সম্বন্ধে পণ্ডিত মোক্ষমূলর সম্প্রতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল,—

"We seem perfectly within our right, when we look upon the numerous coincidences between the fables of Æsopus, and the fables occuring in Sanskrit and and Pali literature as proving the fact that there was a real literary exchange between India, Persia, Asia-minor and Greece beginning with the sixth century B. C."

(Max Muller on Coincidences—Fortnightly Review, July, 1896).

(১২) বিলাতী পণ্ডিত ড্রাপার কৃত History of Conflict between Religion and Science পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

"Here it was truly said the genius of the East met the genius of the West" (p. 19).. ...Aristolleian philosophy was the intellectual corner-stone on which the museum (Library) rested (p. 22) .....The museum was...the birthplace of modern Science (p. 33).

লম্বন করিয়াই গ্রীক্ দর্শন শাস্ত্রের বিকাশ হইয়াছিল। (১৩)

এ সম্বন্ধে এক আপত্তি এই হইতে পারে যে, যদি ইহাই সত্য হয়, তবে কোন গ্রীক্ দার্শনিক গ্রন্থে বা অন্য কোন গ্রীক পণ্ডিতদের গ্রন্থে একথার উল্লেখ নাই কেন? কোন গ্রীক্ পণ্ডিত এদেশের দর্শন শাস্ত্রের উল্লেখ করেন নাই কেন? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, কোন পণ্ডিতই প্রায় স্বীকার করেন না, তিনি কোথা হইতে তাঁহার নিজ মত সংগ্রহ করিয়াছেন। এই যে সম্প্রতি জর্ম্মানিতে হিন্দু দর্শন শাস্ত্র আলোচনা হইতেছে, এই যে আধুনিক জর্ম্মান দার্শনিক পণ্ডিতগণ আমাদের দর্শন শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া নূতন মত উদ্ভাবন করিতেছেন বলিয়া ইউরোপে এত খ্যাতি লাভ করিতেছেন—সপেনহরের ন্যায় বা পল ডুসেনের ন্যায় দুই একজন উদার স্বভাব পণ্ডিত ব্যতীত কয়জন তাহা স্বীকার করিয়াছেন। (১৪)

আমাদের দর্শন শাস্ত্র অবলম্বনে গ্রীক্ দর্শন শাস্ত্র সৃষ্টি হইয়াছিল, এই কথা এত করিয়া বুঝিতে হইতেছে, তাহার কারণ এই যে, বিলাতী পণ্ডিতগণ একথা স্বীকার করিতে বড় প্রস্তুত নহেন—যেন তাহাতে ইহাদের সম্ভ্রমের লাঘব হয়। পণ্ডিত মোক্ষমূলার বলিয়াছেন, মানবজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া যখন দেখা যায় যে, এক জাতির পক্ষে যাহা সাধ্য হইয়াছিল, তাহা অন্য জাতির পক্ষেও সাধ্য, তখন কেন একথা স্বীকার করিবেন যে, ভারত হইতেই গ্রীক পণ্ডিতগণ দর্শনশাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। (১৫) পণ্ডিত ইউবারউইগও তাঁহার কৃত দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে এইরূপ সন্দেহ করিয়াছেন। (১৬) পণ্ডিত ওয়েবারও

(১৩) এ সম্বন্ধে ফরাসি দার্শনিক পণ্ডিত কুঁজের কথা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছেন,—

"These four systems (of philosophy viz Sensationalism, Idealism, Scepticism and Mysticism), born in the old East, after having shone themselves with splendour on the brilliant scenes of the Greek philosophy, and having traduced, observed but not extinguished in the long night of the middle ages, reappeared in the 16th and 17th centuries in modern philosophy, and present in the 18th century is their fertile the grandest and most instructive spectacle which has ever been offered by the annals of history."

(Cousin's History of philosophy vol, I. p. 311).

(১৪) পণ্ডিতবর সপেনহর তাঁহার সর্ব্বপ্রধান পুস্তকে ("World as Will and Idea") মুখবন্ধে বলিয়াছেন,—

"If the reader has also received and assimilated the sacred primitive Indian wisdom, then he is best of all prepared to what I have to say to him......each one of the individual and disconnected aphorisms, which make up the Upanishads may be deduced as a consequence from the thought I am going to impart."

পলডুসেন তাঁহার Element of Metaphysics নামক পুস্তকে বলিয়াছেন,—

"The celebrated "*Tattwamasi*—a sentence which expresses in three words at once the deepest mystery of metaphysics, and the highest aim of morality. An interpretation of this great truth we may consider, as in a wider sense, our whole work...(p. 134).

(১৫) পণ্ডিত মোক্ষমূলর বলিয়াছেন,—

"...A wider study of mankind has taught us that what was possible in one country was possible in another also. But the fact remains nevertheless that the similarities between these two streams of philosophical thought in India and in Greece are very startling, nay sometimes most perplexing."

(Vedant Philosophy p. 9).

(১৬) পণ্ডিত ইউবার উইগ বলিয়াছেন,—

"To what extent the philosophy of the period, (and hence the Genesis of the Greek philosophy in general) was affected by Oriental influences, is a problem whose definte solution can only be anticipated ....Critics have manifested an in-

ঐরূপ কথা বলিয়াছেন (১৭) কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারতে যেরূপ পূর্ণরূপে দর্শনের সর্ব্বাঙ্গীন চর্চ্চা হইয়াছিল, এবং তৎপরে যুনানী বা গ্রীসদেশে দর্শনের যেরূপ চর্চ্চা হইয়াছিল, আজি পর্য্যন্ত কোন কালে কোন দেশে দর্শনশাস্ত্রের সেরূপ চর্চ্চা হয় নাই। আজকাল ইউরোপে দর্শনশাস্ত্র চর্চ্চা যথেষ্ট হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এখনও তাহা বাহ্যিক, অপূর্ণ ও একদেশী। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এখনও অধিকাংশ দার্শনিকগণ দর্শনশাস্ত্রের প্রথম স্তর —চার্ব্বাকমত বা প্রত্যক্ষ অর্থাৎ জড়বাদ অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারেন নাই। (১৮) সুতরাং মানবজাতির ক্রমোন্নতির ইতিহাস আলোচনা করিলে মোক্ষমুলর প্রভৃতি পণ্ডিতদের উক্ত মত সমর্থিত হয় না। (১৯)

যাহা হউক, আমরা আরও স্পষ্ট করিয়া গ্রীক দেশের দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি যে, বেদান্তদর্শন অবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের দর্শন-চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, গ্রীসদেশে থেলস্ হইতে দর্শনশাস্ত্র চর্চ্চা আরম্ভ হয়। যুনানী প্রথম দার্শনিকদিগের নাম থেলস্, আনাক্সিমন্দার, আনক্সিমিনিস, হিরাক্লিতাস্ ও পিথাগোরাস্। ইহারা প্রায় সকলে সমসাময়িক। খ্রীঃ পূঃ ৬০০ হইতে ৫৫০ অব্দ ইহাদের প্রাদুর্ভাব কাল। ইঁহারা প্রথম জগৎ সৃষ্টি তত্ত্ব আলোচনা করেন। ইহার মধ্যে কেহ বেদান্তের (ঋগেদ ও ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদ উল্লিখিত) তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন, জল হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে (আপঃ—বেদান্তদর্শন ২।৩।১১)। কেহ বলিয়াছেন, তেজ হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে ("তেজোঽতস্তথাহ্যাহ—বেদান্তদর্শন, ২।৩।১০)। কেহ বলিয়াছেন, আকাশ হইতে জগৎ সৃষ্ট ("ন বিয়দ শ্রুতেঃ—বেদান্তদর্শন ২।৩।১)। কেহ বা বেদান্তের জন্মান্তরতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

তাহার পর এই সকল দার্শনিক পণ্ডিতদিগের সমকালবর্ত্তী ইলিয়েটিক পণ্ডিতগণ

---

creasing tendency to search for the explanation of the various philosophers of the Greeks in the progressive, inner development of the Greek mind: but they have verged perhaps too near to the opposite extreme. The labors of both Gladisch make a reaction against this extreme, both of them laying stress in the influence of the orient. Gladesch...... maintains that this (oriental) element entered into Greek philosophy through the medium of Greek religion.........that therefore the later philosophers......were indirectly (Plato also directly) affected in the shaping of their doctrine by oriental influence is quite conceivable, and some of these hypotheses have no slight degree of probability."

(History of Philosophy vol I, p. 31-32).

(১৭) "It is not yet possible to decide whether in the beginning of Greek philosophy any connection with Hindu speciation can be established."

(Weber's History of Sanskrit Literature. p. 233).

(১৮) এই দর্শন শাস্ত্রের স্তর বা ক্রম বিকাশের কথা এস্থলে আলোচ্য নহে।

(১৯) মোক্ষমুলর-প্রমুখ পণ্ডিতগণ যে বলিয়াছেন, যাহা এক দেশে সম্ভব হইয়াছিল, তাহা অন্যদেশেও সম্ভব হইতে পারে, তাহা সকল সময়ে সত্য নহে। যদি তাহা হইত, তবে পুরাকালে ভারত ও গ্রীস ব্যতীত অন্য দেশেও স্বাধীন ভাবে দর্শনের চর্চ্চা হইত। যেমন ব্যাস, বাল্মিকী, কালিদাস, সেক্ষপীয়রের ন্যায় কবি, কপিলের ন্যায় জ্ঞানী, শঙ্কর প্লেটো বা ক্যান্টের ন্যায় দার্শনিক, নিউটনের ন্যায় বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি জগতে একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করেন,—যেমন শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ, খ্রীষ্ট বা চৈতন্যদেব একবার মাত্র অবতীর্ণ হন, তেমনই এই ব্যক্তিগত নিয়মানুযায়ী কোন বিশেষ জাতি মধ্যেই দর্শনের প্রথম চর্চ্চা হইয়াছিল এবং অন্য দেশের দর্শন চর্চ্চা বিস্তার তাহা হইতেই হইয়াছিল, এই মত অযৌক্তিক নহে।

বেদান্তের এইরূপ আংশিক মত গ্রহণ না করিয়া একেবারে অদ্বৈত তত্ত্ব গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। খ্রীঃ পূ ৫৬৯ অব্দে জেনোকেনিস এই পণ্ডিত দিগের মধ্যে প্রথম জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং ইনি প্রায় উক্ত থেল্‌সের সমকালবর্ত্তী। অর্থাৎ ইনি এক জন প্রথম গ্রীক্ দার্শনিক। তাঁহার লিখিত কোন পুস্তকের এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, "(এই জগতের ধারণা আর (এক) ঈশ্বরের ধারণা ইহাই দর্শনের দুই চরমসীমা। এ উভয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় প্রয়োজন হয়। কেহ জগৎ ও ঈশ্বর এক মনে করেন; কেহ বা এই জগতের বহুত্ব ঈশ্বরের একত্বে ডুবাইয়া দেন; কিম্বা এই বহুত্ব অস্বীকার করেন, এই জগতকে সেই একের মায়াময় ছায়া বলিয়া মনে করেন।" (২০) তিনি যে সকল দার্শনিক মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বের গ্রীক দর্শন মধ্যে তাহা পাওয়া যায় না। কোন দেশে, কোন কালে কোন দার্শনিক নিজ প্রতিভা বলে অন্য কোন দেশের দর্শন আলোচনা না করিয়া একেবারে দর্শনশাস্ত্রের এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। অন্তত কখন কেহ এ পর্য্যন্ত পারিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য যে, জেনোকেনিস্ প্রমুখ ইলিয়েটিকদিগের দর্শনশাস্ত্র উপনিষদ বা বেদান্তের আভাস অবলম্বনে রচিত। এই ইলিয়েটিক্‌দিগের মধ্যে জেনোকেনিস, পারমেনাইডিস্, জিনো ও মাইনিমাস্—ইঁহারাই প্রধান।

এই ইলিয়েটিকদিগের পরে সক্রেটিস্ শিষ্যগণের মধ্যে আবার বেদান্তসম্মত বাদের প্রচলন হয়। ইহাদের মধ্যে ইউক্লিড্, প্লেটো ও প্লেটোশিষ্য আরিষ্টটেল উল্লেখযোগ্য। প্লেটোর মত অনেকটা রামানুজ কৃত বেদান্ত মতের সমান। আরিষ্টটেল ন্যায়মতের সহিত বেদান্ত মত একত্র করিয়াছিলেন। ন্যায়ের স্রষ্টা ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে সর্ব্বময় একেশ্বরের কতকটা ধারণা করিয়াছিলেন। ষ্টোইক মত প্রবর্ত্তক জিনো, আরিষ্টটেলের পর, বেদান্তের অনেক মত প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গ্রীকদিগের উক্তরূপ দর্শন আলোচনার সময় হইতে আজি পর্য্যন্ত ইউরোপে যত দর্শন শাস্ত্র চর্চ্চা হইতেছে বা যত নূতন মত প্রচারিত হইয়াছে, গ্রীক্ দর্শন শাস্ত্র যে সে সকলেরই মূলভিত্তি, তাহা আধুনিক দর্শন শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত মাত্রেই অবগত আছেন সুতরাং তাহা এস্থলে বিস্তারিত উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তবে বেদান্ত শাস্ত্র কিরূপে ভারতে উৎপত্তি হইয়া, ক্রমে কালবশে জগতের উন্নত জাতি মধ্যে সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে দেখান আবশ্যক।

ভারত হইতে গ্রীসদেশে এই দর্শন শাস্ত্রের যেরূপ প্রচার হয়, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রীসদেশে হইতে মিসর দেশে উহা নীত হয়। যে সময় মিসর দেশ গ্রীসদেশের অধীন ছিল। টলেমি সোটর

(২০) "The idea of the world and that of God are the two extremes of all speculation. It remains to find their relation. Some (theists) identity the world with God or God with the world. Pantheism is the conception of the whole world with God alone to merge plurality with unity. The plurality denied, and the world (plurality) is regarded as a deceitful shadow of the absolute unity."

(Quoted from Tenophanesis'philosophical Fragments by Cousin in his History of Philosophy, vol I).

আরিষ্টটেলের সাহায্যে সে দেশে যে অদ্ভুত বিদ্যামন্দির ও পাঠাগার সৃষ্টি করেন। গ্রীসের অধঃপতনের পরে সেই মিসরদেশে উক্ত বিদ্যামন্দিরের প্রভাবে দর্শন শাস্ত্র আলোচনা হইতে থাকে। এই স্থানে দর্শন শাস্ত্র আলোচনাকারী ছাত্রগণ প্রধানতঃ আরিষ্টটেলের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং ইঁহারা কতকটা বেদান্তবাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন। (২১) ইহাদের ইহুদী আলেক্জন্দ্রিয়া সম্প্রদায় বলা হইত। প্রায় সকল জর্ম্মান দর্শনেতিহাস লেখকগণ স্বীকার করেন যে, এই সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ প্রাচ্য দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। (২২) সুতরাং কেবল যে আরিষ্টটেল শিষ্য বলিয়া ইহারা কতকপরিমাণে বেদান্তবাদী হইয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। বিশেষতঃ প্লেটোর দার্শনিক মতের সহিত প্রাচ্য দার্শনিক মত মিশ্রিত করিয়া, ইহাদের মধ্যে নব প্লেটো সম্প্রদায় নামে আর এক শ্রেণীর দার্শনিক দলের এই সময় প্রাদুর্ভাব হয়। ইহাদের দার্শনিক মতের সহিত বেদান্ত মতের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। ফাইলো উক্ত ইহুদী আলেক্জন্দ্রিয়া সম্প্রদায়ের অগ্রণী। আমোনিয়োস্, প্লোটিনাস্, অরেনিয়াস্, ফরফেরি—ইহারা নব প্লেটো সম্প্রদায়ভুক্ত। জামব্লিকাস, প্রোক্লাস প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইহারা সকলেই কতকটা বেদান্তবাদী ছিলেন (২৩)। ইহারা সমাধি তত্ত্ব জ্ঞাত ছিলেন।

---

(২১) এ সম্বন্ধে পণ্ডিত ড্রাপার যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,—

প্রাচীন গ্রীক ও রোমানগণ বিশ্বাস করিতেন যে, আত্মা দেহের ন্যায় আকৃতি সম্পন্ন (জেন মত)। খ্রীষ্টানেরা প্রথমে এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রূপ মত ইউরোপে প্রচলিত ছিল। কিন্তু পূর্ব্ব আসিয়ায় (ভারত) সম্পূর্ণ ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল। এই দেশে ব্রহ্মের (impersonal God) ধারণা বা কল্পনা হইয়াছিল, জীবাত্মা এই ব্রহ্মের স্বরূপ ও (স্ফুলিঙ্গ মত) তাঁহা হইতে সৃষ্ট ও লয় কালে তাঁহাতেই একীভূত হয়, সে দেশের পণ্ডিতগণ ইহা বিশ্বাস করিতেন এবং সকল জগৎ পদার্থই ব্রহ্মকারণ হইতে অভিব্যক্ত, ইহা বুঝিয়াছিলেন। সমস্ত বৈদিক ধর্ম্ম এই বিশ্বাসের উপর স্থাপিত ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম এই বৈদিক ধর্ম্ম ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আরিষ্টটেল হইতে এই মত পূর্ব্ব ইউরোপের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল। তাহার কথাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"Through Aristole these doctrines (of emanation and absorption &c) were introduced into Eastern Europe indeed, eventually......he was regarded as the author of them. They exerted a dominating influence in the later period of the Alexandrian school."

(Draper's conflict between Religion and Science. p 122).

(২২) ইউবারউইগ্ তাঁহার দর্শনেতিহাসে বলিয়াছেন,—

"This state of Greek philosophy could not but induce a greater susceptibility to oriental influences than hitherto existed and such influences did operate......to determine the form and substance of the speculation of this period (vol I, p 222.

পণ্ডিত রিটার তাঁহার দর্শনেতিহাসে বলিয়াছেন,—

"The influence of the orient was an important co-operating factor in determining the character of the philosophy of their period (vol IV p 330.)

জিমার ম্যান বলিয়াছেন,—

"Plato's attempt to translate oriental mysticism into scientific speculation, ends in Neo-Platonism, with a retranslation of thought into Images."

(২৩) এই বেদান্ত বাদ কাহাকে বলা হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহা বুঝিবার জন্য পণ্ডিত ড্রাপারের কথা নিম্নে লিখিত হইল,—

"Philosophy has never proposed but two hypotheses to explain the system of the world :—first a personal God existing apart, and a human soul called into existence or created and thenceforth immortal second an impersonal intelligence, or indeterminate God, and a soul emerg-

এই সকল দার্শনিকগণ খ্রীঃ অঃ প্রথম শতাব্দী হইতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে জীবিত ছিলেন। ইহাদের পরে ইহুদী ও সারাসেন দিগের মধ্যে দর্শন চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। ইহুদীদিগের "কেবালা" মত কতকটা বেদান্তের সৃষ্টিবাদের অনুরূপ। ইহারাও প্লেটো, আরিষ্টটেলের দর্শন শাস্ত্রের উপর ইহাদের নিজ দার্শনিকমতের ভিত্তি সংস্থাপিত করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কেহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহেন। ইহুদীগের অপেক্ষা সারাসেন ও আরবি মুসলমানগণ দর্শন শাস্ত্র চর্চ্চায় অধিক অগ্রসর হইয়াছিল। নব ধর্ম্ম বলে বলীয়ান হইয়া ইহারা অতি অল্পকাল মধ্যেই চারিদিকে নিজরাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের জ্ঞানচর্চ্চাও যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছিল। ইহারা পশ্চিমে ইউরোপের শেষ সীমা স্পেন হইতে পূর্ব্বদিকে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। কথিত আছে, স্পেন দেশেই কালিফদের রাজধানীতে রাজকীয় পুস্তকাগারে ছয় লক্ষের অধিক গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। সেইরূপ ইহাদের রাজত্বে পূর্ব্বসীমা বগদাদেও যথেষ্ট বিদ্যাচর্চ্চা হইত। এই সারাসেনদের মধ্যে সুতরাং এ সময়ে যথেষ্ট দর্শন চর্চ্চা ছিল। এদেশীয় দর্শনশাস্ত্র সকল সে সময় অনুবাদিত হইয়াছিল। সেই জন্য সারাসেন দর্শনশাস্ত্র যতটুকু পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ আমাদের দর্শন শাস্ত্রের অনুরূপ। আসিয়ার সারাসেন দার্শনিক পণ্ডিতদের মধ্যে প্রধান—আলকেন্দি, আল্‌ফারবি, অভিনিয়া, আলগজেলি। ইহাদের মত অনেকটা বেদান্তের অনুরূপ। (২৪) পণ্ডিত ইউবার উইগ বলিয়াছেন, আরিষ্টটেল ও নব প্লেটো সম্প্রদায়ের মতের সমবায়ে এই সকল সারাসেনদের দর্শনশাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

স্পেন দেশের সারাসেন দার্শনিকদিগের মত এইরূপে নব প্লেটো ও আরিষ্টটেলের মতের অনুকরণে সৃজিত হইয়াছিল। এই স্পেনদেশীয় সারাসেন দার্শনিকদিগের মধ্যে আবেরোর নামই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইনি আরিষ্টটেলের অনুবর্ত্তী ছিলেন। অরিষ্টটেলের দর্শন শাস্ত্র ইনি অনুবাদ করিয়াছিলেন ও ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন। ইনি অদ্বৈতবাদ একরূপ মানিতেন, মৃত্যুর পর জীবাত্মা পরমাত্মায় একেবারে লীন হইয়া যায় বা মৃত্যুতে সদ্যমুক্তি হয় ইহা বিশ্বাস করিতেন।

এই আবেরোর নিকট হইতেই ইউরোপে আত্মাসম্বন্ধীয় বেদান্ত মত প্রচারিত

---

ing from and returning to Him. As to the origin of beings there are two opinions: first that they are created from nothing, second that they come by development from preexisting forms. The theory of creation belongs to the first of the above hypothesis, that of evolution to the last."

(Draper's conflict between Religion and Science p. 140).

এই দুই মতের মধ্যে প্রথম মত ইউরোপের। দ্বিতীয় মত ভারতের। এই দ্বিতীয় মতই বেদান্ত মত। বেদান্ত মতে এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। তাঁহা হইতে জীব ও জগৎ অভিব্যক্ত হয়। প্রলয়ে ইহারা তাঁহাতেই লীন হয়। শাস্ত্রে আছে,—

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবোব্রহ্মৈব নাপরঃ॥"

ইহা যথাস্থলে বিবৃত হইবে।

(২৪) পণ্ডিত ড্রাপার বলিয়াছেন,—

"Philosophy among the Arabs thus took the same direction that it had taken in China, in India, and indeed throughout the East. Its whole spirit depended on the admission of the indestructibility of matter and force......and the emanation of the spirit of man from the universal intellect, the divinty, and its final reabsorption."

(Draper's Conflict between Religion and Science, p. 140).

হইয়াছিল। (২৫) গ্রীসরাজ্য ধ্বংসের পর সমস্ত ইউরোপ যে অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত হইয়াছিল, তাহাতে ইউরোপে খ্রীঃ অব্দের প্রথম হইতেই প্রায় জ্ঞান চর্চ্চা একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল। খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ প্রকৃত দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন না। যাঁহারা দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করিতেন, তাঁহারা প্রায়ই খ্রীষ্ট ধর্ম্মানুমোদিত মতের পোষক যুক্তি দেখাইতেন মাত্র। তখন গ্রীকদের দর্শনশাস্ত্র ইউরোপে প্রচলিত ছিল না। কচিৎ কোন খ্রীষ্টান মঙ্ক গোপনে তাহার আলোচনা করিতেন, এই পর্য্যন্ত। খ্রীঃ অব্দ ৮০০ শতাব্দীতে প্রথম ইরিজিনা নামক পণ্ডিত আরিষ্টটেলের দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তৎপ্রতিপাদিত বেদান্ত মত প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তিনি খ্রীষ্টান পাদরিদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন মাত্র।

তাহার পরে খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবেরোর দ্বারাই ইউরোপে উক্ত বেদান্ত মত সর্ব্বত্র প্রচারিত ও গৃহীত হয়। আবেরোর মত স্পেন হইতে দক্ষিণ ফ্রান্স ও তথা হইতে উত্তর ইতালীতে প্রচারিত হইয়াছিল। অন্য দিকে সিসিলি দিয়া দক্ষিণ ইতালিতে উহার প্রচার হইয়াছিল। তাহার পর ইংলণ্ড ও জর্ম্মানিতে ঐ মত প্রচারিত হয়। ফ্রান্সে খ্রীষ্টান্ ফ্রান্সিস্কান্ সম্প্রদায় ঐ মত অবলম্বন করেন। কোন কোন খ্রীষ্টান দার্শনিক পণ্ডিত ঐ মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইউরোপীয় ইহুদি ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে অনেকে ঐ মত অবলম্বন করিলেন। (২৬) তখন খ্রীষ্টান পাদরিদের চক্ষু ফুটিল, তাহারা ঐ মত সমূলে উৎপাটন করিতে বদ্ধপরিকর হইল। মধ্যযুগের কোন কোন খ্রীষ্টান দার্শনিক বিশেষতঃ এল্বার্ট ও টমাস্ একুইনাস্ ঐ মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্পেনে খ্রীষ্টান পাদরিগণ এই মতাবলম্বী লোকদের উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। প্রায় দশ সহস্র লোককে দগ্ধ করিয়া হত্যা করা হইল; লক্ষাধিক লোক নির্ব্বাসিত হইল। স্বয়ং পোপ ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। (২৭) এইরূপে খ্রীঃ অঃ ষোড়শ শতাব্দী মধ্যে ইউরোপে এই মত প্রচার একরূপ বন্ধ হইয়া আসিল। (২৮)

কিন্তু যখন একবার ইউরোপে জ্ঞানের বিকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তখন সে বিকাশ বন্ধ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

(২৫) পণ্ডিত ড্রাপার বলিয়াছেন,—

"In the intellectual history of Arab is, the few and the Saracens are continually seen together......From them conjointly western Europe derived its philosophical ideas which in the course of time culminated in *averroism*."

The doctrine of emanation and absorption was introduced into Europe by the Spanish Arab.

(Drapers conflict between Religion and Science p 119-151.)

(২৬) মোক্ষমূলার কৃত Centenary Translation of Kant's Critique of Reason গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ইউরোপের এই সময়ের দর্শনের সাধারণ অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা এইরূপে বিবৃত হইয়াছে,—

"Mediæval philosophy is the Christian philosophy of pure subjectivism—the doctrines of absolute Intelligence or Mind, not of Ego or the subject......The world was made subjective in God...The doctrine is akin to Platonic Idealism and Pythagorean harmony Everything it held proceeded by emanation from the Eternal one"

'This led to the renunciation of the objective world and to asceticism and mysticism. Enthusiasm, Ecstacy, subjective absorption in the infinite depths became powerful......"

এই সময়ে ইউরোপে গ্রীক্ ও লাটিন ভাষা চর্চা আরম্ভ হইতেছিল। বিদ্যালয়ে এই সকল ভাষা শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইল। তখন ধীরে ধীরে আবার আরিষ্টটেল ও প্লেটোর মত এবং অন্যান্য গ্রীক্ দার্শনিকদিগের মত প্রচার হইতে লাগিল। তখন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্লেটোর মত অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিলেন। আবার ইউরোপে দর্শন শাস্ত্র আলোচনা আরম্ভ হইল। আবার বেদান্ত মত প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল। মিস্টিসিজম্ বা আইডিয়ালিজম্ নামে এই মত প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল। মিস্টিসিজম্ কতকটা বেদান্তমত ও যোগমত সমবায়ে সৃষ্ট; জারসন চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই মত ইউরোপে প্রচার করেন। তাহার পর একার্ট এইরূপ মত অবলম্বন করেন। ব্রনো এইরূপ মত প্রচার করেন—খৃষ্টান পাদরিগণ সেজন্য তাঁহাকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছিল।

আধুনিক অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিকদিগের মধ্যে স্পাইনোজা, মেলব্রাঞ্চ, বার্কলে এইরূপ মত প্রচার করিয়াছেন। অধুনা জর্ম্মানি দেশই এই মতের প্রধান প্রতিষ্ঠা স্থান। ক্যাণ্টের সময় হইতে, এ পর্য্যন্ত জর্ম্মান দেশে যে দর্শনশাস্ত্র আলোচনা ও নূতনরূপ দার্শনিক মত প্রচার জন্য জর্ম্মান পণ্ডিতগণ ইউরোপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, জর্ম্মানিতে সংস্কৃত চর্চাই তাহার কারণ। জর্ম্মান পণ্ডিতগণ আমাদের দার্শনিক মত আপনার করিয়া লইয়া তাহাতে আধুনিক রুচিসঙ্গত আবরণ দিয়া সাধারণে প্রচার করিতেছেন। (২৯) জর্ম্মান দার্শনিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বেদান্ত মত, কেহ সাংখ্য মত প্রচার করিয়াছেন। কেহ কেহ উভয় মত সামঞ্জস্য করিয়া লইয়াছেন। এই সকল পণ্ডিতগণের মধ্যে ক্যাণ্ট, ফিক্টে, সেলিং, সেপেনহর, হেগেল, হার্টমেন—ইঁহাদের নাম উল্লেখযোগ্য। সপেনহর ও তৎপরে তাঁহার মতানুবর্ত্তী পলডুসেন যে উপনিষদ হইতে তাঁহাদের দর্শন মত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, একথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডে ষ্টারলিং, গ্রীন, কেয়ার্ড, ব্রাডলি প্রভৃতি যে মত প্রচার করিতেছেন, তাহা কতক পরিমাণে বেদান্ত মতের অংশ।

আর কেবল দার্শনিকদিগের মধ্যেই যে এইরূপ বেদান্ত মত প্রচারিত আছে, তাহা নহে। অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই এই মতের অনুগামী (৩০) সাহিত্যে, কাব্যে

(২৭) পোপ ঘোষণা করিয়াছিলেন,—

"Let him be Anathema who says that spiritual things are emanations of the divine substance, or that the divine essence by manifestation or development becomes all things."

(২৮) Ecclesiastical authorities succeeded in repressing them (these opinions) in the sixteenth century, but they never altogether disappeared."

(Draper's conflict between Religion and Science p. 121.)

(২৯) ডেভিস্ তাঁহার হিন্দু ফিলসফি নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

"It is interesting and instructive to note how often the human mind moves in a circle. The latest German philosophy, the system of Schopenheaur and Von Hartmann is mainly a reproduction of the philosophic system of Kapil."

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"The oldest and the latest system of philosophy though severed in time by more than two thousand years speak with the same voice."

(৩০) সপেনহর স্বীকার করিয়াছেন,—

এই মত প্রবেশ করিয়াছেন। বিলাতের কারলাইল—আমেরিকায় ইমারসন কতকটা এই মত প্রচারক। ইংলণ্ডে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, সেলি, টেনিসন প্রভৃতি,ও জর্ম্মানিতে প্রসিদ্ধ গেটে প্রভৃতি কবি এইরূপ মত প্রচার করিতেছেন। "জ'নোনি" প্রভৃতি অনেক উপন্যাসে এই মতের অবতারণা হইতেছে। সুতরাং খ্রীষ্টান ইউরোপের অস্থি মজ্জায় এই মত প্রবেশ করিয়াছে। খ্রীষ্টের নিকট ইউরোপ কেবল "ভক্তি" "প্রেম" লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ভারত ও গ্রীসের দর্শন হইতেই ইউরোপ জ্ঞানশিক্ষা করিয়াছে, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা আধুনিক ইউরোপীয় উন্নতির মূলে, যে জ্ঞান চর্চ্চা দেখিতে পাই,সে জ্ঞান ভারত হইতেই ইউরোপে নীত হইয়াছিল। আর শুধু জ্ঞানচর্চ্চা কেন, ইউরোপের ধর্ম্মও আমাদের সনাতন ধর্ম্মের উপর স্থাপিত,বাইবেলের খ্রীষ্ট ধর্ম্মমত সেই জন্য অনেক স্থলে আমাদের ধর্ম্মমতের অনুরূপ। সপেনহরের ন্যায় খ্রীষ্টান নিরপেক্ষ পণ্ডিত সে কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। (৩১) অতএব এক্ষণকার সমগ্র সভ্য জগৎ, ধর্ম্ম ও দর্শনের জন্য একা ভারতের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দুঃখের বিষয়, আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই ঋণ স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। এজন্য তাঁহারা ভারতীয় সমগ্র দর্শন শাস্ত্র নিতান্ত আধুনিক—বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের অনেক পরে রচিত—এমন কি খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীর পরে রচিত—ইহা অসার যুক্তি অথবা অযুক্তি রূপে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই জন্য আমরা এস্থলে এত কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

দলাদলি।

মানুষ বাল্যকাল হইতে অনুকরণপ্রিয়। সে যেমন দেখিবে, যেমন শুনিবে, সর্ব্বদা সেইরূপ করিতে এবং বলিতে চেষ্টা করিবে। এই অনুকরণপ্রিয়তা উন্নতির মূল। মানুষ যে আজ এত উন্নত হইয়াছে, ইহার মূলে এই অনুকরণ প্রিয়তা। অনুকরণপ্রিয়তার মূলে বিস্ময়, বিশ্বাস এবং তন্ময়তা। বালক যাহা দেখে, তাহাতেই বিস্মিত এবং তাহাতেই আস্থাবান। আস্থাবান বলিয়াই সেইরূপ করিতে চায়। বিস্ময় এবং তন্ময়তার মূলে শক্তিবোধ এবং মহত্ত্বস্মরণ। আমি যাহা পারি না, এ ব্যক্তি তাহা পারে; আমাপেক্ষা এ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, এইরূপ বোধ হইলেই অনুকরণে স্পৃহা

"That the inner nature of all things is absolutely the same, this age had already grasped and understood, after the Eleatics, Erigena, Bruno, Spinoza had thoroughly taught, and Schelling had [illegible]ived [illegible]is doctrine."

(৩১) সপেনহর বলিয়াছেন,—

'New Testament Christianity... is Indian in spirit and therefore more than probably also of Indian origin, although only indirectly through Egypt."
(World as Will and Idea vol III. p. 281.)

সপেনহর অন্য একস্থানে বলিয়াছেন,—

"True spirit and kernel of Christianity as also of Brahminisn and Buddhism is the knowledge of the vanity of earthly happiness, the complete contempt for it and the turning away from it to an existence of another, nay an opposite kind."
(World as Will and Idea, vol III. p. 226.)

সম্প্রতি রুষীয় পাদ্রি নটভিস্ তিব্বত হইতে খ্রীষ্টের যে জীবন চরিত আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে পাওয়া যায় যে, খ্রীষ্ট স্বয়ং ভারতে ও তিব্বতে বহুদিন বাস করিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন। তবে মোক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থ জাল বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

জন্মে। এইরূপ মহত্ত্ব স্মরণ হইতেই মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ মহত্ত্বের পূজায় উন্মত্ত। যাহার ভিতরে যে বিশেষত্বময় মহত্ত্ব দেখিবে, ইংলণ্ডের নরনারীর মুখে তাহার প্রশংসা আর ধরিবে না। প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে, দলপতিদিগের (Party leaders) মধ্যে মত-সংঘর্ষণ দেখা গেলেও, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, সর্ব্বদা তাঁহারা পরস্পরের মহত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া থাকেন না; যদি থাকিতেন, তবে ইংলণ্ডের এত উন্নতি হইত না। উচ্চ আদালতে প্রতিভাশালী সমকক্ষ আইন-ব্যবসায়ীদিগের তর্ক বিতর্ক, বাগবিতণ্ডা খুব দেখা যায়, কিন্তু ঘরে তাঁহারা পরস্পর বন্ধু। বিলাতের দলপতিদিগের ঝগড়া বিবাদও সেইরূপ—পার্লিয়ামেন্টের সভায় মনে হয়, তাঁহারা ঘোরতর শত্রু, কিন্তু বাড়ীতে তাঁহারা পরস্পর বন্ধু। বন্ধুত্বের মূলে বিশ্বাস, মহত্ত্ব স্মরণ এবং বিশেষত্ব-বোধ বিদ্যমান। সেখানে প্রতিযোগীতা আছে, কিন্তু আত্মম্ভরিতা বা অহং-সর্ব্বস্ব-ভাব নাই। ভাল বলিয়া না জানিলে কেহ কাহাকে ভালবাসিতে পারে না। পরস্পরের মহত্ত্ব স্মরণ ভিন্ন বন্ধুত্বের উদয় অসম্ভব। আমি তোমাকে যদি ভাল বলিয়া না জানিতাম, তবে তোমাকে কখনও ভালবাসিতে পারিতাম না; ইহার মূলে এইকথা আছে, তোমার ভিতরে আমি এমন কিছু দেখিয়াছি, যাহা অন্যত্র পাই না। সেই জন্যই আমি তোমার জন্য পাগল। তোমাকে দেখিয়া দেখিয়া আমি যাহা পাইয়াছি, অন্যত্র তাহা পাই নাই, তাই আমি তোমার দাস। এইরূপ বিশেষত্বময় মহত্ত্ব বোধ হইতেই প্রেমের উদয়। অনাবিল প্রেমের মূলেই অনুকরণ-স্পৃহা। বিশ্বনিয়ন্তা প্রেমশৃঙ্খলে নরনারীকে বাঁধিয়া পরস্পরের বিশেষত্ব-অনুকরণে মানুষকে উত্তেজিত করিয়াছেন। উন্নতির সোপান—এই অনুকরণ স্পৃহা। পরিদৃশ্যমান জগতের, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত, লক্ষিত এবং অলক্ষিত, সকল শিক্ষার মূল অনুকরণ-স্পৃহা। ইহা না থাকিলে মানুষ, বংশপরম্পরায় এত উন্নতি লাভ করিতে পারিত কি না, সন্দেহ। বাণিজ্য, দেশ বিদেশকে আমাদের সম্মুখে আনয়ন করিয়াছে, অর্থাৎ আপন পরকে, দেশ বিদেশকে এক সূত্রে বাঁধিতেছে—অনুকরণের মহা মেলা খুলিয়া দিতেছে। এই জন্য বাণিজ্যে জগতের এত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। বাণিজ্য, বাহিরের অভাব দূর করিতেছে, অন্তর রাজ্যের অভাবও দূর করিতেছে। মানুষ পরস্পর ভাই ভাই—সব জাতিই আপন, সকলের মধ্যেই বিশেষত্ব আছে, সকলকেই আদর করিতে হইবে, বাণিজ্য জগতে এই মহাশিক্ষা বিস্তার করিতেছে।

আমি বাল্যকালে ভাবিতাম, এ জগতে পর আবার কে, শত্রু আবার কি? যার কাছে যাই, তার নিকটই কিছু পাই;—ছোট বড় ত বুঝি না। বড় এক বিষয়ে বড়, ছোট আর এক বিষয়ে বড়। মহানের ছেলে সকলেই, কোন না কোন বিষয়ে, বা বিভাগে, সকলেই মহান, সকলেই বড়। তুমি বল, ঐ ব্যক্তি তোমার নিন্দা করে, ঐ ব্যক্তি তোমার অনিষ্টের চেষ্টায় ফেরে। করে করুক, তাহাতে কি? নিন্দা করিয়া বা কে কি করিতে পারে, অনিষ্টই বা কে কি করিবে, যদি আমি ভিতরে খাটী থাকি। আমি যখন মন্দ, তখন জগতের সকলকেই

মন্দ দেখি, আর আমি যখন ভাল, তখন সকলকেই ভাল দেখি। আমিত্বের মলিনতানুসারে জগতের বিকৃতি দর্শন। আমি যখন মন্দ, তখন আমাকে মন্দ বলাই ত উচিত। আমা দ্বারা যদি কাহারও কোন উপকার বা সেবাই না হইল, আমাকে বিনাশ করা বা আমার অনিষ্ট করাই ত ভাল। অন্যে নিন্দা করিলে আমার আত্মদৃষ্টি বাড়ে,—অনিষ্ট যে করিতে চায়, প্রকারান্তরে সে-ই ইষ্ট করে। কাছে আসে, কাছে বসে—বসিয়া বসিয়া অনিষ্ট করিয়া যায় যদি একটু, দিয়া যায় অনেক বেশী। আহা, সে যদি স্বার্থচালিত হইয়া আমার মলিন আমিত্বের নিকট না আসিত, আমি কি তাহার অন্তর রাজ্যের মহাধনে ধনী হইতে পারিতাম? সেই জীবন উষায় ভাবিতাম, এজগতে পর কেহ নয়, শত্রু মোটেই নাই। শত্রু কেবল আমার রিপু সকল, যাহারা আমাকে পাপের পথে লইয়া যাইয়া বধ করে। শত্রু কেবল সে, যে আমাকে পশুত্বে নমিত করে?

বাল্যকালের এই কথা, এখন বার্দ্ধক্যের উষায়, নিজের এবং অন্যের চরিত্র দেখিয়া যেন অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। দিন দিন আমরা হইতেছি-কি? মানুষ মানুষকে আপন ভাবিবে, মানুষ মানুষের মহত্ত্ব দেখিবে, দেখিয়া শিখিবে, উন্নত হইবে, এই ত বিধাতার বিধান। এখন দেখি, মানুষ কেবল রক্ত পানে লালায়িত। ভ্রাতৃত্ব সংস্থাপনের জন্য এ জগতে ধর্ম্মের উদয়—এখন দেখি, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ সাধনে সকল ধার্ম্মিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দেখি, মানুষ মানুষকে মারিবার জন্যই দিবারাত্রি ব্যতিব্যস্ত। বুয়র সমর এবং চিন সমর—বাহিরে এবং ঘরে ঘরে। হায়রে হায়, জগতের অবস্থা এবং পরিণাম এতই মলিন!!

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এই বঙ্গপ্রদেশ—অনুন্নত, অশিক্ষিত, নির্ধন, দুর্ব্বল, দরিদ্র, অজ্ঞানতার গাঢ় তিমিরে নিমগ্ন। এই বঙ্গপদেশের শতটী ভাইকেও আমরা আপনার করিয়া লইতে পারিলাম না! ধর্ম্মে দলাদলি, সমাজে দলাদলি, সাহিত্যে দলাদলি, সঙ্গীতে দলাদলি, রাজনীতিতে দলাদলি—পরস্পরের রক্তপানে পরস্পর উন্মত্ত। এরূপ হীনাবস্থা জগতের আর কোথাও দেখিয়াছ কি?

অনুকরণের মূলে প্রেম, দলাদলির মূলে বিদ্বেষ এবং হিংসা। অনুকরণের রাজ্যে প্রতিযোগীতার সংঘর্ষ আছে, কিন্তু হিংসার তীব্র দাহন নাই। মানুষ একরূপে বড় হইতে চায়—অন্যের প্রতিষ্ঠা এবং মহত্ত্ব অনুকরণ করিয়া। ইহার মূলে উচ্চাভিলাষ ও প্রতিযোগীতা আছে। অন্যরূপে বড় হইতে চায়—অন্যকে বিনাশ করিয়া। ইহার মূলে শুধু বিদ্বেষ। তুমি আমার প্রতিপক্ষ, আমি শক্তিতে কিছুতেই তোমাকে খর্ব্ব করিতে পারিলাম না, তোমাকে বিনাশ না করিলে,আমি আর বড় হইতে পারি না। বড় হওয়া—দুইয়েরই লক্ষ্য; কিন্তু এক স্বর্গ ধরিয়া এবং আর এক নরক অবলম্বনে। রবীন্দ্রনাথ সমালোচনার তীব্র বাণে মাইকেলকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কেন, পাঠক বিচার করুন। বঙ্কিমচন্দ্রকে ধরিয়া যাঁহারা মানুষ, তাঁহারা, বঙ্কিমের স্বর্গারোহণের পর, তাঁহাকে খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কেন, পাঠকগণ বিচার করুন। বিচার করুন,বঙ্গবাসীতে সঞ্জিবনীতে,আনন্দবাজারে হিতবাদীতে,বেঙ্গলীতে অমৃতবাজারে এবং অন্যান্য পত্রিকা সকলে

ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বিষ সর্ব্বদা উদ্গীরিত হয় কেন? রাজনীতির সভা একটী ছিল, দুটী হইল; সাহিত্য সভা একটী ছিল, দুটী হইল; সঙ্গীত সমাজ একটী ছিল, দুটী হইল; স্বারস্বত সমাজ ঢাকায় একটী ছিল, দুটী হইল; ধর্ম্মসমাজের কথা আর বলিব কি, সে ইতিহাস ত সকলেই জানেন। এ সকল কেন? আনন্দমোহন কৌন্সিল সভায় সম্মানের আসনে বসিতে চান, সীতানাথ বাধা দেন; শশিশেখরেশ্বর বড় হইতে চান, প্যারীমোহন বাধা দেন। হেরম্বচন্দ্র, কৃষ্ণকুমার জীবনের রক্ত ঢালিয়া আনন্দমোহনের প্রীত্যর্থে কত বৎসর সাধন করিলেন, শেষে অর্দ্ধচন্দ্র পুরস্কার পাইলেন! এখন পৃথক স্কুলের আয়োজন হইতেছে। এ সকল তীব্র হলাহলের ইতিহাস এদেশে অলিখিত থাকে থাকুক, কিন্তু ইহার মূলে কি শিক্ষা? বাঙ্গলার মাসিক পত্র পাঠ কর—মাসিক সাহিত্য সমালোচনার ছলনায় সেখানে ব্যক্তিত্বের বিনাশের কাহিনী লিখিত হইতেছে। একজনকে বধ করিয়া বড় হইবার ইচ্ছা দিন দিন সংক্রামিত ব্যাধির ন্যায় এদেশে বদ্ধমূল হইতেছে। পরনিন্দা, পর কুৎসা পাঠে এদেশের ভাল ভাল লোকের মনও সদা প্রফুল্ল। 'আমি বড়, আমি বড়, আমি ভাল, আমি ভাল, আর সব খারাপ" এই অহঙ্কার মূলক আত্মপ্রতিষ্ঠা বঙ্গের ঘরে ঘরে। দলাদলি, রক্তারক্তি, ঝগড়া বিবাদ—নিন্দা গালাগালি ভিন্ন আর কিছু যেন এদেশে নাই। অযোগ্য এবং অসংযত পরনিন্দা সাহিত্যের ভিতর দিয়া এখন সমাজের অণুতে অণুতে প্রবিষ্ট হইতেছে। সুরেন্দ্রনাথ এবং মতিলাল, কাব্যবিশারদ, এবং সমাজপতি, বিনয়কৃষ্ণ এবং যতীন্দ্রনাথ, সারদা চরণ এবং হীরেন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ এবং রাজেন্দ্রনাথ—ইঁহাদিগের সকলেই প্রতিষ্ঠিত, প্রতিভান্বিত,—ক্ষমতাশালী, সহৃদয়, দেশানুরাগী, মাতৃবৎসল, কিন্তু পরস্পর পরস্পরের বিদ্বেষ্টা কেন, বলিতে পার কি? একতায় উন্নতি, বিভাগে পতন—এই মূল শিক্ষা, উন্নতির এই প্রথম যুগে, মহারথীগণ ভুলিয়া যাইতেছেন কেন, বলিতে পার কি? লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ইহার উত্তর এক ভিন্ন দুই নয়—ইহার মূলে কেবল বিদ্বেষ,—ইহার মূলে কেবল অহং সর্ব্বস্ব ভাব। হায়রে বঙ্গদেশ!!

সে দিন একখানি সংবাদ পত্রে গ্রাম্য দলাদলির কথা পাঠ করিতেছিলাম। পাঠ করিতেছিলাম এবং অন্তর দগ্ধ হইতেছিল। বঙ্গদেশের কত পল্লীর কত দলাদলির কথাই জানি। সহরে সহরে বোর্ড, মিউনিসিপালিটী হইয়াছে, সে সকলের দলাদলির কত কথাই জানি। মহা সহর কলিকাতা, প্রতিভা আর পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি আর গবেষণা, কৃতিত্ব এবং জ্ঞান—এ সকলের খনি। একজন মহা পণ্ডিত বলিতেন, আমি কাজের ভিড়ে সদা ব্যস্ত রিপুর কথা ভাবিবার অবসর কোথায়? কলিকাতা কাজের উৎস। এখানে অবিরত কত মানুষ খাটিতেছে,—কাজের বিরাম নাই। এখানে কার্য্যের স্রোতে ভাসিতে পারিলে অসার স্বার্থ এবং রিপুর গণনা কৃতী মানুষের মধ্যে আসিতে পারে কি? কিন্তু হায়, এ হেন সহরেও কলুষিতচিত্ততা, নীচতা, ক্ষুদ্রতা, হিংসা বিদ্বেষ পূর্ণ মাত্রায় প্রদীপ্ত। একজনের নিকট একজনের প্রশংসা কর, অমনি সেখানে মহা গর্জ্জন আরম্ভ হইবে। স্কুলের ছাত্র হইতে কলেজের শিক্ষক পর্য্যন্ত, হিতৈষীর প্রাঙ্গণ হইতে সম্পাদকের বৈঠক পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই

অবাধ পরনিন্দার গরল সদা উদ্গীরিত হইতেছে। সে কালের কবির লড়াই, এ কালের সংবাদ পত্রের কুৎসিৎ ভাষা পড়িয়া লজ্জা পাইতেছে। সেই জন্যই বুঝিবা কবির দল সকল বিলুপ্ত। তুমি যদি ধৃষ্টতা পূর্ব্বক সম্পাদকগণের নীচতার বিরুদ্ধে লেখ, তুমি রুচিবাগীশ বিশেষণে ভূষিত হইয়া উপহসিত এবং উপেক্ষিত হইবে। কলিকাতার মুদ্রাযন্ত্র সকল মেছুনীর হাটে পরিণত হইয়াছে, কলিকাতার চাদ্‌নীর দোকানীরা এবং বাজারের মেছুনীরা এখন লজ্জায় অধঃবদন হইয়াছে। দেশের শোচনীয় অবস্থার কথা ভাবিলে প্রাণ অস্থির হয়। গত ৬।৭ বৎসরের মধ্যে যত লাইবেল মকদ্দমা এই বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়াছে, বোধ হয়, তাহার পূর্ব্বের ৫০ বৎসরের মধ্যেও তত হয় নাই। মানুষের মান বাড়িয়াছে, আস্পর্দ্ধাও বাড়িয়াছে। দলাদলির নূতন নাটকের নূতন নূতন অঙ্ক প্রত্যহই অভিনীত হইতেছে। গত কয়েক বৎসরের বড় বড় লাইবেল মকদ্দমায় এদেশের বড় বড় লোকেরা কোন না কোন পক্ষ-সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেই সূত্র হইতে কলিকাতায় বিষম দলাদলির বীজ রোপিত হইয়াছে। সেই বীজ এখন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। বিভক্ত সভা সমিতির অন্তরালে সেই বীজ মুকুলিত। সম্বাদ পত্র সকল পক্ষবিশেষের মুখ পাত্রঃস্বরূপ হইয়াছে। যে পক্ষের কাগজ ছিল না, সে পক্ষঃরাতারাতি কাগজ প্রকাশ করিতেছেন। সংবাদ পত্র বর্ত্তমান যুগের দলাদলির মুখপাত্র স্বরূপ হইতেছে। হিংসা বিদ্বেষের উদ্গীরিত কলুষ রাশিতে দেশ পরিপূর্ণ।

কয়েক বৎসরের মধ্যে এ দেশে অনেক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গলাভাষার গৌরবের বিষয় কেহ কেহ বলেন। কিন্তু পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরের গালাগালি যে কাগজে না থাকে, সে কাগজের তেমন কাট্‌তি নাই। ইহাতে প্রমাণিত হয়, গালাগালি শ্রবণের জন্য দিন দিন লোকের ঔৎসুক্য বাড়িতেছে। ইহাতে উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় না; ইহা ঘোরতর দুর্দ্দশার কথা। যে দেশের লোকেরা পরকুৎসা করিতে ভালবাসে এবং যে দেশের লোকেরা পরকুৎসা শুনিতে লালায়িত, সে দেশের পরিণাম কি? মহত্ত্ব স্মরণ, মহত্ত্ব চিন্তন ভিন্ন কখনও কোন ব্যক্তি, কোন জাতি উন্নত হইতে পারে না। পরনিন্দা, পরকুৎসা লিখিয়া লিখিয়া, এবং শুনিয়া শুনিয়া আমাদের আত্মা ও মন কলুষিত হইয়া গিয়াছে, আমরা দিন দিন দুর্গতির পূতিগন্ধময় প্রদেশে নিমগ্ন হইতেছি। দুর্গন্ধে মজিতে মজিতে, পচিতে পচিতে আমাদের ভালমন্দ বিচারশক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। আমরা দিন দিন মনুষ্যত্বের অযোগ্য হইতেছি। এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে এদেশের আর মঙ্গল নাই। "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হইয়া উন্নতি লাভের আশা নাই। বিভাগ করিয়া শাসন করা গবর্ণমেণ্টের দুর্জ্জয় নীতি; আমরা যদি এই কলুষিত রীতিকে পদদলিত করিয়া একতা এবং সাম্য, সদ্ভাব এবং পুণ্যের পথে অগ্রসর হইতে না পারি, এদেশের মঙ্গল নাই। ভারতের দুর্দ্দশা এবং দুর্গতির শেষ নাই, এখন সকলে, ব্যক্তিগত প্রাধান্য ভুলিয়া, ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, ব্যক্তিগত দোষ ত্রুটী ভুলিয়া যদি একতার পবিত্র রজ্জুতে আবদ্ধ হইতে

না পারি, এদেশের মঙ্গল নাই। এদেশ ডুবিয়াছে, সকলে একত্র মিলিত না হইলে কথনও এদেশের উদ্ধার হইবে না। হিতৈষী-গণ সতর্ক হউন।

বাঙ্গালা বর্ণমালার অসম্পূর্ণতা।

বাঙ্গালা বর্ণমালা দেবনাগরী হইতে উদ্ভূত। সংস্কৃত ভাষা লিখিবার জন্য এই বর্ণমালাই যথেষ্ট। সংস্কৃত মৃতভাষা—বহুদিন মৃত। দীর্ঘকাল ইহার বৃদ্ধি নাই। বৃদ্ধি নাই, সুতরাং নূতন কোন প্রয়োজনও ইহাতে উপস্থিত হয় না। যাহার প্রাণ আছে, যাহার পুষ্টি আছে, পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার নূতন অভাব সকল সমুপস্থিত হয়, এবং এই সকল অভাব মোচনার্থ প্রয়াসেই তাহার উন্নতি।

বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতেরই বংশধর। অধিকাংশ বাঙ্গালা শব্দ সংস্কৃত শব্দের রূপান্তর মাত্র। অপর অনেক বাঙ্গালা শব্দে ও সংস্কৃত শব্দে কোন প্রভেদই নাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভিত্তি সংস্কৃত ব্যাকরণের উপরই স্থাপিত। এমন সময় ছিল, যখন বাঙ্গালাতে সংস্কৃত মূলক ভিন্ন অন্য শব্দ স্থান পায় নাই। কালক্রমে অনার্য্য পার্ব্বত্য জাতিদিগের কতগুলি কথা বাঙ্গালাতে প্রবেশ করে। ১২০৭ খ্রীঃ অব্দে মুসলমানেরা বাঙ্গালা জয় করিলে জেতৃগণের সংস্পর্শে বাঙ্গালাতে অনেক আরবী ও পারসী শব্দ প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়। আবার যে দিন ইংরেজেরা হৃতবল মোগল-কর হইতে বাঙ্গালার সিংহাসন কাড়িয়া লইয়াছেন, সেইদিন হইতে নূতন নূতন ইংরেজী শব্দ বাঙ্গালাতে নিত্যই দত্তকরূপে গৃহীত হইতেছে।

যতদিন আমরা একাকী থাকি, ততদিন আত্মতৃপ্ত থাকি—আপনাদের কোন অভাব বা দোষ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই না। কিন্তু যখন অন্যের সঙ্গে আমাদের দেখা শুনা হয়, তখন তুলনার চক্ষে আমরা আপনাপন অভাব প্রত্যক্ষ করি। ভাষা সম্বন্ধেও এইরূপ—যতদিন বিদেশী কোন ভাষার সঙ্গে আমাদের ভাষার তুলনা হয় নাই, তত দিন ইহার যে কিছু অভাব আছে, এরূপ চিন্তা আমাদের আদৌ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু ২।১টী বিদেশী ভাষার সম্মিলনে বাঙ্গালার কিয়ৎ পরিমাণ অসম্পূর্ণতা আমাদের নিকট পূর্ণ প্রতীয়মান হইতেছে।

সংস্কৃত মূলক শব্দগুলি লিখিবার জন্য বর্ত্তমান বাঙ্গালা বর্ণমালাই যথেষ্ট। কিন্তু অনেক আরবী, পারশী ও ইংরেজী কথা এমন আছে, যাহা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে হইলে বাঙ্গালাতে অক্ষরের অকুলন হয়। এই অভাব মোচনার্থ বাঙ্গালায় নূতন কয়েকটী বর্ণ সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে।

ক, খ, গ বাঙ্গালায় জিহ্বা মূলীয় বর্ণ। পারসীতে এ তিনটী জিহ্বা মূলীয় ছাড়া এতদনুরূপ আর তিনটী কণ্ঠ্য বর্ণ আছে—কাফ (১ম) খে, গায়েন। ইহাদের মধ্যে কোন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ বাঙ্গালায় লিখিতে হইলে শুদ্ধ করিয়া লিখিবার যো নাই। বাঙ্গালায় "কলমের" ক, "খারাপের" খ, ও "দারোগার" গ জিহ্বা মূলীয়, কিন্তু বাস্তবিক পারশীতে ঐ অক্ষরগুলি কণ্ঠ্য। হিন্দিতে নীচে বিন্দু বসাইয়া এই বর্ণগুলি লিখিত হয় বলিয়া ইহাদের উচ্চারণও ঠিক হইয়া থাকে। বাঙ্গালাতেও এই অক্ষর-

গুলি ঐরূপ বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত হইলে মূল ভাষার প্রকৃত উচ্চারণ জ্ঞাপন করিতে পারে। কিন্তু এই অক্ষরগুলি একেবারেই না হইলে নয়, এমন নহে। অনেক আরবী ও পারশী শব্দ বহুদিন বাঙ্গালাতে বাস করিয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে। সুতরাং ইহাদিগকে বাঙ্গালা পরিচ্ছদে সজ্জিত দেখিতে অনেকেরই আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু ঐ ভাষাদ্বয় হইতে নূতন কোনও শব্দ বাঙ্গালাতে প্রচলিত করিতে হইলে এই পরিবর্ত্তিত অক্ষরের প্রয়োজন হইতে পারে।

ইংরেজী কথাগুলির কথা স্বতন্ত্র। ইংরেজী বর্ত্তমান রাজভাষা, শিক্ষিত সভ্যদের ভাষা। শুদ্ধরূপে ইংরেজী লেখা ও উচ্চারণ করা প্রত্যেক বাঙ্গালীর অভীপ্সিত। শিশুকাল হইতে আমরা বিশুদ্ধভাবে ইংরেজী বর্ণগুলি উচ্চারণ করিতে যত্নবান হই। ভ্রমেও একটী ইংরেজী কথার উচ্চারণ ভুল হইলে আমাদিগকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালা পুস্তকে ইংরেজী কথা শুদ্ধরূপে লিখিত হউক, এরূপ ইচ্ছা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে।

ইংরেজীতে 'Z' উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বাগ্র ও দন্তের ভিতর দিয়া শ্বাস বাহির করিয়া দিতে হয়। বাঙ্গালায় এরূপ কোন অক্ষর নাই। 'Z' সম্বলিত কোন ইংরেজী কথা বাঙ্গালায় লিখিতে হইলে 'Z' দ্বারা কাজ সারিতে হয়। কিন্তু ইংরেজী 'Z' ও বাঙ্গালা 'জ'তে আকাশ পাতাল প্রভেদ। হিন্দি রীত্যনুসারে 'জ'র নীচে একটী বিন্দু বসাইয়া 'Z' বানাইলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। সংস্কৃতে 'Z' এর অনুরূপ কোন উচ্চারণ নাই। 'জ' যুক্ত বাঙ্গালা কথাগুলি পূর্ব্ববঙ্গে 'Z' যুক্ত বলিয়া উচ্চারিত হয়। 'জমিদার', 'জবরদস্তি', 'জোর' প্রভৃতি পারশী শব্দ পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরাই শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আজকাল পশ্চিমাঞ্চলের অনুকরণে পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষিত অধিবাসীগণও ঐ কথাগুলির উচ্চারণে ভুল করিতেছেন।

ইংরেজীর 'V' বাঙ্গালাতে 'ভি' বলিয়া লিখিত হয়। বাঙ্গালায় 'ভ' ওষ্ঠ্য বর্ণ; কিন্তু ইংরেজীর 'V' দন্তৌষ্ঠ্য—উচ্চারণে উপরের দন্তপাঁতি দ্বারা অধর ঈষৎ স্পর্শ করিয়া শ্বাস ছাড়িয়া দিতে হয়; আর 'ভ'তে অধর ও ওষ্ঠের সংযোগ, শ্বাস ছাড়িয়া না দিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। সুতরাং 'ভ' দ্বারা 'V' লিখিত হইতে পারে না। বাঙ্গালী শিশুদের জন্য যাঁহারা ইংরেজী ব্যাকরণ লেখেন, তাঁহারা 'Z'কে 'জেড্' ও 'V'কে 'ভি' লিখিয়া বড়ই অনিষ্ট করেন। কারণ শিশুগণ ইহা দ্বারা বিকৃত উচ্চারণ শিক্ষা করিয়া থাকে। অনেকে অতি কোমল বয়সে যাহা শিক্ষা করে, বড় হইলে আর তাহা ভুলিতে পারে না। বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ছাত্রগণ 'V'কে অন্তস্থ 'ব' র মতন উচ্চারণ করিয়া থাকে। তাহাদের এই উচ্চারণও ভ্রমাত্মক; কারণ অন্তস্থ 'ব' র প্রকৃত প্রতিরূপ 'V' নহে, 'W'। কিন্তু এই উচ্চারণ তাহাদের মধ্যে এমন বদ্ধমূল হইয়াছে যে, শতবার সতর্ক করিয়া দিলেও তাহারা 'V' শুদ্ধ করিয়া উচ্চারণ করিতে পারে না। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় 'V' স্থানে 'হ্ব' এই যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হয়। 'গভর্ণমেণ্ট' না লিখিয়া মাহ্রাটাগণ 'গহ্বর্ণমেণ্ট্' লিখিয়া থাকেন (সাধনা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম ভাগ, ৫১৮ পৃঃ—'মরাঠী ও বাঙ্গালা'

প্রবন্ধ)। কিন্তু 'হ্ব' 'ভ' অপেক্ষা অনেকটা 'V'র কাছাকাছি হইলেও প্রকৃত পক্ষে এই দুই উচ্চারণ এক নহে। এ স্থানেও 'ভ'র নীচে বিন্দু বসাইয়া এই দন্তোষ্ঠ্য বর্ণের অভাব দূর করা যাইতে পারে।

নাগরীতে দুইটী 'ব' আছে। প্রথমটীকে বর্গীয় ও দ্বিতীয়টীকে অন্তস্থ বলা হয়। সংস্কৃতে ইহাদের উচ্চারণ স্বতন্ত্র এবং লিখিবার প্রণালীও কথঞ্চিৎ ভিন্ন। বর্গীয় 'ব' ওষ্ঠ্য; ইংরেজী 'B' ও পারসী 'বে'র মত উচ্চারিত হয়; উচ্চারণ সময়ে অধরে ওষ্ঠ চাপিয়া, শ্বাস বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। অন্তস্থ 'ব' ইংরেজী 'W' ও পারসী 'ওয়াও' একই ভাবে উচ্চারিত; উচ্চারণকালে অধরে উপরের দন্ত ঈষৎ লাগাইয়া শ্বাস ছাড়িয়া দিতে হয়। সংস্কৃতে প্রথম 'ব'র বাম ভাগের কোন একটী রেখা দ্বারা কাটিয়া দেওয়া হয়; হিন্দিরও এই রীতি। বাঙ্গালাতেও এই প্রথা চলিত হইলে এই দুইটী বর্ণের বিভিন্ন উচ্চারণে আর কোন গোল থাকে না। বাঙ্গালাতে বর্ত্তমানে দুইটীই একভাবে লিখিত ও পঠিত হয়। ইংরেজী 'F' ও বাঙ্গালা 'ফ' এক বর্ণ নহে। বাঙ্গালায় 'ফ' ওষ্ঠ্য বর্ণ—উচ্চারণে শ্বাস মুখের ভিতরেই আবদ্ধ থাকে। কিন্তু ইংরেজী 'F' দন্তোষ্ঠ্য; দন্ত ও অধরের ভিতর দিয়া শ্বাস বাহির করিয়া দিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। এখানেও হিন্দিতে বিন্দু প্রয়োগই ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। 'ফ'র নীচে একটী বিন্দু বসাইয়া হিন্দি লেখকগণ 'F'এর কাজ চালাইয়া থাকেন। আমরা ইদানীং ইংরেজীর অনুকরণে বাঙ্গালা 'ফ'কে প্রায় 'F' বানাইয়া তুলিয়াছি। ইংরেজীওয়ালাদের মুখে এখন'ফ''F'এ বড় একটা প্রভেদ নাই।

ইংরেজীতে একটী যুক্তাক্ষর আছে 'Zh'; ইহার উচ্চারণ "শ" ও নয়, "জ" ও নয়। তালুতে জিহ্বাগ্র লাগাইয়া একটু জোরে শ্বাস ছাড়িয়া দিলে তবে 'Zh' এর প্রকৃত উচ্চারণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালাতে এই উচ্চারণ বিশিষ্ট কোন শব্দ লিখিবার শিশুপাঠ্য ব্যাকরণ লেখক ভিন্ন অন্যের বড় একটা দরকার হয় না। আবশ্যক হইলে 'শ'র নীচে একটী বিন্দু বসাইয়া 'Zh' এর কার্য্য চালাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

আচার্য্য মোক্ষমুলর ভূমণ্ডলের যাবতীয় ভাষা রোমান বা বর্ত্তমান ইংরেজী অক্ষরে লিখিত দেখিতে চান। ভারতীয় উর্দ্দু, পালি, খাসিয়া প্রভৃতি ভাষা রোমান অক্ষরে লিখিত হইতেছে। কিন্তু ইংরেজী বর্ণমালার অসম্পূর্ণতা বাঙ্গালা বর্ণমালা হইতে অনেক বেশী। সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি ভাষার ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ রোমান অক্ষরে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইতে পারে না। এই জন্য ইংরেজী বর্ণমালায় অনেকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রচলিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে উর্দ্দু শিক্ষা করা অনেক সময়ে আবশ্যক। কিন্তু পারসীকদিগের লিখিবার প্রণালী এত কদর্য্য যে, ঐ ভাষা শিক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ। ঐ ভাষায় লিখনকালে স্বরচিহ্ন সকল ব্যবহৃত হয় না—শব্দগুলি কেবল ব্যঞ্জন সমষ্টি—আবার একই রকমে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ লিখিত হয়; কাজেই পূর্ব্বে উর্দ্দুতে কিছু দখল না জন্মিলে ঐ ভাষা পড়া যায় না। স্বর চিহ্নের অভাব বশত প্রসিদ্ধ মৌলবীগণও অনেক সময়ে পাঠে ভুল করিয়া থাকেন। এবং হস্তলিখিত দলিল, দস্তাবেজ বিভিন্নরূপে পঠিত হইতে পারে বলিয়া আইন আদালতে প্রতারণা অনেক

হয়। বাঙ্গালা অক্ষরে উর্দ্দু শিক্ষার পুস্তক ইতি পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে যে বাঙ্গালী স্বল্পায়াসেই উর্দ্দু শিখিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রস্তাবিত উপায়ে পরিবর্দ্ধিত হইলে বাঙ্গালা বর্ণমালা দ্বারা শুধু উর্দ্দু কেন, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষাই লিখিত হইতে পারিবে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস গুপ্ত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

কবির মৃত্যু।*

আঁধারিয়া দীন বঙ্গ কবিতা কানন,
জগতের স্নেহ মায়া ছাড়ি,
কোথা, কোন্ দেশে। কবি করেছ গমন
অশ্রুসিক্ত স্নিগ্ধ পথ ধরি!

(১)

ছায়া সুপ্ত বরষার সস্নেহ পরশে
ফুটিয়াছে যূথী ফুলগুলি,
বিমল "দুইটী তারা" রয়েছে আকাশে,
হায়, শুধু তুমি গেলে চলি।

(২)

কেমনে ভুলিলে কবি গোলাপবালায়,
সে ত হায় ভুলেনি তোমারে,
আধখানি অঙ্গ ঢাকি শ্যামল পাতায়
দেখ সে নাচিছে ধীরে ধীরে।

(৩)

দেখ তোমা লাগি শ্যাম মাধবী বল্লরী
কিশলয়ে সাজিছে আবার,
সেফালিকা স্বপ্নিশেষ দূরে পরিহরি
প্রকাশিছে সুষমা তাহার।

(৪)

ফুলময়ী প্রকৃতির বিলাস বাসর
তুমি কি গো দেখিবেনা আসি?
ধরার এ মনোরম মাধুরী সুন্দর
অনন্তে কি যাবে তবে মিশি?

(৫)

ফিরিবে না আর কি গো এ ধরা মাঝারে
ত্যজিয়া সে শান্তিময়ী পুরী,
হৃদয় শ্মশান কিগো শুধু চির তরে
রবে তব স্মৃতিটুকু ধরি?

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

* কবিভ্রাতা ৺নি[illegible] বসু মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে লিখিত।

রজনী।

আলো করি দশদিক্
চেয়ে আছে অনিমিখ
নির্ম্মল সুনীলাকাশে পূর্ণ শশধর,
ছড়ায়ে সুরভি চুল
হাসিছে কানন-ফুল,
রজত জোছনা মাখা দিক দিগন্তর।
আকুল সে পিককুল ভ্রমে কুঞ্জে কুঞ্জে,
ঘুম ঘোরে প্রজাপতি
শুনিছে স্বপন-গীতি,
প্রকৃতি গাঁথিছে মালা বসি বন মঞ্চে।
পবিত্র সরল শুদ্ধ নক্ষত্র সুন্দর,
ঝরিয়া শিশির বিন্দু
গড়িতেছে ক্ষুদ্র সিন্ধু,
খুলেছে প্রকৃতি যেন পুণ্যের নির্ঝর।
প্রকৃতির মহা শোভা মহা মহোৎসব,
পথে পথে, ঘাটে মাঠে,
সরসীর শ্যাম তটে,
জোনাকি জোছনা মাখা—কুসুম সৌরভ।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

দয়ার নিদয় রূপ।

হয়েছে তোমার তরে
আকুল আকুল প্রাণ,
দেখাইয়ে প্রেমমুখ
প্রেমময় রাখ প্রাণ,
জুড়াইবে পাপ আঁখি
জুড়াইবে প্রাণ মন,
নয়নের কোণে দিলে
একবার দরশন।
ঘন ঘটা অন্ধকারে
দিনেশ পড়িলে ঢাকা,
নির্জ্জীব জগৎ হয়
মলিন বিষাদে মাখা,
না দেখিলে প্রেমমুখ
তোমার তেমতি হায়,
আমার প্রাণের জ্যোতি
একেবারে নিবে যায়!
নয়নে উথলি উঠে
প্রাণের কালিমা রাশি,
কঠোর কুরূপ ধরে
তরুলতা, রবি, শশী;
জীবন্মৃত হই, হয়
জীবন যাতনাময়,
অন্তরে বাহিরে হেরি
মৃত্যুময় সমুদয়!
কাতরে করুণা কর,
নিরাশ করোনা প্রভু,
দেখাইতে প্রেমমুখ
বিমুখ হ'ওনা কভু;
আমারে নিদয় তুমি,
এও কি কখন হয়?
দয়াই প্রকৃতি তব,
জানি তুমি দয়াময়!
মিলনে কৃতার্থ তুমি
করেছ করেছ যারে,
বিরহের এ প্রদাহ
সেই তো সহিতে পারে;
ক্ষীণাঙ্গ পতঙ্গ আমি,
আশ্বাসে জীবন ধরি,
দয়ার নিদয় রূপ
আমি কি সহিতে পারি?
চেয়ে দেখ প্রেমময়,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে
কত দুঃখ, কত ক্লেশ,
প্রাণ যে কেমন করে!
ঘুচাবে সকল দুখ
ও প্রেম মুখের জ্যোতি,
চেয়ে দেখ প্রেমময়,
প্রেমানন্দের এ মিনতি।

প্রেমানন্দ।

বাঙ্গালির ছেলে।

বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়;
নিস্তেজ দুর্ব্বল হিয়া,
প্রলোভনে পদ দিয়া,
শেষে অনুপায় দেখি, করে হায় হায়।
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
লম্ফ ঝম্প, হাঁকা হাঁকি,
দেশোদ্ধারে ডাকা ডাকি
সভায় করিয়া, ঢুকে শৃগাল-গুহায়;
বাঙ্গালির ছেলে, তোরা কে দেখিবি আয়।
তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অনুপম,
বাল্যে তারা রবি সম,
অর্দ্ধমৃত হয়ে যায় যৌবন-উষায়;
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
কিশোর বয়স কালে,
কি জানি কি পাপ ফলে,
কলঙ্ক কালিমা কেবা [illegible] মাথায়!
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।

সুবিশাল পরিবার
চাহিছে বদনে যার,
বিলাসিতা আসি তারে নাশ করে যায়!
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
বিজাতীয় ভাষা শিখে,
মায়ের অসভ্য দেখে,
অবজ্ঞায় অনাদরে যায় ঠেলে পায়!
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
ফিরায়ে চিকণ বেশ,
চুরুট ফুঁকার বেশ,
ছড়ি, ঘড়ি, চশমাতে কিবা শোভা পায়!
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
সদাই হুজুগে চলে,
মোহের কুহকে ভুলে,
প্রেম বলে ফণীহার বাঁধিছে গলায়!
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
বিয়ে করে বাল্যকালে,
যৌবনে সন্তান-জালে
বিজড়িত হয়ে, শেষে দেখে অনুপায়!
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
কে জানে কি ধাতু দিয়া
গড়া তাহাদের হিয়া,
ভুলিলা বিধাতা দিতে সাহস তাহায়;
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবে আয়।
হীনতায় পূর্ণ বুক,
সহিতে না পারে দুখ,
ননীর পুতুল তারা বাতাসে মিশায়;
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
কদাচারে কাঁদে আয়া!
বাপ মারে নাহি মায়া,
ভাই বোনে নাহি পালে স্নেহ মমতায়;
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই,
বিসম্বাদ সদাই,
দেখিতে না পারে এরা কভু একতায়;
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
হারায়েছে মনুষ্যত্ব,
ভুলে গেছে নীতিতত্ত্ব,
আত্মসুখ ধর্ম্ম কর্ম্ম ভাবে সর্ব্বদায়;
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
শ্রমেতে বিমুখ এরা,
শ্রম করে অসভ্যেরা;
"সভ্য" বাঙ্গালিরা শুধু প্রভু লাথি খায়!
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
ষাট্ বর্ষে মরে দারা,
তবু দারা গ্রহে তারা,
নাহি লজ্জা বোধ কিম্বা অপযশ তায়।
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
বালিকা বিধবা বালা
সহিছে বৈধব্য জ্বালা,
তার তরে ব্রহ্মচর্য্য আছে ব্যবস্থায়!!
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।

শ্রীপঙ্কজিনী বসু।

বৈরাগ্য।

অলক্ষিতে সুখ দুঃখ আসে,
আবার অলক্ষে ভেসে যায়,
ভাবিতে দেয়না অবসর,
কিবা ছিল কিবা গেল হায়!

মোর কেহ সাধনার নয়—
তারা আসে নীরবে পালায়,
মোর হৃদি রঙ্গভূমি যেন,
তারা এসে দুদণ্ড খেলায়!

বিয়োগান্ত নাট্যভূমি সম
পড়ে আছি, নীরব চেতনা—.
তারা এসে হেসে দলে যায়,
পড়ে থাকে শ্রান্তির মূর্চ্ছনা!

স্বপনের সম সুখ আসে,
পুনঃ যায় নীরবে সরিয়া,
মেঘমুক্ত শশী সম তাহে
এক জ্যোতিঃ উঠয়ে ফুটিয়া।

সে পবিত্র জ্যোতিঃ মাঝে
কার স্পর্শ অনুভবে পাই,
কে যেন প্রাণের অন্তরালে
বলে মোরে "কেহ নাই নাই"!

আচম্বিতে দুঃখ রাশি আসে,
হৃদি ওঠে সঘনে কাঁপিয়া,
পুনঃ যায় কালের সাগরে
আলেয়ার সম মিলাইয়া।

দুঃখ জ্বালা কেটে যায় যবে,
প্রাণ মোর উঠে জাগরিয়া,
কে আমার হৃদয়েতে যেন
এক কথা বলে আশ্বাসিয়া;—

"এ অনিত্য ধরণীর মাঝে
তারা কেহ চিরস্থায়ী নয়,
সুখ কিম্বা বিভীষিকা আসে
—যায় চলে কি ক্ষতি তাহায়।"

কেনবা সুখের অভিলাষ,
কেন দুঃখে হবে ম্রিয়মাণ,
যাহা মোর ইচ্ছাধীন নহে,
তার তরে ব্যস্ত কেন প্রাণ?

অনিত্য সংসারে সুখ দুঃখ
জীবনের দৈনিক বিকাশ;
কেন রবে শঙ্কা, আরাধনা,
গমনে, স্থাপনে অভিলাষ?

তাদের বিচ্ছেদ আক্রমণে
কেন প্রাণে জাগে অবসাদ?
কেনবা আদর অবসানে
থাকে প্রাণে মধু তিক্ত স্বাদ?

কালের বুদ্বুদ সুখ দুঃখ
তার বুকে নীরবে মিলায়,
তারি টানে আসে তারা নামি,
তার স্রোতে পুন ভেসে যায়।

হেরি এই নিত্য আকর্ষণ,
নিত্য হেরি তাহার নির্ব্বাণ,
আমার হৃদয় বিথারিয়া
এক জ্যোতিঃ হইছে স্ফুরণ।

কামনা, যাতনা, অবসাদ
জীবনের যতেক কালিমা—
সে জ্যোতিঃ মাঝারে ডুবে গিয়ে,
জাগে এক আশা মাধুরিমা।

সকল আঁধার নাশি যবে
সেই জ্যোতিঃ বিতরে আলোক,
অপার অনন্ত শান্তি লভি,
ভুলে যাই আঘাতের শোক।

নির্ভীক, সাহসী সেই হৃদি,
হেরিলে প্রলয় ভয়ঙ্কর,
হাসিয়া উড়ায় অবহেলে;
বিচলিত নহে সে অন্তর।

সে জ্যোতিঃ বৈরাগ্য তার নাম,
আগ্নেয়াস্ত্র তীক্ষ্ণ খরধার
পড়িলে তাহার মুখে কাটি
সুখ দুঃখ হয় একাকার।

সুখে তার নাহিক হরষ,
দুঃখে তার নাহিক বিষাদ,
জীবনের অনিবার্য্য পথে
ভ্রান্ত জীব (ই) লভে পরমাদ।

শ্রীপ্রিয়বালা রায়।

"জন্ম দিনে"

আজি তব শুভদিনে, প্রকৃতি আপন মনে
আনিয়াছে কত উপহার,
স্নিগ্ধতর ঊষা প্রাণ, ফুল্ল বিহঙ্গের গান
সমীরণে পুণ্য দেবতার।
বিমল আকাশ হ'তে নেমে আসে ধরণীতে,
তোমা লাগি আনন্দ সুন্দর;
বিনয়-বিনম্র শিরে, রাখ, বোন, পূর্ণ ক'রে
নিরমল কোমল অন্তর।
অম্বরে, সাগর জলে সুরলোক ধরাতলে
মহিমার রাগিণী ঝঙ্কার;
প্রীতি, পুণ্য সুকোমল, ছেয়েছে ধরণীতল
উচ্ছ্বসিত সুধা-পারাবার।
নব আজি ধরা জীর্ণ, স্বর্গ লোক অবতীর্ণ
সূক্ষ্ম আত্মা তব চারিধারে
জন্ম দিনে দিতে তোমা, এনেছে আশীষ ভূমা
স্নেহ সুধা মরণ মাঝারে।
আজি,
ভুল ক্ষুদ্র আকিঞ্চন, হো'ক তব প্রাণ মম
শুদ্ধ, পূত প্রেমের আলয়;
অপ্রেম, বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব, জীবনের পূতিগন্ধ
শুভ দিনে হো'ক সবে লয়।
আজি শুধু আলিঙ্গন, শুধু প্রীতি বরিষণ,
আজি স্নিগ্ধ আনন্দ বন্ধন;
উদার, সুন্দর প্রাণে, অনন্তের সন্নিধানে
অশোভন হো'ক্ বিসর্জ্জন।
আজি,
নবীন বরষ কূলে, পুরাতন ফেল খুলে
নূতনেরে কর পরিধান;
অপ্রেমে ফেলিয়া তীরে, খোল তরী ধীরে ধীরে
হাতে ল'য়ে প্রেমের নিশান।
সম্মুখে নবীন রবি, আশা পূর্ণ সেই ছবি
হৃদি মাঝে থাকুক অঙ্কিত;
নিরাশা বেদনা ভার, পশ্চাতের অন্ধকার,
আশালোকে হো'ক তিরোহিত।
ক্ষণকাল চিন্তা কর, হ'ল কি সুন্দরতর
চরিত্রের সুন্দর বরণ;
জীবন নির্ঝর জলে, খেলিছে কি কুতূহলে
ইন্দ্রধনু করুণা কিরণ।
জনক হিমাদ্রি শিরে, চাহিয়া বারেক ফিরে
ভাব তাঁর মহিমা গম্ভীর;
তাঁহা হ'তে যেই প্রাণ, হ'ল কি তা সুমহান
পবিত্র, সরল, শান্ত, ধীর।
সংসারের শত কাজে, সদা যেন মনে রাজে
সেই মূর্ত্তি মহিমা-পূরিত
দিন দিন চিত্তে তব, ভাব ভক্তি অভিনব
রূপে রসে হো'ক বিকশিত।
আজি এ মঙ্গল দিনে, কি দিবে এ দীন হীনে
আমি তব অপদার্থ ভাই;
পবিত্র দেবতা যিনি, তোমারে করুন তিনি
সুপবিত্র—এই ভিক্ষা চাই।

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

কবির স্মৃতি।*

(স্বর্গারোহণ ২৯আষাঢ়,১৩০৭।১৩ই জুলাই১৯০০)

সেই বন-শোভা তোমারি রচিত,
তোমারি কল্পনা ভরা,
সেই লতিকায় শ্যাম-শুভ্র ফুল,
উপবন আলো করা;

---

* "সাহিত্য", নব্যভারত," "প্রদীপ", প্রভৃতি মাসিক পত্রাদির বিশিষ্ট সুলেখক, সাহিত্য সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত কবিবর মহাত্মা নিত্যকৃষ্ণ বসু, এম, এ, মহোদয়ের স্বর্গারোহণে তাঁহারই উদ্দেশে (অশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত) কবিতাটী রচিত। ইনি কোন্নগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত থাকিয়া কোন্নগরের গৌরব বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন।

সেই সে সকলি তব স্মৃতিময়,
তোমারি কিরণ ঢালে,
তুমি কোথা আজ? বিভূষিত বুঝি
ত্রিদিবে কুসুম-মালে!
"শোভাময়ী", "ঊষা"তোমারি রচনা;
তোমারি আবেশ মাঝে
কবিবর, তব মানস উছলি'
"উন্মাদিনী" প্রেমরাজে;
তবু গো দেবতা, হৃদয় আকুল,
স্মরিতে কাহিনী হেন,
শুধু শুধু স্মৃতি; তুমি কোথা, আজ
শূন্য সিংহাসন কেন?
কৌমুদী রজনী,— "বিরহী" তথায়
সৃজিয়াছ দেব কবি!—
সমীর-নিস্বনে দেছ প্রাণে তার
জাগায়ে প্রেমের ছবি।
প্রভাত-কিরণে সে অপরাজিতা
তোমারি রচনা সেই,
হাসি ভরা গালে সে মাধবী-বালা;
শুধু আজ তুমি নেই!
তুমি "মোহ"রচি; সে মোহ-আবেশে,
প্রাণের উছাসে কত,
কহিয়াছ কবি, "হোক উদ্যাপন
জীবনে মরণ-ব্রত!"
তোমারি সে "ভুল" তব "তাপহরা,"
করুণ উছাস তুলে,
তোমার করুণ তাপিত নিশ্বাস
আজো জাগে হৃদি-কূলে!
তোমার কবিতা মুরলী মধুর,
পশে যেন কাণে কাণে,
উদাস-আকুল শোক-স্মৃতি তব,
তায় ভেসে আসে প্রাণে;
তোমার মধুর উপদেশ দেছে
বিকাশি, জ্ঞানের রবি,
শ্রাবণের ধারে অশ্রু ঝরে তাই;
শ্রাবণে বিদায় কবি!

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী।

ব্রহ্ম ও জগৎ। (১৮)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা যেরূপ অনুলোম-ভাবে ব্রহ্মশক্তি হইতে জগতের স্থূলভাবে বিকাশের কথা দেখাইয়াছি, বিলোম ভাবেও, তদ্রূপ সেই ব্রহ্মশক্তিতেই উপনীত হওয়া যায়। স্থূলশরীরটী মৃত্যুর পর, কেবল মাত্র পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতে পরিণত হয়। কার্য্য তাহার কারণেই লীন হয়—এই নিয়ম বশতঃ শরীরের স্থূলাংশ বিশ্লিষ্ট হইয়া সূক্ষ্ম কারণাত্মক উপাদানে—সূক্ষ্মপঞ্চভূতে অর্থাৎ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাত্মক শক্তিতে পরিণত হয়। তখন কেবল জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের শক্তি নিচয় (মন ও প্রাণ) এবং ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি বৃত্তি সমন্বিত বুদ্ধি (বুদ্ধি ও অহঙ্কার তত্ত্বদ্বয়) এই কয়েকটী মাত্র শক্তিরূপে সূক্ষ্ম ভাবে বর্ত্তমান থাকে। ইহাই জীবের সূক্ষ্ম শরীর। ব্যক্তি ভেদে এই শরীর গুলি অনন্ত। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ইহারা থাকিবে; প্রলয়ে কেবল অব্যক্তভাবে থাকে মাত্র। প্রলয়ে এই সূক্ষ্ম শরীর গুলি অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থিত ইন্দ্রিয়শক্তি ও বুদ্ধি বৃত্তি লুপ্ত হইয়া যায়। তখন কেবল মাত্র বুদ্ধি সত্ত্বা মাত্র অবস্থিত থাকে। এ অবস্থায় বুদ্ধির কোনই বৃত্তির বিকাশ থাকে না। সুপ্তভাবে উহাতেই থাকিয়া যায়; এবং থাকে বলিয়াই উহাকে কেবল সত্ত্বাত্মক বলে ইচ্ছা, কামনা, কাম, ক্রোধ, হিংসা,

জ্ঞান (thoughts) প্রভৃতি সমুদয়ই বুদ্ধির বৃত্তি (modifications)। সে অবস্থায় এ বৃত্তি গুলি আদৌ বিকাশ থাকে না। কেবল দ্বৈতবর্জ্জিত (unconscious) জ্ঞান ধারা মাত্র রূপে বুদ্ধিটী অবস্থিত থাকে। জীবের ইন্দ্রিয় শক্তি গুলি এবং যে যে ইন্দ্রিয় শক্তি ও বুদ্ধ্যাদি দ্বারা জীব যে সমস্ত ক্রিয়া করিয়াছিলেন, সেই ক্রিয়ার সংস্কারগুলিও "অদৃষ্ট" রূপে সেই বিলীন, সুষুপ্ত বুদ্ধিতে লীন থাকে। সৃষ্টির আদিতে এই গুলিই আবার যথাযথ ক্রমে প্রস্ফুটিত হয়। শ্রুতি এই জন্যই ত গাহিয়াছেন যে," * * * ধাতা যথা পূর্ব্ব মকল্পয়ৎ।" ঈশ্বর যেটী যেরূপ ছিল অর্থাৎ যে জীব যেরূপ ভাবে বিলীন হইয়াছিল, সেই ভাবে তাহারা প্রাদুর্ভাব করান। নূতন কিছুই হইল না। এই অব্যক্ত বুদ্ধি গুলি ঈশ্বরচৈতন্যেই বিলীন থাকে। এই অব্যক্ত বুদ্ধি গুলিই সমষ্টিভাবে, ঈশ্বরের শক্তি বা কারণ-শরীর রূপে বেদান্তে কথিত হইয়াছে।

বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই অচেতন, জড় পদার্থ। ইহারা আন্তর্নিহিত অদৃষ্ট বা ক্রিয়া প্রভাবে সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল। ঈশ্বর-চৈতন্যই এই ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক। সৃষ্টির আদিতে তাঁহা হইতেই ঐ অচেতনবর্গের ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনিই বুদ্ধির বৃত্তি গুলির প্রকাশক। তিনি প্রকাশ না করিলে, বৃত্তি গুলির বোধই জন্মিতে পারিত না। প্রলয়ে বুদ্ধির বৃত্তি লীন থাকা প্রযুক্ত, তৎকালে চৈতন্য কোন বৃত্তি প্রকাশ করেন না, তখন কেবল বুদ্ধিতে চৈতন্যের সত্তাটী মাত্র থাকে। এটী ব্রহ্মেরই জ্ঞানাত্মক সত্তা মাত্র। ইহা আনন্দময় সত্তা। কেন না, ব্রহ্ম-সত্ত্ব, জ্ঞান ও আনন্দময়। সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মচৈতন্যই সেই বিলীন বৃত্তি ও ইন্দ্রিয় শক্তি গুলিকে প্রকাশিত করেন, তাই সে গুলির বোধ জন্মিয়া থাকে। এইরূপে তিনি ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির প্রবর্ত্তক ও প্রকাশক। অতএব এক বুদ্ধিরই অব্যক্ত, সূক্ষ্ম এবং স্থূল এই ত্রিবিধাবস্থা। এক বুদ্ধি হইতেই সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয় শক্তি ও পরমাণু সমূহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। অতএব বেদান্ত ও সাংখ্যমতে বুদ্ধিও একরূপ জড় দ্রব্য। বুদ্ধিকে জড় এবং দ্রব্য বলাতে, এখনকার নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় কেহ কেহ হাস্য করিতে পারেন বটে, কিন্তু যখন বুদ্ধি হইতে পরমাণু জন্মিয়াছে, তখন বুদ্ধি যে পরমাণুর ন্যায় নিতান্ত ব্যাপক পদার্থ, তাহা সাংখ্য শাস্ত্র সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। শক্তিময় ব্রহ্মের এই বুদ্ধিই প্রথম বিকাশ। এ অবস্থায় মায়া নিরতিশয় সত্ত্বদ্রব্য প্রধান। বীজে যেরূপ বৃক্ষের শাখা প্রশাখা প্রভৃতি বিলীন থাকে, এই বুদ্ধিতেই তদ্রূপ উহার বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলি নিহিত থাকে। সেই গুলির এখনও সূক্ষ্মভাবে বা স্থূল ভাবে বিকাশ হয় নাই। সুষুপ্তি অবস্থায় যেমন ইন্দ্রিয়-শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিগুলির বিলোপ হয় এবং সুষুপ্তির অন্তে পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রকাশ পায় এবং তখন যেমন কেবল মাত্র সত্ত্বাত্মক জ্ঞানটী মাত্র থাকে, অব্যক্তাবস্থায় ব্রহ্মশক্তি বা বুদ্ধিরও ঠিক্ তদ্রূপ অবস্থা। স্বপ্নাবস্থায় যেমন মন কেবল সংস্কার লইয়া ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ও বুদ্ধির কার্য্য করে, তদ্রূপ সূক্ষ্মাবস্থায়ও শক্তি ও বৃত্তিগুলি কেবল শক্তিরূপে ক্রিয়াত্মক থাকে। সূক্ষ্মাবস্থায় বুদ্ধিতে, অহঙ্কার (বুদ্ধির বৃত্তি সমূহ) ইন্দ্রিয়শক্তি, মন প্রভৃতি দেখা দিল। অর্থাৎ বৃত্তিরহিত বুদ্ধিতে যে বৃত্তিগুলি নিহিত ছিল, তাহারা দেখা দিল এবং সেই বৃত্তি-সমন্বিত বুদ্ধিতে যে পঞ্চ সূক্ষ্মভূত ও ইন্দ্রিয়াদি নিহিত ছিল, পূর্ব্ববৎ সেগুলিও দেখা দিল। কোন অবস্থাতেই নূতন কিছু হইল না। যাহা ছিল না, তাহা পরে হয়না। কার্য্য,কারণেতেই থাকে। হয় তাহা স্থূলভাবে, নয় সূক্ষ্মভাবে, নয় অব্যক্ত ভাবে,—এই ত্রিবিধাবস্থায় কার্য্য-কারণে থাকে। সাংখ্যের সঙ্গে বেদান্তের প্রভেদ এই যে, সাংখ্য বলেন যে, সৃষ্টির আদিতে বিলীন কার্য্যগুলির প্রবর্ত্তনের জন্য ঈশ্বরের অধিষ্ঠান স্বীকারের প্রয়োজন কি ? অন্তর্নিহিত ক্রিয়াশক্তি বলে ওগুলি নিয়মিত ভাবে আপনিই প্রবর্ত্তিত হইবে। বেদান্তমতে শক্তিমানই কেবল একমাত্র

কারণ। শক্তিযুক্ত হইলেই শক্তিমান কার্য্য সমূহকে প্রবর্ত্তিত করান এবং সর্ব্বদা প্রকাশিত করিতেছেন। মায়ানিহিত জীবের অদৃষ্টই, শক্তি ও শক্তিমানের যোগের হেতু। যত দিন না ভোগ হইয়া যাইতেছে, ততদিন এ মায়া বা শরীরের নিবৃত্তি হইবে না।

মাটীতে তুমি একটী বীজ রোপিত করিলে। সূর্য্যকিরণ ও শিশিরবিন্দু ঐ বীজের উপরে ক্রিয়া প্রকাশ করিতে লাগিল। বীজ হইতে ক্রমে অঙ্কুর, শাখা, পুষ্প, ফলাদি জন্মিল। বীজ মধ্যে নিহিত অসাধারণ শক্তিবশতঃই এই পত্র পুষ্পাদি হইল। সূর্য্যকিরণ ঐ গুলি জন্মিবার সাধারণ কারণ মাত্র। বীজনিহিত অসাধারণ শক্তিই বৃক্ষাদির ভেদের ও শাখা প্রশাখাদির উৎপাদনের কারণ। সূর্য্য কিরণাদিও কারণ বটে, কেন না সূর্য্যকিরণাদি না থাকিলে বীজনিহিত শক্তি, ক্রিয়া করিতেই অবসর পাইত না। শক্তির প্রসরণ হইতেই পারিত না। ঈশ্বর ও জীব সৃষ্টিতে এইরূপ কারণ। মায়ানিহিত শক্তি সমূহ হইতেই নানা জীব নানা ভাবে কার্য্য করে এবং নানা প্রকারের পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে। ঈশ্বর সূর্য্যকিরণের ন্যায় ঐ শক্তি প্রভৃতির বিকাশের কারণ। ঈশ্বর চৈতন্য না হইলে, ঐ ক্রিয়া গুলির আদৌ বিকাশ হইতে পারিত না; উহাদের উদ্ভবই হইত না। আবার ঈশ্বর চৈতন্য না হইলে বুদ্ধি বৃত্তি ও ইন্দ্রিয় শক্তি গুলির প্রকাশ বা বোধ (Consciousness)ও হইতে পারিত না। এইরূপে প্রকৃতিনিহিত ক্রিয়ার প্রধান চালক,—ঈশ্বর। ঈশ্বর, সান্নিধ্য মাত্রেই ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক ও প্রকাশক হন। জীব বাস্তবিক অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, দ্বেষ, ইন্দ্রিয়শক্তি প্রভৃতি অনুসারেই অর্থাৎ প্রকৃতি বশেই চিরদিন কার্য্য করিতেছে। সে জন্য জীব নিজেই প্রতিবিম্বরূপে ভোগ উপার্জ্জন করিতেছে এবং সেই প্রবৃত্ত্যাদি কার্য্যের জন্যও সুতরাং জীব দায়ী। ঈশ্বর সৃষ্টির আদিতে সেই প্রকৃতি নিহিত শক্তি ও কার্য্য প্রভৃতির প্রবর্ত্তন করান মাত্র এবং সর্ব্বদাই তিনি সে গুলির প্রকাশ করিতেছেন মাত্র। সুতরাং জীবকৃত কর্ম্মের জন্য তাঁহার কোন দোষ গুণ নাই। জীব নিজের নির্লেপ নিষ্ক্রিয় জ্ঞানময় স্বরূপ ভুলিয়া, প্রকৃতির প্রবৃত্তি, ক্রিয়া প্রভৃতিকে আপনার বলিয়া অভিমান করে। জীবের তাহা পরিত্যাগ না করিলে উদ্ধার নাই। প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হইবেই, ইন্দ্রিয়গুলি স্বীয় শক্তি অনুসারে চলিবেই। ব্রহ্মের তাহাতে সম্পর্ক নাই। এই ভাবে সর্ব্বদা চিন্তা আবশ্যক। এইরূপে আত্মকর্ত্তৃত্ব, প্রকৃতিতে নিহিত দেখিতে হয়। প্রকৃতির স্বাভাবিক ক্রিয়াতেই আত্মার ক্রিয়ার অভিমান হয় মাত্র। প্রকৃতির যোগ না থাকিলে, বাস্তবিক আত্মা নিষ্ক্রিয়। এইরূপে আত্মকর্তৃত্বের বিলোপ করতঃ, আত্মার ও প্রকৃতির স্বরূপ চিন্তা করিতে হয়। এইরূপ করিলে আত্মা প্রকৃতির বশীভূত হইতে পারে না। প্রকৃতির স্থূল অভিব্যক্তি ক্রমে ক্রমে ব্রহ্ম শক্তিতে বিলীন করিয়া চিন্তা করিতে হয়। এইরূপে অনুলোম ও বিলোম ভাবে কার্য্য-কারণাত্মক চিন্তাই বাস্তবিক পক্ষে শ্রুত্যুক্ত "অধ্যাত্মযোগ।" ইহা আমাদের "বিশ্লেষণ প্রণালীরই" নামান্তর মাত্র। এ কথা আমরা আর একদিন বিশদ রূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

চৌধুরীর লড়াই।

অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী ও প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ৺ আনন্দরাম বড়ুয়া যখন নোয়াখালী জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর ছিলেন, তখন একদিন মফঃস্বল যাওয়া উপলক্ষে তিনি সহরের ৭ মাইল উত্তরে একটী ক্ষুদ্র একতালা জঙ্গলাবৃত পাকা বাড়ী দেখিতে পান। তিনি গ্রামের কোন বৃদ্ধের নিকট শুনিলেন, যে উহা বাবুপুরের প্রসিদ্ধ

জমিদার বংশের বাড়ী ছিল। তাঁহারা গৃহবিবাদে লিপ্ত হইয়া জমিদারী খোয়াইয়াছেন। তাঁহাদের বৃত্তান্ত এদেশে "চৌধুরীর লড়াই" নামে গীত হইয়া থাকে।

বড়ুয়া মহোদয় বেগমগঞ্জ থানায় পৌঁছিয়া, তত্রত্য দারোগার নিকট"চৌধুরীর লড়াই" গান শুনিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। দারোগা আলাউদ্দিন নামক প্রসিদ্ধ গায়ককে আনাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের চিত্তবিনোদনার্থ গীত আরম্ভ করাইলেন। বড়ুয়া সাহেব গান শুনিয়া প্রীত হইলেন, এবং নোয়াখালীর ইতিহাসের এরূপ একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা এপর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই দেখিয়া আক্ষেপ করিলেন। পরে নোয়াখালী সদরে আসিবার সময় তিনি উক্ত গায়ককে সঙ্গে আনিলেন ও সেই গীত পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য লিপিবদ্ধ করাইলেন। ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার কাল হইল। তদবধি "চৌধুরীর লড়াই" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা দূরবর্ত্তী হইল।

সম্প্রতি মহম্মদ আবদুল জব্বর নামক একজন শিক্ষিতব্যক্তি, বড়ুয়া মহোদয়ের সংগৃহীত সেই হস্তলিপি অবলম্বনে উক্ত গীত পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই গীত এতদ্দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এতদূর সমাদৃত যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। এমন কি, ইহার মধ্যেই এই পুস্তকের প্রকাশককে জাল জুয়াচুরীর জন্য ক্রেতাগণকে সতর্ক করিয়া বিজ্ঞাপন দিতে হইয়াছে।

"চৌধুরীর লড়াই" কোন্ সময়ের ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। তবে উহার মধ্যে যে সকল ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ৮০।৯০ বৎসরের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তখনও নোয়াখালী (সুধারাম) একটী ফৌজদারী শাসন বিভাগে (১) পরিণত হয় নাই; তখন বোধহয় বরিশাল ইহার সদর (Head Quarter).) ছিল, তাহা ঢাকার অধীন ছিল। তখনও ইংরেজের শাসনপ্রণালীর এতদূর কড়াকড়ি হয় নাই, তখন এই জেলায় বাবুপুর, দত্তপাড়া, খিলপাড়া, মাইজদী প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণ খুব দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ছিলেন। ইঁহারা অনেক অনেক জাইগিরদার, লাঠিয়াল, ফৌজ, বরকন্দাজ আদি রাখিতেন ও সময়ে সময়ে পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতেন। এইরূপ একটী যুদ্ধের বিবরণ এই গীতে বর্ণিত হইয়াছে।

এই গীতের রচয়িতার নাম কি, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। গ্রন্থের কোন স্থলেই গ্রন্থকারের নাম, বাসস্থান, ব্যবসায় বা বংশাবলীর উল্লেখ নাই। তবে গ্রন্থপাঠে এ পর্য্যন্ত জানা যায় যে, তিনি একজন মুসলমান। গ্রন্থারম্ভে তিনি "নুর হাবির খোদা" আছহাব উম্মত," 'মক্কা মদিনা' প্রভৃতির বন্দনা করিয়াছেন। এই গীত যখন রচিত হইয়াছিল, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে যে আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হয় নাই, অথবা হইয়া থাকিলেও নোয়াখালির ন্যায় এই দুর্গম গহন অরণ্য মধ্যে তাহার আলোক প্রবেশ লাভ করে নাই। সুতরাং কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারতের ন্যায় এই গীত সাধারণ চলিত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। এই গীত পয়ারছন্দে রচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে নির্দ্দিষ্ট অক্ষরের সমতা প্রায়ই রক্ষিত হয় নাই। ইহা সুর করিয়া গান করিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল এবং তাহার বেশ উপযোগী। এই গীত রচয়িতা আধুনিক হিসাবে অশিক্ষিত ছিলেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু সরল, সহজ প্রচলিত ভাষায় গীত রচনা করিতে তাঁহার বেশ ক্ষমতা ছিল। এই গীতের রচনা মধ্যে

(১) হাণ্টার সাহেব বলেন, ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে সুধারামে ইংরেজদের একজন (Salt agent) লবণের কর্মচারী নিযুক্ত হন। ১৮২২ সালে এখানে একজন জয়েণ্টম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন ও সুধারামের পরিবর্ত্তে জেলার নাম নোয়াখালী হয়। ১৮৬৯ সালে নোয়াখালী একটী জেলায় পরিণত হয়।

আধুনিক শিক্ষিত কবিদিগের রচনার ন্যায় কুত্রাপি কষ্ট-কল্পনা নাই; ইহার কোন স্থান দুর্ব্বোধ্য নহে; আর স্বভাব-কবির স্বভাবসিদ্ধ একটী সহজ প্রবাহ (natural-flow) ইহার সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এই কবির উপমাগুলি, অনেক সময়ে গ্রাম্য কৃষকেরা সর্ব্বদা যে সকল ঘটনা বা বস্তু প্রত্যক্ষ করে, তাহাই অবলম্বনে কল্পিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে স্বভাব-কবির উপযুক্ত কবিত্বের সৌন্দর্য্য ছটাও দেখা যায়। আবার কোন কোন স্থানে বর্ণনা নিতান্ত হাস্যাস্পদও (ludicrous) হইয়াছে।

"চৌধুরীর লড়াই" পুস্তক সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এতদূর আদৃত হওয়ার এক প্রধান কারণ এই যে, ইহা এই অঞ্চলের প্রচলিত ভাষায় রচিত হইয়াছে। লাঙ্গলধারী কৃষক, নৌকাচালক মাঝি, মণিহারীর দোকানদার, চাকর খানশামা, কুলি মজুর পর্য্যন্ত সকলেই ইহা সুর করিয়া পড়িয়া থাকে, এবং সকলেই ইহার অর্থ বুঝিতে পারে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, কলিকাতাবাসী কোন সাহিত্য-সমালোচকের নিকট এই পুস্তক পাঠাইয়া দিলে, তিনি ইহার অধিকাংশই বুঝিতে পারিবেন না। এমন কি, আমি নিজে পূর্ব্ববঙ্গবাসী হইলেও এই নোয়াখালীর চলিত ভাষা প্রথমতঃ বুঝিতে পারিতাম না; এবং প্রায় এক বৎসর এখানে অবস্থিতির পরেও এই পুস্তকের অনেক কথা অনুবাদকের সাহায্য বিনা বুঝিতে পারি নাই। এক বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে যে এতদূর ভাষাগত পার্থক্য আছে, ইহা ভাবিলে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি কল্পে বাস্তবিকই হতাশ হইতে হয়। ৺ বড়ুয়া মহোদয় সেই বৈষম্য হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে জেলায় জেলায় প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষায় একখানি অভিধান প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। এই "চৌধুরীর লড়াই" গীতসংগ্রহও কিয়ৎ পরিমাণে তিনি সেই উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা সাহিত্যের দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তদবধি বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবীদিগের মধ্যে কেহই আর এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

প্রথমতঃ আমরা "চৌধুরীর লড়াই" গ্রন্থের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত কি, তাহা দেখিব।

এই গ্রন্থের পুরানাম "রাজ নারাণ (রাজ নারায়ণ) ও রাজচন্দ্র চৌধুরীর লড়াই। রঙ্গমালা সুন্দরীর বয়ান।" (১) পাঠকগণ অবশ্য জানেন, ব্রহ্মার সৃষ্টির আদি হইতে প্রায় সকল লড়াইয়ের মূলেই কামিনী কিম্বা কাঞ্চণ বিদ্যমান আছেন। এ লড়াইও সেই প্রথমোক্ত কারণে অর্থাৎ কামিনী লইয়া ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, "হাবির খোদা" "আছহাব উম্মত্" "মক্কা মদিনা" "রহমানের রহিম" "বিছমোল্লা" প্রভৃতির বন্দনা করিয়া ও "ইন্দ্রসভার চরণ শিরেতে বন্দিয়া" গ্রন্থকার এইরূপে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেনঃ—

"চৌধুরী ছিল রাজনারাযণ রাজ্যের অধিকারি।
সিন্দুর কাইতের (২) জঙ্গলা কাটি বান্ধিল রাজবাড়ী"
হাট মিলাল ঘাট মিলাল গল্লি (৩) সারি সারি।
প্রথম দৌলতের কালে রাজগঞ্জের কাছারি॥

এই রাজনারায়ণ চৌধুরী বাবুপুরের জমিদার "সূর্য্যবংশীয় (৪) রাজা"। তাঁহার সমান জমিদার তখন "ভাটির বাঙ্গালায়" ছিল না। গ্রন্থকার এই "ভাটির বাঙ্গলা" বলিতে কোন্ কোন্ জেলা বুঝিতেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তবে তিনি যে "পিরথিমিতে" না বলিয়া "ভাটির বাঙ্গালা" বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, এইজন্য তাঁহার ভৌগলিক জ্ঞানকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার অধীনে বার তের শত জায়গিরদার ছিল; তাহারা হুকুম পাইলেই লড়াই করিবার জন্য কোমর বাঁধিত। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কথা আর কি বলিব—

---

(১) পাঠক বয়ান অর্থে বদন বুঝিবেন না। বয়ান—বৃত্তান্ত, কেচ্ছা।

(২) সিন্দুরকাইত—গ্রামের নাম। এখানে চৌধুরীদের বাড়ী ছিল।

(৩) গল্লি = গলি।

(৪) অর্থাৎ প্রত্যেক বড় রাজা কি জমিদারকে যেন অবশ্যই সূর্য্যবংশীয় হইতে হইবে!

"যে কালের মহারাজের টাকার কিবা রাট। (১)
যার টাঙ্গনের (২) পিঠে শোভে লাল বনাতের ঠাট।"

অর্থাৎ তাঁহার ঘোড়ার পৃষ্ঠে লাল বনাতের "ঠাট" শোভা পাইত। মহারাজের রাজচন্দ্র নামে এক যুবক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন; তিনি বড় ভ্রাতার পুত্র। তাঁহার মাতা সুমিত্রা দেবী বিদ্যমান। এই কারণে তিনি এক রকম "আলালের ঘরের দুলাল" হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি একটী "রসিয়া নাগর," গৃহে রূপবতী যুবতী স্ত্রী, সোণামালা বর্ত্তমান থাকিতেও তাঁহার মন ঘরে টিকিত না। শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণবী তাঁহার "প্রেমের উকীল" ছিল। তাহার মন্ত্রণায় আলাদী নগরের আত্মারাম নড়ের (নট) কন্যা, ও গোলাপ রায়ের ভগিনী রঙ্গমালা সুন্দরীর প্রতি তাঁহার চক্ষু পড়িল। রঙ্গমালার রূপের বর্ণনায় কবি তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পিতা পঁচিশ টাকার লোভে রামগতিয়া নামক এক "কুব্জ পৃষ্ঠ ন্যুব্জ দেহ" বৃদ্ধের সহিত এই কন্যাকে ডুবাইয়া দিল। কিন্তু কন্যাটী ডুবিল না, শ্যামা বৈষ্ণবীর প্রযত্নে আবার ভাসিয়া উঠিল। রাজচন্দ্র বৈষ্ণবীর পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে ভিক্ষা (!) করিবার জন্য রূপার ঘটী (!) গড়াইয়া দিলেন। এবং তিনি পাঁচ শ টাকার অলঙ্কার গামছায় (!) বান্ধিয়া "সোণালী ধুতীর কোচা তেপেচে" করিয়া "গোলাপী চাদর" একখান কান্ধে ফেলিয়া "জরির জুতা পরিয়া, সোণা রূপার জিন, হীরায় "টাক" শোভিত "লেজ বাড়ুয়া দৈল্লা টাঙ্গনে" (৩) চড়িয়া ও "এক দমে কালীনাম হাজার বার নিয়া" রঙ্গমালার দর্শন লাভ বাসনায় গমন করিলেন। ওদিকে রঙ্গমালাও বৈষ্ণবীর "পান পড়া" ও জল পড়ার" চোটে অস্থির হইয়াছিল—

"বিষ বিষ নানে কন্যার অষ্ট অলঙ্কার।
বিষ বিষ নানে কন্যার গজমতি হার॥ (৪)

যাহা হউক, সেই পাঁচ শ টাকার অলঙ্কার পরিলে, কন্যার কিরূপ শোভা হইল, কবি তাহা বর্ণনা করিতেছেন—

"অলঙ্কার পরি কন্যা আনা (১) ধরি চায়।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন ভূমিতে উদয়॥
তাড়ল তোড়ল সব দোরা বাজু মল।
মাথার উপরে সিতীপাটি কমরে শিকল॥
সন্ধ্যাকালে ঠাকুর যেমন নামিয়া বসে পাটে।
কপালে সিন্দুর যেন পরায় নানা ঠাটে॥
সিন্দুরের বিন্দু বিন্দু কাজলের রেখা।
নবীন মেঘের আড়ে চন্দ্র দিল দেখা॥"

এই রূপে রঙ্গমালা সুন্দরীর সহিত রাজচন্দ্রের প্রণয় জন্মিল। রঙ্গমালার বাপ ও ভাই প্রথমে অনেক ওজর আপত্তি করিয়াছিল, পরে মহারাজ সবংশে কাটিয়া ফেলিবে, এই ভয়ে আর কোন কথা বলিল না। মহারাজার হুকুমে ধন গাজি মন গাজি প্রভৃতি মুল্লুকের ছৈয়ানগণ (ঘরামী) আসিয়া গোলাপ রায়ের "সাত দেউড়ী" ঘর দরজা তুলিয়া দিল। তাহার মধ্যে বালাখানা, "দালান কোটা," "জলটুঙ্গি" "ফুলটুঙ্গি" প্রভৃতি নানা রঙ্গের ঘর প্রস্তুত হইল। ঢাকা জেলা হইতে "ভিমবরগা" আনাইয়া সেই ঘরের খুঁটী (!) দেওয়া হইল ও বরিশাল হইতে কামরাঙ্গা পাটী আনিয়া তাহা চালে লাগান হইল।

রাজচন্দ্রের এই সকল কীর্ত্তিকাহিনী খুড়া রাজনারায়ণের কাণে গেল। কিন্তু তিনি এ সকল বয়সের ধর্ম্ম বলিয়া কোন কথা বলিলেন না। আর এক দিন কালাযুগী আসিয়া তাঁহার কাছে নালিশ করিল।

"কালাজুগী বলে বাবু কই তোমার ঠাঁই।
তোমার ভাইর বেটার কথা কৈতে দিবা রাত্রি নাই॥
শিকার করিতে গেল করিমন্নুর পাথরে। (২)
আমার বাড়ীতে গেল সে কিসের খাতিরে॥
গেছে গেছে রায়ত বাড়ী তারে অধিক নাই।
আমার স্ত্রীরে মারে কেবল হামইলে (৩) লটকাই॥"

ইহা শুনিয়া চৌধুরী "ভরম সভার মধ্যে

(১) রাট—ধুমধাম।
(২) টাঙ্গন—ঘোড়া।
(৩) একটা লম্বা লেজযুক্ত ধবল ঘোটক।
(৪) গজমতি হার জিনিসটা কি ও তাহার মূল্য কত, তাহা এই গ্রাম্য কবি বোধ হয় জানিতেন না। নতুবা যে গজমতি হার গলায় পরে,সে "পঁচিশ টাকার গহনা পরিয়া এতদূর উৎফুল্ল হইবে কেন?

(১) আনা—আয়না, দর্পণ।
(২) পাথর—ময়দান, মাঠ।
(৩) হামইল—তাঁতের খুঁটী।

সরম পাইল এবং চাঁদ ভাড়ালীকে হুকুম দিল—

তোরে বলি চাঁদ ভাড়ালী কই তোমার ঠাঁই।
যুগী বাড়ি তুন পিলাইয়ারে বান্ধি আন যাই॥ (১)

এখানে চাঁদ ভাড়ালীর একটু বিশেষ পরিচয় দেই। কেননা, এই নাটকে ইনি এক-জন প্রধান অভিনেতা। তিনি রাজনারায়ণের খানসামাতে খানসামা, মন্ত্রীতে মন্ত্রী, সেনাপতিতে সেনাপতি, আবার প্রাইভেট সেক্রেটরিতে প্রাইভেট সেক্রেটরি। হুকুম পাওয়া মাত্র চাঁদ ভাড়ালী চারি পাঁচ জন খোট্টা প্যায়দা লইয়া কালাজুগীর বাড়ীতে গেল ও গলায় কাপড় দিয়া বান্ধিয়া "পাগলা চৌধুরী'কে ধরিয়া আনিয়া তাহার খুড়ার কাছে হাজির করিল। বৃদ্ধ খুড়া তাহাকে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা করিলেন, কিন্তু আবার ঘোড়া কেনার জন্য পঁচিশ টাকা গণিয়া দিলেন, আর বলিলেন "খবরদার" আর কালাযুগীর বাড়ী ঘোড়া দৌড়াইতে যাইও না; আমার আগ দরজায় ঘোড়া দৌড়াও, আমি দোতালায় বসিয়া তামাসা দেখিব।" (দোতালা ছিল কি না সন্দেহ)।

কিন্তু রাজচন্দ্র তাহা শুনিবার জন্য কি দায় ঠেকিয়াছেন? তিনি পূর্ব্ব বাবুপুরের তেরশ জায়গীরদার ডাকাইয়া আনিয়া, লোক লস্কর লইয়া কালাযুগীর বাড়ীতে গিয়া ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া মজা দেখিতে লাগিলেন।

কালাজুগী আসিয়া আবার রাজনারায়ণের নিকট নালিশ করিল। রাজনারায়ণ তাহা শুনিয়া "অগ্নির হুলকা যেন গর্জ্জিয়া" উঠিলেন, ও রাজচন্দ্রের উদ্দেশে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন; এদিকে রাজচন্দ্রের মাতা সুমিত্রাও একথা জানিতে পারিয়া হুকুম দিলেন—

"তোরে বলি রাজনারায়ণ কই তোর ঠাঁই।
রাজচন্দ্রের মুখ আমি মোরে দেখাও চাই॥"

চাঁদ ভাড়ালীর কিন্তু একথা সহ্য হইল না। সে আবার অগ্নির হুলকার মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল "ছেলেটাকে কি রকমে মারিয়া ফেলিবে? ইহা শুনিয়া রাজনারায়ণের মনে মায়া জন্মিল, তিনি হুকুম দিলেন, "আচ্ছা তুমি যাও, যুগীবাড়ী হইতে তাহাকে আবার বান্ধিয়া আন।" এদিকে রাজচন্দ্র সে সংবাদ পাইয়া রঙ্গমালার বাড়ীতে গিয়া সে রাত্রি রহিল, পরদিন সকালে বেশ ভালমানুষটীর মত বাড়ীতে আসিল—যেন কিছুই ঘটে নাই। রাজনারায়ণের রাগ তখন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, তিনি কালা জুগীকে ডাকাইয়া সরকার হইতে পঁচিশ টাকা গণিয়া দিলেন। আর বলিলেন—

"আর যদি রাজচন্দ্র তোমার বাড়ী যায়।
নাক কাণ কাটি তার করি বেরি দায়।"

এইরূপে কীর্ত্তিমান রাজচন্দ্রের কীর্ত্তি-কলাপ কোন রকমে বাধা না পাইয়া ক্রমশঃ আরও বাড়িতে লাগিল। একদিন তিনি দোনালী বন্দুক লইয়া ময়দান পাথরে "পাখী শিকার করিতে গিয়াছিলেন। ইতি মধ্যে দেখিলেন, লামচর চৌধুরীর পুত্রবধূ মাই-জন্দী চৌধুরীর "মাইয়া" সোয়ারীতে চড়িয়া বাপের বাড়ী "নাইউর" করিতে যাইতেছেন। একটী গরু একখানা শ্যামল শস্য পূর্ণ ক্ষেত্র দেখিলে কি কখনও লোভ সম্বরণ করিতে পারে? রাজচন্দ্রও লোভ সম্বরণ করিতে পারিবেন কেন? তিনি লোকজন লইয়া সেই "সোয়ারী" ঘিরিলেন ও সেই কন্যার সঙ্গে সৈন্য সেনা মারি "ধাবাই" দিলেন। সেই কন্যাটীর নাম চন্দ্রকলা, তিনি বড় বুদ্ধিমতি ছিলেন। তিনি অনেক রকম সম্পর্ক দেখাইলেন; রাজচন্দ্র কিছুতেই মানেন না, তখন তিনি বলিলেন, "আচ্ছা চল তোমার বাড়ীতে যাই।" তখন রাজচন্দ্র সেই পাল্কী উঠাইতে হুকুম দিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। এদিকে চন্দ্রকলা; "কার সোয়ারী কার সোয়ারী" বলিতেই একে-বারে রাজচন্দ্রের মায়ের কাছে যাইয়া হাজির হইলেন; এবং খুব শক্ত রকম দশ কথা শুনাইয়া দিলেন—

"শুন শুন মা সুমিত্রা কই তোমার ঠাঁই।
তোমার পুত্র খানি একটী পাল কিসের লাই॥ (১)

(১) যুগীবাড়ী হইতে ছেলেটাকে বান্ধিয়া আন দেখি।

(১) লাই—লাগি।

তোমার দরজাতে মাগো জয়কালী নাই।
জয় কালীর দুয়ারে পুত্র বলি দেও যাই॥"

ইহা শুনিয়া সুমিত্রা কাঁদিতে লাগিল—

"ইহানি (২) আছিল মোর কপালে লিখন॥
আহারে কায়নালী (৩) যম লৈয়া যা মোরে।
কু পুত্র জন্মিল বুঝি আমার উদরে॥"

পরে সুমিত্রা রাগ করিয়া—

"পিছা (৪) হাতে করি তারে দৌড়াইতে লাগিল।
নড় বাড়ীর (৫) দিকে চৌধুরী উঠি লড় দিল।

তখন সুমিত্রা চন্দ্রকলার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন; কিন্তু সেই তেজস্বিনী রমণী সেখানে পানটীও খাইলেন না, কারণ রাজচন্দ্র নড়ের বাড়ী খায়, তাহার জাতি গিয়াছে। পরে সুমিত্রা তাঁহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। চন্দ্রকলা মায়ের নিকট কাঁদিয়া সকল কথা কহিলেন। মা ভয়ানক রাগিয়া গেলেন ও শ্রীধর চৌধুরীকে জানাইলেন। তিনি "রাজচন্দ্র চৌধুরীকে বাঁধিয়া আনিব" ও "তাহার সোণার নগর অনলে দহিব" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া টান দিয়া "চিনের কাগজ" বাহির করিলেন ও দেশে বিদেশে যুদ্ধ সজ্জা করিবার জন্য জমিদারদিগকে লিখিলেন। তাহার হুকুম মতে "তেরশ জায়গীরদার কমর বান্ধিল" ও "লাখে লাখে সৈন্য" আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু যুদ্ধ বাধিল না। ইহার "তেলেছ মত (১)" যখন পুরোহিত ঠাকুর শুনিলেন, তখন তিনি আসিয়া শ্রীধরকে বলিলেন—

"কি সর্ব্বনাশ! তুমি কর কি?

"আবুঝীয়া (২) চৌধুরী তোমার কিছু বুদ্ধি নাই॥
মতে মতে (৩) সৈন্য তুমি সাজাও কিসের লাই॥
তেরশ সৈন্য যাও যুদ্ধ করিবারে।
বারশ জাগির্দ্দার আছে তার আগদরজার পরে॥
তেরশত সৈন্য তোমার ফালাবে কাটিয়া।
কাইল বেয়ানে (৪) তোমার বাটী নিবেবে লুটিয়া॥
চান্দা বড় বীর ভাই চান্দা বড় বীর।
একলা চান্দা কাটে নয়শ মানুষের শির॥"

এইরূপে পুরোহিত ঠাকুরের পরামর্শে যুদ্ধ থামিয়া গেল। তাঁহারই পরামর্শে দেশ বিদেশে পত্র পাঠাইয়া "রাজচন্দ্রের গো" জাতি নাশ করিয়া একঘরিয়া করা হইল, ও পূজা বন্ধ হইল। কিন্তু ইহাতে তাহাদের যে বড় কিছু ক্ষতি, কি মনঃকষ্ট, কি অসুবিধা হইয়াছিল, তাহা গ্রন্থকার লেখেন নাই।

শ্রীবতীন্দ্রমোহন সিংহ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৯। পীরখাঁ নাজির। বগুড়া চৌধুরী প্রেস, দাম চার পয়সা। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে পদ্যে পীরখাঁর অত্যাচার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। লেখক এক স্থানে এই উদার কথাটী লিখিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

"একটী কথা বলবো হেথা, হিন্দু সমাজের প্রতি।
দয়া করে বুঝাও মোরে, ওগো সমাজ-পতি।
সরলপ্রাণা, যত ললনা, তাদের কিবা দোষ।
পাপীর সাজা দিতে নার তাকেই এত রোষ?
লজ্জাশীলা, কত মহিলা, পাপীর অত্যাচারে।
মনের আগুন, জলছে দ্বিগুণ, বধ আবার তারে।
এক ঘরে ক'রে তারে, ভাসাও একাকিনী।
কি বিড়ম্বনা, ঘোর লাঞ্ছনা, আহা অনাথিনি!
দারুণ শঠ, ঘোর লম্পট, পুরুষ ত্রাণ পায়।
আর অসহায়া নারীর বেলা, কঠোর বিধি হায়!

১০। স্মৃতি-মন্দির। উপন্যাস। শ্রীকেদারেশ্বর সেন, বি-এ প্রণীত, মূল্য ১৷০। হরিনাথ এবং সর্ব্বাণীর চিত্র এই গ্রন্থে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। সেবা পরম সাধন, সেবা পরম ধর্ম্ম, হরিনাথের জীবনে এই সেবা-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবে প্রস্ফুট হইয়াছে। গ্রন্থকার সাহিত্য-সংসারে নূতন প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল

---

(২) ইহানি—ইহা নাকি।
(৩) কায়নালী—কাল। (৪) পিছা—ঝাড়ুন ঝাঁটা।
(৫) নড়বাড়ী—রঙ্গমালার বাড়ী।

(১) তেলেছমত—বৃত্তান্ত।
(২) আবুঝীয়া—নির্ব্বোধ। (৩) মতে মতে—চুপে চুপে।
(৪) বেয়ানে—প্রাতে।

এবং মধুর। সামান্য সামান্য যে সকল ত্রুটী আছে, তাহা কালে সংশোধিত হইলে, লেখক চরিত্র অঙ্কনে বিশেষ দক্ষ হইবেন, আশা করি।

১১। অঞ্জলি। বেঙ্গল প্রেস, ২০ নং মদনমিত্রের লেন। গ্রন্থকারের নাম নাই। নিরাশ প্রণয়ের উচ্ছ্বাস। পুস্তকের ছাপা ভাল। লেখা বেশ সরল এবং মিষ্ট। কিন্তু এরূপ গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য কি? পড়িয়া কাহারও উপকার হইবে, সে আশা নাই। হৃদয়ের সকল অসংযত উচ্ছ্বাস কি জগৎকে দেখাইতে আছে?

১২। লিপি-বিজ্ঞান। শ্রীবিশ্বেশ্বর সেন গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ✓১০, ভারতমিহির যন্ত্র। পরিষ্কার ছাপা, উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু লিপি-বিজ্ঞানের উপদেশ সকল কে পাঠ করিবে? শিক্ষক না ছাত্র? লেখকের ইচ্ছা, যাহারা "ক, খ," পড়িবে, তাহারা। "দোয়াতটী ডানদিকে রাখিয়া তালপত্র, কদলি পত্র বা কাগজ যাহাতে লিখিতে হইবে, তাহা সম্মুখে রাখিবে।" ইত্যাদি কথা বর্ণজ্ঞানবিহীন বালকেরা কিরূপে বুঝিবে? উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও, বুদ্ধির তারতম্যে অনেক কাজ ভালরূপে সম্পন্ন হয় না; এ কথার দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থ।

১৩। অমিয় কবিতা। ঐ গ্রন্থকার, ঐ প্রেস, মূল্য ✓০। তৃতীয় সংস্করণ। মোটের উপর এ পুস্তকখানি স্কুলপাঠ্য হওয়ার উপযোগী হইয়াছে।

১৪। Report of the Chaitanya Librrary, 1898 99. এই লাইব্রেরি বাঙ্গালীর একটী অক্ষয়কীর্ত্তি। উৎসাহী সম্পাদক বাবু গৌরহরি সেনের কর্ত্তব্যপরায়ণতায় এই পুস্তকালয়টীর দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পুস্তক সংখ্যা ৪৭০৩, বাঙ্গালা ২৭৯৩,ইংরাজি ১৯১০। পূর্ব্বের স্থিত সহ মোট আয় ৩৫৬৫৸৶১৫,ব্যয় ৯৭১/৫; স্থিত ২৫৯৪৸৶১০। কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে এইরূপ লাইব্রেরি হইলে কলিকাতার অপূর্ব্ব শ্রী হইবে।

১৫। The Third Annual Report of the Ram Mohan Ray Seminary, Bankipur, 1890-91 সাধারণতঃ আমাদের দেশে আদর্শ বিদ্যালয় অতি অল্প আছে। চরিত্র গঠনের জন্য অতি অল্প স্কুলেই চেষ্টা করা হইয়া থাকে। ব্যবসার খাতিরে কঠোর শাসন প্রথা উঠিয়া যাইতেছে বলিলেই হয়; পাছে ছাত্রেরা স্কুল পরিত্যাগ করে,এই ভয়ে ছাত্রদের সকল দোষ উপেক্ষিত হইতেছে; দুর্নীতে দিন দিন ছাত্রগণ ডুবিয়া যাইতেছে। রামমোহন রায় সেমিনারি এরূপ স্কুল নয়। আমরা জানি, অনেক খারাপ ছেলে এখানে ভাল হইয়াছে। শিক্ষকগণ সুনীতিপরায়ণ, চরিত্রবান ব্যক্তি—আপন আপন স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া এই স্কুলের উন্নতির জন্য অম্লান চিত্তে পরিশ্রম করিতেছেন। দুঃখের বিষয়, ছাত্র সংখ্যা আজও ৩১৫ জনের অধিক হয় নাই। এজন্য স্কুলের খুব অর্থাভাব। এই আদর্শ বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য সকল সহৃদয় ব্যক্তির মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। স্কুলের সম্পাদক বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী একজন আদর্শ ব্যক্তি।

১৬। The Report of the Calcutta Orphanage for the year 1899. কলিকাতায় যত ভাল কাজ হইতেছে, তন্মধ্যে অনাথাশ্রম অন্যতম। বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, বিধাতার আদেশে, অতি সামান্যভাবে এই কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিধাতার কৃপায়, দিন দিন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত হইতেছে, দিন দিন আশ্রমের উন্নতি হইতেছে। গত বৎসর বালিকা ২০, বালক ৩২, মোট ৫২জন আশ্রমে ছিল। সমস্ত বৎসরের গড় সংখ্যা ৪৬। গতবর্ষের আয় স্থিত সহ ৭৬০৭৷৶৫ পাই,ব্যয় ৩৮৫৮৷৶৫। গড়ে প্রতি জনের প্রতি মাসে ৬/১০। স্থিত ৩৭৪৯৶। সৎকার্য্যের সহায় ভগবান, এই আশ্রমটী এই কথার জীবন্ত সাক্ষ্য দিতে বিদ্যমান। আজকাল অনেক বড় বড় লোক ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন, কিন্তু আদিতে প্রাণকৃষ্ণকে কত কষ্টই পাইতে হইয়াছিল! প্রাণকৃষ্ণের এই পুণ্য কীর্ত্তি অক্ষয় হউক।

ঋগ্বেদসংহিতা ও ব্রহ্মসঙ্গীত।

ইতি[illegible]মাত্রেই বিদিত আছেন যে, আমাদের অতি প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষ বৈদিক ঋষিগণ অগ্নি, সূর্য্য, বরুণ ও ইন্দ্র প্রভৃতি প্রাকৃতিক দেবগণের উপাসক ছিলেন। ঋগ্বেদের সংহিতা অংশে এই সকল দৃশ্য অকল্পিত মনোহর দেবগণের স্তোত্রাবলী সঙ্কলিত হইয়াছে। আমরা এই স্তোত্রাবলীরূপ স্বচ্ছ মুকুরে তাৎকালিক আর্য্য ঋষিগণের হৃদয় ও মস্তিষ্ক সুস্পষ্ট প্রতিফলিত দেখিতে পাই। কোনও বৈদিক ঋষি "দ্বয়াবিনঃ" হইতে রক্ষাহেতু ব্রহ্মণস্পতি নামক বৈদিক দেবতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। (ঋগ্বেদসংহিতা, ২য় মণ্ডল, ২৩ সূক্ত, ৫ ঋক্।) ঐ ঋকের সায়ণ ভাষ্যে "দ্বযাবিনঃ' শব্দের এই অর্থ লিখিত আছে; 'মনস্যন্যৎ, ক্রিয়ায়াং চান্যৎ, ইত্যেতৎ দ্বয়ং যেষামস্তি তে দ্বয়াবিনঃ, অর্থাৎ বঞ্চকাঃ"। সুতরাং কখনই এ প্রকার কল্পনা করিতে পারা যায় না যে, বৈদিক ঋষিগণ স্বয়ংই আমাদিগের সহিত বঞ্চকতা করিয়াছেন। এই সকল স্তোত্র তাঁহাদের শুভ্র মানসের সরল বিশ্বাস হইতে উদ্ভূত, স্বাভাবিক প্রার্থনা, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারে পরিপূর্ণ।

এই অসীম বিশ্বমধ্যে তাবৎ পদার্থ ও ঘটনাই সেই ঋষিগণের মনে অলৌকিক বিস্ময় ও ভয় উৎপাদন করিত এবং তাঁহারা তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী বা অভিমানিনী দেবতা কল্পনা করিতে স্বভাবতঃ উদ্যত হইতেন। এই জন্যই আমরা ভারত-ইতিহাসের সেই অতীত পুরাতন পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিলে দেখিতে পাই যে, মেঘ, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টির ইন্দ্র, অগ্নির হুতাশন বা হুতবহ, দিবাভাগের মিত্র, নিশাভাগের বরুণ, নিশা-শেষাংশের অশ্বিনৌ, প্রাতঃকালের উষা, সূর্য্যের সবিতা, অনিলের বায়ু ও ঝঞ্ঝাবাতের মরুদ্গণ দেবতা। প্রথমতঃ ঋষিগণ বহির্জগতের এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ দেবদেবী কল্পনা করিয়া পরে অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই, ব্রহ্মণস্পতি, বাচস্পতি, বাস্তোস্পতি, গণপতি প্রভৃতি দেবগণের নাম শুনা যায়। যেমন পৌরাণিক যুগে কৃষ্ণাষ্টমী, রামনবমী, অনন্তচতুর্দ্দশী ও শিবরাত্রি ইত্যাদি প্রত্যেক ব্রত সম্বন্ধেই 'ইদং ব্রতানাং উত্তমং ব্রতম্' ইহাই সকলব্রতের মধ্যে উত্তম ব্রত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, বৈদিক দেবগণ সম্বন্ধে তদ্রূপ দেখা যায়। ঋষিগণ যে কোনও দেবতার স্তুতি আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাকেই সকল দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদবী প্রদান করিয়াছেন। বৈদিক কালের এইরূপ অসামঞ্জস্য দর্শনে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। কেননা, তাঁহাদের প্রত্যেক দেবমধ্যেই, আমরা সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব, জগৎপালকত্ব প্রভৃতি ঈশ্বরের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ সমূহ দেখিতে পাই। প্রকৃত পক্ষে এই ঈশ্বরীয় মহান্ ভাবটী তাঁহাদের বহু দেবদেবীর অস্তিত্বের মেরুদণ্ডস্বরূপ। ইহাই তাঁহাদের দেবতত্ত্বে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় প্রবাহিতা। ইহাই বৈদিক দেবপুঞ্জরূপ Algebraic expression এর Common factor; আমরা ইহাকেই সেই প্রাচ্যতম বহু দেববাদের মধ্যে প্রতীচ্যকালীন উপ-

নিষৎ কথিত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মহাবাণীর নিগূঢবীজ বলিয়া নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারি।

আমার বিশ্বাস, বৈদিক ঋষিগণ, প্রথমে জড় ও চেতন পদার্থদ্বয়ের পার্থক্য রেখা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, সূর্য্য, অগ্নি, মেঘ, বায়ু প্রভৃতিকে সজীব, সচেতন, বহু শক্তি দেব বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন; পরে উঁহাদিগকে অচেতন বলিয়া জানিতে পারিয়াও সহসা পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিতে সাহসী হন নাই—ঐ সকল নামে উঁহাদের অভিমানিনী বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিয়াছিলেন। পরিশেষে এতাদৃশী ব্যষ্টি উপাসনাতে অতৃপ্ত হইয়া, তাঁহাদের মধ্যে অনেক মহর্ষিই ক্রমশঃ পূর্ণ একেশ্বরবাদে উপনীত হইয়াছিলেন।

যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই এ কথা বলিতে সাহসী হইবেন না যে, হিন্দুধর্ম্মের শৈশবাবস্থা ঋগ্বেদ-সংহিতার কাল হইতে এ সময় পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে কোনও পরিবর্ত্তন বা সংস্কার সংসাধিত হয় নাই। এ কথা যদি সত্য হয় যে, হিন্দুধর্ম্মের সনাতনত্ব ইহার অপরিবর্ত্তনীয়ত্ব বা সংস্কার-বিহীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইলে এখন আমরা দেখিতে পাইতাম যে, গণেশ ও কালী, হনুমান ও রামচন্দ্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা, কার্ত্তিক ও জগদ্ধাত্রী, শিব ও কৃষ্ণ, দুর্গা ও রাধিকা প্রভৃতি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা তান্ত্রিক দেবদেবীর মিশ্রীকৃত পূজাবাহুল্যের পরিবর্ত্তে কেবল অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, দ্যৌস্, দ্যৌসপতিস্ত্রৌ, বায়ু ও বরুণ প্রভৃতি বৈদিক তেত্রিশকোটী দেবতার অর্চ্চনায় ভারত ব্যস্ত রহিয়াছে। তাহা হইলে ইঁহাদেরই সরল স্তুতি-গীতিতে ভারতাকাশ নিনাদিত হইত। ভারতসমীরণ এই সকল দেবতার উদ্দেশে আবর্জ্জিত সমিধ-প্রদীপ্ত বহ্নি সম্ভূত পূতহবির্গন্ধ সর্ব্বত্র বহন করিত, এবং উদাত্ত, অনুদাত্ত স্বরিত স্বরে গীত সুমধুর সাম-সঙ্গীতে মুখরিত অগ্নিগৃহ প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে সুরক্ষিত হইত। যদি হিন্দু ধর্ম্মকে সংস্কারগ্রহ বলিয়াই তোমার বিবেচনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে দ্বিজ-সন্তানগণ গায়ত্রীগ্রহণরূপ বৈদিকী দীক্ষাতেই নিশ্চিন্ত রহিতেন এবং তুমি তান্ত্রিকী দীক্ষার নামই শুনিতে পাইতে না। সংস্কার বা বিকাশসূত্রে ঋক্‌সংহিতার সময়ের পর হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে নূতন কিছু প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া যদি তোমার প্রতীতি না জন্মে, তাহা হইলে, বল দেখি, দুরাশা সমূহে পরিপূর্ণ উদ্ধত যুবক হৃদয়ের ন্যায় অধুনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রত্যেক ধমনী মধ্যে কোথা হইতে অবতারবাদ আসিল?

এখন, যদি পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনই হিন্দুধর্ম্মের বিপুলশরীর গঠিত করিয়াছে, তবে ইহার সনাতনত্ব কোথায়? আমাদের হিন্দুধর্ম্ম সনাতন বলিয়া আমরা যে গলাবাজি করি, তাহার মূল ভিত্তি কৈ? যদি হিন্দুধর্ম্ম বুদ্ধ, খ্রীষ্ট বা মহম্মদ প্রভৃতির ন্যায় মহাজন বিশেষের, কিম্বা দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ বা অবতারবাদ প্রভৃতির ন্যায় মত বিশেষের উপর নির্ভর করিত, তবে হিন্দুধর্ম্ম সনাতন হইতে পারিত না, কিন্তু ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই ধর্ম্ম মানব প্রকৃতির অন্তস্তলে নিহিত এবং মানব প্রকৃতি সনাতনী বলিয়া ইহাও সনাতন। মানব-প্রকৃতিতে গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন যীশু খ্রীষ্ট বলিয়াছেন:—

"Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." [St. Mathew iv 4]

এখানে অন্ন (Bread) শব্দটীকে সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিলে চলিবে না। ইহার বিশালতর অর্থ পরিগ্রহ করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, বিপুল যশঃ, অতুল সম্পত্তি, সুস্বাদু আহার্য্য, সুগন্ধি দ্রব্য, সুন্দররূপ প্রভৃতি মর্ত্ত্য ঐন্দ্রিয়িক সুখরাশিতে মনুষ্য পরিবেষ্টিত থাকিলেও, তাহার জীবন অকৃতকার্য্য ও অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। বস্তুতঃ এই সকল মনুষ্যাত্মার প্রকৃত সুখের উপকরণ নহে, তাহার আনুষঙ্গিকমাত্র। যদি মনুষ্য উদরপূর্ত্তিকে জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত, তাহা হইলে, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় মনুষ্য নামধেয় দ্বিপদ জন্তু যেরূপ বর্ব্বর দশায় ছিল, বর্ত্তমান সময়েও সেইরূপ থাকিত। কিন্তু অশেষ তাপে তপ্যমান জীবনকে সুবহ করিতে হইলে কেবল অন্নরাশি যথেষ্ট নহে, তাহা হইলে চাই সহানুভূতি, দয়া, স্নেহ ও বিশুদ্ধ উচ্চাভিলাষ। ইহাদের জন্যই মানব মন লালায়িত। ইহাদিগকে একটি কথায় প্রকাশ করিতে হইলে, প্রেম বা ভালবাসা ভিন্ন অপর কোনও শব্দ মনে আইসে না। ঈশ্বরপ্রেমই ভালবাসার পরাকাষ্ঠা এবং ইহাই যীশুখ্রীষ্টের পূর্ব্ব উদ্ধৃত মহাবাক্যের (Word of God) প্রত্যেক হৃদয়ই এই স্বর্গীয় অনল পোষণ করিতেছে। এই যে অসভ্য জাতিরা কোন একটী বৃক্ষকে সিন্দুররঞ্জিত ও ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধশাখ করিয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিতেছে, ইহাই তাহাদের ঈশ্বর-প্রেমের নিদর্শন, ইহাকে উপেক্ষা করিও না, ইংলণ্ডীয় কবির কথা মনে কর, "Child is the Father of Man." এই অসভ্যেরা (আমরা সভ্য কি না, তাই, উহাদিগকে পৃথক্ করিবার জন্য এই মধুর সম্ভাষণ) কেবল আমপিশিতের উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহাদের সমীপে (Word of God) এই ভাবে প্রকাশিত। উহারা এই প্রকারেই ঈশ্বরকে প্রেম করিয়া তৃপ্ত। কালক্রমে আধ্যাত্মিকী ক্ষুধা বর্দ্ধিত হইলে উহাদের ধর্ম্ম ও বিশ্বাস অন্যবিধ আকার ধারণ করিবে।

যীশুখ্রীষ্টের কথা চিরসত্য বলিয়াই, আমরা মহর্ষিগণকে বেদের রচয়িতা দেখিতে পাইতেছি। যখন এই সকল মহর্ষিগণ সপ্তসিন্ধু প্রদেশে (নব্য পঞ্জাবে) বেদ গান করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা শাক্ত কি বৈষ্ণব, শৈব কি সৌর ছিলেন, এ প্রশ্ন শ্রীমান্ বাসুদেবানুগৃহীত ব্যক্তিবর্গের মুখেই শোভা পায়, অথবা "আমাদের পূর্ব্বপুরুষাচরিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেছি," এই ভাবিয়া যাহারা ফোঁটাতিলক শিখায় স্ব স্ব দেহ ভূষিত করিয়া স্ফীত বক্ষে বিচরণ করেন, এবং ইংরেজ-ঘেঁসা নব্যতন্ত্রের হিন্দুর ছায়াস্পর্শে ভাগীরথী-সলিলে তিনবার অবগাহন করিয়াও স্বীয় আত্মা ও শরীরের পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দিহান থাকেন, (অর্থাৎ তাঁহাদের গঙ্গাভক্তি অতিপ্রবলা কি না, এজন্য) তাঁহাদেরই হস্তে এ কূট প্রশ্ন মীমাংসার ভার অর্পণ করিলাম। যাহা হউক, আমি দেখিতেছি যে, এই বৈদিক মহর্ষিগণ আপনাদিগকে হিন্দু সংজ্ঞায় পরিচয় দেন নাই। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে রাধা বা রাধিকা শব্দের ন্যায় সুবিস্তৃত সংস্কৃত ভাষায় "হিন্দু" শব্দটি নাই, ইহা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয়। তবে দুই এক খানি পুরাণ ও তন্ত্রে "হিন্দু" শব্দের উল্লেখ আছে, কিন্তু ইহারা এত আধুনিক যে,

এই সকল শাস্ত্রে "ইংলণ্ডদেশোদ্ভব ইংরাজগণ ভারত শাসন করিবেন," এই ভবিষ্যদ্বাণী (?) পরিদৃষ্ট হয়। একখানি সংস্কৃত অভিধান "হীনান্ দূষয়তি ইতি হিন্দু নিপাতন সিদ্ধঃ" অর্থাৎ "হীন জনকে দোষ দেয় অতএব হিন্দু, এই শব্দটী নিপাতন সিদ্ধ" এইরূপে হিন্দুশব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন [শব্দকল্পদ্রুমঃ]। আশা করি, বুদ্ধিমান্ পাঠক হিন্দুশব্দ উল্লেখকারী শাস্ত্রকে প্রামাণ্য জ্ঞান করা দুরূহ জ্ঞান করিবেন। আমি কথিত অভিধানের মত পণ্ডিতী ফলাইয়া "হিন্দুকে একেবারে "নিপাত' করিতে নিতান্ত মর্ম্ম বেদনা অনুভব করি। অনেকে 'হিন্দু' শব্দটীকে 'সিন্ধু' শব্দের যাবনিক অপভ্রংশ জ্ঞান করেন। প্রাচীদিক্ অভিমুখীন যাত্রী আর্য্যংশের একভাগ সিন্ধুতীরে প্রথম বসতি করিয়াছিলেন বলিয়া পরবর্ত্তী কালে তাঁহারা হিন্দুনামে অভিহিত হন। সংস্কৃত 'সিন্ধু' শব্দটী প্রাকৃতভাষায় 'হিন্দু'তে পরিণত হইতে পারে কি না, এ বিষয়ে প্রাকৃততত্ত্ববিদ্‌গণের মনোযোগ প্রার্থনা করি, কারণ, তাহা হইলে আর আমাদিগকে যবন-ভ্রাতৃগণের ভাষা আশ্রয় করিতে হয় না। (১)

আজকাল যেরূপ ঘরে বাহিরে নিষ্কাম ধর্ম্মের ধ্বজা উড়িতেছে, তাহাতে আমরা বৈদিক মহর্ষিবৃন্দের নিকট হইতে অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারি।

---

(১) মাননীয়া শ্রীমতী সরলা দেবী বি, এ, ভারতীতে (১৩০৬, জ্যৈষ্ঠ) "হিন্দু" ও "নিগর" শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থলে লিখিয়াছেন, "অনেকেরই ধারণা এই যে, পারসীক "হিন্দু' শব্দ সংস্কৃত "সিন্দু" শব্দের রূপান্তর মাত্র। * * * পারস্য ভাষার সহিত কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় থাকিলে এ ধারণা টিকে না। "হিন্দু" শব্দ সংস্কৃত সিন্দু শব্দ হইতে উৎপন্ন নহে, উহা একটি প্রাচীন পারসীক শব্দ, উহার অর্থ কৃষ্ণ, কাল। * * * ইরাণীদিগের জেন্দাবস্থনামক যে প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ বেদের সমসাময়িক, তাহাতে হিন্দু শব্দ একবার উল্লিখিত হইয়াছে।" লেখিকা মহোদয়া "হিন্দু" শব্দের কৃষ্ণার্থ দৃঢ় রাখিবার জন্য বলিতেছেন, "পারস্য বণিক্‌গণ যখন সমৃদ্ধ ভারতে পণ্য দ্রব্য লইয়া যাতায়াত করিত, কিম্বা মোগল পাঠানেরা যখন ভারত জয় করিল, তখন তাহারা আমাদের নামকরণ করিয়া থাকিবে 'হিন্দু' অর্থাৎ তাহাদের তুলনায় কৃষ্ণকায়। গোরা সাহেবের তুলনায় আমরা এখন কালা আদমি, গৌর মধ্য এসিয়া নিবাসীগণের তুলনায় আমরাও সে দিন হিন্দু অর্থাৎ কাল অর্থাৎ কালা আদমি ছিলাম।"

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, বেদ গ্রন্থ রচনা সময়ে 'হিন্দু' শব্দের প্রচলন দেখা যাইতেছে এবং পাঠান ও মোগল কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ-বিজয়ের বহু পূর্ব্বে বিদেশীয় ইতিহাসে ইহা হিন্দুস্থান নামে বিখ্যাত। সেই প্রাচীন বৈদিক সময়ে, পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে সদ্য আগত আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ গৌরকায় ছিলেন। তাঁহারা অনেক সময়ে ভারতের আদিম নিবাসী কৃষ্ণকায়গণের বিনাশের জন্য দেবগণ সমীপে প্রার্থনা করিতেন। [ঋগ্বেদ সংহিতা] সুতরাং হিন্দু ও কৃষ্ণ এই দুই শব্দের পরস্পর বিরোধ সূচক অর্থই লক্ষিত হইতেছে।

লেখিকা পুনশ্চ লিখিতেছেন "নিগার বা নিগ্রোর অর্থ সেই এক, উহা লাটিন নিজর হইতে উৎপন্ন, ইহার মৌলিক অর্থ কৃষ্ণ, কাল, আধুনিক অর্থ অসভ্য দাস। পারস্য ভাষায় হিন্দু শব্দের একটি অর্থ দাস। আমাদের "দেব" বা পারসীকদের দৈত্য, আমাদের "অসুর" তাহাদের পূজ্য। অনেক বিষয়েই তাহাদের সহিত আমাদের চিরবিরোধ। সুতরাং যুদ্ধে বন্দী হইলে আমরা হিন্দুরা অর্থাৎ কৃষ্ণকায় মনুষ্যেরা তাহাদের দাস হইতাম। সেই জন্য হিন্দু শব্দ ক্রমশঃ দাসার্থ বোধক হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং সাহেব আমাদের হিন্দু না বলিয়া নিগর বলিয়া সম্বোধন করিলে কোনও ক্রমে অত্যুক্তি হয় না।"

এই অংশ পাঠ করিয়া আমি একবার ভাবিয়াছিলাম, লেখিকা মহাশয়া বুঝি পরিহাস করিতেছেন।

শ্রদ্ধাও ভক্তির সহিত নমস্কারপূর্ব্বক কি ক্ষুদ্র কি মহান্, কি ব্যক্তিগত কি পরিবারগত যে কোনও অভাব উপস্থিত হউক না কেন, তাঁহারা তাহা (২) তাঁহাদের বিশ্বাসের দেবগণ সমীপে আবেদন করিতেন এবং সেই দেবগণের প্রিয় হইবার জন্য সোম ও হোমের ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকট দুর্ভিক্ষ আশঙ্কায় বৃষ্টি প্রার্থনা করিতেন, কৃষ্ণ অনার্য্য রাক্ষসগণের সহিত সমরে বিজয় যাক্ষা করিতেন, ধন, গো, অশ্ব, পুত্র প্রার্থনা তাঁহাদের রসনার নিত্য বুলি ছিল। এই দেব-বিশ্বাস কেমন স্বাভাবিক, সরল ও সুন্দর! আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষা করিবার জন্য, রোগ-শোক বিপদ ভয় হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য, দৈনিক আহার্য্য সংস্থান করিবার জন্য অদৃশ্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা সহজে আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। আমি একথা বলিতেছি না যে, নিষ্কাম ধর্ম্মযাজন শশশৃঙ্গবৎ একেবারেই অসম্ভব। যদিও গীতায় এই নিষ্কাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা হইয়াছে এবং এই ধর্ম্ম আদর্শে অনেক জীবন পরিচালিত হইয়াছে, তথাপি বৈদিক ঋষিগণের ন্যায় সকাম পন্থানুসরণ করা আমাদের অধিকতর প্রকৃতিসঙ্গত। কামনা বিনাশ নহে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল কামনারাশি দমিত করিয়া ভগবানের মহতী কামনার অনুগত করাই যদি নিষ্কাম ধর্ম্মের অন্যতম সংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে "Thy will be done" এই কথাটি নিষ্কাম ধর্ম্মের চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

কিন্তু সমগ্র প্রবন্ধটির গুরুগম্ভীর "চাল" দেখিয়া সে ধারণা তিরোহিত হইয়াছে। ঋগ্বেদসংহিতায় দেবগণকে পুনঃ পুনঃ অসুর শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। "অস্যতি শত্রূন্ ইতি শেষঃ' বেদে এই অর্থে দেবগণকে অসুর বলা হইয়াছে। বৈদিক "অসুর" ও পারসীক "অহর" একই জিনিষ। হিন্দু শব্দের প্রথম প্রচলন কালে, সেই বৈদিক সময়ে, হিন্দু ও পারসীকগণের মধ্যে "চিরবিরোধ" ছিল না, প্রত্যুত বহুবিষয়ে ইহাদের ঐক্য ছিল [ম্যাক্সমুলর, হিবার্ট্ লেক্চর্।]

লেখিকা এই প্রবন্ধের এক স্থলে বৈয়াকরণগণকে আক্রমণ করিয়াছেন, "এই সকল তথ্য পর্য্যালোচনা করিয়া আমার বোধ হয় আর্য্যেরা যখন বিভক্ত হন নাই, যখন পারসীক ও প্রাচীন হিন্দুগণের পূর্ব্বপুরুষেরা একত্রে মধ্য এসিয়ায় অবস্থান করিতেন, তখন তাঁহাদের সাধারণ ভাষায় কৃষ্ণার্থবোধক একটি শব্দ ছিল, যাহা হইতে হিন্দু ও সিন্ধু দুইই উৎপন্ন এবং দুয়েরই মৌলিক অর্থ কৃষ্ণ। বহু পরবর্ত্তী বৈয়াকরণিকেরা এই মূল অর্থ অব্যবহারে বিস্মৃত হইয়া, স্যন্দ্ ধাতুর উত্তর ঔণাদিক উ প্রত্যয় করিয়া, কোনরূপে জোড়াতাড়া দিয়া সমুদ্রার্থবোধক সিন্ধুশব্দ যে নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের একটি কারিগরিমাত্র। অধুনা সমুদ্র যেমন ভাষায় "কালাপাণি" সে দিনও উহা তদ্রূপ "ভাষায়" 'সিন্ধু' অথবা কাল অথবা কালাপাণি ছিল।"

সিন্ধুনদীকে পারসীকেরা উচ্চারণ দোষে হিন্দু বলিত এবং ক্রমে ঐ নদীতীরবাসীর নাম হইল হিন্দু। এ কথা স্বীকার করিলে আর এত কষ্ট কল্পনা করিতে হয় না। বৈদিক "সপ্ত সিন্ধবঃ" এবং অহরমস্দের "হপ্ত হিন্দব' সমার্থক, লেখিকা ইহা স্বীকার করিয়াছেন, ইহা আমাদের পূর্ব্ব কথিত ধারণার অনেকটা অনুকূল।

এই সকল তথ্য পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য যে, তদীয় "হিন্দু ও নিগর' প্রবন্ধে কবি কল্পনার যত সমাবেশ, ঐতিহাসিক সত্যের তত নহে।

(২) হিন্দুগণের, বিশ্বাস বেদ অপৌরুষেয়, ঋষিগণ মন্ত্র দ্রষ্টা মাত্র, মন্ত্রস্রষ্টা নহেন। ঋগ্বেদসংহিতা, ৩ম, ৭৩, ১০; ৭ম ৬১, ২; ৭ম ৮১, ৬; ৭ম, ৯৪,১ প্রভৃতি ঋকগুলি পাঠ করিলে এ ভ্রান্ত বিশ্বাস দূরীভূত হইবে।

এই পবিত্র মহাকথাটি যাঁহার মুখনিঃসৃত, তাঁহারই মুখ হইতে, বৈদিক কালের বহু সহস্র বৎসর পরে, "Ask and it shall be given" এই উপদেশ উচ্চারিত ও উদ্ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাই এই বৈদিক ঋষি জীবনের মূলমন্ত্র ছিল বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

ঋগ্বেদের সংহিতাংশ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। লৌকিক প্রসিদ্ধি এই, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ নামধেয় গ্রন্থকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন, প্রত্যেকের নাম ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ। এই জন্য ইনি বেদব্যাস নামে বিখ্যাত। কিন্তু এরূপ কল্পনা করিবার যথেষ্ট হেতু আছে যে, সমগ্র বেদ শ্রুতিগোচর করিয়া মস্তিষ্ক মধ্যে ধারণা জনসাধারণের পক্ষে দুঃসাধ্য কার্য্য বলিয়া ইহা প্রথমতঃ ঋক্, যজুঃ, সামাখ্য তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, এজন্য বেদের নামান্তর ত্রয়ী। পরে অথর্ব্ববেদের মন্ত্রাদি সংগ্রহণ ও প্রণয়ন করিয়া ইহাতে সংযোজিত করিয়া দেওয়া হয়। বেদের ন্যায় জাতীয় বিপুল গ্রন্থাবলীর এতাদৃশ বিভাগ ও সংযোগ, এক জনের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। এই সুমহান্ ব্যাপার মহর্ষিসঙ্ঘের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকিবে, ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পুনশ্চ প্রত্যেক বেদ সামান্যতঃ দুই অংশে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রাংশ বৈদিক দেবদেবীর উদ্দেশে বিরচিত; সুন্দর সরল কবিতারাজি সুশোভিত। ইহাকে সংহিতাভাগও বলে। বহু জাতির সমবেত অনুসন্ধানে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সমগ্র পৃথিবীমধ্যে ঋগ্বেদ সংহিতাই অতি প্রাচীনতম পুস্তক। প্রতীচ্য প্রত্নতত্ত্ববেত্তৃগণ তিন সহস্র খ্রীঃ পূঃ ইহার রচনাকাল নির্দ্দেশ করেন। প্রফেসর বি, জি, তিলক এ বিষয়ে কঠোর পরিশ্রমের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ঋগ্বেদসংহিতা রচনার প্রধানতঃ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কাল আছে, তন্মধ্যে প্রথমটির সময় খ্রীঃ পূঃ ছয় সহস্র বৎসর। সম্প্রতি বেদাধ্যায়িগণের মধ্যে এই মত Kielhorn, MaxMuller, Muir, Colebrooke, Peterson, Weber এবং Wilson প্রভৃতি বেদবেত্তা মহাত্মাগণের মত অপেক্ষা অধিকতর গ্রাহ্য ও আদরণীয় হইতেছে। সংহিতার বিমল স্তোত্র রচনার সঙ্গে সঙ্গেই যজ্ঞের অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল। বেদের "ব্রাহ্মণ' ভাগে বৈদিক যজ্ঞ সমূহের বিধি প্রতিষেধ পূর্ণাঙ্গরূপে লিপিবদ্ধ আছে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যে বহুকাল ব্যবধান। কোন্ যজ্ঞে কি প্রকারে ইন্ধন স্থাপন করিতে হইবে, কি মন্ত্রে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে, কোন্ কোন্ পশু হত্যা করিতে হইবে, কোন্ মুখে উপবেশন করিলে হবিঃ দেবগ্রাহ্য হইবে, ইত্যাদি বহুবিধ খুটিনাটিতে ব্রাহ্মণ সকল পরিপূর্ণ। যজ্ঞীয় মন্ত্রের অধিকাংশ সংহিতা হইতে সংগৃহীত। ঐতরেয় ও কৌশীতকী ঋগ্বেদের, তৈত্তিরীয় কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের, শতপথ শুক্ল যজুর্ব্বেদের, ষড়্বিংশ ও অদ্ভুত সামবেদের ব্রাহ্মণ। ঋক্, যজুস্ ও সামবেদের পুরোহিতগণ যথাক্রমে হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্য্যু শব্দে অভিহিত। সূত্র ও প্রাতিশাখ্য গুলিও বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত। আরণ্যক ও উপনিষৎগুলি ব্রাহ্মণের শেষ

সময়ে বিরচিত এবং ব্রাহ্মণেরই অন্তর্ভূত। এ বিষয় পরে বিবৃত করা যাইবে।

ভারতে আগমনের পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণের ধর্ম্ম কীদৃশ ছিল, তাহা জানিতে অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু অনুসন্ধানের পর এই যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, প্রাগিতিহাস কালে কাস্পীয়ান্ (কাশ্যপীয়!) হ্রদের সমীপবর্ত্তী মধ্য এসিয়ায় আর্য্যগণ বাস করিতেন। দেশ জয় ও উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে করিতে তাঁহাদের একশাখা পশ্চিম দিকে গমন করিয়া গ্রীক্, রোমান্ প্রভৃতি প্রাচীন জাতির জীবন প্রতিষ্ঠা করেন, অপর শাখা পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া সপ্তসিন্ধুদেশের অনার্য্য দস্যুগণকে পরাজিত করিয়া, প্রাচীনভারত-গৌরবের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। কেবল আর্য্য, তুরেণীয় ও সেমেটিক ভাষার সৌসাদৃশ্যে প্রতীচ্য ও প্রাচ্য প্রদেশের এই নিকটতর সম্বন্ধ ধরা পড়ে, এমন নহে। উভয় বিভাগের প্রাচীন শাস্ত্র সমুদয় অন্বেষণ করিলে, যাগবিধি, বলিদান ও দেবগণের ঐক্য, এই সম্বন্ধ আরও নিকটতর করিয়া তুলে। বৈদিক দ্যৌস্ গ্রীক, জিউস্ [Zeus] জর্ম্মানি জিও [Zeo] বৈদিক দ্যৌস্পিতরৌ ইতালীয় জুপিটার (Jupiter), বৈদিক অগ্নিঃ (অগ্নিস্) পারিসিক ইগ্নিস্ (Ignis) এ সকল দেবতা একই জিনিষ। বৈদিক ঋষিগণ তাঁহাদের দেবগণকে অসুর বলিতেন। 'অসুর' দিবাদিগণীয় অস্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। জেন্দ্ ভাষায় দেবগণের নাম অহুর। উপনিষদে অসুর শব্দার্থ সুরবিরোধী দৈত্যদানবগণ [ছান্দোগ্য উপনিষৎ] পুরাণরচয়িতৃগণ উপনিষৎ হইতে সুর ও শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। অশেষ শাস্ত্র পারদর্শী ম্যাক্স মূলার তদীয় হিবার্ট বক্তৃতায় একস্থলে লিখিয়াছেন, "মূল আর্য্যজাতির শাখা সকল নানাভাগে বিভক্ত ও পৃথক হইয়া পড়িবার পরেও ভাষা ধর্ম্ম ও কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে বহুদিন পর্য্যন্ত এক প্রকার ছিল।" তিনি সংস্কৃত, জেন্দ, হিব্রু, জার্ম্মান্ ও লাটীন, এই কয়টী ভাষার বৈদিক "ঋত" পদের শব্দ ও অর্থগত সৌসাদৃশ্য তুলনা করিয়া উক্ত মত দৃঢ়ীকৃত করিয়াছেন।

এক্ষণে আমাদের ভারতীয় ধর্ম্মের ক্রম বিকাশ আলোচনার পথ অপেক্ষাকৃত সহজ ও পরিষ্কৃত হইয়া আসিল। ঋগ্বেদের সর্ব্বপ্রথমেই

অগ্নি

স্তুতি। যে দিন দাবানল পরিদর্শন করিয়া কোনও ঋষি কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নির আবির্ভাব করিয়াছিলেন, সে দিন ঋষিসমাজ মধ্যে মহান্ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। সেই দিন কত কৌতূহলপ্রদীপ্তলোচনা ঋষীপত্নী সেই অদৃষ্টচর ব্যাপার দেখিতে দ্রুত পদবিক্ষেপ করিয়াছিল; কত ঋষিকুমার কুমারী সকৌতুকনয়নে এই ব্যাপার দেখিতে অগ্নির চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়াছিল। ঋষিগণ ভাবিলেন, যাঁহার আলোকে দশদিক্ উজ্জ্বল ও যাঁহার স্পর্শে শরীর দগ্ধ হয়, এ সর্ব্ব বিনাশক অসহ্য-তেজাঃ দেবতা কে? জল বিক্ষেপে ইনি কোথায় তিরোভূত হন, তাহা কে জানে? ইন্ধনাদি যাহা কিছু অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করা যায়, তাহাও পরমুহূর্ত্তে কোথায় লুকায়িত হয়, তাহাই বা কে জানে? অগ্নিশিখা সর্ব্বদা উর্দ্ধগামিনী। নিশ্চয়ই অগ্নি সকল পদার্থই

অদৃশুভাবে উর্দ্ধবিহারী ইন্দ্রাদি দেবগণ সমীপে লইয়া যাইতে পারেন। এইরূপে অগ্নির হুতবহত্ব কল্পনা ঋষিগণের মধ্যে উদিত হইয়াছিল। অগ্নি দেবগণকে যজ্ঞে আনয়ন করিয়া থাকেন। অগ্নিও এক মহতী দেবতা। আমার বোধ হয়, রোম্যান্ ক্যাথলিক এবং ট্রিনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্টিয়ান্‌গণ যেমন ঈশ্বর ও মনুষ্যগণের মধ্যস্থ বোধে যীশু খ্রীষ্টের পূজা করিয়া থাকেন, সেইরূপ, মহর্ষিগণ অগ্নিকে দেবগণ ও তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানে পূজা করিতেন। কয়েকটি অগ্নি সম্বন্ধীয় ঋক্ দেখুন।

"আমি যজ্ঞের পুরোহিত, ঋত্বিক্, হোতা, বহুরত্নধারক অগ্নিদেবকে স্তুতি করিতেছি। অগ্নি পুরাতন ও নব্য ঋষিগণের স্তুত্য। তিনি এই যজ্ঞে দেবতাগণকে আনয়ন করুন। অগ্নির প্রসাদেই যজমান প্রতিদিন বর্দ্ধমান যশঃ ও পুত্রযুক্ত ধন লাভ করেন।" [১ম ১ সূ ১-৩ ঋক] (১)

"হে বৈশ্বানর অর্থাৎ বিঘ্নরহিত, হে অগ্নে, হবির্দাতা আমাদিগকে তুমি বহু ও অন্ন বল প্রদান কর। রুদ্র ও বসু দেবগণের সহিত আসিয়া আমাদিগকে মহৎ সুখ প্রদান করুন।" [৭৫৯]

অগ্নি সর্ব্বজ্ঞ [৭-৭-১]। ইন্দ্রের ন্যায় অগ্নি জগতের সম্রাট [৭-৬-১]। অগ্নিই ঋষিগণের গৃহপতি ছিলেন [৭-১-১]। অগ্নি পাপ ও নিন্দিত কর্ম্ম হইতে রক্ষাকারক [৭-১২-২]। বৈজ্ঞানিকের কথা ক্ষণেকের জন্য বিস্মৃত হইলে, এই জ্যোতির্ম্ময়

সূর্য্য

কেন পৃথিবীর তাবৎ সভ্য ও অসভ্য প্রাচীন জাতি সমীপে জগদীশ্বররূপে প্রতিভাত হইয়াছেন, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। অগ্নির দেবত্বজ্ঞান সময় সাপেক্ষ। ঋষিগণ কচিৎ দাব বা বড়বানল পরিদর্শন করিয়াছিলেন [ঋগ্বেদ সংহিতা ৭মং ৩ সূ ২ ঋক্]। বৈদ্যুতাগ্নিও সকল দিন অনুভূত হয় নাই। আম দ্রব্য ভক্ষণের অতীত না হইলে আর ইন্ধনাগ্নির নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। কিন্তু ঋষিগণ প্রত্যহই দেখিতেছেন, একই সময়ে পূর্ব্বগগনে সূর্য্য স্বীয় শুভ্রোজ্জ্বল তেজো রাশি দ্বারা দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ ও ভূলোক আপূরিত করিয়া উদিত হইতেছেন। ইঁহার অনুপস্থিতিতে পৃথিবী অন্ধকার ও দস্যুভয়ে ভীতা ছিল। ইঁহার অভ্যুদয়ে তাহার সে ভয় দূরীভূত হইল। এ দেবতা কে? ইতি কেমন সমদর্শী, ধনী ও দরিদ্র, জ্ঞানী ও মূর্খ, সুশ্রী ও কুশ্রী, সকলকেই ইনি প্রেম কিরণের আলিঙ্গন প্রদান করিতেছেন। আমরা ইঁহাকে দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু স্পর্শ করিতে পারি না। এ দেবতা কে? পরিশেষে ঋষিগণ মহাদ্যুতিকে সবিতা বলিয়া স্থির করিলেন। *সেই বর্ষীয়ান্ আর্য্যশিশুগণ এই পরিদৃশ্য*মান অলোকসাধারণ পরিশ্রমী সূর্য্যকে যে বিশ্বেশ্বর বলিয়া ধারণা করিলেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। প্রাচীন কালের ন্যায় না হউক, সূর্য্য এখনও ভারত হইতে যথেষ্ট পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। বর্ত্তমান প্রধান পঞ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইঁহার উপাসক সৌর নামে বিখ্যাত। প্রত্যেক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের নিত্য অনুষ্ঠের সন্ধ্যা বন্দনাতে সূর্য্যোপস্থান করিয়া থাকেন। হিন্দু দেবদেবীর প্রাত্যহিক পূজা মধ্যে কাশ্যপেয় মহাদ্যুতি ধ্বান্তারি ও সর্ব্বপাপঘ্ন সূর্য্যের অর্ঘ অতি প্রসিদ্ধ। হিমালয় হইতে কন্যা কুমারী, ও সিন্ধু হইতে ইরাবতী পর্য্যন্ত ভারতীয় সকল ব্রাহ্মণের মুখ

(১) এই বঙ্গানুবাদ গুলি মৎকর্ত্তৃক মহাত্মা সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যানুসারে কৃত। লেখক।

ঐক্য বন্ধন স্বরূপ সকল শাস্ত্র প্রশংসিত গায়ত্রী মন্ত্রের দেবতা সূর্য্য। (১) এজন্য সাবিত্রী গায়ত্রীরই নামান্তর।

প্রাতঃস্মরণীয় মোগলসম্রাট মহাত্মা আকবর প্রতিদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যবন্দনা করিতেন। অসভ্য সাঁওতালেরা এখনও সূর্য্যের পূজা করিয়া থাকে। তাহাদের ভাষায় সূর্য্যর নাম চণ্ডু। এই ভারত বক্ষে কতই ধর্ম্ম ও রাজপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তথাপি, ইহা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় যে, ভারতভূমিতে হব্যসমৃদ্ধিবপুঃ অগ্নির অভ্যর্থনা চিরদিনই চলিতেছে এবং ভারতাকাশে সূর্য্য চিরদিনই ভারতবাসীর অর্ঘ গ্রহণ করিতেছেন।

ঋগ্বেদ সংহিতার সূর্য্য স্তুতি দেখুন।

"হে মিত্রাবরুণ। সর্ব্বস্তুত্য এই সূর্য্যদেব অন্তরীক্ষে উঠিতেছেন। ইনি স্থাবর ও জঙ্গম বিশ্বের রক্ষক। ইনি মনুষ্যদিগের পাপ পুণ্য সকলই জানেন।" [৭-৬০ ২]

"হে সূর্য্য। তুমি যে আলোক দ্বারা অন্ধকার পরাজিত ও জগৎ জাগরিত কর, সেই আলোক দ্বারা আমাদের সমুদয় দুর্ব্বলতা, ঔদাসীন্য, রোগ ও নিদ্রাভাব দূরীভূত করিয়া দেও।" [১০-৩৭-৪]

"বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র, অর্য্যমা, রুদ্র ও অরাতিগণ যে সূর্য্যের হিংসা করে না, আমরা মঙ্গললাভার্থ সেই সূর্য্যকে নমস্কার ও আহ্বান করিতেছি।" [২-৩৮-৯]

"হে সবিতঃ! স্তোতা আমাদিগকে কাম্য ধন ও সুখ দান কর।" [২-৩৮-১১]

আমার বোধ হয়, সূর্য্যই ঋষিগণের আদি দেবতা। ইহার পর ঋষিগণ

ঊষা-

কে দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বদিকে এই যে শুক্লবসনা জ্যোতির্ম্ময়ী সুন্দরীকে দেখা যায়, এ দেবী কে? এ হেন শান্ত মধুর মূর্ত্তি বিরল দর্শন। গত তামসী রজনীতে যখন আমরা সুষুপ্তির সুকোমল অঙ্কে সুখ-শায়িত ছিলাম, তখন ইনিই আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। ইনি আমাদিগকে অগ্নিহোত্রের সময় উদ্বোধিত করিয়া দিতেছেন।

ভগিনীর ন্যায় স্নেহময়ী এ দেবী কে? তাঁহারা ঊষাকে দ্যৌস্ [আকাশ] দেবতার কন্যা ও সূর্য্যের গৃহিণী বলিয়া স্থির করিলেন [৭-৭৫-৫]।

ঊষা পূর্ব্বদিকের দ্বার খুলিয়াছে। তাঁহার বিবিধ বর্ণরঞ্জিত বেশভূষার আভা লইয়া মেঘশিশু গুলি খেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বায়ু দেবতা এ আনন্দের কথা প্রত্যেক গৃহীকে জানাইবার জন্য অন্তরীক্ষে মৃদুমন্দসন্তরণ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধরণী-দেবীর ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য পাখী সকল গাছ ছাড়িয়া আকাশে আসিয়া সুমধুর তানে গান ধরিয়াছে। সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে লাল চোখে (সারা রাত কি জাগিয়াছেন?) যখনই ঊষার নির্ম্মল রজতশুভ্র অঞ্চল ধরিতে যাইবেন, তখনই ঊষা সে দিনের মত পলায়ন করিল। ছি! ঊষা ভারি লাজুক মেয়ে!

ঊষা সম্বন্ধে ঋষিদের ইহাই প্রধানকল্পনা। কোনও কোনও ঋষি ঊষাকে সূর্য্যের ভগিনী কল্পনা করিয়াছেন। [২-১২-৭ ও ৫-৭৯-৮] কোনও ঋষি ঊষাকে সূর্য্যের কন্যা বলিয়াছেন [৪-৪৩ ২]। কবিগণ নিরঙ্কুশ। Max Muller বলেন, "এইগুলি পুরাণ গঠনের যথেষ্ট উপাদান।"

ঊষার নিকট ঋষিগণের প্রার্থনা শ্রবণ করুন।

"হে দ্যৌঃ দেবতার দুহিতা ঊষা, তুমি সকলের আহ্লাদক হইয়া প্রকাশিত হও। তুমি তমোরাশি

(১) ঋগ্বেদ ৩-৬২-১০।

বিনাশ কর এবং প্রতিদিন আমাদিগকে সৌভাগ্য প্রদান কর।" [১-৪৮-৯]

"হে উষা, তুমি আমাদিগকে প্রভূত বহুরূপ ধন ও গো প্রদান কর। আমরা যেন শত্রুহিংসা করিয়া যশোলাভ করিতে পারি। হে অন্নবতি, তুমি আমাদিগকে অন্নের সহিত সংযুক্ত কর।" [১-৪৮ ১৬]

"হে শুভ্রবর্ণা উষা, তোমার আগমনে দ্বিপৎ ও চতুষ্পৎ প্রাণী সকল চেষ্টাবন্ত হইয়াছে এবং পতত্রিগণ আকাশপ্রান্তে উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। তুমি সকল ভূতজাত তোমার আলোক প্রকাশিত করিয়াছ; ধন কামনা করিয়া কণ্বগোত্রজাত (অথবা মেধাবী) ঋষিগণ তোমাকে আহ্বান করিতেছেন।" [১-৪৯-৩ ও ৪]

ঋষিগণ প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে দৃঢ়মূল মহীরুহ উৎপাটিত ও সমুদ্র সলিলে (১) পোত সকল নিমজ্জিত হইতে দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হৃদয়ে

বায়ু

দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বায়ুই ঈশ্বর [৭ ৯০-৩]। বায়ু বিশ্ববরণীয় [৭-৯১-১]। ধনদাতা [৭-৯০-৩] ধনী লোকেরা এক মনে বায়ুর সেবা ও যজ্ঞ করিয়া থাকেন [৭-৯১-৩] ঋষিগণ বলিতেছেন, আমরা বায়ু স্তুতি প্রভাবে শত্রুনিসূদন করিয়া থাকি। [৭-৯২-৪] "বায়ু জগৎপ্রভু, আদিভব, দেবনিশ্বাস এবং জগতের অঙ্কুর বলিয়া স্তুত হইয়াছে, আমরা উহার স্বর শুনিতে পাই, কিন্তু উহাকে দেখিতে পাই না।" [১০ মণ্ডল ১৬৮ সূক্ত]

মহর্ষিগণ বায়ু সমীপে কি যাজ্ঞা করিতেছেন, তাহাতে অবধান করুন।

"সর্ব্বগামী বায়ু দেবতা আমাদিগকে বৃষ্টি দান করুন।" [৭-৪০-৬]।

"হে বায়ু! তোমার শত সহস্র অশ্ব আছে, তাহাতে আরোহণ করিয়া এই যজ্ঞ-গৃহে আইস। আমাদিগকে গো, অশ্ব ও পুত্র প্রদান কর।" [৭-৯২-৩]।

দশ দিক পরিষ্কৃত। সহসা কোথা হইতে ঋষিবিদ্বেষ দস্যুগণের ন্যায় ঘোর কৃষ্ণ মেঘমণ্ডল আকাশ মধ্যে আসিয়া অযুত হস্তিশুণ্ডের ন্যায় মুষল ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিল। এই বিপুল জলবর্ষকালে মেঘের কোলে ললিত বিদ্যুল্লতার আবির্ভাব, বনস্পতিশিরে বজ্রপাত ও তাহার কঠোর ভীষণ নিনাদে ঋষিগণের "বিজ্ঞান" রহিত চমকিত হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ ইহাদের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া, তাঁহারা বজ্রায়ুধ

ইন্দ্র

দেবতার আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। যতদূর আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ অনুমান করা গিয়াছিল যে, বোধ হয়, সূর্য্যই ঋষিবৃন্দপূজিত দেবসমূহের রাজা হইবেন। কিন্তু মহর্ষিগণ ইন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। প্রথমতঃ ইন্দ্র মেঘ, বজ্র ও বৃষ্টির অধিপতি দেব বলিয়া কল্পিত হন, পরে ইনি স্থাবর ও জঙ্গম বিশ্বের অধিপতি বলিয়া বারত হইয়াছেন। ইন্দ্র সর্ব্বশক্তিমান্, মনুষ্যের অটল আশ্রয়ভূত ও সর্ব্ব জীবের রাজা। [ঋগ্বেদ ৪-১৭-২০] ঋষিগণ ইন্দ্রের নিকট অনেক মনের কথা নিবেদন করিয়াছেন।

"হে ইন্দ্র, যুদ্ধকালে যে সকল মর্ত্ত্য আমাদের বিনাশ করিতে সম্মুখে আইসে, তাহাদিগকে হত্যা কর। নিন্দাকারী লোকগণকে আমাদিগ হইতে দূরে নিক্ষেপ কর। আর আমাদিগকে ধন প্রদান কর।" [৭-২৫-২]

"সকল দেবতাই ইন্দ্রসৃষ্ট জগৎ তাঁহার নিয়মের সমাদর করিয়া থাকেন। যিনি পৃথিবী ও দ্যুলোক ধারণ করিয়াছেন, সেই শোভনকর্ম্মা ইন্দ্রই সূর্য্য ও [দিন] দান করিয়াছেন।" [৩-৩২-৮]

(১) বৈদিক কালে সমুদ্র-যাত্রা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদ ১ম ৮৮ সূ ৩ঋ]

"হে ইন্দ্র, আমরা যেন তোমার ন্যায় কর্ম্মশীল ও বলশালী হই। হে অশ্ববিশিষ্ট শূর, চিরদিন (তোমার আশ্রয়ে) আমাদিগকে স্থান দেও, আমাদিগকে হিংসা করিও না।" [১ ২৫-৪]

"হে হর্য্যশ্ব, তোমার গান করিয়া আমরা সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হই।" [১ ৩২-১৫]

"ইন্দ্রের কর্ণ সর্ব্বদা আমাদের যাচঞা শ্রবণ করিয়া থাকে। ইন্দ্র আমাদিগকে শত সহস্র ধন দান করুন।" [০-৩২-৫]

"হে ইন্দ্র, তুমি স্তোতৃগণের রক্ষক ও বর্দ্ধক হও।' [১ ৩২-২৫]

"হে বৃত্রহন অর্থাৎ মেঘনাশক ইন্দ্র, তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কেহ নাই, জ্যায়ান কেহ নাই। এমন কি, তোমার সদৃশও কেহ নাই।" [৪-৩০-১]

এইবার আমরা যে বৈদিক দেবতা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত। স্থান বিশেষে সমুদ্রাধিপতি বলিয়া কথিত হইলেও,

বরুণ

কি স্বর্গ, কি পৃথিবী সকলের প্রভু। (ঋগ্বেদ ১-২৫-২০) বরুণ মনুষ্য ও দেবতা সকলেরই রাজা (২-২৭ ১০)। ইনি জগতের সকল নিয়মের ধারণকর্ত্তা, এজন্য ইঁহার নাম ধৃতব্রত (১ ২৮ ৮)। মহর্ষিগণ বরুণকে বহু মর্ম্মস্পৃক স্তোত্র উপহার দিয়াছেন।

"বরুণ দেবতা মিথ্যাবাদিগণকে হিংসা করেন।' (৭-৮৪-৪)

"হে বরুণ, আমার এমন কি ভয়ানক পাপ আছে, যে হেতু তোমার সখাভূত আমার হিংসা করিতেছ। হে তেজস্বিন্ হে দুর্দ্ধর্ষ, আমাকে সেই পাপ বলিয়া দেও। তাহা হইলে আমি নিষ্পাপ হইয়া তোমাকে অবগত হইতে পারি।" (৭-৮৬-৬)

"বরুণের সৃষ্ট এ ভূলোক ও দ্যুলোক অতীব সুন্দর (৭-৮৭-৩)

'যে বরুণ পাপ ক্ষমা করিয়া স্তোতৃগণকে দয়া করেন, আমরা নিষ্পাপ হইয়া যেন সেই অদীনাত্মা বরুণের ব্রত (কর্ম্ম) সকল আনুপূর্ব্বিক অনুষ্ঠান করি, হে বরুণ দেব, তুমি আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।' (৭ ৮৭ ৭)

"বরুণ রাজাদিগেরও রাজা। ইঁহা হইতে নদী সকল রূপ প্রাপ্ত হয়। ইঁহার বলকে কেহ বাধা দিতে পারে না।" (৭ ৩৪ ১১)

একটী বরুণদেবের গীতি শ্রবণ করুন।

মো ষু বরুণ মৃন্ময়ং গৃহং রাজন্নহং গমম।
মৃলা সুক্ষত্র মৃলয়।১।
যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ।
মৃলা সুক্ষত্র মৃলয়।২।
ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে।
মৃলা সুক্ষত্র মৃলয়।৩।
অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারম।
মৃলা সুক্ষত্র মৃলয় ৪।
যৎ কিং চেদং বরুণ দৈব্যে জনে
অভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি
অচিত্তী যত্তব ধর্ম্মা যুযোপিম
মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ।৫।

এই গানটি ঋগ্বেদসংহিতার ৭ম মণ্ডল, ৮৯ সূক্ত। ইহার বঙ্গানুবাদঃ—

হে বরুণ, হে রাজন্, আমি যেন তোমার মৃণ্ময়গৃহে বাস না করি, কিন্তু স্বর্ণময় সুবর্ণ গৃহ প্রাপ্ত হই। হে মহাধন, আমাকে ধন ও সুখ দেও।১।

হে শস্ত্রধারিন্, যখন আমি বায়ুপূরিত চর্ম্মপাত্রের ন্যায় কম্পমান হইয়া তোমার সমীপবর্ত্তী হই, তখন, হে মহাধন, তুমি আমাকে ধন ও সুখ দেও।২।

হে ধনবান নির্ম্মল বরুণ, দীনতাবশতঃ তোমার অনুজ্ঞাত কর্ম্মের প্রতিকূল গমন করিয়াছি, হে মহাধন, তুমি আমাদিগকে ধন ও সুখ দান কর।৩।

জলরাশির মধ্যে থাকিয়াও, তোমার স্তোতা তৃষ্ণাতুর হইয়াছে। হে মহাধন, তুমি আমাদিগকে ধন ও সুখদান কর।৪।

হে বরুণ, মনুষ্য আমরা যে দৈব্য অভি

দ্রোহ আচরণ করিয়াছি ও অজ্ঞান বশতঃ তোমার ধর্ম্মে অবহেলা করিয়াছি, হে দেব, সেই পাপ জন্য আমাদিগকে হিংসা করিও না।৫।

ইঁহারাই বৈদিক সংহিতার প্রধান দেবতা। এতদ্ব্যতীত অশ্বিদ্বয়, বিশ্বদেবগণ, প্রজাপতি, রুদ্র, বিশ্বকর্ম্মা, বসুগণ, সোম ও সরস্বতীনদী প্রভৃতি কতিপয় দেবস্তুতি সংহিতায় দৃষ্ট হয়। সর্ব্বদা না হউক, মধ্যে মধ্যে তাঁহারাও যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাইবেলের ন্যায় বেদেও অনেক অতি-প্রাকৃতিক ঘটনার (Miracle) বর্ণনা দেখা যায়। (১ম ১১৬ সূক্ত) তন্মধ্যে একটীর কথা শুনুন। কোনও সময়ে গোতম ঋষি মরুভূমি মধ্যে অত্যন্ত পিপাসিত হইয়া অশ্বিনৌ দেবযুগল সমীপে জল প্রার্থনা করায়,তাঁহারা সেখানে একটি বিপরীতগঠন কূপ খনন করিয়া দিয়াছিলেন। বিপরীত-গঠন, কেননা তাহার জল পূর্ণ তলদেশ পৃথিবী পৃষ্ঠে আসিয়াছিল ও শূন্য উদ্ধদেশ নিম্নে গমন করিয়াছিল। [১ ১১৬-১০]। তৃষাতুর ঋষির স্নানদানাদি সৌকর্য্যার্থ এই রূপ কূপ নির্ম্মাণ [উহার সায়ণ ভাষ্য] প্রথম পাঠকালে কূপের এতাদৃশী কল্পনা আমার নিকট প্রচুর হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছিল।

আমি অনেক সময় ইয়ুরোপের বীর্য্য ও সমৃদ্ধি এবং নব্যভারতের দৌর্ব্বল্য ও দারিদ্র্যের বিষয় ভাবিয়া থাকি এবং এই মহৎ শোকোদ্দীপক পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখি যে,ইউরোপ ও ভারতের ধর্ম্ম-প্রকৃতিমূলক প্রভেদই এই পার্থক্য হেতু। পাশ্চাত্য জগতের পক্ষে ইহা নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, তাহার ধর্ম্মের মধ্যে পুনর্জ্জন্মবাদ প্রবেশ করে নাই। ইহা অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, অতি প্রাচীন ইহুদিগণের মধ্যে ইহজন্মের পুণ্য ও পাপ কার্য্যের ফলভোগার্থ জন্মান্তরে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল ; বহু প্রবলতর কারণে ইহা লোপ পাইয়াছে এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রত্যয় সমগ্র ইউরোপ আবৃত করিয়াছে। খ্রীষ্টীয়ান্ মত এই—আমরা একবার মাত্র মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়াছি, পূর্ব্বে আমরা একেবারে ছিলাম না, ঈশ্বর আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সৃষ্ট করিয়াছেন, মৃত্যুর পরে শেষ বিচার দিন (Last day of judgment) পর্য্যন্ত আমাদিগকে সুষুপ্ত অবস্থায় থাকিতে হইবে। পরে, সেই দিন ঈশ্বরের নিকট আমাদের বিচার হইবে, তাহাতে, যাঁহারা যীশু খ্রীষ্টকে মনুষ্য ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের একজাত তনয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহারা অনন্ত স্বর্গে ও তদিতর জনগণ অনন্ত নরকে বাস করিবে। বর্ত্তমান কালে ইউনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্টীয়ানগণ অনন্ত নরকের প্রতিকূলে ঘোরতর প্রতিবাদ আনয়ন করিয়াছেন। স্বাধীন চিন্তার যতই স্ফূর্ত্তি হইবে, ততই প্রাচীন ধর্ম্ম পরিশোধিত হইবে, আশা করা যায়। সে যাহা হউক, কেহ বিদ্বান্, কেহ মূর্খ, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ সুন্দর, কেহ কুৎসিত প্রভৃতি সংসার বৈচিত্র্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধগণ পুনর্জ্জন্মবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ানেরা এই সকল প্রভেদ প্রাক্ পরীক্ষা বিধি (probation-theory)র উপর সংস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সংসার আমাদের পরীক্ষাস্থল, ঈশ্বর আমাদিগকে যে রূপ অবস্থায় ফেলিয়াছেন, সেই অবস্থোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সানন্দ-চিত্তে

সম্পাদন করাই আমাদের উচিত। ইহাতেই আমাদের পরত্র শুভ নিশ্চিত। উহারা জানে, এই পার্থিব জীবন আমাদিগকে একবার বৈ দুইবার দেওয়া হইবে না। নিদ্রা ও বিশ্রামের যথেষ্ট সময় সমাধির অভ্যন্তরে আছে। এখন আমাদিগকে এই কর্ম্মক্ষেত্রে অক্লান্ত হৃদয়ে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে হইবে। এই সকল ধারণা বশতঃ ইউরোপীয়েরা যেমন উৎসাহময় কর্ম্মের উপাসক, হিন্দু ও বৌদ্ধগণ তেমন নহে। যে পুনর্জন্ম যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য হিন্দু ও বৌদ্ধগণের প্রত্যেক সাধনা, তাহারা সেই পুনর্জন্মবাদে প্রত্যয় না করিয়া অনেকটা অবোধ্য অনাবশ্যক যাতনা হইতে মুক্তি পাইয়াছে। আমাদের প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণেরও ধারণায় কোনও প্রকার পুনর্জন্মভীতি ছিল না। সংসার হইতে মুক্তিলাভ করা মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, ইহা কথনই তাঁহাদের মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। গর্ভযন্ত্রণা পরিহার, পুনর্জন্ম নিবৃত্তি, এ সকল কথা তাঁহারা জানিতেন না; এজন্য তাঁহারা প্রভূত উৎসাহ ও কর্ম্মময়, আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল ও ঐহিক সুখভোগরত এবং স্পার্টান প্রভৃতি প্রাচীন জাতির ন্যায় বীরত্বের উপাসক ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দুগণ তাঁহাদেরই সন্তানগণ জীবনভার ক্লান্ত হইয়া যেন এই বলিয়া রোদন করিতেছে "তারা, কোন্ অপরাধে, এ সংসার গারদে'' আমাদিগকে আবদ্ধ রাখিয়াছ? আমরা জীবন চাহি না, আমাদিগকে মুক্তি দেও। (১) যদিও ভক্তিমার্গানুসারী দ্বৈতবাদিগণ মুক্তি প্রার্থনা করেন না, তথাপি ভক্তির অনুকূল হইবে বলিয়া জীবন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন। তাঁহারা সংসারের প্রতি বীততৃষ্ণ। সর্প ও ব্যাঘ্র অপেক্ষাও সংসার ও স্ত্রীজাতিকে ভয় করেন। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, ইহারাও জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে ধারণা হইতে বহুদূরে আনীত হইয়াছেন। "পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ। ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরঃ হরিঃ॥" ইহাই বর্ত্তমান হিন্দুপ্রার্থনা। এই পাপসম্ভব বোধ সকল হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এই হেতু, তুমি তাহাদিগকে পুনর্জন্ম বিনাশের অর্থাৎ মুক্তির জন্য যে উপায় প্রদর্শন করিয়া দেওনা কেন, তাহারা প্রাণপণে তাহার অনুসরণে যত্ন করিবে। যদি তুমি তাহাকে বল যে, মধু পান করিয়া, অনাঘ্রাত-পুষ্পা সুন্দরীর রস সম্ভোগানন্তর লোলজিহ্বা কালিকা ঠাকুরাণী সমীপে তাহাকে বলি দিলে (তন্ত্র শাস্ত্রের মত) তোমাকে আর জননী জঠরের জ্বালায় জ্বলিতে হইবে না, ইতিহাস অনুসন্ধান কর, তুমি দেখিতে পাইবে যে, সে ইহাতেও পশ্চাৎপদ নহে। হিন্দু অতি সরল বিশ্বাসী বলিয়াই ঈদৃশ বীভৎস ও নিকৃষ্ট পাপকর্ম্মে ধর্ম্ম জ্ঞানে প্রবৃত্ত হয়। এখন তুমি ইহার Dark side গ্রহণ করিও না। ইহার উৎকৃষ্ট অংশ তুমি সূক্ষ্মভাবে গ্রহণ করিলে, তুমি ইহাতে সাধ-

(১) "নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃতকো যথা॥"

মৃত্যু কামনা করা উচিত নহে, বাঁচিবারও ইচ্ছা করা উচিত নহে। বেতনভুক্ ভৃত্য যেমন ভৃতির অপেক্ষায় থাকে, সেইরূপ নিয়মিত সময়ের অপেক্ষায় থাকিবে। [মনুসংহিতা, ৬ অধ্যায়, ৪৫ শ্লোক]

মহর্ষি মনুর এই অমূল্য অনুশাসন হিন্দুসাধারণের মনে স্থান পায় নাই।

কের আত্মা সম্বন্ধীয় মঙ্গলের শুভ্র জ্যোতিঃ বই কোনও পাপ উদ্দেশ্যের কৃষ্ণরেখা দেখিতে পাইবে না। তুমি দেখিবে যে, ইহার উদ্দেশ্য সাধু ও স্বাভাবিক হইলেও, সাধকের ভ্রম ও কুশিক্ষা বশতঃ তদবলম্বিত উপায় অতীব জঘন্য ও হেয় হইয়া পড়িয়াছে।

এই অধোনীত ধর্ম্মের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে, বৈদিক মহর্ষিগণের অনুগমন ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। আমার এ কথা শুনিয়া কেহ যেন বোধ না করেন যে, আমি পুনরায় ইন্দ্রাদি প্রাকৃতিক দেবতাবৃন্দ পূজার পুনরুত্থান আকাঙ্ক্ষা করি। পুনরায় "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ হোতারম্ রত্নধাতমম" ইত্যাদি অগ্নিসঙ্গীতে মনঃসংযম করিতে বলি, অথবা "ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ ইত্যাদি আপোদেবীগীতি ত্রিসন্ধ্যা কণ্ঠভূষা করিতে উপদেশ দেই। আমি চাই, এই সুন্দর সুখদুঃখ মিশ্রিত মনুষ্যজীবনকে, বৈদিক মহর্ষিগণ যে ভাবে অবলোকন করিতেন, আমরাও যেন সেইরূপ শিক্ষা পাই। আমরা জীবনকে দুর্ব্বহভার বোধ ও ভয় না করিয়া, সেই এক বিশ্বধুরন্ধরের প্রসাদে, সমীরণ যেমন সহজে চতুর্দ্দিকে পুষ্পগন্ধ বহন করে, সেইরূপ ইহাকে সহজ-বাহ্য করিয়া তুলি। সেই মহর্ষিগণ কখনই তাঁহাদের জীবনকে North worth living মনে করেন নাই। অনার্য্য দাসগণের সহিত সমরে, বহু সময়, তাঁহাদের বাহু শ্রান্ত ও ক্লিষ্ট হইয়াছিল। সেই নবাগত ভারত অতিথিগণকে বহু মানসিক জ্বালায় দগ্ধ হইতে হইয়াছিল, তথাপি তাঁহাদের সমগ্র ইতিহাসে আত্মহত্যা কামনার বিন্দু বিসর্গও দেখা যায় না। সেই বিপুল-বীর্য্য ঋষিগণের কি অনন্ত ধৈর্য্য। আমি তাঁহাদের ন্যায় pastoral অথবা nomadic জীবন যাপন করিতে বলি না, কিন্তু প্রভূত প্রাণনী শক্তি যুক্ত, হরিণ শিশুবৎ উৎফুল্ল, মত্ত মাতঙ্গবৎ মহাবীর, মহর্ষিগণ যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়াছিলেন, আমরাও তাঁহাকে জীবনের লক্ষ্য করিয়া চলিতে চাই।

আমরা তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
আর কভু হবনাক এসংসারে পথহারা)।

মহর্ষিগণের জীবনের সহিত এ সঙ্গীত-সংযোগ বিচ্ছিন্ন দেখিতে চাহি না। আমাদের বালকগণ তৎকালীন ঋষিতনয়গণের ন্যায় কুশসমিধ আহরণে জীবনের বহুমূল্য প্রভাত ব্যয়িত করুক, ইহা আমরা দেখিতে চাই না, কিন্তু তাহাদের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু ও আচার্য্যপরায়ণ দেখিতে চাই। আমরা বৈদিক কালের ন্যায় গো অশ্ব ছাগ মহিষাদি নির্ব্বাক্ পশুর সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন হত্যা শোণিতে বেদিস্থান পূর্ণ দেখিতে চাহি না কিন্তু আর্য্য ঋষির মহান্ কলঙ্ক, ভারতের সে দুর্যশঃ প্রথার শেষ স্মৃতিচিহ্ন বলিপ্রথাকে একেবারে উৎসাদিত দেখিতে চাই।

যখন গৌরব-রবি ভারতের মধ্যাহ্ন আকাশে বিরাজিত, তখন একবার আমার এই কল্পনা কার্য্যপ্রসব করিয়াছিল। পূর্ব্বতন বৈদিক ঋষিগণের সরল প্রাণের মধুবর্ষী গান সকল ব্রাহ্মণ ও আরণ্যককালে, যাদৃশ বিশ্বাসের সহিত অনেকখানিষ্পাদিত যজ্ঞপটলে ব্যবহৃত হইত, তাহা নিশ্চয়ই অজ্ঞেয়তা ও সংশয়বাদ হইতে গরিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যখন যজ্ঞ সকল প্রাণহীন দেশাচারে পরিণত হইল এবং বাহ্যাড়ম্বরের বাহুল্য ধর্ম্মের উন্নতিমুখীন গতি প্রতিরোধ করিতে

প্রয়াস পাইল, তখনই কতিপয় স্বাধীন চেতাঃ মহর্ষি সত্যের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। এস্থলেও "Ask and it shall be given" এই মন্ত্র—যাহা সংহিতাযুগের প্রাণ ছিল, তাহাই এখানে কার্য্যকর হইল। এক্ষণে তাঁহারা এমন এক পদার্থ আবিষ্কার করিলেন, যাঁহার মুখ চাহিয়া তাঁহারা অকুতোভয়ে তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন :—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"
[কঠোপনিষৎ, ২য় অধ্যায়, ষষ্ঠবল্লী, ৩ শ্রুতি।]

"ইহারই ভয়ে অগ্নি উত্তাপ প্রদান করিতেছেন, ইহারই ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছেন, ইহারই ভয়ে ইন্দ্র বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন, ইহারই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছেন এবং পঞ্চম যে মৃত্যু, তিনিও ইঁহার ভয়ে ধাবিত হইতেছেন।"

যে সময়ে সমুদয় দেশ অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র ও বায়ু প্রভৃতি দেবগণ উদ্দেশে যজ্ঞাবলী পরিপূরিত ও সমুদয় দিক্ ইঁহাদেরই স্তুতি-গীতি মুখরিত, সেই সময়ে, ভাব দেখি, এই ভয়ানক কথার অভ্যন্তরে কত শাক্য সিংহ ও আচার্য্য শঙ্কর, কত মার্টিন লুথর ও রামমোহন, কত জেমস্ মার্টিনো ও নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট লুকায়িত রহিয়াছে। যে দিন মহর্ষিবৃন্দ বহুদেববাদের মধ্যদিয়া একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং মানবহিতার্থ প্রথম উপনিষৎ রচনায় উপবেশন করিয়াছিলেন, সে দিন কেমন মহান্ পবিত্র ও সুন্দর! সেই দিনই, ভারতীয় সমাজে আভ্যন্তরিক প্রলয় হইয়া যথার্থতঃ সত্যযুগের আরম্ভ হইয়াছিল। সেই দিন সূর্য্য কি অধিকতর উজ্জল হন নাই এবং চন্দ্র আরও অধিক করিয়া তাঁহার সুধা বর্ষণ করেন নাই? সেই নবযুগের প্রথম বাসরে সমুদয় জগৎ কি আরও মধুরতর রূপে প্রকাশিত হয় নাই?

বৈদিক অগ্নি সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ সম্বন্ধে উপনিষদের একটি অভিমতি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই সঙ্গে তলবকার উপনিষদের দেবাখ্যায়িকা পাঠ করুন। তাহা হইলে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবেন। উপনিষৎ হস্তামলকবৎ ব্রহ্ম লাভ করিয়া একস্থলে বলিতেছেন :—

"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমাবিদ্যুতোভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥
[মুণ্ডকোপনিষৎ, ২-২-১০]

"সূর্য্য সেই ব্রহ্মের প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না; চন্দ্র, তারা ও এই সকল বিদ্যুৎ ও তাঁহার প্রকাশক নহে, সুতরাং এই (সামান্য, ক্ষুদ্র) অগ্নি কি প্রকারে তাঁহার প্রকাশক হইবেন? পক্ষান্তরে, এই সকল সূর্য্যাদি স্বয়ম্প্রকাশ ব্রহ্মের পশ্চাৎ প্রকাশিত। তাঁহারই প্রভায় ইহারা জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছে।"

"পূর্ব্ব ও নূতন ঋষিগণের ঈড্য" [ঋগ্বেদ ১-১-২] অগ্নিপ্রভৃতি দেবগণ সম্বন্ধে উপনিষৎ-রচয়িতা মহর্ষিগণ ইহা বলিলেন, তাঁহাদের আদরণীয় যজ্ঞ কর্ম্ম সম্বন্ধে কি কথিত হইয়াছে, দেখুন :—

"অষ্টাদশাঙ্গ যজ্ঞরূপ কর্ম্ম অদৃঢ় ও বিনাশী, যে সকল লোক ইহাকে শ্রেয়স্কর ভাবে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুগ্রস্ত হয়।৭।

"যেমন এক অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অন্ধ সকল গমন করিলে তাহারা অত্যন্ত ক্লেশ পায়, সেইরূপ যাহারা যজ্ঞকর্ম্মরত হইয়া চিন্তা করে যে 'আমরা জ্ঞানী ও পণ্ডিত' সেই মূঢ়েরা পুনঃ পুনঃ জন্ম জরা মরণাদি দুঃখ প্রাপ্ত হয়।" ৮।

[ইহার সহিত যীশুখ্রীষ্টের উপদেশ মিলন করুন, "যদি একজন অন্ধ অপর অন্ধের

পথপ্রদর্শক হয়, তাহারা দুইজনে কি গর্ত্তে পতিত হয় না?"]

(মুণ্ডকোপনিষৎ ১ম মুণ্ডক, ২য় খণ্ড)

উপনিষদে এইরূপ শ্রুতির অভাব নাই।

এক্ষণে উপ নিষদের উপাস্য দেবতা সম্বন্ধে শুনুন।

"যোহয়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ।
যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ।
তমেব বিদিত্বা মৃত্যুমেতি নান্যপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

[সাধারণ ব্রহ্মসমাজের "উপদেশ ও ব্যাখ্যা" ধৃত উপনিষদের বাক্য।]

"এই যে আত্মাতে তেজোময়, অমৃতময় সর্ব্বানুভূ পুরুষ রহিয়াছেন এবং এই যে আকাশে তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বানুভূ পুরুষ রহিয়াছেন, ইহাঁকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায়। আশ্রয়ের অন্য পন্থা নাই।"

নিম্নে উদ্ধৃত শ্রুতিতে এই ভাবই সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত হইয়াছে।

"যিনি সূর্য্যে থাকিয়া, সূর্য্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া, সূর্য্যকে নিয়মিত করিতেছেন, সূর্য্য যাঁহাকে জানে না, সূর্য্য যাঁহার শরীর, তিনিই তোমার হৃদয় মধ্যবর্ত্তী পরমাত্মা।"

"যিনি চন্দ্রে থাকিয়া, চন্দ্রের অভ্যন্তরে থাকিয়া, চন্দ্রকে নিয়মিত করিতেছেন, চন্দ্র যাঁহাকে জানে না, চন্দ্র যাঁহার শরীর, তিনিই তোমার হৃদয়মধ্যবর্ত্তী পরমাত্মা।" * * * *

"যিনি আকাশে থাকিয়া,আকাশের মধ্যে থাকিয়া আকাশকে নিয়মিত করিতেছেন, আকাশ যাঁহাকে জানে না, আকাশ যাঁহার শরীর, তিনিই তোমার হৃদয় মধ্যবর্ত্তী পরমাত্মা।' (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)

ইহা অপেক্ষা ঈশ্বরের সুস্পষ্টতর ও মহত্তর ধারণা এ পৃথিবীতে কোনও দেশের কোনও জাতির, কোনও ভাষার কোনও গ্রন্থে নাই।

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" পরমাত্মাকে প্রিয় জ্ঞানে উপাসনা করিবে।

আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ"

(মুণ্ডকোপনিষৎ ৩—১—৪)

ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি (বিষয়সুখে সুখী না হইয়া) পরমাত্মায় ক্রীড়া ও সুখ-বোধ করেন, সর্ব্বদা পরোপকারাদি সৎকর্ম্মনিরত হন। ইনিই ব্রহ্মবিৎগণের শ্রেষ্ঠ।

বৈদিক কালে মহর্ষিগণকে কর্ম্মযোগে যোগী দেখিয়াছি, এই বার উপনিষৎ কালে তাহাতে জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ সম্মিলিত হইয়া, তাঁহাদের জীবন আমাদের পূর্ণ আদর্শ করিয়া তুলিয়াছে।

বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, মীমাংসা ও বৈশেষিক এই ষড়দর্শন ভারতের গৌরব। ইহাদের মূল উপনিষদে নিবদ্ধ। রামোপনিষৎ, শিবোপনিষৎ, আল্লোপনিষৎ প্রভৃতি জাতীয় ও বিজাতীয় অনুকরণগুলির কথা বলিতেছি না। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য যেগুলির ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাহারাই প্রকৃত আদি উপনিষৎ, তাহাদের নাম, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মণ্ডক, মাণ্ডক্য, শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক। এই সকল উপনিষদে, আমাদের পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ,ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্ম সম্ভোগের সুন্দর সরল বিবৃতি আছে। আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, জগৎ কি,ইহার স্রষ্টাই বা কিরূপ, আমার সহিত উভয়ের কি সম্বন্ধ? এই সকল অতীব প্রয়োজনীয় দার্শনিক নিগূঢ় বিষয়গুলি উপনিষদে অতি সহজ ভাষায় বর্ণিত আছে। এই সকল উপনিষৎ আধ্যাত্মিক ভারতের চরমানুভূতি সত্য, বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সকল হইতে

বিচ্ছিন্ন করিয়া অসংলগ্ন ভাবে এই উপনিষৎ সকল পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাতে এমন সকল বিষয় পরিদৃষ্ট হইবে, যাহার কোনও অর্থ বা উদ্দেশ্য নির্ণয় করা সম্পূর্ণ সম্ভাবনাতীত। কিন্তু আমরা যদি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্মচিন্তার মূলসূত্র ধরিয়া একটী গ্রন্থির পর অপর গ্রন্থি অতিক্রম করিয়া উপনিষদে উপনীত হই, তাহা হইলে উপনিষদ্‌বিবৃত অর্থ পরিগ্রহ করিতে আর কোনও ক্লেশ পাইতে হয় না। তখন এই পবিত্র ও মহান্ গ্রন্থাবলীর উদ্দেশ্য সুনির্ম্মল আকাশের ন্যায় পরিস্কৃত হইয়া উঠে। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও ঔপনিষদিক ব্রহ্মজ্ঞানের দাত্রকুষ্মাণ্ড সম্বন্ধের আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। শ্রীমদ্ভবদ্গীতাতে যাহা উপনিষৎ ও স্মৃতি উভয় নামে অভিহিত হয়, তাহাতে সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের প্রশংসনীয় চেষ্টা করা হইয়াছে। আধুনা এ চেষ্টা অনেকটা ফলবতী দেখিতে পাইয়াছি। "যজ্ঞৈর্দেবান্ ভাবয়ধ্বম্" এবং "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই উভয়ই গীতাতে লিখিত। টোলের পণ্ডিতগণ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ শাস্ত্র কল্পনা করিয়া বৈদিক কর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান দুইই বজায় রাখিতে চান। আমার মতে এই সকল মহাসুধীগণ দেশাচার ও সত্য, দুই নৌকায় পদস্থাপনা করিয়া আপনার মৃত্যু আপনারাই শীঘ্র আনয়ন করিতেছেন। যাহা সত্য, তাহা চিরকাল্ থাকিবে, যাহা অসত্য তাহা ক্ষণস্থায়ী। অসত্যকে লৌহস্তম্ভ দ্বারা উত্তোলিত করিয়া রাখিলেও, তাহা, এক দিন না একদিন, পৃথিবীতে পতিত, চূর্ণিত ও ধূলিসাৎ হইবে। এবং সত্যকে আর ধূম-মলিন করিয়া রাখিলেও, কোনও সময়ে না কোনও সময়ে, শির উত্তোলন করিবে। বর্ত্তমান সময় ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আমি মনশ্চক্ষে দেখিতেছি, উপনিষৎ ভারতের অপহৃত গৌরব প্রত্যানয়ন করিবার উপক্রম করিতেছে। উপনিষদের মধ্য দিয়া ভারত পুনরায় মহীয়ান্ হইবে। কে জানে কবেকার কথা, আমরা উপনিষৎ পাঠ করিয়া দেখিতে পাই যে, এক সময়ে ভারতে ব্রহ্মবাদ আবির্ভূত হইয়াছিল। তাহার পর কত বিপ্লবের মহান্ তরঙ্গ ভারতবক্ষে বহিয়া গিয়াছে, এখন সেই অতিপ্রাচীন, বিস্মৃত বা অনাদৃত সত্য নূতন বেশে ও নূতন জ্যোতিতে অগ্রসর হইতেছে। বেদান্তজননী প্রাচ্য উপনিষৎ বাণী আজ প্রতীচ্য ধর্ম্মদর্শন মতের সহিত সম্মিলিত হইয়া অযুত হস্তীর বল ধারণ করিয়াছে। আজ, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, কঠ, মণ্ডুক প্রভৃতি মহর্ষিগণ, হিগেল, স্কোপেনহোর, কার্লাইল, ইমার্সন, প্রভৃতির সহিত সম্ভাষণ করিতে করিতে আমাদের নিকট অগ্রসর হইতেছেন। এই অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মচিন্তা ও কার্য্যপ্রবাহকে বাধা দিও না। যদি বুদ্ধিমান হও, ইহাতে যোগদান কর, নতুবা সরিয়া দাঁড়াও। এ চিন্তা-স্রোতাস্বিনীকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলে, পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর প্রতিকূলে সুরগজ ঐরাবতের যে দশা ঘটিয়াছিল, সেই দশা ঘটিবে।

উপনিষদুক্ত ব্রহ্মজ্ঞান উন্মুক্ত বায়ুর ন্যায় লোক-সমাজে পরিগৃহীত হয় নাই। উপনিষদের মধ্যে ঈশ্বরের সত্য স্বরূপের সুবিমল ভাব হৃদয়ে ধারণার্থ সংসারকে অনিত্য ও অনৃত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। "ন দানেন ন প্রজয়া ন কর্ম্মণা ত্যাগেনৈকে-নামৃতত্বমাণশুঃ" না দানের দ্বারা, না সন্তানের দ্বারা, না কর্ম্ম দ্বারা মুক্তিলাভ হয়,

কেবল ত্যাগের দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়। [বাই বেলের সহিত তুলনা কর, যীশুখ্রীষ্ট বাক্য, মথি. ১৯, ১৬-২৩] উপনিষদের এই বৈরাগ্য-কুঠার বৈদিক সংহিতার ইহলোক সর্ব্বস্বতার মূলে আঘাত করিল। 'যামিমাং পুষ্পিতাং' প্রভৃতি গীতার শ্লোকে, শ্রীকৃষ্ণ, বেদের প্রতি যথেষ্ট কটাক্ষপাত করিয়াছেন। এই কারণে উপনিষৎ হিন্দুগণের শেষ শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইল না। আশ্বালায়ন, শাট্যায়ন, কাত্যায়ন, দ্রাহ্যায়ন ও গোভিলীয় গৃহ্য ও কল্পসূত্রের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া, মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, বশিষ্ঠ ও শাতাতপ প্রভৃতি মহর্ষিগণ সাধারণের শুভ-উদ্দেশেই সুললিত সহজ-বোধ্য "স্মৃতি"শাস্ত্র সকল রচনা করিয়াছেন। তার পর, ব্যাস নামধারী ব্যক্তিগণ বেদ, উপনিষৎ ও স্মৃতির ভাবকেই অতিরঞ্জিত, অপরঞ্জিত, পরিবর্ত্তিত ও নানাবিধ লোকরঞ্জন রসযুক্ত করিয়া "পুরাণ" ও উপপুরাণ গুলি প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পৌরাণিক যুগেই শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়গুলির উদ্ভব। এই সময়েই, বৌদ্ধগণের অনুকরণে, দেবদেবীর মৃদাদিগঠিত মূর্ত্তিপূজা হিন্দুশাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিল। পুরাণ ও উপপুরাণ শাস্ত্র গুলি, হিন্দু-দেব-দেবী সমূহের এক একটীকে অবলম্বন করিয়া লিখিত। এই সকল শাস্ত্রে সাম্প্রদায়িক অন্যান্য বিদ্বেষ ও বিবাদের যথেষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার, স্থানবিশেষে বিভিন্ন মত সকলের একতা-সংস্থাপনের চেষ্টাও দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারত ও রামায়ণ ইতিহাস নামে পরিচিত। আমি মহাভারতকে পুরাণ বলিয়া বিবেচনা করি এবং বাল্মীকীয় রামায়ণকে কোনও শাস্ত্র-গ্রন্থ মনে না করিয়া সংস্কৃত ভাষার একখানি সুন্দর মহাকাব্য বলিয়া মনে করি। শৈব ও বৈষ্ণবগণের মতৈক্য সংসাধনের জন্য কোনও কবি এমন একটী মূর্ত্তি পূজার আবিষ্কার করিলেন যে, তাঁহার অর্দ্ধাংশ শিব ও অপরার্দ্ধ বিষ্ণু। পুনশ্চ একজন সুরসিক কবি জগতের জনক ও জননী হর ও গৌরীর এক দেহ কল্পিত করিয়া ইঁহাদের ভক্তগণের আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছেন। ইঁহারা বৈদিক অগ্নিসোমৌ, মিত্রাবরুণৌ, ইন্দ্র বায়ু প্রভৃতি দ্বিদেবগণের অনুকরণে সৃষ্ট। পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক নিতান্ত অতি-স্বাভাবিক হরহরি ও হরগৌরীর একদেহে মিলন কল্পনা হইতে একটী শুভ্রোজ্জলাংশু-রেখা নির্গত হইতেছে। অধুনা ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ভারতবর্ষ যে সমগ্র পৃথিবী-ব্যাপিনী একতার জন্য মহতী বেদনা অনুভব করিতেছে, তাহারই অঙ্কুর ইহাতে লক্ষিত হয়। এক সময়ে সমগ্র ভারতকে কেবল শাক্ত-ধর্ম্মাক্রান্ত করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। গৃহীত উপায়টী এই:—দক্ষালয়ে শিবনিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিলে, বিষ্ণু তদীয় সুদর্শন চক্রে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে নিক্ষেপ করেন। (১) এই সকল স্থান শক্তি দেবীর পীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক্ষণে অধিষ্ঠিত-পীঠ নগর গুলি তীর্থ রূপে পরিগণিত। সমগ্র ভারতকে শাক্ত ধর্ম্মরূপ ঐক্য বন্ধনে বদ্ধ ও অনুপ্রাণিত রাখাই এই কল্পনার উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবতারগুলিও ভারতবর্ষকে বৈষ্ণব

(১) "সুদর্শন চক্রের প্রভাব অলৌকিক হইলেও, উমাদেবীর কোনও অঙ্গ আমেরিকা, ইংলণ্ড, রুশিয়া, চীন বা আফগানিস্থানে পতিত হয় নাই।" লেখক।

ধর্ম্মে একত্ব স্থাপানেরও প্রচুর সহায়তা করিয়াছে।

বৈদিককালে মুক্তি সম্বন্ধে ধারণা মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ। ইহা কোনও প্রকার দার্শনিক জটিলতায় দুরবগাহ নহে। বৈদিক মহর্ষিগণ কতকগুলি কর্ম্ম তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও কতকগুলি কর্ম্ম তাঁহাদের অকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এই সকল কর্ত্তব্যের অননুষ্ঠান ও অকর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানকে তাঁহারা পাপ বিবেচনা করিতেন। পাপ বশতঃ দেবগণের রোষভাজন হইতে হয়। [৭ম ৮৬-৪] পাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য, তাঁহারা দেবগণের সমীপে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেন। [৭ম ১০৪, ২৩ ও ৭ম ৮৬, ৩ ইত্যাদি]। পৌরাণিকগণ এই মুক্তিকে তাঁহাদের সামীপ্য, সাযুজ্য,সারূপ্য প্রভৃতিতে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। উপনিষদ্‌কারগণের মতে মায়া হইতে মোচনের নাম মুক্তি। আমি এই "মায়া" শব্দের ইতিহাসের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহিতেছি। কেননা, হিন্দুধর্ম্ম অধ্যেতৃগণের পক্ষে ইহা অত্যন্ত আবশ্যক। ঋগ্বেদসংহিতায় মায়া শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা ও শক্তি [৪-৩০ ১২ ও ২১ ঋক্ সায়ন-ভাষ্য]। বেদান্ত বা উপনিষৎ মতে রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় জীবের অবিদ্যাবশাৎ ব্রহ্মে জগৎ ভান হইতেছে। বস্তুতঃ জগতের অস্তিত্ব নাই। অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া প্রভাবে আমরা প্রতারিত হইতেছি। [ছান্দোগ্য উপনিষৎ দেখ] পক্ষান্তরে বৈদিককালে জগতের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। [৪-৩০-৩] সমগ্র বেদ সংহিতা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহাতে দেবগণ জগতের সৃষ্টি ও রক্ষা কর্ত্তা, অন্ন ও আয়ুদাতা রূপে বর্ণিত। কুত্রাপি তাঁহাদিগকে বিশ্বনাশক বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে যখন মৃত্যু ও প্রলয়ের কথা মহর্ষিগণের মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল, তখন তাঁহাদের মধ্যে বৈরাগ্যবাদ আসিল এবং সংসারের অনিত্যতা বোধ তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ বৈদান্তিক মায়াবাদে উপনীত করিল।

এইরূপে বৈদিক বলিষ্ঠ, কর্ম্মিষ্ঠ ও বর্ষিষ্ঠ মহর্ষিগণের আশাময়, উৎসাহময়, সারল্যময় পবিত্র স্বর্গীয় জীবন-সঙ্গীত আধুনিক হিন্দুত্বের মর্ম্মভেদী দুঃখসঙ্কুল রোদনের গানে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এইরূপে বৈদিক সংহিতা যুগের

> "মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
> মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥
> মধুনক্ত মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
> মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
> মধুমান্নো বনস্পতি র্মধুমাস্তু সূর্য্যঃ।
> মাধ্বীর্গাবো ভবন্তুনঃ॥

এই মধুময় সংসারচ্ছবি হিন্দুর চক্ষে জলন্ত অনল রাশি, ঘৃণ্য ভস্মস্তূপ ও পরিশেষে অস্তিত্ব-হীন মহাশূন্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

বৈদিক দেবগণ পৌরাণিকযুগে কীদৃশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন, তাহা দেখুন।

বৈদিক কালের বিষ্ণু সূর্য্যেরই নামান্তর। পৌরাণিক কালে ইনি শঙ্খ চক্র গদা-পদ্ম ধারী ত্রিবিক্রম। [ঋ ৭-১০০-৩ ও ৪]। বৈদিক রুদ্র পৌরাণিক শিবঠাকুর। সর্ব্বঋষি পূজিত সর্ব্বজ্ঞ বরুণ রাজা পৌরাণিক যুগে সমুদ্রাধিপতি পাশাস্ত্রধারী সামান্য দেবমাত্র। এই সকল আলোচনা করিয়াও, তুমি কি বলিবে যে, হিন্দুধর্ম্ম, খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর সময়ে যাহা ছিল, এখনও সেইরূপ আছে?

বৈদিক ঋষিগণ ইন্দ্রকে এই জন্য স্তব করিতেছেন যে,তিনি বজ্র দ্বারা বৃত্র (মেঘ—সায়নভাষ্য) কে বিচ্ছিন্ন করিয়া নদী সমূহকে জল প্রদান করিতেছেন। [১ম ৩২ সূ]। ইহার উপর, কল্পনাপ্রিয় পৌরাণিকগণ বৃত্রাসুরবধ উপাখ্যান রচনা করিলেন। বৈদিক নক্ষত্র চক্ষুঃ ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিয়া অহল্যা [যে ভূমি এত কঠিন যে, তদুপরি হল কর্ষণ নিতান্ত অসাধ্য] কে হল্যা (হলচালন যোগ্যা) করিয়া তুলিয়াছিলেন। পৌরাণিকেরা ইহার উপর এক কুৎসিৎ উপন্যাস প্রস্তুত করিয়াছেন। বৈদিক ইন্দ্র ব্রাহ্মণগণের উপাস্য, পৌরাণিক ইন্দ্র সময়ে সময়ে ব্রহ্মকোপানলে দহ্যমান। বৈদিক ইন্দ্র বীরের আদর্শ, অসুর বিজয়ী, অসামান্যপ্রভাব, স্তোতার বরদাতা ইত্যাদি [৩ মং ৪২ সূক্ত] আর পৌরাণিক ইন্দ্র (১) অসুর ভয়ে সদাভীত,বন হইতে বনান্তরে গুপ্তবেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন, কুটিলচিত্ততা ও ছদ্মবেশ তাঁহার নিত্য সহচর,কোনও পার্থিব নরনবতি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেই, তাঁহার প্রাণ পাখী দেহ-পিঞ্জর ছাড়ে আর কি? তখন তিনি ত্রায়াত্রায় বোধশক্তি রহিত হন। সৎবা অসৎ যে কোনও উপায়ে স্বকার্য্য সিদ্ধি করিতে হইবে, এ বিষয়ে তিনি মোগল ভূপতি আরংজীবকেও পরাজিত করিয়াছেন। বৈদিক দেবতাগণকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকখানি পুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে, যথা, অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ,সূর্য্য পুরাণ, ইত্যাদি। কিন্তু "ইন্দ্র পুরাণ" রচিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ ও পারিজাত হরণ প্রভৃতিতে ইন্দ্রের যথেষ্ট লাঞ্ছনা করিয়াছেন। রাবণের এক পুত্রের নাম ইন্দ্রজিৎ। আত্মত্যাগের মহান্ আদর্শ মহর্ষি দধীচির অস্থিতে ইন্দ্র বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া বৃত্রাসুর বধ করেন। কিন্তু দধীচি মুনির আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে, বেদসংহিতায় ইন্দ্রকে বজ্রায়ুধ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কল্পনার মোহময়ী মদিরায়, পুরাণ-রচয়িতা ঋষিগণ ইহা লক্ষ্য করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। বৈদিক সংহিতাতে ইন্দ্রকে "শচীপতি" শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু পুরাণ গৃহীত অর্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। যাস্ক, সায়ন প্রভৃতি বেদব্যাখ্যাতা আচার্য্যগণ শচীপতি শব্দের অর্থে শচী অর্থাৎ কর্ম্ম সকলের পতি অর্থাৎ পালক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইন্দ্র অধ্যক্ষ থাকাতেই, বৈদিক যজ্ঞ প্রভৃতি আর্য কর্ম্ম সকল নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইত। কর্ম্ম অর্থে শচী শব্দ বেদের সর্ব্বত্র প্রযুক্ত। পুরাণ-বর্ণিতা শচী পরমা সুন্দরী চিরযৌবনা, হাবভাবকেলিনিপুণা, ভরতমুনি-পরিচালিত গন্ধর্ব্ব-অপ্সরঃ সম্পাদিত রঙ্গমঞ্চের রসভঙ্গ উদ্ঘাটনের পারদৃশ্বরী। এ হেন শচী যাঁহার বামপার্শ্বশোভিনী,সেই ইন্দ্রও মধ্যে মধ্যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অবলা সরলা ঋষি বালাদের সর্ব্বনাশে সমুদ্যত! বৈদিক ইন্দ্রের উপাসনা তো বহুদিন হইল লোপ পাইয়াছে। হিন্দুর পূজাগৃহেও পৌরাণিক ইন্দ্রের দর্শন পাইবে না। তবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বহুদিন ধরিয়া শেষোক্ত ইন্দ্রের ধ্যান করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের সুকৃত ফলে নব্য বঙ্গ জীবনে এই ইন্দ্র- আদর্শের সামান্য অংশব লক্ষিত হয়, নতুবা হে বঙ্গীয় যুবক! তুমি এই ঋষি-

---

(১) কখনও তিলোত্তমা, উর্ব্বশী, রম্ভা, চিত্রলেখা প্রভৃতি সুরসুন্দরীর সহিত মন্দাকিনী-শীকরসিক্ত চির-বসন্ত-অনিল-আধুনিত-পারিজাত-সেবিত নন্দনকাননে মদন বিলাসে অভিভূত কখনও অসুর ইত্যাদি।

নীতে তোমার শচীকল্পা তরুণীকে অরুন্তুদ বিরহবাণে বিদ্ধ করিয়া পরের দ্বারে মধু অনুসন্ধান করিতেছ কেন ?

যাহা হউক, "শচী" শব্দের মূর্ত্তি পরিগ্রহের ন্যায়, হবিঃ প্রক্ষেপক "স্বাহা" মন্ত্রটীও পৌরাণিক কালে নয়নগ্রাহ্যা সুন্দরী যুবতী সাজিয়া অগ্নি গৃহিণী হইয়াছেন। তুমি তথাপি, কি বলিবে যে, হিন্দুধর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয় সনাতন ?

মহর্ষিগণ পুরাণ ও উপপুরাণ রচনা করিয়াও সুস্থির থাকিতে পারেন নাই। তাঁহারা এখন এমন একটী বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন, যাহাতে ভারতীয় ধর্ম্ম একেবারে নূতন আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্র রচনা ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। যুগভেদে ধর্ম্মভেদ স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে। এ জন্য তন্ত্রসৃষ্টি অত্যন্ত সহজ ব্যাপার হইয়া উঠিল। তন্ত্র প্রণেতা বলেন, বেদ সত্যযুগের জন্য, কলিকালে আগম ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তন্ত্রের অপর নাম আগম। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহানুভূতি প্রাপ্তি আশায়, জনৈক কবি আগম শব্দের এই অর্থ করেন।

'আ'গতং শিববক্ত্রেভ্যো 'গ'তঞ্চ গিরিজাশ্রুতৌ
'ম'তঞ্চ বাসুদেবস্য 'তস্মদাগমঃ উচ্যতে ॥

শিব স্বয়ং তন্ত্রবক্তা, গিরিজা শ্রোত্রী ও বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণ তন্ত্রের অনুমোদক। বেদ হইতে উপপুরাণ পর্য্যন্ত সকল শাস্ত্রই, তন্ত্ররচয়িতৃগণের জ্ঞাত ছিল। তাঁহারা প্রাক্কালীন শাস্ত্র সকল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, ও নূতন অনেক রচনা করিয়া, কল্পনী বিপ্রবের ন্যায়, ভারতীয় ধর্ম্মজগতে মহান্ বিপ্লব সংঘটন করিতে সমুদ্যত হইলেন। পৌরাণিক কালেই পতঞ্জলির যোগদর্শন ভারতের উপর খুব প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল। অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধির প্রলোভন রূপপত্র মোহের ন্যায় জন-সাধারণকে আত্মহারা করিয়া তুলিয়াছিল। তন্ত্র শাস্ত্র এ সুযোগ অবহেলা করিবার পাত্র নহেন। তিনি এই যোগমার্গকে আরও অন্ধকারময় দূরতম প্রদেশে প্রসারণ করিলেন। ষট্ চক্র ভেদ ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অথর্ব্ববেদ বহুকাল পরে 'ত্রয়ী' তে সংযোজিত হইয়াছিল। এই অথর্ব্ববেদ অভিচার, বশীকার, ইন্দ্রজাল, প্রভৃতি বিষয়ক বহুবিধ মন্ত্রের ভাণ্ডার। তন্ত্র শাস্ত্র এই ভাণ্ডার আত্মসাৎ করিলেন। অনেক তান্ত্রিক দেব-দেবী আছে, ইহাদের কল্পনা নিতান্ত কষ্টসাধ্য। এই সকল দেব দেবীর বীজ ও শাখা মন্ত্রে তন্ত্র শাস্ত্র পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তন্ত্র বৈদিক মন্ত্রের ন্যায় সুগুপ্ত শাস্ত্র। তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ না করিলে, ইহার প্রকৃত মর্ম্মস্থলে প্রবেশ নিতান্ত দুঃসাধ্য। এই জন্য ইহার সকল রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিলাম না। তন্ত্র শাস্ত্রও বামাচার, বীরাচার, কুলাচার, পশ্বাচার, কাপালিকতা প্রভৃতি নানা শাখায় বিভক্ত। তন্ত্র শাস্ত্র নিতান্ত আধুনিক। (১)

(১) গত এপ্রিল মাসের একখণ্ড Bi-weekly Bengalee তে দেখিলাম যে, সম্প্রতি নেপাল হইতে "কুবলয় তন্ত্র' নামে একখানি তন্ত্রের পাণ্ডুলিপি এসিয়াটিক সোসায়েটিতে আনীত হইয়াছে। এই পাণ্ডুলিপি অতি প্রাচীন; "খ্রীঃ পূঃ ছয়শত বৎসর ইহার কাল।" উক্ত বেঙ্গলির সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন, "এই আবিষ্কার তন্ত্রশাস্ত্রের আধুনিকত্বের প্রবল বিরোধী।"

এক্ষণে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ইহার মীমাংসা করুন।

"শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা।"
বেদব্যাস।

এ শ্লোকে তন্ত্রের নাম নাই। তন্ত্রের অতি সহজ সংস্কৃত ভাষাও ইহার আধুনিকত্বের অন্যতম প্রমাণ। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য তদীয় ভাষ্যে স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে প্রমাণ স্বরূপ বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তন্ত্রের একটী শ্লোকও দেখিতে পাওয়া যায় না। তন্ত্র শাস্ত্র যে প্রাচীন নহে, ইহাও তাহার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এমন কি, বিদ্যালয়ে পাঠদশায়, আমি একখানি তন্ত্র রচনার কথা শুনিয়াছি, তাহাতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের বীজ মন্ত্র ও তদ্‌গ্রহণের আবশ্যকতা লিখিত আছে। তন্ত্র শাস্ত্রের আধুনিকত্ব তত দোষাবহ নহে। বঙ্গদেশের প্রথম সংস্কারক রামমোহন রায় তন্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম উদ্ধার ও প্রচারের অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। তিনি ইহাকে অবজ্ঞা করেন নাই। বস্তুতঃ কোনও ধর্ম্মগ্রন্থই অবজ্ঞেয় নহে। কেননা, ধর্ম্মগ্রন্থ মাত্রেরই উদ্দেশ্য, যাঁহা হইতে জগৎ ও আত্মার প্রকাশ, তাঁহার বিষয়ে জ্ঞান ও ভক্তি প্রদান। তন্ত্র শাস্ত্রের পঞ্চ-মকার (মৎস্য, মাংস, মুদ্রা, মৈথুন ও মদ্য) সমুদয় সুসভ্য ও সুশিক্ষিত সমাজে ঘৃণ্য—ইহা নিঃসন্দেহ। ধর্ম্মের উন্নততম শিখরে আরোহণ করিয়া, মনুষ্যের পদস্খলন ও বীভৎস দুর্গন্ধ খাতে পতন হয়—পঞ্চ-মকার জগতকে ইহাই সাক্ষ্য দিতেছে। যদিও তন্ত্রে ইহার সুন্দর আধ্যাত্মিক অর্থ বিদ্যমান, তথাপি ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, কালীঘাট প্রভৃতি তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের প্রধান প্রধান রঙ্গভূমিতে সে সূক্ষ্ম অর্থ পরিগৃহীত না হইয়া, ইহার স্থূল অর্থ অনুসারে কার্য্য হইয়া থাকে। পঞ্জাব, বোম্বে, মান্দ্রাজ প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে তান্ত্রিকতার প্রাধান্য অধিক। মৃত শব মলমূত্র ভক্ষণকে ধর্ম্মাচরণ জ্ঞান করা ভূ ভারতে আর কোথাও নাই, ইহা অতিবাদ নহে। বাঙ্গলারই কৃষ্ণানন্দ "তন্ত্রসার" সংগ্রহ করিয়াছেন। "প্রাণতোষণী" তন্ত্রসংগ্রহেরও বঙ্গদেশে উৎপত্তি। তান্ত্রিকী দীক্ষারূপ সূচীর আকৃতিতে তন্ত্র হিন্দু সমাজে প্রবেশ করে। শূদ্র ও স্ত্রীগণের বেদে অধিকার নাই, সুতরাং তাহারা বৈদিক দীক্ষা-বিবর্জ্জিত। তাহারা প্রথমে তন্ত্রোক্ত দীক্ষা গ্রহণ করে, ইহা তাহাদের ধর্ম্মভাব সংপোষণের অনুকূল হইয়াছিল। ক্রমশঃ ব্রাহ্মণগণেরও এই ধারণা দৃঢ়মূল হইতে লাগিল যে, পরকালে সদ্গতি লাভের জন্য বৈদিক গায়ত্রী অপেক্ষাও তন্ত্রোক্ত মন্ত্র গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। এ জন্য, পুরোহিত অপেক্ষা গুরুর অধিক সম্মান দেখা যায়। পূর্ব্বে তান্ত্রিকীদীক্ষা optional ছিল, এক্ষণে ইহা compulsory হইয়া দাঁড়াইতেছে। তথাপি আমি অনেক ব্রাহ্মণকে তন্ত্রদীক্ষা হইতে যাবজ্জীবন বিরত দেখিয়াছি। যেমন তান্ত্রিক যোগীর বিশ্বাস, শরীরস্থা কুলকুণ্ডলিনীকে জাগরিতা করিতে না পারিলে সিদ্ধ হওয়া যায় না, সেইরূপ তান্ত্রিক উপাসকগণের বিশ্বাস, যে কোনও দেবমন্ত্র হউক না কেন, তাহার চৈতন্য সঞ্চার করিতে না পারিলে কোনও ফলোদয় হয় না। একটী উদাহরণ শুনুন, মনে করুন, কালীদেবীর একটি মন্ত্রগ্রহণ করিলেন, ন্যাসাদি ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা সেই মন্ত্র-চৈতন্য করিলে, কালীদেবী আপনাকে দর্শন দান ও আপনার সহিত কথা-

বার্ত্তা করিবেন। হাওড়া জেলার অন্তর্বর্ত্তী আমতা গ্রাম শক্তিদেবীর একটি পীঠ স্থান। সেখানে একটী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের সহিত আমার আলাপ হয়। তিনি তান্ত্রিক সন্ধ্যা গায়ত্রী ব্যবহার করেন। বৈদিক সন্ধ্যা ও গায়ত্রী একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। গোপনে, উপনয়ন প্রভৃতি দশসংস্কার তন্ত্র মতে সমাধা করেন। তাঁহার বিশ্বাস, "কলি যুগে তন্ত্র ব্যতীত অন্য সকল শাস্ত্রই অপ্রামাণিক ও অগ্রাহ্য" [মহানির্ব্বাণ তন্ত্র দেখ।] বর্ত্তমান কালের যোগী Theosophical Society তন্ত্রশাস্ত্র লইয়া খুব নাড়াচাড়া করিতেছেন। আমি "জ্ঞান সঙ্কলনী" প্রভৃতি দুই এক-খানি তন্ত্র দেখিয়াছি। তাহারা তান্ত্রিকতা দোষ রহিত।

যখন মুখুয্যেদের খিড়কির পুষ্করিণী হইতে বিলাতের পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত মতভেদ বিদ্যমান, তখন এই সকল হিন্দুশাস্ত্রে যে মতদ্বৈধ নাই, এরূপ আশা করা যায় না। অনুমান ৫।৬ বৎসর হইল, 'সাধনা'র ধর্ম্ম জঙ্গল শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখক মহাশয় ঘোর তমসাচ্ছন্ন হিন্দুধর্ম্ম-অরণ্যানীতে প্রবেশ করিয়া দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন। বাস্তবিকই বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম এমনই কণ্টকাকীর্ণ "পাঁচফুলের সাজি" হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। এমন অন্যোন্যবিরোধী মতসমাকুল ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর নাই। তথাপি যাঁহারা সমগ্র হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস পক্ষপাতশূন্য হইয়া পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহ আমার সহিত একবাক্যে বলিবেন যে, বেদসংহিতা হইতে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম ঈশ্বরবিরহে ক্রন্দন ও অতৃপ্ত অপূর্ণ ঈশ্বরসম্ভোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক কথায় সুবিস্তৃত হিন্দুধর্ম্মকে এই বেদান্ত সূত্রে বদ্ধ করা যায় "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।" [বে স্-১-১] যদিও সময়ে সময়ে এই ব্রহ্মোন্মুখিতার ব্যভিচার হিন্দুর ইতিহাসে দেখা গিয়াছে, তথাপি সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষিত হইয়াছে যে "Man is Man for a' that" (১)

এই সঙ্গে, আমার একথা বলা কর্ত্তব্য যে, মানব স্বভাবোচিত স্বাধীন চিন্তাই হিন্দু

(১) কিন্তু কঠোরশ্রমী স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত তদীয় "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের উপক্রমণিকাতে আমার এই কথার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি শ্রুতি স্মৃত্যাদি হিন্দুশাস্ত্রকে এবং জগদ্বিখ্যাত ভারতীয় ছয় দর্শনকে নাস্তিকতায় পরিপূর্ণ বলিয়াছেন। সুতরাং তত্তৎশাস্ত্র মর্য্যাদক সমগ্র হিন্দু জাতিকেই নাস্তিক বলিয়াছেন। তাঁহার কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে আমি পাঠকগণকে ঐ গ্রন্থখানি পাঠ করিতে ও স্বয়ং মীমাংসা করিতে অনুরোধ করি। দত্তমহাশয় বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনগুলিকে নিরীশ্বর বলিতে চাহেন। অথবা, যিনি কার্য্য + প্রার্থনা = ফলসিদ্ধি এবং কার্য্য = ফলসিদ্ধি ∴ প্রার্থনা ০, এই সমীকরণ দ্বারা প্রার্থনার মূল্য শূন্য নির্দ্ধারণ করিতে কিঞ্চিৎমাত্র কুণ্ঠিত হননাই, তাঁহার নিকট দর্শন-রচয়িতৃগণ যে নাস্তিকতা দোষে দুষ্ট হইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। মহাত্মা অক্ষয় কুমারের নিকট বঙ্গভাষা খুব ঋণগ্রস্তা, কিন্তু এজন্য তদীয় শাস্ত্র বিষয়ক মত যে সকল বঙ্গবাসিগ্রাহ্য হইবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই গ্রন্থ এফ, এ পরীক্ষার্থিনীদের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। এই ব্যক্তিগত ভ্রান্তমত অধ্যয়নে বালাগণের কতদূর সুশিক্ষা হইতে পারে, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করুন। আমার বিবেচনায়, ঐ গ্রন্থের উপক্রমণিকাংশ পরিবর্জ্জন করিয়া কেবল মূলভাগ স্ত্রীপাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃকল্প।

ধর্ম্মের অস্থি মজ্জা। এ নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্রে পরস্পর বিরুদ্ধ বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্ব নিকৃষ্ট সংস্কার, মলিনীকৃত দেশাচার ও কলুষীভূত সমাজের অবশীভূত এইরূপ স্বাধীন চিন্তাই যে, জাতীয় ধর্ম্মোন্নতির বিপুল সহায়ক, এ কথার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। হিন্দু শাস্ত্রে এই সাহসিক শ্লোক লিখিত আছে :—

"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অযুক্তং তৃণবত্ত্যাজ্যং যদ্যুক্তং পদ্মজন্মনা ॥ যোগবাশিষ্ঠ।

"বালকেরও বাক্য যুক্তিযুক্ত হইলে উপাদেয়। পক্ষান্তরে, কমলযোনি ব্রহ্মা যদি অযুক্ত কথা বলেন, তাহাও তৃণবৎ পরিত্যাজ্য।"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বৈদিক সংহিতার মহর্ষিগণের বহুদেববাদ [ম্যাক্সমূলর ইহাকে ইষ্টেশ্বরবাদ (Henotheism) বলেন, এই সংজ্ঞাই অধিকতর সঙ্গত।) ক্রমশঃ একেশ্বরবাদ অভিমুখে প্রধাবিত হয় এবং অবশেষে তাহা উপনিষদের ব্রহ্মবাদে পরিসমাপ্ত হয়। এমন কি, সংহিতা মধ্যেই শেষের দিকে এই একত্ব জ্ঞানের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ঋষিগণ এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, সকল দেবতা এক। অগ্নিকে ইন্দ্র, বিষ্ণু, সবিতা, পূষা ও অদিতি বলা হইয়াছে। এমন কি, অগ্নি সর্ব্বদেব বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। (ঋগ্বেদ, ৫ম, ৩সূ) অথর্ব্ববেদের এক স্থানে দেখা যায়, "সন্ধ্যাকালে অগ্নি বরুণ হইয়া উঠেন, প্রাতরুত্থান কালে তিনি মিত্র হন, শেষে সবিতা হইয়া তিন আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করেন এবং মধ্যাহ্নকালে ইন্দ্র হইয়া স্বর্গ উত্তপ্ত করেন।" (১৩-৩-১৩)। পুনশ্চ

"সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ঃ বাচোভিঃ
এক সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।

মেধাবী কবিগণ একমাত্র পক্ষী (সূর্য্য) বা পরমাত্মাকে বাক্য দ্বারা নানারূপে বর্ণনা করেন। (ঋগ্বেদ ১০ম, ১১৪, ৫)

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণং অগ্নিমাহুঃ
অথো দিব্যঃ সঃ সুপর্ণঃ গরুত্মান্
একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥

জ্ঞানী ঋষিগণ একমাত্র সৎপদার্থকেই ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, স্বর্গীয় গরুড়; পক্ষী, যম ও বায়ুশব্দে অভিহিত করিয়াছেন। (ঋগ্বেদ, ১-১৬৪-৪৬)

মনুসংহিতায় এই কথারই প্রতিধ্বনি শ্রবণ করুন।

"এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্মশাশ্বতম্।

কেহ ইহা (পরমপুরুষ)কে অগ্নি, কেহ প্রজাপতি মনু, কেহ ইন্দ্র (১), কেহ প্রাণ ও অপার শাশ্বত ব্রহ্ম বলেন। (মনুসংহিতা ১২শ অধ্যায়, ১২৩ শ্লোক।)

"যে অনন্ত শাশ্বত ব্রহ্ম ঋগ্বেদের সংহিতা-রচনা কালে পর্ব্বত, নদী, সূর্য্য, আকাশ, উষা, চন্দ্র, বিশ্বকর্ম্মা, প্রজাপতি প্রভৃতির অন্তরালে পরিলক্ষিত হইতেন, উপনিষদে সেই মহান্ দেব আপনার উচ্চতম ও পবিত্রতম মূর্ত্তিতে পরিদৃষ্ট। (ম্যাক্সমূলর হিবার্ট লেক্‌চর।"

এই অনন্ত উদ্দেশে ঋষিগণ যে সূক্ষ্ম ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম পথের পান্থ হইয়াছিলেন, উপনিষৎ সেই পথের শেষ সীমা। অদ্বৈতবাদই এই শুভ যাত্রার উন্নততম ও বিশুদ্ধতম ফল। কিন্তু পরবর্ত্তী অন্যান্য ঋষিগণ মানুষীকরণের (Anthropomorphism) পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া পরিশেষে পৌরাণিক অবতারবাদে উপনীত হইয়াছিলেন। ক্রমভাবটি এইরূপ

(১) মহর্ষি মনুর সময়ে ইন্দ্রের পৌরাণিক দুর্দ্দশা ঘটে নাই।

বৈদিক ঋষিগণ কবিসুলভ ভাব-বশে ইন্দ্রের ধৃতবজ্রহস্ত, বরুণের সহস্রচক্ষুঃ প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। যজ্ঞসম্ভারপূরিত ব্রাহ্মণ যুগে দেবগণের বহুমুখ হস্তযুক্ত মূর্ত্তি কল্পনা আরব্ধ হয়। পুরাণ-কালে, দেবগণ মনুষ্য-দেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূমণ্ডলে, না, ভারত-মণ্ডলে অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করেন। এই হেতু, সুদূর বৃন্দাবনবিহারী নটবর শ্যামাঙ্গের জন্য নদীয়াবিহারী গৌরাঙ্গের পাষাণ-ভেদী বিরহ-রোদন এবং কাহারও মতে, শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ পরমহংসদেব শ্রীমদ্গৌরাঙ্গের অবতার।

আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম এই অদ্বৈতবাদ ও অবতারবাদের সঙ্করীকরণ মাত্র। ব্রহ্ম-সঙ্গীত এই উভয়বাদ পরিহার করিয়া কেবল একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রকে একটী মহান্ বৃক্ষ কল্পনা কর। ঋগ্বেদসংহিতা ইহার বীজ, ব্রাহ্মণ ইহার প্রকাণ্ড, উপনিষৎ ও পুরাণ ইহার দুইটী শাখা, ষড়্দর্শন উপনিষদের ও উপপুরাণগুলি পুরাণের প্রশাখা, তন্ত্রশাস্ত্র ইহার পরগাছা বা আলগ্‌লতা, অসংখ্য সম্প্রদায়গ্রন্থগুলি ইহার পত্র ও ব্রহ্মসঙ্গীত ইহার চিরশোভিত সুগন্ধি পুষ্প। পৃথিবীর তাবৎ ধর্ম্মবৃক্ষের ন্যায় ইহারও অতি মহৎ ফল ঈশ্বর-সম্মিলন।

বৈদিক প্রার্থনা আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে ব্রহ্মসঙ্গীতের একটি প্রার্থনা শ্রবণ করুন।

"দেহ জ্ঞান দিব্য জ্ঞান, দেহ প্রীতি শুদ্ধপ্রীতি,
তুমি মঙ্গল আলয়।
ধৈর্য্য দেহ বীর্য্যদেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ,
বিবেক বৈরাগ্য দেহ, দেহ ও পদে আশ্রয়।"

ইহার একটী উষাসঙ্গীত দেখুন।

"অয়ি সুখময়ি উষে! কে তোমারে নিরমিল?
বালার্ক সিন্দুর ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল?
হাসিতেছ মৃদু মৃদু
আনন্দে ভাসিছে সবে
কে শিখাল এই হাসি, কেবা সে যে হাসাইল।"

ইত্যাদি।

রামমোহন কৃত গীতাবলী স্পষ্টতঃ উপ-নিষৎ হইতে গৃহীত। ঋক্সঙ্গীত ও অন্যান্য-ব্রহ্ম সঙ্গীতের স্থানে স্থানে বেশ ঐক্য আছে। (১) ঈশ্বরের পিতৃত্ব।

যনীং সবাধঃ পিতরং ন পুত্রাঃ
সমান দক্ষা অবসে হবন্তে।"

পুত্রগণ যেমন পিতাকে আহ্বান করে, সেইরূপ সমোৎসাহ ঋত্বিক্ সকল স্তোত্র ও শস্ত্র দ্বারা রক্ষা পাইবার জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন। [৭-২৬-২]

"নহি ত্বদন্যন্মঘবন্ন আপ্যং
বস্যো অস্তি পিতা চন॥"

হে মঘবন্! তোমা ভিন্ন আমাদের অন্য কোনও ধন নাই এবং তোমা ভিন্ন আর আমাদের স্তবনীয় পিতা নাই। [৭-৩২-১৯] ইত্যাদি।

ব্রহ্ম সঙ্গীত।

"তুমি কি গো পিতা আমাদের?
ওই যে নেহারি মুখ অতুল স্নেহের।
"পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে
ভুলে যাও সব অভিমান॥ ইত্যাদি।

(২) ঈশ্বরের মাতৃত্ব।

"উশতীরিব মাতরঃ।" [সন্ধ্যাবিধি]

মাতার ন্যায় জল আমাদের মঙ্গলকামনা করেন।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

"জননী সমান, করেন পালন,
সবে বাঁধি আপন স্নেহগুণে।
* * * *
কেবা জানে কত সুখ রত্ন দিবেন মাতা,
লয়ে তাঁর অমৃত-নিকেতনে।"

(৩) ঈশ্বরের বন্ধুত্ব।

"য ইন্দ্র শুষ্মো মঘবন্তে অস্তি
শিক্ষা সখিভ্যঃ পুরুহূত নৃভ্যঃ।

হে পুরুহূত (ইন্দ্রকে অনেকে আহ্বান করে, এজন্য ইন্দ্রের নাম পুরুহূত) মঘবন্ ইন্দ্র! তোমার যে বল আছে, তোমার সখা মনুষ্যগণ (স্তোতা ঋষিগণ) কে সেই বল প্রদান কর। [১-২৭-২] ইত্যাদি।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

"প্রেমমুখ দেখহে তাঁহার।

* * * *

সকল সময়ে বন্ধু তিনি এক, সম্পদে বিপদে। ইত্যাদি।',

"তুমি একজন হৃদয়ের ধন।

* * * *

কারু পিতা, কারু মাতা, কারু সুহৃৎ সখা হও।"
ইত্যাদি।

(৪) ঈশ্বরের প্রিয়তমত্ব।

"মা হেড়ে ভূম বরুণস্য বায়ো
র্মা মিত্রস্য প্রিয়তমস্য নৃণাম্।"

'আমরা যেন মনুষ্যগণের প্রিয়তম বরুণ, বায়ু, ও মিত্রের ক্রোধভাজন না হই। [১-৬২ ৪-]

ব্রহ্মসঙ্গীত।

"ডেকেছেন প্রিয়তম,
কে রহিবে ঘরে।
ডাকিতে এসেছি তাই
এস ত্বরা করে।" ইত্যাদি।

(৫) ঈশ্বরের রাজভাব।

"হব্যং নো মিত্রো অর্যমা সুজাতো
রাজা সুক্ষত্রো বরুণো জুষন্ত।

"মিত্র, শোভন জাত অর্য্যমা ও বলশালী রাজা বরুণ আমাদের হব্য গ্রহণ করুন।" [১-৬৪-৪]

ব্রহ্মসঙ্গীত।

"কি ভয়, অভয়ধামে, তুমি মহারাজা
ভয় যায় তব নামে।" ইত্যাদি।"

(৬) সুমতি প্রার্থনা।

"ত্বং বিষ্ণো সুমতিং বিশ্বজন্যা—
মপ্রযুতা মেবযাবো মতিং দাঃ।"

হে কামপ্রদাতঃ বিষ্ণো, তুমি আমাদিগকে দোষরহিত বুদ্ধি ও বিশ্বজনীন সুমতি দান কর। [১-১০০-২]

ব্রহ্মসঙ্গীত।

জয় দেব, জয়দেব।

* * * *

ইহলোকে সুমতি দেও, পরলোকে সুগতি॥

(৭) ধনপ্রার্থনা।

"আধ্রশ্চিদ্যং মন্যমানস্তুরশ্চি
দ্রাজা চিদ্যং ভগং ভক্ষীত্যাহ।"

যে ভগদেবের নিকট দরিদ্র ও রাজা উভয়েই "আমাদিগকে ধন দেও" বলিয়া প্রার্থনা করে। [১-৪১-২]

ব্রহ্ম সঙ্গীত।

"কর গভীর দারিদ্র্য হরণ।' ইত্যাদি।

কে জানে কোন্ অতীত কালে, পঞ্জাবের প্রবলবেগা সিন্ধুতটে বসিয়া, ভারতের নবাতিথি আর্য্যগণ "কস্মৈদেবায়হবিষা বিধেম?" (কোন্ দেবতাকে হবিঃ দ্বারা পূজা করিব?) বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন, আর আজ পূতনীরা ভাগীরথীর সাগরসঙ্গম সন্নিকটে, আমরা গাহিতেছি।

"সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি
ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে।',

সকল ভাষাই যে ভাবগ্রাহীর ভৃত্যা, তাঁহার নিকট নিশ্চয়ই ঋকৃসঙ্গীতের সংস্কৃত ও ব্রহ্মসঙ্গীতের বঙ্গভাষা উভয়ই তুল্য গ্রাহ্য। হে স্বর্গীয় সঙ্গীত! আমি কত সময় শোক তাপে জর্জ্জরিত হইয়া তোমার নিকট সান্ত্বনা পাইয়াছি। সংসার-চক্রে নিষ্পেষিত হইয়া, কত সময় তোমার নিকট আশ্রয় পাইয়াছি। তুমি আমার হৃদয়নাথের

জ্যোতিঃ আনয়ন করিয়া দিয়াছ। আমার রোগশয্যায় তোমারই করুণা রোগ-যন্ত্রণা বিস্মৃত করিয়া দিয়াছে। সংসারাসক্তির বিষম বিষবিকারে তুমিই ভিষকের কার্য্য করিয়াছ। পাপ ও অনুতাপের যন্ত্রণা হইতে তুমিই আমাকে মুক্তিদান করিয়াছ। আবার, হে প্রিয়, সুখের সময় তোমার আলিঙ্গনে রোমাঞ্চিতকায় হইয়াছি। হে সুন্দর, তোমার সৌন্দর্য্যে অমার তারা, পূর্ণিমার শশী, বর্ষার মেঘ, বসন্তের বায়ু আরও সুন্দর বোধ হয়। হে সুমিষ্ট, তুমি এই মধুময় জগতকে কাননে বা ভবনে, পথে বা নদী-তীরে, ঊষা বা সন্ধ্যায়, মধ্যাহ্নে বা নিশীথে, আরও মধুময় করিয়া থাক। হে বাঞ্ছিত, তুমি চিরদিন আমার সঙ্গে থাক।

শ্রীঅমৃতলাল ভট্টাচার্য্য।

বর্ষার গাথা।

অতুল সুষম, কেতকী কুসুম,
সুবাসে ছেয়েছে দিক্;
মেদুর পবন, মুরছি পড়িছে,
কুহরে কচিৎ পিক;
মেঘে ঢাকা মুখ, সুনীল আকাশ
চপলা চমকি চায়।
কারে যেন প্রাণ, বুকের ভিতরে
যতনে ডাকিছে আয়!
কে যেন আছিল, গিয়াছে চলিয়া,
স্মৃতি টুকু মনে জাগে,
আন্ কথা মনে ভাবিতে যাইয়া
তার কথা আসে আগে।
তমুময় ভাবে, উঠেনি ফুটিয়া
এখনো আমার প্রিয়া,
নয়ন এখনো, লভেনি তাহারে
লোলুপ চাহনি দিয়া—;
শুধু যেন তার, সুরভি গঠিত,
অশরীরি মুখখানি,
বাসনা নদীর উজান প্রবাহে
কল্পনা দেখায় আনি।
মধু ক্লান্তিভরা সুষুপ্তি আকর
প্রেমে উলসিত আঁখি।
শাশ্বরাগগড়া শীতল হাসিটী
স্নেহে প্রাণে দেয় ঢাকি।
পুলক গঠিত, সরস পরশ
সুখ মুরছার খনি,
করিতে তাহারে, নগন পরাণ,
চায় হৃদয়ের মণি।
সে যে কোথা আছে,জানিনা বুঝিনা,
প্রাণ তবু তারে চায়,
মেঘ'রথে চড়ি, সাধের কল্পনা
তারে অন্বেষিতে ধায়।
কড় কড় করি, ডাকে জলধর
বিজলী বিকট হাসে,
চলিত পরাণ নিরাশ হইয়ে
নিজ ঘরে ফিরে আসে।
মুদিরের ছায়া পড়েছে তমালে
বকুলে আঁধার মাখা,
বিজনের মুখে নিরাশার ছবি,
রয়েছে সতত আঁকা!
করুণ রাগিণী, করি আলাপন
নিভৃত মনের কথা,
ঝাউ তরুগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
গাথায় প্রকাশে ব্যথা।
কাকুলি জড়িত অস্ফুট কাঁহনি,
তরুর মরম টুটি.।
হয়ত পরশি কোন্ উপাদান
ভাষায় উঠিবে ফুটি

এমনি করিয়া উঠিবে ফুটিয়া
আমার সুখদা প্রিয়া,
সুরভি মাখান জোছনা মথিয়া,
আসিবে মাধুরী নিয়া।
(তার) অপার মাধুরী, অসীম সুষমা
হৃদয়ের মাঝে জাগে,
কে যেন তাহারে, রেখেছে ডুবায়ে,
সুগভীর অনুরাগে।
সে এলনা বলি, তাই এ যাতনা
ফুকারি কাঁদিছে মন,
মেঘে ভরা নভ বিষাদে হৃদয়
বিমলিন উপবন।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

ব্রাহ্মণ ও জাতিভেদ।

বিগত বারে "বর্ণভেদ ও জাত্যন্তর পরিণাম" নামক প্রস্তাবে আমরা প্রদর্শন করিয়াছি যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্থষ্টি-পকরণে বর্ণ ভেদের পূর্ব্বে যে জাতিভেদ হয়, তাহা যেমন নৈসর্গিক ব্যাপার, বর্ণভেদের পর প্রতি সমাজে যে জাতিভেদ ঘটে, তাহাও তদ্রূপ নৈসর্গিক ব্যাপার। প্রতি সমাজে বলিবার কারণ এই, জাতিভেদ সর্ব্ব মনুষ্য-সমাজেই লক্ষিত বা অলক্ষিতভাবে বিদ্যমান আছে। নৈসর্গিক ব্যাপারকে বিপর্য্যস্ত না করিয়া হিন্দু সমাজ যাহা শাস্ত্রানুযায়ী, তাহারই অনুসরণ করিয়াছে।

যাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ, তাহাদিগের নিকট অবশ্য সাত্ত্বিক ভাবেরই সমাদর অধিক। বর্ণভেদের নিয়ম-অনুসারে সমাজের যে ভাগে সেই সাত্ত্বিকভাব সমূহ প্রবল, আর্য্য-জাতি যে সেই সাত্ত্বিক ভাগেরই অধিক সমাদর করিবে, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। এজন্য প্রাচীন আর্য্য-সমাজে ব্রাহ্মণ-বর্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ গ্রহণ করিয়াছিল। কিরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বলিতেছি। সেই প্রস্তাবের প্রসঙ্গ ক্রমেই আর্য্য সমাজে কিরূপে জাতিভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয় যে, এ কল্পের প্রারম্ভে প্রথমে কতিপয় জীবন্মুক্ত পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। শুধু এ কল্পে কেন, প্রতি কল্পের প্রারম্ভে তাঁহাদের আবির্ভাব হয়। প্রতি কল্পের আদিতে জগতে বেদ প্রকাশ * করিবার জন্য কল্প হইতে কল্পান্তরে তাঁহারা আবির্ভূত হন। বেদ প্রকাশ করিয়া পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হন। বেদ কল্পে কল্পে এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিকল্পের যুগ ধর্ম্মানুসারে এই বেদের ক্রমশঃ বিলোপ হইতে থাকে সত্য, কিন্তু সৃষ্টিকালে আবার পুনরাবির্ভাবে তাহার সম্পূর্ণতা সাধিত হয়। একবার বেদ আবির্ভূত হইলে, ক্রমশঃ নানা কারণে তাহা জগন্ময় প্রচারিত হইতে থাকে। এ কল্পেও তাহা জগন্ময় নানা আকারে প্রচারিত হইয়াছে। কিরূপে হইয়াছে, তাহাও আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। সে যাহা হউক, এই বেদ-প্রকাশক বৈদিক ঋষিগণ হইতে নানা মনুর আবির্ভাব হয়। এই মনুগণ হইতে মনুজ মনুষ্যলোকের সৃষ্টি।

* বেদ ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা। এই ব্রহ্মজ্ঞান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিত্য নিয়মাদি ও ধর্ম্মজ্ঞান হইতে উৎপন্ন নিত্য বস্তুজ্ঞান। সেই নিত্যবস্তুর যোগমূলক প্রত্যক্ষই ব্রহ্মজ্ঞান।

একই মনুষ্যলোক কর্ম্মানুসারে কিরূপ নানা বর্ণে ক্রমশঃ বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, শাস্ত্রে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। আমরা "বর্ণভেদ ও যুগান্তর-পরিণাম" নামক প্রস্তাবে তাহার আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং সে কথার পুনরুল্লেখ এখানে আবশ্যক নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন, যাঁহারা সত্ত্ব গুণ প্রধান, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। সুতরাং কর্ম্মানুসারে যাঁহারা সত্ত্বগুণ-প্রধান ছিলেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ জাতির আদি পুরুষ ছিলেন। ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও কর্ম্মানুসারে প্রাচীনকালে যখন লোক চণ্ডালত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিলেন, তখন আর ক্ষত্রিয়ত্ব,বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্বের কথা কি? তাই মহাভারত বলিয়াছেন —

"ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কার্য্য দ্বারাই পৃথক পৃথক বর্ণলাভ করিয়াছেন।"

যাঁহারা কেবল সত্ত্বগুণে প্রধান ছিলেন, তাহারাই তবে ব্রাহ্মণ জাতির জন্মদাতা। সাত্ত্বিক-গুণ সম্পন্ন এই ব্রাহ্মণ্য সংরক্ষণ করিবার জন্য বেদ বর্ণাশ্রম নিয়ম নিয়োজিত করিয়াছেন। এই বর্ণাশ্রম নিয়মই প্রাচীন কালের প্রধান শিক্ষা-প্রণালীরূপে আর্য্য-সমাজে প্রবর্ত্তিত ছিল। এই শিক্ষা-প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য ধনোপার্জ্জন নহে, কিন্তু দেবত্বার্জ্জনই তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই বর্ণাশ্রম-নিয়ম কেবল ব্রাহ্মণ-বর্ণের নিমিত্ত নিয়োজিত হইলেও অপরাপর বর্ণ অধিকারানুসারে তাহা গ্রহণ করিতে পারিত। সে কথা পরে বিবেচ্য। এক্ষণে ব্রাহ্মণের নিমিত্ত যে আশ্রম-নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

*"বর্ণভেদ ও জাত্যন্তর পরিণাম"-নামক প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তির সূক্ষ্ম শরীর বা চিত্তপুরুষ ইহজন্মে যেরূপ গুণার্জ্জন করিয়াছে, পরজন্মে তাহার তদনুসারে জন্মলাভ হয়। সেই নিয়ম অনুসারে যাঁহার জন্ম ব্রাহ্মণকুলে হইয়াছে, ধরিয়া লইতে হইবে যে, তাঁহার সাত্ত্বিকগুণ অধিকতর প্রবল। কোন্ কুলে বা জাতিতে কাহার জন্ম হইবে, এ কথা তোমার আমার কাছে ঘোর প্রহেলিকা, কিন্তু ঐশ্বরিক সৃষ্টির নিয়মানুসারে তাহার অবশ্য নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। সেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন যে, যাহার যেমন কুলে জন্ম,তাহার গুণাংশ তদ্রূপ। নহিলে জন্মের ইতর বিশেষ হইবে কেন? বিভিন্ন কুলে বিভিন্ন লোকের জন্ম হইবে কেন? অধিকতর সাত্ত্বিক গুণ থাকাতে যাহার ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম হয়, তাঁহার সেই বীজগত শ্রেষ্ঠত্বের উন্মেষ সাধন করিবার জন্য উপনয়ন-সংস্কার ও চারি আশ্রম-নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

যিনি যে কুলে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি সেই কুলধর্ম্মানুসারে আশৈশব শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকেন। একজন ব্রাহ্মণের ঘরে যেরূপ আচার ব্যবহার,যেরূপ রীতিনীতি প্রচলিত, অন্য বর্ণভুক্ত লোকের ঘরে ঠিক তদ্রূপ আচার ব্যবহার ও রীতি-নীতি কখনই প্রচলিত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ করিয়া যে ব্যক্তি সেই কুলানুগত শিক্ষা মাতৃ-অঙ্ক হইতে প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাকে শৈশব কাল হইতেই তদ্রূপ শিক্ষায় প্রবর্ত্তিত রাখিবার জন্য ব্রাহ্মণের উপনয়ন-সংস্কার, বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাত্ত্বিক বীজোৎপন্ন হইলে কি হইবে, যতদিন ব্রাহ্মণ

উপনীত না হন, ততদিন তিনি শূদ্র। এই উপনয়ন-সংস্কারই ব্রাহ্মণকে দ্বিজত্ব দিবার প্রধান উপায়।

এই উপনয়ন-সংস্কার পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয়, তাহাতে উপনীত ব্যক্তি এই ত্রিবিধ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েন।

(১) ব্রতঞ্চরিষ্যামি তচ্ছেকেয়ং তেনর্দ্ধ্যাসমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি।

আমি বলিতেছি—প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালন করিব।

(২) তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ।

সেই ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে শক্যতা লাভ করিয়া এবং তাহাতে ধর্ম্ম-ঋদ্ধিসম্পন্ন হইয়া আমি অনৃত বা মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইব।

(৩) সত্যমুপৈমি স্বাহা।

আমি সত্যলাভ করিব।

এই প্রতিজ্ঞাত্রয় অত্যন্ত কঠিন বিষয়। প্রথমে দেখুন, ব্রাহ্মণপুত্র প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেছেন,আমি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিব। এই ব্রহ্মচর্য্য নিতান্ত নিগ্রহ ব্যাপার। ব্রহ্মে নিয়ত বিচরণ করার নাম ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মে নিয়ত বিচরণ করিতে হইলে শয়নে,ভোজনে, ও স্বপনে ব্রহ্ম-ধ্যান ও ব্রহ্মজ্ঞান করা চাই। ব্রহ্মচারী কখন ব্রহ্মহারা হইতে পারিবেন না। আহারে তিনি ব্রহ্মকে দেখিবেন, সুতরাং তাঁহার আহার পর্য্যন্ত সাত্ত্বিক নিয়মে পরিচালিত হওয়া উচিত। এইজন্য ব্রহ্মচারীর পক্ষে যে আহার বিহিত হইয়াছে, তাহা সাত্ত্বিক ভাবেরই পরিবর্দ্ধন সাধন করে। আচার ব্যবহারেও ব্রহ্মচারীর সাত্ত্বিকপথ নিয়োজিত। বেদ ও ব্রহ্মলাভার্থ ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে থাকিবেন। এই গুরুগৃহে তাঁহার পক্ষে যে নিয়ম নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা কেবল ভক্তিসাধক পথ। এই ভক্তিসাধক পথে তিনি অতি কঠিন শাসনে শাসিত থাকেন। এত কঠিন নিয়মে থাকিবার প্রয়োজন পার্থিব ধন সম্পত্তি নহে। যে ধন লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মচারী অতি কঠিন নিয়মে থাকেন, সে ধন ধর্ম্মসম্পত্তি। এই ধর্ম্ম লাভ করিবার জন্য তিনি অতি কঠিন সংযম শিক্ষা করেন। এই সংযমই ইন্দ্রিয় ও রিপুবশ করিবার প্রশস্ত পন্থা। যিনি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত না করিতে পারেন, তিনি কখন কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে শাসন করিতে পারেন না। এই রিপুগণের উপর জয়লাভ না করিতে পারিলে কখন ভক্তিপথের পথিক হওয়া যায় না। ভক্তিপথের পথিক না হইতে পারিলে কখন ধর্ম্মলাভ করা যায় না। এই ভক্তি সুধু দেবভক্তি নহে, যিনি গুরুজনকে ভক্তি করিতে পারেন,তিনিই দেবভক্তিতে উপনীত হইতে পারেন। সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ পিতা, মাতা, দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরুকে যিনি ভক্তি করিতে না পারেন,তিনি কি কখন অসাক্ষাৎ সূক্ষ্ম দেবতাকে ভক্তি করিতে পারেন? এজন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে প্রথমে গুরুভক্তি নিয়োজিত হইয়াছে। এই গুরুভক্তি লাভ করিতে হইলে গুরুর আদেশ প্রতিপালন করা আবশ্যক; গুরুর আদেশ ক্রমে কঠিন সংযম শিক্ষা চাই, ইন্দ্রিয় ও ক্রোধাদি রিপুগণকে বশ করা চাই। এইরূপ ভক্তি পথের পথিক হইতে পারিলে মানুষ দেবভক্তিতে আসিতে পারেন। দেবভক্তিতে না আসিতে পারিলে ব্রহ্মকে লাভ করা দুঃসাধ্য। ব্রহ্মকে লাভ না করিতে পারিলে ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করা মিথ্যা।

তবেই দেখা যাইতেছে, যিনি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিবেন, তিনিই কেবল ধর্ম্মধনে ধনী হইতে পারিবেন। যিনি ধর্ম্মঋদ্ধিতে

সম্পন্ন হইতে পারেন, তাহার পক্ষেই মায়া মোহ জয় করা সম্ভব। মায়া মোহ জয় করিতে হইলে মায়া কি, সে জ্ঞান হওয়া অগ্রে আবশ্যক। সে জ্ঞান কেবল বেদার্থ জ্ঞানেই লাভ করা যায়। মায়াই মিথ্যাদৃষ্টি। সেই মিথ্যা দৃষ্টি জ্ঞানচক্ষু না ফুটিলে অপসারিত হয় না। মিথ্যাদৃষ্টি অপসারিত না হইলে প্রকৃত সত্য ও নিত্যবস্তু কি, তাহা জানা যায় না। সেই প্রকৃত ও সত্য বস্তুই ব্রহ্ম। সুতরাং সত্যলাভের অর্থই ব্রহ্মলাভ। ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন এই—সত্য বা ব্রহ্ম লাভ। ব্রহ্মলাভই ব্রাহ্মণের মহাব্রত ফল। এই ব্রহ্মলাভেই ব্রাহ্মণ্য লাভ হয়। তাই উপনয়নকালে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, আমি মায়ামুক্ত হইয়া সত্য লাভ করিব।

উপনয়নকালে ব্রাহ্মণ যে ত্রিবিধ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েন, তাহার অর্থ কি, আমরা দেখিলাম। এই পরমার্থ লাভ কিরূপে হইবে, তজ্জন্য ব্রাহ্মণ উপনয়ন-কালে আর তিনটী গুরু-আদেশ গ্রহণ করেন। সেই আদেশত্রয় এই :—

(১) "সমিধমাধেহি।"

তুমি অগ্নি কার্য্য বা যজ্ঞকার্য্য করিবে।

(২) "আপোহশানং কর্ম্ম কুরু।"

যথাবিহিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আপকার্য্য করিয়া আহারাদি করিবে।

(৩) "মা দিবাস্বাপ্সীঃ।"

দিবাভাগে ঘুমাইবে না।

এইরূপ আদিষ্ট হইলে ব্রাহ্মণকুমার প্রতিজ্ঞা করেন—"করিব।"

সুতরাং তিনি উপনয়নকালে আরও এই ত্রিবিধ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞাসূত্র লইয়াছেন, এই তিন প্রতিজ্ঞা তাহাদের সাধক ও উপায়। যে সত্য লাভ করা ব্রহ্মচারীর প্রয়োজন, তাহারই উপায় এই তিন প্রতিজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি যজ্ঞকার্য্য করিব। ব্রহ্মলাভ উদ্দেশেই সমস্ত যজ্ঞকার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সকল যজ্ঞের শেষ, ব্রহ্মযজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞান। এই ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নিতে যোগী কিরূপ সর্ব্ব যজ্ঞাদির সমস্ত কর্ম্ম আহুতি দিয়া থাকেন, তাহা গীতার চতুর্থাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং সেই যজ্ঞাদির সমস্ত কর্ম্মের উল্লেখ করা এস্থলে আবশ্যক হইতেছে না। যে যজ্ঞাদির শেষ—ব্রহ্মযজ্ঞ, সেই যজ্ঞাদির মধ্যে সংসারাশ্রমের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডই নিবিষ্ট আছে। এজন্য দেখা যাইতেছে, সংসারীর সর্ব্বযজ্ঞের শেষ এই ব্রহ্মযজ্ঞে উপনীত হওয়া। যতদিন না এই ব্রহ্মযজ্ঞে উপনীত হইতে পারেন, ততদিন ব্রাহ্মণকে সমস্ত সাংসারিক কার্য্যে এক ব্রহ্মকেই স্মরণ করিয়া সমুদায় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। তাই দেখা যায়, ব্রাহ্মণকে সর্ব্বকার্য্যের পূর্ব্বে আপকার্য্য বা জলকার্য্য করিয়া ব্রহ্মকে স্মরণ করিতে হয়। তিনি আহার করিতে যাইতেছেন, তৎপূর্ব্বে সাবিত্রী-মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক জলকার্য্য আছে। এইজন্য, পাছে আহারেও তিনি ব্রহ্মকে ভুলিয়া যান। যদি আহারে তিনি ব্রহ্মকে ভুলিয়া যান, তাহা হইলে তিনি এমত আহার করিতে পারেন, যদ্দ্বারা তাহার রোগোৎপত্তি হইতে পারে। রোগোৎপত্তি হইলে তাহার প্রয়োজনসিদ্ধির ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। তিনি যেন শরীর-ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য জানিয়া আহারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন, শুধু আহারের জন্য পান-ভোজন নহে। শুধু যে আহারের সময় গায়ত্রী জপ করিয়া তাঁহাকে

জলকার্য্য করিতে হইবে এমত নহে,বিহারে, শয়নে, স্বপনে, ক্রীড়ায়, আচমনে, আচারে, ব্যবহারে, সর্ব্ব সময়ে ও সর্ব্ব অনুষ্ঠানেই তাহাকে জলকার্য্য করিতে হইবে। এমন কি, মূত্রত্যাগেও তাহাকে জল দ্বারা দেহ-শুদ্ধ করিতে হইবে। কারণ, যিনি বাহ্য শুচি অভ্যাস করেন, অন্তশুচি তাঁহারই লাভ হয়। যিনি এক বিষয়ে শুচি অভ্যাস করেন, সর্ব্ব বিষয়ে ক্রমে ক্রমে তাঁহার শুচি অভ্যস্ত হইতে থাকে। সুতরাং যিনি শুদ্ধ হইতে না অভ্যাস করেন, তাঁহার পাপাশুদ্ধি অপনীত হয় না। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-আহ্নিকেও জল-কার্য্য। সুতরাং এই জলকার্য্যই ব্রাহ্মণকে তাঁহার প্রধান ব্রত স্মরণ করাইয়া দেয়। এই জলকার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণ সতত ব্রহ্মকে স্মরণ করিয়া সর্ব্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। ব্রহ্মকে সমক্ষে রাখিয়া সর্ব্বকার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিবার কোন উপায় নাই।

যে সাত্বিক পথাবলম্বী ব্রাহ্মণ নিজ ব্রহ্ম-চর্য্য ব্রত-পরায়ণ হইয়া সংসার-ধর্ম্ম করেন, তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যাদি এত অধিক যে, তিনি দিবসে ঘুমাইবার সময় পান না। প্রতিদিন সংসার-যজ্ঞ সমাপন করিতেই তাহার দিন অতিবাহিত হয়, তবে আর তিনি কখন দিবসে নিদ্রা যাইবার সময় পাইবেন? এই জন্য ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন যে, এই ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া আমি কখন দিবাভাগে নিদ্রা যাইব না।

ব্রাহ্মণ উপনয়নকালে এই ছয় প্রতিজ্ঞায় প্রতিশ্রুত হইয়া সর্ব্বশেষে সেই সমস্ত প্রতি-জ্ঞার বন্ধন-স্বরূপ আরও গুরুতর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েন। এই উপনয়ন-যজ্ঞ সাধন কালে তাহার সাক্ষী স্বরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন। সংসারে ব্রাহ্মণের মহাযজ্ঞ কি,এই যজ্ঞোপবীতই তাহা বলিয়া দিতেছে। তিনি সেই যজ্ঞোপবীত ধারণ কালে কি বলেন?—

"যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্যত্বোপবীতেনোপনেহ্যামি।"

"এই যজ্ঞের সাক্ষী স্বরূপ তুমি যজ্ঞোপ-বীত, এই যজ্ঞের বন্ধন স্বরূপ তোমায় গ্রহণ করিলাম। সুতরাং তোমায় ত্যাগ করিব না।"

এবড় শক্ত প্রতিজ্ঞা। গুরুর নিকট সাবিত্রী-গ্রহণ কালে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মণ সাবিত্রী সূত্র ধারণ করেন। পূর্ব্বকৃত ছয় প্রতিজ্ঞার বন্ধন-স্বরূপ তিনি যজ্ঞোপ-বীত ধারণ করিয়া বলিতেছেন, হে যজ্ঞোপ-বীত,আমি যদবধি ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাচরণে নিযুক্ত থাকিব, যত দিন না সত্যলাভ হইবে, তত-দিন তোমায় এই প্রতিজ্ঞা কতিপয়ের সাক্ষী ও বন্ধনস্বরূপ ধারণ করিব। প্রত্যুতঃ এই ব্রতে আমি নিযুক্ত থাকিব কি না, তুমি দেহে থাকিয়া তাহা দিবা রাত্রি স্মরণ করাইয়া দিবে। আর এই সমস্ত প্রতিজ্ঞা পালন কালেও তুমি সাক্ষী থাকিবে। আমি যে কার্য্য করিব, তোমায় সাক্ষী রাখিয়া করিব। সাক্ষী না হইলে তুমি বন্ধন-স্বরূপ হইবে কিরূপে? তুমি দেখিতে পাইবে যে, আমি সে সমস্ত কার্য্য করিতেছি কি না। ব্রাহ্মণকে এই জন্য সেই উপবীত ধরিয়া সকল কার্য্য করিতে হয়। সেই উপবীতই তাঁহাকে ব্রাহ্মণত্ব দিয়াছে। নহিলে তিনি কি? সেই উপবীত-ধারণের পূর্ব্বে তিনি ত শূদ্র ছিলেন। কেবল সেই উপবীতই তাঁহাকে ব্রাহ্মণত্ব দিয়াছে। ব্রাহ্মণ যে আশীর্ব্বাদ করেন, তাহাও সেই উপবীত ধরিয়া। সেই উপবীত ধরিয়া তিনি যেন বলেন, আমি

এই উপবীতধারী বলিয়াই ব্রাহ্মণ এবং সেই ব্রাহ্মণ্যের চিহ্ন স্বরূপ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আমি আশীর্ব্বাদ করি নাই, আমার ব্রাহ্মণ্যই যেন আশীর্ব্বাদ করিতেছে। স্নান, আহ্নিক, জপ, পূজা, প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই সেই উপবীত হাতে করিয়া করিতে হয়। তাহাকে সাক্ষ্য রাখিয়া তবে ব্রাহ্মণকে সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। এই যজ্ঞ-সূত্র বড় সামান্য সূত্র নহে। তাহার ত্রিদণ্ডী ত্রিবিধ প্রতিজ্ঞার বন্ধনী। সেই বন্ধনী ও সাক্ষী স্বরূপ দেহে দিবা রাত্রি অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মণকে যে রাত্রি দিন শাসন করিতেছে, তাহাই ত্রিদণ্ডী। সেই শাসন রজ্জু বিরহিত হইলে কাজেই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকে না। যাঁহার ব্রহ্মপদলাভ হইয়াছে, যাঁহার ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের উদ্যাপন হইয়াছে, তিনিই কেবল সেই উপবীত পরিত্যাগ করিতে পারেন। নহিলে ব্রাহ্মণ যতদিন প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকিবেন, যত দিন তিনি ব্রহ্মলাভে কৃতকার্য্য হইতে না পারিবেন, ততদিন তাঁহাকে সেই যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতেই হইবে। অন্যথা তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গের মহাপাতকে পতিত হইবেন।

এইরূপ ঘোর প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া ব্রাহ্মণ জীবন-পথে পদার্পণ করেন। কিরূপে তিনি এই প্রতিজ্ঞা পালন করেন? এই প্রতিজ্ঞা পালন জন্য তাঁহাকে চারি আশ্রম-নিয়ম পালন করিতে হয়। ব্রাহ্মণের চারি অবস্থা —উপনীত হইবার পূর্ব্বে তিনি শূদ্র, উপনয়ন কালে তিনি দ্বিজ, গুরুগৃহে ব্রহ্মচারী হইয়া যখন তিনি বেদ পাঠ করেন, তখন এবং সংসারধামে তিনি বিপ্র। প্রাচীন কালে বানপ্রস্থে যখন তিনি মুনি ঋষিগণের আরণ্য আশ্রমে তাঁহাদিগের নিকট আরণ্যকের এবং ব্রাহ্মণভাগের নিগূঢ় তত্ত্ব উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ্য লাভের উপযোগী হইতেন, তখন হইতে তিনি ব্রাহ্মণ এবং যখন সন্ন্যাসাবলম্বন করিয়া তিনি জীবন্মুক্ত হইতেন, তখন দেবতা। এইরূপ দেবত্ব লাভ করিয়া তিনি ব্রহ্মপদ পাইতেন। ব্রহ্মপদ লাভ করিবার জন্য যে ব্রাহ্মণ সৃষ্ট, সেই ব্রহ্মপদ লাভ করিলেই তিনি মুক্ত।

এই ব্রহ্মপদ লাভ করিবার জন্যই ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন। ব্রহ্মপদ লাভ করাই যাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ও মহাব্রত, তিনিই ব্রাহ্মণ। গুরুগৃহে সমগ্র বেদ পাঠ করিয়া তিনি সংসারাশ্রমের জন্য প্রস্তুত হইতেন। এই সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া তিনি বেদের ক্রিয়া-কাণ্ড সমুদায় প্রতিপালন করিতেন এবং যখন তাহাদের প্রকৃত মর্ম্মাবগত হইতেন, তখন তাঁহার সংসারে বৈরাগ্যোদয় হইত। এই বৈরাগ্যোদয় তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন, এ সংসার মায়াময়। তখন তাঁহার নিকট সমুদায় ক্রিয়া-কাণ্ডের অসারতা প্রতিপাদিত হইত। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের অসারতা জ্ঞান হইলে, তখন তিনি বানপ্রস্থে বেদের ব্রাহ্মণভাগ ও আরণ্যকের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণে অধিকারী হইতেন। ব্রহ্মচর্য্যে তাঁহার যে বেদ পাঠ হইয়াছিল, তাহা কেবল পাঠ মাত্র। তাহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে সেই বেদানুযায়ী আচরণ করিতে হয়। এই আচরণে বেদের তাৎপর্য্যাবগত হওয়া যায়। সংসারাশ্রমের ক্রিয়াকাণ্ড করিয়া যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞান ব্রাহ্মণকে আরণ্যক ও ব্রাহ্মণভাগ পাঠের জন্য প্রস্তুত করিয়া দেয়। বানপ্রস্থে তিনি সেই আরণ্যক ও ব্রাহ্মণের যে তাৎপর্য্য

গ্রহণ করিতে থাকেন, তাহাতে তাঁহার বেদের উপর এক নূতন আলোকপাত হয়। সেই নূতন আলোকে তাঁহার বৈরাগ্য ও ক্রিয়া-কাণ্ডের অসারতা জ্ঞান আরও সুদৃঢ় হইয়া যায়। তখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হয়। যখন তাঁহার এইরূপ চৈতন্যোদয় হয়, তখন তিনি উপনিষদ্‌ভাগ এবং বেদান্তদর্শন পাঠের জন্য অধিকারী হয়েন। এরূপ বৈরাগ্য এবং চৈতন্যোদয় না হইলে কেহ বেদান্ত ও বেদান্তদর্শন পাঠের প্রকৃত অধিকারী হইতে পারেন না। এই বেদান্ত পাঠে যখন তাহার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তখনই তাহার মায়াজাল কাটিয়া যায়। তখন তিনি প্রকৃত নিত্যবস্তু কি, মায়া কি, ব্রহ্ম কি,—এসমস্ত তত্ত্বজ্ঞানে সম্পন্ন হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে প্রতিপালন করিতে সক্ষম হয়েন। নহিলে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে প্রতিপালন করা যায় না। নহিলে বেদান্ত ও বেদান্তদর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হওয়া যায় না। এই সন্ন্যাস ধর্ম্মাচারে ব্রাহ্মণ জ্ঞানযোগী। এই জ্ঞান-যোগ সাধন করিয়া তাঁহার সত্য ও ব্রহ্ম লাভ হয়। এই সত্য ও ব্রহ্ম লাভ হয়। এই সত্য ও ব্রহ্ম লাভে তিনি মুক্তি লাভ করেন। এই মুক্তি লাভে তিনি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।

তবেই দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মচর্য্যে ব্রাহ্মণের যে বেদশিক্ষা হয়, তদুপরবর্ত্তী আশ্রম-ত্রয়ের সদাচারে তাঁহার প্রকৃত জ্ঞানোদয় হয়। গুরুর নিকট উপদেশ লাভ করেন ব্রাহ্মণ কিসের জন্য? সেই বেদকে কার্য্যে প্রতিপন্ন করিবার জন্য। বেদাচার না করিলে, অনুষ্ঠান না করিলে, বেদের প্রকৃত মর্ম্মাবগত হওয়া যায় না।

বৈদিক জ্ঞান কেবল বেদানুষ্ঠান দ্বারাই লাভ করা যায়। এই অনুষ্ঠান দ্বারাই এক এক বেদভাগের প্রকৃত অধিকার জন্মে। ব্রহ্মচর্য্যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানানুশীলন করেন, সংসারাশ্রমে তিনি হৃদয়ের সমস্ত প্রবৃত্তির অনুশীলন করেন। চিত্ত ও হৃদয়—এতদুভয়ের অনুশীলন না হইলে মানবের পূর্ণতা হয় না। তাই ব্রহ্মচর্য্য ও সংসারাশ্রমের শিক্ষাপ্রণালীই মানবের সম্পূর্ণতা সাধন করে। ব্রহ্মচর্য্যে জ্ঞানের পরিতৃপ্তি এবং সংসারাশ্রমে প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধন হয়। কিন্তু উভয় আশ্রমেই সঙ্গে সঙ্গে সংযম শিক্ষা করিতে হয়। এই সংযমের ফল কি? ফল সমস্ত জ্ঞানবৃত্তি ও প্রবৃত্তির চরিতার্থতার পর নিবৃত্তি ও বৈরাগ্য। বৈরাগ্যোদয় না হইলে, বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের প্রকৃত তত্ত্বগ্রহণ করা যায় না। এই ক্রিয়া-কাণ্ড যে কেবল বৈরাগ্যোৎপাদনের নিমিত্ত, তখন তাহা বুঝা যায়। এই ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান দ্বারা যে বৈরাগ্যোদয় হয়, তাহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। এই রূপ বৈরাগ্যেই চিত্ত হইতে বাসনা সমুদায়ের অবসান হইতে পারে। বাসনার অবসান না হইলে, প্রকৃত জ্ঞানোদয় হয় না। প্রকৃত বৈরাগ্য না জন্মিলে, প্রকৃত জ্ঞানোদয় না হইলে, কেহ উপনিষদ্-পাঠের জন্য অধিকারী হইতে পারেন না। বেদান্তের অধিকার এইখানে আসিয়া জন্মে। সেই অধিকার বেদান্ত দর্শনের প্রারম্ভেই উক্ত হইয়াছে। যিনি অনধিকারী, তিনি বেদান্তদর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে কখনই সক্ষম নহেন।

ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিকতা এই চারি আশ্রমের নিয়ম প্রতিপালনে পরিপুষ্টিলাভ করে। ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক পথ এত বিস্তৃত। এই সাত্ত্বিক পথে চিরজীবন বিচরণ করিলে তবে

প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য লাভে সমর্থ হইতে পারা যায়। সাত্বিক পথে থাকিয়া ব্রহ্মণ্য লাভের জন্য ব্রাহ্মণ সৃষ্ট, উপনীত ও ব্রাহ্মচর্য্য ব্রতধারী। এই সাত্বিক পথে বিচরণ করিয়া তিনি কি গুণ সমুদায়ের অধিকারী হন, গীতায় তাহা উক্ত হইয়াছে :—

"অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়াভূতেষলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমাধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥"
১৬অ। ১-৩।

"ভগবান্ কহিলেন—হে ভরত; যাঁহারা দেবযোগ্যা সাত্বিকী সম্পৎ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদেরই এই বিংশতিটি দৈবীসম্পৎ জন্মিয়া থাকে।

ভয়রাহিত্য, চিত্তসংশুদ্ধি (সুপ্রসন্নতা) আত্মজ্ঞানোপায়ে পরিনিষ্ঠা, দান (আত্ম) ভোজ্য অন্নাদির যথোচিত সম্বিভাগ) দম, (বাহেন্দ্রিয় সংযম) যজ্ঞ, (অগ্নিহোত্রাদি দেব যজ্ঞাদি) স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন ব্রহ্ম যজ্ঞাদি) তপ, অবক্রতা, অহিংসা (পরপীড়াবর্জ্জন) সত্য, (যথাদৃষ্টার্থ ভাষণ) অক্রোধ, ত্যাগ, (ঔদাস্য) শান্তি, অপৈশুন (অসাক্ষাতে পর-দোষ প্রকাশ না করা) সর্ব্বজীবে দয়া, লোভ রাহিত্য, মৃদুতা, কুকার্য্য-প্রবর্ত্তনে লোক লজ্জা, অচপলতা (ব্যর্থ ক্রিয়ারাহিত্য) তেজঃ (প্রগল্ভতা) ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, (বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি) অদ্রোহ (জিঘাংসারাহিত্য) ও অনভিমানিতা।"

এই সমস্ত গুণই মোক্ষের হেতু। প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণকে এই সমস্ত গুণের অধিকারী হইয়া মোক্ষ-লাভের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইত। যে ব্রাহ্মণ দৈবীসম্পৎ লাভের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে এত গুণের অধিকারী হইতে হইলে যে সংযমের সহিত জ্ঞানানুশীলনের এবং হৃদয়ের প্রবৃত্তির অনুশীলনের আবশ্যকতা, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যায়। ব্রহ্মচর্য্যের জ্ঞানানুশীলন ব্রতে এবং সংসারাশ্রমের প্রবৃত্তি-অনুশীন কার্য্য মানবের সম্পূর্ণতা সিদ্ধ না হইলে, কখনই এ সমস্ত গুণের অধিকারী হওয়া যায় না। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণেরা এই গুণ সমুদায়ের প্রকৃতপক্ষে অধিকারী হইয়া গিয়াছিলেন। তাই, আমাদের শাস্ত্রে এত মুনি-ঋষি চরিত্রের সমাবেশ দেখা যায়। এক আধ জন নয়, সহস্র সহস্র মুনি ঋষিগণের পবিত্র চরিত্র আমাদিগের পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যাস, বাল্মীকির জীবন-চরিত উচ্চৈঃস্বরে ব্রাহ্মণের সাত্বিক জীবনের উপদেশ দিতেছে। এই দৈবী সম্পৎলাভ কেবল মুখের কথা নহে, কেবল শাস্ত্র-বচন নহে, তাহা যে প্রকৃতপক্ষে অর্জ্জনীয় এবং তাহা যে ব্রাহ্মণেরা প্রকৃতপক্ষে লাভ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের জীবন-চরিত পাঠে বিলক্ষণ সপ্রমাণ হয়।

ব্রাহ্মণেরা এই সমস্ত গুণসম্পন্ন হইয়া তবে প্রকৃত জ্ঞান-লাভের উপায়াবলম্বী হইতে পারিতেন। প্রকৃত জ্ঞান-লাভের উপায় কি কি, গীতা তাহা বলিতেছেন ;—

"অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসাক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এবচ।
জন্মমৃত্যু জরাব্যাধিদুঃখ দোষানুদর্শনম্॥
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥"
১৩অ। ৭-১১।

"আত্মশ্লাঘা-রাহিত্য, অদাম্ভিকতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, সদ্গুরুসেবা, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, স্থৈর্য্য, শারীর-সংযম, ইন্দ্রিয় বিষয়ে (রূপরসাদিতে) বৈরাগ্য, অহঙ্কারত্যাগ, জন্ম মৃত্যু-জরা-ব্যাধিতে দুঃখ দোষ অনুদর্শন (জন্মাদি যে সকল দুঃখের কারণ, ইহাই পুনঃ পুনঃ আলোচনা) স্ত্রী পুত্রাদিতে অনাসক্তি এবং তাহাদের সুখ দুঃখে আপনাকে সুখী ও দুঃখী মনে না করা, ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তিতে সমচিত্ততা, আমাতে (অর্থাৎ ঈশ্বরে) অনন্যযোগে (কায়মনোবাক্যে এবং সর্ব্বাত্মদৃষ্টিতে) একান্ত ভক্তি, চিত্ত-প্রসাদ-জনক স্থানে বাস, জন-সমাজে অপ্রীতি আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা, এবং মোক্ষদর্শন অর্থাৎ মোক্ষই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহারই আলোচনা, এই বিংশতি সংখ্যক জ্ঞান-সাধন বিষয়কে বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ জ্ঞান বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন।"

জ্ঞানলাভের পক্ষে এই সমস্তই যে প্রকৃত পন্থা, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে জীবন-ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ একদা ধর্ম্মের উচ্চশিখরে উঠিয়া যে পরম জ্ঞানের অধিকারী হইতেন, তাহা এই বশিষ্ঠাদির উপদেশে প্রতীত হয়। তাহা শাস্ত্রের অলীক কথা নহে, কাব্যের আদর্শ নহে, সেই মহাদর্শ ঋষিগণ প্রকৃত-পক্ষে উঠিয়া তবে উচ্চৈঃস্বরে তাহা জগন্ময় ঘোষিত করিয়া গিয়াছেন। এ ঘোষণা কিসের জন্য? অন্যকে পথ দেখাইবার জন্য। সেই পথে বিচরণ করিয়া তৎপরে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ মুক্তিলাভের যোগ্য হইয়া গিয়াছেন। আজিও যে নির্জ্জন দেশে কত যোগী ঋষি এই উপায় অবলম্বন করিয়া জ্ঞানযোগ সাধন করিতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে?

একেই বলে ব্রাহ্মণ্য-লাভ। এই ব্রাহ্মণ্য লাভ কেবল মুখের কথা নয়। এ যোগসাধনা এতগুণের আধার হওয়া বড় কম কথা নয়। যোগসাধনা কি? মহাভারত বলিয়াছেন—

"রজ ও তমোগুণ নাশক অনুষ্ঠানই যোগ। এই রূপ যোগসাধনা দ্বারা ব্রাহ্মণ রজ ও তমোগুণ নাশে সিদ্ধ হইয়া সত্ত্বগুণের প্রাবল্য সাধন করিয়া ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন। মুনিঋষিগণ প্রকৃতপক্ষে অনেক সাধনা দ্বারাএই ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া গিয়াছিলেন।"

কোথায় আমরা ঘোর পাপ সংসারের পঙ্কে নিমজ্জিত রহিয়াছি, কোথায় ব্রাহ্মণের স্বর্গীয় দেবোপম, পবিত্র ব্রাহ্মণ্য। এই ব্রাহ্মণ্য লাভার্থ ব্রাহ্মণের উপনয়ন এবং ব্রহ্মচর্য্য ব্রত-ধারণ।

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি, সর্ব্বসমাজেই সাত্ত্বিক গুণ-বিশিষ্ট লোক ছিলেন এবং এখনও আছেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইবার উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু উপযুক্ত পাত্র হইলে কি হইবে? আর্য্যকুলে ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া উপনীত হইলে যে সাত্ত্বিকতার পরিপুষ্টি সাধন করিতেন, অপর সমাজের সাত্ত্বিকলোক সে উপায়-বিরহিত। এই স্থলে আর্য্যকুলের ব্রাহ্মণ হইতে অপর সমাজের ব্রাহ্মণসমুচিত গুণসম্পন্ন-ব্যক্তির বিভিন্নতা। আর্য্যকুলের ব্রাহ্মণ সাত্ত্বিক সংস্কার সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী, অপর সমাজে লোক ব্রাহ্মণ-গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তির গর্ভে বা ঔরসে জন্মলাভ করিলেও এরূপ ব্রত-ধারণ-বিরহে তাঁহার ব্রাহ্মণ্য লাভ করিবার কোন উপায় নাই। এই রূপ সংযম ব্রত ধারণ করিয়া আর্য্যকুলে ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন। সেই যজ্ঞোপবীত তাঁহার প্রধান চিহ্ন। এই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ সর্ব্বজাতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। সুতরাং তাঁহা

হইতেই জাতিভেদের উৎপত্তি হয়। কারণ তিনি আর সকল লোক হইতে স্বতন্ত্র হইয়া এক ভিন্ন জাতীয় হইয়া দাঁড়াইলেন। এক শ্রেণীর বিভাগ ও বিভিন্নতা ঘটিলে, সমাজে অপরাপর শ্রেণীর বিভাগ আপনা-আপনিই ঘটিয়া আইসে। যেহেতু এই ব্রাহ্মণ বর্ণের অধঃপতনে অপর বর্ণের উৎপত্তি হয়। মহাভারতও সেই কথা বলিয়াছেন :—

"মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণ প্রভাবে কামভোগ প্রিয়,ক্রোধ-পরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব, যাঁহারা রজ ও তমোগুণ প্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব এবং যাঁহারা তমোগুণ-প্রভাবে হিংসাপরতন্ত্র, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ "কার্য্য" দ্বারাই পৃথক্ বর্ণ লাভ করিয়াছেন।' শান্তিপর্ব্ব। ১৮৮ অধ্যায়।

যেরূপে এক বর্ণ হইতে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপে আবার প্রতি বর্ণ মধ্যে নানা উপবিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। যখন এই সমস্ত উপবিভাগ হইয়াছে, তখনই সমাজ মধ্যে জাতিভেদ হইয়া গিয়াছে। এই উপবিভাগ যখন প্রতি বর্ণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে,তখন সমস্ত উপবিভাগ জাতি নামে বাচ্য হইয়াছে। ব্রাহ্মণজাতি মধ্যেও নানা উপবিভাগের উৎপত্তি হইয়া এক এক শ্রেণী বিভাগ হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষত্রিয়বর্ণ অসিজীবী এবং মসিজীবী-রূপে দুই উপবিভাগে পরিণত হইয়া Military এবং Civil শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা বরাবর অসিজীবী ছিলেন, তাহারাই প্রকৃত ক্ষত্রিয় নামের উপযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারাই ক্ষত্রিয় নামে প্রথিত হইয়া পড়িলেন। মসিজীবিগণ ক্রমে মৃদুস্বভাব ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। তখন ক্ষত্রিয়গণও আর তাহাদিগকে নিজ জাতিমধ্যে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। যাহারা তত নিস্তেজ ও মৃদুস্বভাব হইয়া পড়িলেন, তাহাদিগের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া অসিজীবী ক্ষত্রিয়গণ সুতরাং এক স্বতন্ত্র জাতি হইয়া পড়িলেন। অসিজীবী ক্ষত্রিয়গণ নিজ স্বভাব দোষে ক্ষত্রিয় জাতি হইতে কাজেই পতিত হইয়া এক স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইলে সম্ভবতঃ এই জাতিই কায়স্থ নামে প্রথিত হইলেন। তাহাদের করণ-কারণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল। অনেকে অনুমান করেন, এই ধর্ম্মভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়গণই শাস্ত্রোক্ত করণ জাতি।

যে কর্ম্মবিভাগ এক ব্রাহ্মণ বর্ণকে চারি বর্ণে পরিণত করিয়াছে, সেই কর্ম্মবিভাগই প্রতি বর্ণ মধ্যে নানা জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। তাই বৈশ্যগণ নানা জাতিতে ক্রমে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কর্ম্ম ও ব্যবসায়ই এই সমস্ত উপবিভাগের কারণ। সেই কর্ম্ম ও ব্যবসায় শূদ্রবর্ণকে শেষে অসংখ্য জাতিতে পরিণত করিয়াছে। এই জাতি সমস্ত ক্রমে বংশ পরম্পরাগত হইয়া পড়িয়াছে। কেন হইয়াছে, একজন সুবিজ্ঞ ইংরাজী ঐতিহাসিক তাহার কারণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন—

"The regulations of Indian policy, with respect to the different orders of men, must necessarily, at sometimes, check genius in its career, and confine to the functions of an inferior caste talents fitted to shine in a higher sphere. But the arrangements of civil government are made, not for what is extraordinary, but for what is common; not for the few, but for the many. The object of the first Indian legislators was to employ the most effectual means of providing for the subsistence, the security, and happi

nes of all the members of the community over which they presided. With this view they set apart certain races of men for each of the various peofessions and arts necessary in a well ordered society, and appointed the exercise of them to be transmitted from father to son in succession. This system, though extremely repugnant to the ideas which we, by being placed in a very different state of society, have formed, will be found, upon attentive inspection, better adapted to attain the end in view, than a careless observer at first sight is apt to imagine. The human mind bends to the law of necessity, and is accustomed not only to accommodate itself to the restraints which the condition of its nature or the institutions of its country impose, but to acquiese in them. From his entrance into life, an Indian knows the station allotted to him, and the *functions* to which he is distined by his birth. The objects which relate to these are the first that present themselves to his view. They occupy his thoughts or employ his *his hand*, and from his earliest years, he is trained to the habit of doing with ease and pleasure that which he must continue through life to do. To this may be ascribed that high degree of perfection conspicuous in many of the Indian manufactures; and though veneration for the practices of their ancestors may check the spirit of invention, yet, by adhering to these, they acquire such an expertness and delicacy of hand, that Europeans, with all the advantages of superior science, and the aid of more complete instruments, have never been able to equal the exquisite execution of their workmanship. While this high improvement of their more curious manufactures excited the admiration and attracted the commerce of other nations, the seperation of professions in India, and the early distribution of the people into classes, attached to particular kinds of labour, secured such abundance of of the more common and useful commodities, as not only supplied their own wants, but ministered to those of the countries around them."

Appendx to an Historical Disquisition concerning the Knowledge which the Ancients had of India—by

W. Robertson. D. D.

হিন্দুজাতিভেদের উপকারিতা]:: সম্বন্ধে একজন বিলাতী প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা কি বলিলেন দেখুন। তিনি: বলিলেন :—

"ভারতবর্ষীয় সামাজিক জাতিভেদের ব্যবস্থা-নিবন্ধন কখন কখন কোন প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিভা স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারিত না বটে, কখন কখন নীচকুলে এমত লোকও জন্মগ্রহণ করিত, যিনি হয় ত কোন উচ্চকুলের গৌরব সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারিতেন বটে। কিন্তু দেশের সমাজিক রাজব্যবস্থা লোক বিশেষের ক্ষতি বৃদ্ধির নিমিত্ত নহে। রাজনীতিজ্ঞেরা যে ব্যবস্থা স্থাপন করেন, তাহা সাধারণ হিতের নিমিত্ত, এক আধ জন অসাধারণ ব্যক্তি বিশেষের নিমিত্ত নহে। ভারতবর্ষীয় রাজব্যবস্থারও এই রূপ উদ্দেশ্য ছিল। সমাজস্থ সর্ব্ব-সাধারণের যাহাতে ভরণ পোষণ জীবিকা নির্ব্বাহ, জাতিকুল ও ধনমান রক্ষা এবং সর্ব্ববিধায়ে সুখ বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বিধান করাই সেই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল। তাই, তত্রস্থ সমাজ, শিল্প, ব্যবসা ও কর্ম্ম-বিভাগানুসারে নানা ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল এবং সেই জাতিবিভাগ পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে, বংশপরম্পরাগত হইয়াছিল। বিলাতী সমাজের বিভিন্ন ব্যবস্থা-নিবন্ধন, সেই ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের মতামত তদনুকূল না হইতে পারে, কিন্তু বিদেশীর চক্ষে সহসা সে ব্যবস্থা ভাল না লাগিলেও বিচার করিয়া তাহার গুণাগুণ পর্য্যালোচনা করিলে তাহাতে তত দোষ দৃষ্ট হইবে না। মানুষ দুরতিক্রমণীয় ভবিতব্যতার দাস, কালক্রমে অভ্যাস বশতঃ সেই দাসত্ব সে অক্লেশে বহন করিয়া আইসে। ভারতে সকলেই নিজ নিজ জাতীয় ধর্ম্ম ও কর্ম্ম আশৈশব জানিয়া থাকে। সকলেই জানে, তাহাকে কি কাজ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। সুতরাং যাহাকে যাহা করিতেই হইবে, তাহা সে অশৈশব শিক্ষা করে এবং অভ্যাসবশতঃ অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া যায়। স্বধর্ম্ম এবং স্বজাতীয় ব্যবসা ও কার্য্য সবাই আনন্দ সহকারে সুসম্পন্ন করিয়া থাকে। এই জন্য, ভারতীয় দ্রব্যাদির শিল্প নৈপুণ্য একেবারে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পিতৃ, পিতামহ যে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, সে কার্য্যের সম্মান রক্ষার্থ হয়ত ভারতীয় শিল্পী নিজ কার্য্যের উন্নতি সাধনে তত তৎপর না হইতে পারে, কিন্তু চিরদিন এক কাজ করিয়া আসিতেছে বলিয়া সেই কার্য্য তাহার এত সহজ হইয়া আইসে, তাহার সূক্ষ্ম কীর্ত্তি কর্ম্মে

অভ্যাস বশতঃ তাহার এত দক্ষতা হয়, হাত চলে যে, সে সূক্ষ্ম শিল্প নৈপুণ্যের কাছে আজি বৈজ্ঞানিক ইউরোপীয় শিল্পী তাহার বিজ্ঞানের সহায়তা এবং সম্পূর্ণ কল কাটরা লইয়াও পরাভব স্বীকার করিতে-ছেন। আজি ইউরোপীয় কল-কৌশলে মোটা কাজের সামান্য সামান্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম শিল্প কার্য্যে ভারত-গৌরব আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এককালে ভারতবর্ষের শিল্পি-গণের হস্তজাত দ্রব্যাদি সহজে এত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত যে, তদ্দারা শুধু যে ভারতীয় শিল্পিগণ স্বদেশের অভাব মোচন করিত, এমত নহে, তাহাতে চারি পার্শ্বস্থ দেশ সমূহেরও অভাব উন্মোচিত হইয়াছিল।"

ডাক্তার রবার্টসন যাহা বলিয়াছেন, তাহার সমুদায় কথাই অতীব যুক্তিযুক্ত। তিনি একজন বিদেশী হইয়া আমাদের জাতিভেদের উপকারিতা এত বিশদরূপে বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার সদুপদেশ লাভ করিয়া অনেক স্বদেশীয় ইংরাজীশিক্ষিত লোকের কুসংস্কার দূরীভূত হইবে। আমাদের সমাজস্থ জাতিভেদ-প্রথা সম্বন্ধে এক জন উদারচেতা, বিচক্ষণ সুবিজ্ঞ ইংরাজী লেখকের কথার ফল অধিকতর বলিয়াই আমরা ডাক্তার রবার্টসনের উপর আর কোন কথা বলিতে চাহি না।

সৃষ্টির আদিকালে একই ব্রাহ্মণজাতি হইতে কেমন নানা জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। গুণ ও কর্ম্মবিভাগ দ্বারাই এই জাতি সমূহ সহজেই সমাজ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

খ্রীষ্টীয়ান ও চীনবিভ্রাট।

যীশুখ্রীষ্টকে ত্রাতা বলিয়া গ্রহণ না করিলে মানবের মুক্তি নাই, খ্রীষ্টিয়ানদের এইরূপ বিশ্বাস। এবং তাঁহাদের আরও বিশ্বাস যে, সর্ব্বত্র মুক্তি-মন্ত্র প্রচার করাই পরম ধর্ম্ম। যাঁহারা যথার্থ খ্রীষ্টভক্ত, তাঁহারা যদি এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া দেশে বিদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তত্তৎদেশে ধর্ম্মপ্রচারের ফলে যতই অনিষ্টপাত হউক না কেন, প্রচারকদিগকে দোষ দিতে পারা যায় না।

খ্রীষ্টিয়ানদিগের মুক্তি জিনিসটা কি, তাহা কখনও বুঝিতে পারি নাই; অথবা যতটা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে ইহাই বুঝিয়াছি যে, কখনও সেই অপরিজ্ঞাত বস্তু কি, তাহা বুঝিতে পারিব না। ধন, মান বা স্বাস্থ্য লাভে মুক্তি নাই; জ্ঞানলাভে বা সৌন্দর্য্য অনুভূতিতেও মুক্তি নাই; আর্জ্জব, সত্যবাদীত্ব, ইন্দ্রিয় সংযম, লোক-হিতৈষণা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতির বিকাশে মুক্তি নাই; এক হউন বা একাধিক হউন, জগৎকর্ত্তাতে বিশ্বাস এবং ভক্তিতেও এই অপরিজ্ঞাত পদার্থ লাভ হয় না; বাসনা পরিশূন্য অজ্ঞেয় আত্মা নামক পদার্থের অস্তিত্ব এবং অমরত্বে বিশ্বাস থাকিলেও এই রহস্যময় মুক্তিলাভের পথ পরিষ্কার হয় না। কি জানি সেই "নির্গুণং বস্তু কিঞ্চিৎ" কি, যাহা একমাত্র যীশুর নামে মস্তক অবনত করিলেই লাভ হয়! সে জিনিস যাহাই হউক, তাহা দান করাই যখন পরম ধর্ম্ম, তখন পাদরীদিগের কর্ম্ম-ক্ষেত্র জগৎব্যাপী।

যতদেশ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং যেখানে

যেখানে ইউরোপীয় বাণিজ্য প্রসারিত হইতেছে, সে সর্ব্বত্রই পাদরীগণ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য উপস্থিত হইতেছেন। ইহার পারলৌকিক বা আধ্যাত্মিক ফল যাহাই থাকুক, সাংসারিক ফল তেমন সুখপ্রদ বা মঙ্গলজনক হইতেছে না। প্রথমে, বাণিজ্য আরম্ভ; দ্বিতীয়ে মিসনরির আবির্ভাব; তৃতীয়ে ধর্ম্ম প্রচার জনিত বিদ্বেষের ফলে বিবাদ বিসম্বাদ; চতুর্থ অবস্থায় বিবাদ প্রসমনের নামে দেশ জয়। আমাদের মুখে এই কারণ নির্দ্দেশগুলি বড় শোভা পায় না, বিশেষতঃ এ বিষয়ে আমরা বহুজ্ঞ নহি বলিয়া মিসনরিগণ আপত্তি তুলিতে পারেন। কিন্তু কথাগুলি যে সত্য, তাহা ইউরোপীয় লেখকদিগের দ্বারাই প্রমাণিত করা যাইতে পারে। চীন দেশের যুদ্ধে, একথা পার্লামেণ্টে পর্য্যন্ত অংশতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। এবং চীনদেশের উপদ্রবের বহু পূর্ব্বে ইংরাজ দার্শনিক হর্বর্ট স্পেন্সার তাঁহার সমাজ বিকাশ তত্ত্বগ্রন্থের ২য় ভাগে এ সকল কথা বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যেখানে ধর্ম্মপ্রচারের ফলে এই প্রকার শোচনীয় ফল; আধ্যাত্মিক শান্তি স্থাপনার নামে এই প্রকার জীবনব্যাপী অশান্তির সৃষ্টি; অনন্ত জীবন লাভের নামে অনন্ত দাসত্ব; সেখানে যে সাধারণ শ্রেণীর লোক এই ধর্ম্মপ্রচারকে ছলনা ও ভাণ মাত্র বুঝিয়া ভীত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? মিসনরীগণ যে পবিত্রতায় "ঘুঘু" এবং সরলতায় "মেড়া" একথা "আমরা না হয় বুঝ্‌তে পারি, খোট্টালোকে তা বোঝে না।" তাহারা ভাবে, যে, এ যে "প্রতাপাগ্রে ততঃ শব্দঃ, পরাগস্তদনন্তরং" ইত্যাদি।

সম্প্রতি মিসনরিদিগের পক্ষপাতী একজন পার্লেমেণ্টের সভ্য, চীনদেশের উপদ্রব উপলক্ষ্য করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই :—

"অখ্রীষ্টিয়ান এবং বর্ব্বর দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের আমি পক্ষপাতী, ইহা দ্বারা ইউরোপীয় সমুন্নত সভ্যতা, বিদেশ মধ্যে বিস্তৃত হইয়া লোকের অশেষ হিত সাধিত হয়। যদি ও এই প্রচার দ্বারা প্রথমতঃ অশান্তি উৎপাদিত হয়, তথাপি ভবিষ্যৎ ফলের প্রতি লক্ষ্য করিলে এ অশান্তিকে অমঙ্গলকর বলা যায় না। চীনদেশের উপস্থিত যুদ্ধ বিগ্রহাদির মূলে যে মিসনরিদিগের ধর্ম্মপ্রচার, তাহা নিঃসন্দেহ। চীনদেশীয় লোকেরা অখ্রীষ্টিয়ান বলিয়া কৃপাপাত্র, কিন্তু ইহারা বর্ব্বর নহে। চীনদেশীয় সভ্যতা এবং ইউরোপীয় সভ্যতায় এতটা মৌলিক প্রভেদ, যে একের উচ্ছেদ সাধন ব্যতিরেকে অন্যটী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। সভ্যতা বলিতে গেলে দেশের সমগ্র আচার ব্যবহার, পারিবারিক ও সামাজিক রীতি, শাসন এবং ব্যবস্থা প্রণালী বুঝিতে হয়। কাজেই চীনদেশে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে সম্পূর্ণরূপ চীনদেশীয় জাতীয় জীবন, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হয়। যেখানে যেখানে লোকে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেখানেই আর জাতীয়ত্ব নাই। ইহা দেখিলে দেশের লোক অবশ্যই ভীত হইবে এবং বিদেশীয় সংস্পর্শ বিষবৎ প্রত্যাখ্যান করিবে। এই কারণেই চীনদেশের লোক ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে এতটা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। আমি অখ্রীষ্টিয়ানদিগের পক্ষপাতী হইলেও এই বিষময় ফল দেখিয়া চীনদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের অনুকূলতায় কোন কথা কহিতে পারি না।"

উল্লিখিত কথাগুলি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। প্রথম কথা, যেখানে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, সেইখানে ইউরোপীয় সভ্যতা জাঁকিয়া বসে; এবং নবদীক্ষিতেরা জাতীয়ত্ব হারাইয়া স্বদেশদ্রোহী হয়। প্রাচীন ইতিহাসে এবং একালের ঘটনায় ইহার ভুর ভুরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম যখন যীশুর মরণান্তে প্রথম প্রচারিত হয়, তখনি ধর্ম্মটা

য়ীহুদী ভাবময় ছিল। কিন্তু পরে যখন এই ধর্ম্ম মিসর এবং রোমদেশে লালিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইল, তখন য়ীহুদীয় ভাব সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছিল বলিয়াই তত্তৎদেশে ইহার পরিবর্দ্ধন সম্ভবপর হইয়াছিল। কেবল য়ীহুদীভাব পরিহার করিয়াছিল তাহাই নয়, মিসরীয়, গ্রীসীয় এবং রোমক প্রাচীন ধর্ম্মই খ্রীষ্টিয়ানির নামে খাড়া করা হইয়াছিল। শিশু হোরস্ (Horas) ক্রোড়ে আইসিস্ দেবী (Isis)। বালক যীশু ক্রোড়ে মাদোনারূপে আবির্ভূতা হইলেন; ঈশ্বরের একটা "মা" পাইয়া দেশের লোকের ভায়েনা পূজা করিবার সাধ মিটিল। মিসরীয় ত্রিত্ব-বাদ, নব ট্রিনিটিরূপে আবির্ভূত হইল। প্রাচীন গ্রীকদিগের ওলিম্পস্ Olympus বজায় রহিয়া গেল, কেবল দেবতাগুলির নাম পরিবর্ত্তিত হইল মাত্র। যে কারণে রোম ও গ্রীস্ প্রভৃতি দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম পরি-বর্দ্ধিত হইল, সেই কারণে য়ীহুদা দেশে ইহার বিস্তার লাভ সম্ভবপর হইল না। আরবাদি দেশে এই ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া যখন জাতীয়ত্ব ধ্বংস করিতে বসিল, তখন মহম্মদের আবির্ভাবে খ্রীষ্টিয়ানী পরিহার এবং জাতীয়ত্ব রক্ষা সাধিত হইল। ইউ-রোপের উত্তরাংশের বর্ব্বর জাতিদিগের মধ্যে না ছিল সমাজ, না ছিল ধর্ম্ম এবং না ছিল ঐতিহাসিক স্মৃতি; কাজেই সেই সেই দেশে বিনা বাক্য ব্যয়ে ধর্ম্ম প্রচার হইয়া-ছিল; এবং পরে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মিসরীয়, রোমক এবং গ্রীসীয় দেবতাবাদ, পরিত্যক্ত হইয়া,সেই সেই দেশেই প্রোটেষ্টাণ্ট ভাব বর্দ্ধিত হইতে পারিয়াছিল। লাটিনীয় জাতির অধী-নতা পাশে ইংলণ্ড যাহাতে বাঁধা না পড়ে, সেই ভয়েইংরাজ ব্যস্ত ছিল; এবং সেই জন্যই পোপ পরিহার করিয়া দেশের লোক প্রোটেষ্টাণ্ট হইল। এ সকল স্থলেই ধর্ম্ম রক্ষার অর্থ জাতীয়ত্বের প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধী-নতা রক্ষা। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনে যে কেবল একটা মত পরিবর্ত্তন মাত্র হয়, তাহা নয়; যে দেশ হইতে আসিয়া জিনিসটা প্রচারিত হয়, সেই দেশীয় ভাবও তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ দেশে ইহার দৃষ্টান্ত এত অধিক যে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজনীয়। যে কারণে আরবে মহম্মদের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই কারণেই এ দেশের রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। অবশ্য তাঁহার পরবর্ত্তীয়েরা খ্রীষ্টিয়ানীয় ছাঁচে ধর্ম্ম গড়িয়া লইয়া এখন আপনারা খ্রীষ্টয়ান কি না, বুঝিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার ধর্ম্মে ইহার কিছুই ছিল না; অদ্বিতীয় বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মই প্রচারিত হইয়াছিল। জাতীয়ত্বের বিনাশ যখন দেশের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ, তখন সূক্ষ্ম পরকাল ভাবিয়া, এত বড় ইহকালটা কোন্ মূর্খ জলাঞ্জলি দিতে পারে? এই জন্যই স্বতঃই সাধারণ লোকেরা বিদেশীয় ধর্ম্মের নাম শুনিলেও চমকিয়া উঠে। ভারতের দক্ষিণ প্রদেশে জাতিকুল বজায় রাখিয়া রোমাণ কাথলিকগণ দেশীয় লোকের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাহা জানি; কিন্তু তদ্ব্যতীত সর্ব্বত্রই জাতীয়ত্ব সংহার করিয়া খ্রীষ্টিয়ানেরা স্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করি-তেছেন।

দ্বিতীয় কথা এই যে, খ্রীষ্টিয়ানীর সঙ্গে যে প্রকারের ইউরোপীয় সভ্যতা উদয় হয়, সে জিনিসটা কি? খ্রীষ্টিয়ানীর জ্ঞান কাণ্ডভাগ সম্পূর্ণরূপে গ্রীসদেশীয় দর্শন শাস্ত্র হইতে সমুদ্ভূত। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন

যে, ভারতীয় বেদান্ত হইতে এই দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি। সে কথা না মানিলেও, এই উভয় দেশের দার্শনিক তত্ত্বে যে কিছু বিরোধ নাই, তাহা বিশেষজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিবেন। অপিচ, বৌদ্ধ ধর্ম্ম,বেদান্তেরই ব্যাখ্যা এবং চীন দেশের ধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ড, বেদান্তেরই ছায়া। এরূপ স্থলে চীনদেশে যদি খ্রীষ্টিয়ানীয় জ্ঞানকাণ্ডটার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র আবির্ভূত হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? এ কালের দর্শন বিজ্ঞানত সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের বিরোধী। কোথাও সভ্যতা বিস্তারের নামে খ্রীষ্টিয়ানগণ তাহার প্রচার করেন, তাহা দেখা যায় না। বরং খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রথম আবির্ভাব কাল হইতে এ পর্য্যন্ত ইহাই দেখিয়া আসিয়াছি যে, এই ধর্ম্মবিজ্ঞান বিস্তারের চিরবিরোধী। আজ কাল ইউরোপে যে জ্ঞান মাহাত্ম্য দেখিতেছি, তাহা খ্রীষ্টিয়ানী ধর্ম্ম সমুদ্ভূত নহে। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের উৎপত্তির বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে, ভারতে, মিসরে, গ্রীসে, রোমে এবং সারাসানদিগের মধ্যে যাহা অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইতেছিল, তাহাই একালের ইউরোপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। খ্রীষ্টিয়ানের দল, এই জ্ঞানচর্চ্চা তিরোহিত করিবার জন্য কত প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কত লোক হত্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হইতে পারেন নাই। কাজেই সভ্যতার নামে ইউরোপীয় জ্ঞান দেখিয়া যে ভারতীয় বা চীনদেশীয় লোক ভীত, ইহা ত বুঝিতে পারি না। বরং যে দেশে জ্ঞানই মুক্তি বলিয়া আদৃত এবং মুক্তির নামে যে দেশে অপরিজ্ঞাত অবস্থা স্বীকার করে না, সে দেশে ত জ্ঞানের কথা উপেক্ষিত হইবার নহে।

যদি জ্ঞান প্রচারে নহে, তবে ইউরোপীয় সভ্যতা কি ভাবে আসিয়া দেখা দেয়? বাইবেল প্রচারের প্রথম শিক্ষা এই যে,ভারত বা চীন দেশে যাহা কিছু প্রাচীন, সকলই মন্দ; যাহা কিছু আচার ব্যবহার সকলই দোষযুক্ত। কারণ, এই সকল দেশ যীহোবা বা গড্ নামক ঈশ্বরের পদার্পণ বঞ্চিত, এবং শয়তান শাসিত। জিজ্ঞাসা করি যে, আমাদিগের ধুতি চাদর হইতে ব্রহ্মবিদ্যা পর্য্যন্ত এমন কি আছে, খ্রীষ্টিয়ানেরা যাহার পক্ষপাতী? ধুতি এমনই অপবিত্র যে, ইহা পরিয়া মেম দর্শন করিলে কোন এক পক্ষকে নিরয়গামী হইতে হয়; ব্রহ্মবিদ্যার নাম করিলেও খ্রীষ্টিয়ানের নরক মুখব্যাদান করে। আমরা মদ্য স্পর্শ করি না, সেটা কুসংস্কারের ফলে। কাজেই মদ্যপানের নিষেধ আজ্ঞা আজ কাল কেহ কেহ প্রচার করিলেও, এতৎসম্পর্কীয় কুসংস্কারটুকু ভাঙ্গিতে কেহ ছাড়েন না। ইহাতে ইউরোপীয় সভ্যতা যে আকারে বর্দ্ধিত হয়, আমি তাহার ভৌতিক চিত্র অঙ্কিত করিতে অসমর্থ। এই প্রকার কুসংস্কার ধ্বংশে, যে সভ্যতা বিকশিত হয়, তাহা অনুপযোগী পরিচ্ছদে, অস্বাস্থকর আহার পানে, এবং অসংযমতাময় "বল্ নৃত্যে" পরিসমাপ্ত হয়। এই সভ্যতায় স্বদেশীয় সকল অবস্থার প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা জন্মে।

খ্রীষ্টিয়ান না হইয়াও যাহারা বিলাতি আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান, তাঁহারা সর্ব্বদাই স্বদেশের ঠাকুর ফেলিয়া বিদেশের কুকুর লইয়া যত্ন করিতেছেন। শরীরের রং বদলান সম্ভবপর হয় না; কিন্তু পোষাক পরিবর্ত্তন অতি সহজ। ইহাতে ফল এই হয় যে, ভাল দেশীয় পরিচ্ছদ পরিহিত দেখিলে

লোকে মনে করিত যে, ইনি দেশীয় ভদ্র লোক; আর কৃষ্ণ দেহে বিলাতি পরিচ্ছদ দেখিলে লোকে ভাবে, ইনি ট্যাঁস ফিরিঙ্গি। সেই ট্যাঁসফিরিঙ্গি হইতে পারিলেও বিলাতি আদর্শপ্রিয় ভদ্রলোকগণ সন্তুষ্ট। বড় অথবা সভ্য সাহেবেরা কিছু দেশীয় লোকদিগের সহিত মিলিতে মিশিতে চায় না; অথবা কবির বচনই সত্য যে:—

যতই বলুন, যতই শিখুন, তাদের চলন চাল,
ইংরাজেরা ভোলেনা তায় হায়রে কলিকাল।

এরূপ অবস্থায় ইংরাজের সহিত মিশিবার সুখটা নীচ জাতীয় ফিরিঙ্গির সহিত মিশিয়া মিটাইতে হয়। মধু অভাবে গুড় না চালাইলে চলে কই? এটিকেট এবং ইংরাজী চাল দেখাইবার জন্য অশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত, এবং নীচ চরিত্র ফিরিঙ্গির দল নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে আনিয়া গৃহ পবিত্র করিতে হয়। তথাপি ধুতি পরা সচ্চরিত্র দেশীয় লোকের সহিত সংস্রব রাখা অন্যায় বলিয়া ভাবা হয়। এই সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই গুপ্ত কবি বলিয়াছেন যে, "কোনরূপে পিত্তি রক্ষা এঁটো কাঁটা খেয়ে।" এ সকল দেখিয়া শুনিয়া দেশের লোকে কেনই না মনে করিবে যে, ফিরিঙ্গিয়ানায় দেশের অধোগতি উপস্থিত হয়?

এই জন্যই বিদেশীয় সম্পর্কে দেশের লোক শিহরিয়া উঠে। একদিকে যেমন খ্রীষ্টিয়ানের গোঁড়ামির দিকে চাহিয়া দেখিলে মানিতে হয় যে, ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তাঁহারা যাহা করেন, তাহাতে তাঁহাদের দোষ নাই। অন্যদিকে দেশীয় লোকও যে তাঁহাদের বিদ্রোহী হইয়া উপদ্রব উপস্থিত করে, তাহাও তাহাদের মূর্খতাময় ক্ষুদ্রবুদ্ধির হিসাবে ন্যায্য বলিয়া প্রতীত হয়। এরূপ স্থলে চীন দেশ হইতে পাদরী বিদায় করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাই সর্ব্বথা মঙ্গলকর বলিয়া মনে হইতেছে। চীন দেশীয়েরা পরলোকে নরকভোগ করিবে কি না, ইহা অপেক্ষা ইহলোকে তাহাদের সুখ শান্তি কিসে বৰ্দ্ধিত হয়, সে বিষয়ের চিন্তা ও চেষ্টাই অধিক প্রার্থনীয়। চীনদেশের ভিটায় পবিত্র আত্মার "ঘুঘু" চরাইবার জন্য মহম্মদের তরোয়ালের উপর কামান ও অগ্নি যোগ না করিয়া, যাহাতে ইংরাজের বাণিজ্য ও ক্ষমতা সে দেশে সদ্ভাবের সহিত পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহারই চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়। রাজনীতি যখন ইহলোক লইয়া, তখন পারলৌকিক তত্ত্বের একটু অবমাননা হইলে ক্ষতি কি? ইংরাজ জাতি যে প্রকার রাজনীতি কুশলী, তাহাতে মনে হয় না যে, এই বিদ্রোহ থামিয়া গেলে জর্ম্মান বা রুষিয়ার মত ইংরাজ এ দেশের উপর দাদ্ তুলিতে চেষ্টা করিবেন, অথবা পাদরী-হুজুগ বজায় রাখিয়া আপনার সৌভাগ্য বিস্মৃত হইবেন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ব্রহ্ম ও জগৎ। (১৯)

এই প্রবন্ধের বিগত তিন সংখ্যায় আমরা যাহা দেখাইয়া আসিয়াছি, তাহা হইতেই পাঠক বেদান্তের মায়াবাদের প্রকৃত মর্ম্ম ও তাহার সহিত সাংখ্যমতের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়াছেন। তথাপি আমরা তৎসম্বন্ধে আরো কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া শ্রুত্যুক্ত "অধ্যাত্মযোগের" কথা বলিব। বেদান্ত মতে ব্রহ্ম বাস্তবিক পক্ষে নির্গুণ,

নিষ্ক্রিয়, অচিন্ত্য ও কার্য্যকারণাতীত। এরূপ অবস্থায় ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় ব্রহ্ম কেবলমাত্র, সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ। অথবা সৎচিৎ-আনন্দ স্বরূপ। কিন্তু ব্রহ্মের এই জ্ঞান আমাদের মত দ্বৈত গ্রাহী নহে। এই জ্ঞান বিশুদ্ধজ্ঞান (mass of cognition)। শঙ্করাচার্য্য বলেন, বিশেষ বিশেষ জ্ঞানমাত্রেই অন্তঃকরণের বৃত্তি। অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি,—ইচ্ছা, দ্বেষ, কামনা, ভয়, ক্রোধ ও সুখদুঃখাদিরূপে দেখা দেয়। মানবীয় জ্ঞানের অবস্থাই এইরূপ; ইহা দ্বৈতালিঙ্গিত এবং নানাবিধ বৃত্তি (modification) বিশিষ্ট। ব্রহ্মের জ্ঞান এরূপ নহে। ব্রহ্মের জ্ঞানের একমাত্র অবস্থা; এ জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন আকার নাই। ইচ্ছাদ্বেষাদি বিশেষ বিশেষ জ্ঞানগুলি,—সেই একমাত্র জ্ঞান দ্বারা প্রতিমুহূর্ত্তে প্রকাশিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, বুদ্ধির ইচ্ছাদ্বেষাদি বৃত্তিগুলি বাস্তবিক পক্ষে অচেতন। ইহারা ব্রহ্মের সেই চিৎসত্ত্ব বা নির্ম্মল একরসাত্মক জ্ঞানালোক দ্বারা আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় বলিয়া উহাদিগকে আমরা ইচ্ছা দ্বেষাদি রূপে বুঝিতে পারি মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞান এইরূপ। তাঁহার দৃক্‌শক্তি আমাদের ন্যায় নহে যে, প্রতিক্ষণে নানাবিষয় অবগাহন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান লাভ করিবে। তাঁহার দৃক্‌শক্তি বা জ্ঞানক্রিয়া সদা প্রকাশিত, ইহার বাধা নাই; ইহা ধারাবাহিকরূপে কেবল সদা প্রকাশাত্মক; এ জ্ঞানের প্রকাশ্য এ বস্তু, ও বস্তু—এইরূপ দ্বৈতভাব নাই। এই জন্য এ জ্ঞান অনন্ত বা সীমা (limitation) বর্জ্জিত। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। কিন্তু এ আনন্দ আমাদের ন্যায় দ্বৈতবিষয়ালিঙ্গনকারী আনন্দ নহে। আমাদের নানাবিধ আনন্দ সমূহের মূল কারণ এই আনন্দ। এই আনন্দের জ্ঞাতা (rejoicer) এবং পাত্র (the thing rejoiced at) নাই। ইহা সদা একরূপ এবং অনন্ত। ব্রহ্মের এই জ্ঞান ও আনন্দ তবে, বিষয় বিষয়ী সম্বন্ধ বিবর্জ্জিত। এই ব্রহ্ম জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় কিছুই নহেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বেদান্তের এই ব্রহ্মের কোন রূপ জ্ঞান বা আনন্দ নাই; ব্রহ্মই জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ। মনুষ্য গাঢ় নিদ্রার পরে গাত্রোত্থান করিয়া যেরূপ মনে করে যে, "আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম"—ব্রহ্ম-জ্ঞান কতকটা সেইরূপ। উহাতে কেবল অস্তিত্ব জ্ঞান মাত্র থাকে। ইহা বৃত্তি রহিত জ্ঞান। এই নির্ম্মল জ্ঞানালোক, আমাদের বুদ্ধির হিংসা দ্বেষাদি সমুদায় বৃত্তিকে আলোক প্রদান করিয়া থাকে। এই জ্ঞানালোক না থাকিলে, সমস্ত বৃত্তি অন্ধকারময় ও জড়ভাবে থাকিত। তখন আর সে বৃত্তিগুলি মনুষ্যের বোধের সীমায় আসিত না। এই আলোকে প্রকাশিত হয় বলিয়াই আমরা সুখ দুঃখ, ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতি অচেতন বৃত্তিগুলির বোধ বা অনুভূতি লাভ করিতে সক্ষম হই। এই জন্যই উপনিষদ্ বলেন যে "কঃ কেন কং পশ্যেৎ; কঃ কেন কং কুর্য্যাৎ" ইত্যাদি। বেদান্তের ব্রহ্ম এইরূপ। ইহা দেশ, কালের অতীত। কেন না, ইহাকে সীমা দিতে পারে, এরূপ দ্বিতীয় বস্তু নাই। ইহা অন্তঃকরণের বিবিধ জ্ঞানের (all modes of consciousness) সীমার বাহিরে বর্ত্তমান। এ জ্ঞানের জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় কেহই নাই। ইহা কার্য্যও কারণও নহে। বেদান্তমতে এরূপ ব্রহ্ম "ঈশ্বর" নহেন।

এই ব্রহ্ম যখন কার্য্যের কারণরূপে প্রকাশিত হন, সেই অবস্থায় ইনি ঈশ্বরপদবাচ্য।

অনাদিকাল হইতে একটী সৎ এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে একটী অসৎ—পদার্থ আছে। এই অসৎ সেই সতেরই শক্তিমাত্র। এই অসৎ যখন সতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, অর্থাৎ সৎ পদার্থ যখন তাঁহার মধ্যস্থ শক্তি বিকাশ করিবার ইচ্ছা করেন,তখন এই সৎই কারণ হইয়া পড়েন এবং তাঁহাব সেই শক্তিই "অব্যক্ত-কার্য্য"রূপে অবস্থিত থাকে। ব্রহ্মের এই শক্তি বা পরে প্রকাশিত কার্য্যের এই অব্যক্তাবস্থাই 'অব্যক্তমায়া' নামে অভিহিত। বাস্তবিক পক্ষে মায়া বা ব্রহ্মশক্তি, সত্ব, রজঃ ও তমঃ বা সুখ দুঃখ-মোহ এ ত্রিবিধ উপাদানের সমপরিমাণ-মিশ্রণাত্মক পদার্থ। এ পদার্থত্রয় স্থূল জড় পদার্থ নহে; ইহা শক্ত্যাত্মক। জড় যেরূপ আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তির সমবেত মিলন ভিন্ন আর কিছুই নহে (ইংরেজী Psichology দেখ), তদ্রূপ এই শক্তিত্রয়ও ভবিষ্যৎ কার্য্যের শক্তিময় রূপ। এ অবস্থায় ইহা কার্য্যশীল নহে। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম যখন সিসৃক্ষু হন অর্থাৎ তাঁহার শক্তিবিকাশ করিবার ইচ্ছা করেন, তখন ব্রহ্ম কারণ স্বরূপ বা সগুণ ঈশ্বর এবং তাঁহার শক্তিও তখন কেবল সত্বময় অবস্থা ধারণ করে। শক্তির এই প্রথম বিকাশ বা সত্ব প্রধান অবস্থাই ভবিষ্যৎ জগতের বীজশক্তি। এই অব্যক্তাবস্থা ব্রহ্মের "কারণ-শরীর" বলিয়া অভিহিত। ব্রহ্মচৈতন্য মায়াতে প্রতিবিম্বিত হইলেই, অর্থাৎ ব্রহ্ম যখন সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখনই তন্নিহিত শক্তির সত্বময় প্রথম বিকাশ হয়। এই সত্ব অবস্থা তখনও (unconscious)অব্যক্ত মাত্র। সমুদ্রের জলরূপ উপাদান কারণে যেরূপ পরে প্রকাশিত ফেন, তরঙ্গ, বুদ্বুদ্ প্রভৃতি অব্যক্তাবস্থায় লীন থাকে,ব্রহ্মেও তদ্রূপ পরে প্রকাশিত বুদ্ধি, মন প্রভৃতি অব্যক্তাবস্থায় লীন থাকে। এ অবস্থায় অব্যক্তমায়া নিতান্ত অসৎ বা অভাবাত্মক হইতে পারে না। কেন না, সায়নাচার্য্য বলেন যে, 'জগৎ-সৃষ্টির আদি নাই। এক প্রলয় সময়ে, যাহা যাহা অব্যক্ত ভাবে লীন ছিল, পর সৃষ্টির আরম্ভে সেইগুলিরই ক্রমে বিকাশ হয়। সুতরাং এই "অব্যক্ত মায়াতে" পূর্ব্বসৃষ্ট সমুদয় পদার্থই অতি সূক্ষ্ম ভাবে বিলীন অবস্থায় নিহিত ছিল। সেই গুলিরই সৃষ্টি সময়ে পুনবায় সূক্ষ্ম ও স্থূলভাবে বিকাশের নামই "সৃষ্টি"। অতএব এই অব্যক্ত বা ঈশ্বরের সৃষ্ট্যুন্মুখ শক্তি একেবারে অভাবাত্মক পদার্থ নহে।

ব্রহ্মের এই সৃষ্ট্যুন্মুখ শক্তিই (অব্যক্তাবস্থায় স্থিত) "কারণ শরীর" বা "আনন্দময়" কোষ নামে বেদান্তে অভিহিত হইয়াছে। সাংখ্যাচার্য্যগণ ইহাকেই সত্বগুণ প্রধান "মহত্তত্ব" বা বৃত্তিরহিত বুদ্ধিতত্ব (mind without any modifications) বলেন। ইহা ব্রহ্মশক্তিরই প্রথম বিকাশাবস্থা। ইহা বীজ স্বরূপ। পরে প্রকাশিত সমস্ত শক্তি ইহাতে নিহিত আছে; কেবল বাহ্যবিকাশ নাই মাত্র। এই শক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্য ঈশ্বর নামে অভিহিত। ইনিই কারণাত্মক। এখনও এই জ্ঞানময় চৈতন্যে,জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—এই দ্বৈতভাব প্রকাশ পায় নাই। ইহা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাবে প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বতম অবস্থা। মায়ার এই অব্যক্তাবস্থাকে সত্বপ্রধান বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলী সমস্তই ইহাতে সত্বামাত্রে অবস্থিত আছে। সকলেরই অব্যক্ত ভাবে "অস্তিত্ব" আছে বলিয়াই ইহা সত্ব-প্রধান। ইহা ঈশ্বরেরই শক্তি। এখনও বুদ্ধি, মন, ও ইন্দ্রিয়াদির ভিন্ন ভিন্ন শক্তিগুলি, সেই সেই

রূপে প্রকাশিত হয় নাই। ইহারা সুপ্তভাবে ইহাতে বিলীন আছে। ইহারা পরে সূক্ষ্মরূপে এবং স্থূলরূপে দেখা দিবে। অতএব এই অব্যক্তশক্তিই জগতের উপাদান কারণ। ইহা ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া, ব্রহ্মও নিমিত্ত কারণ হইলেও, ব্রহ্মই বাস্তবিক পক্ষে জগতের উপাদান কারণ। কেন না, শক্তি ও শক্তিমান একই পদার্থ। জগতের এই পূর্ব্বাবস্থা বা Potcrtial or pre-existent state অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; নতুবা ঈশ্বরের সৃষ্টি শক্তির ব্যাখ্যা করা যায় না। কেননা, ঈশ্বর যদি শক্তিশূন্য হন, তবে তিনি সৃষ্টি করিবেন কিরূপে? তাহা হইলে, অভাব হইতে ভাবপদার্থ জন্মিল, একথাও স্বীকার করিতে হয়। ব্রহ্মশক্তিতে যদি ভবিষ্যৎ কার্য্য সকলের বীজ নিহিত না থাকিত, তবে তাহা অকস্মাৎ কিরূপে প্রাদুর্ভূত হইল? এই জন্যই উপনিষদ্ বলেন যে, সৃষ্টির প্রাক্‌কালে ঈশ্বরকে "তপস্যা" বা "সংকল্প" করিতে হইয়াছিল। ইহার অর্থ prevision of the world that is to be. অর্থাৎ পূর্ব্বে যেরূপ ভাবে জগৎ তাঁহার শক্তিতে লীন হইয়াছিল, ঠিক্ তদ্রূপ ভাবে সৃষ্টির ইচ্ছা। শক্তির ধ্বংশ অসম্ভব। শক্তি নিত্যবর্ত্তমান না থাকিয়া পারে না, কেবল তাহার বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় মাত্র (আমাদের প্রকাশিত "হার্ব্বার্ট স্পেনসার ও তাঁহার মত" নামক প্রবন্ধ দেখ)। সুতরাং যাহা শক্তিরূপে সূক্ষ্মভাবে লীন হইয়াছিল, তাহার যখন ধ্বংশ অসম্ভব, তখন, তাহার পুনরায় অব্যক্তাবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া, ক্রমশঃ ব্যক্ত-সূক্ষ্ম এবং তৎপর ব্যক্তস্থূল অবস্থায় পরিবর্ত্তন হইবেই হইবে। নতুবা বলিতে হয় যে, শক্তি ধ্বংশ হইয়া গেল। এইরূপে বারম্বার সৃষ্টি ও লয় হইতেছে। শঙ্কর এই জন্যই বলিয়াছেন যে, এই অব্যক্ত মায়া বা সৃষ্ট্যুন্মুখ ব্রহ্ম-শক্তি, ভবিষ্যৎ ইন্দ্রিয় ও শরীরাদির সূক্ষ্ম, সমষ্টিভূত শক্তির মিলনাত্মক শক্তিমাত্র। ইহাতে যাহা যাহা ছিল, (বীজভাবে ছিল) তাহাই যথাযথ প্রকাশিত হইয়া, এই জগৎরূপে বিকাশ পাইয়াছে। মায়া বা ব্রহ্মশক্তি এই বীজাবস্থায় পরিণত হইবার পরেই, সূক্ষ্মাবস্থায় প্রকাশ পায়। এই সূক্ষ্মাবস্থায়, বুদ্ধির বৃত্তিগুলি, ইন্দ্রিয়ের শক্তিগুলি এবং সূক্ষ্ম রূপরসাদি প্রকাশ পায়। যাহা বীজাবস্থায়, নির্ব্বিশেষভাবে ছিল; তাহাই সূক্ষ্মরূপে বিশেষ বিশেষ শক্তি ও বৃত্তি(Modifications) রূপে দেখা দিল। নূতন কিছুই হইল না। তারপর পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া এইগুলিই আবার ব্যক্তস্থূলরূপে দেখা দেয়। তখন মায়ার স্থূলাবস্থা। তখন ব্রহ্মশক্তি "অন্নময় কোষ" নামে অভিহিত; কেননা, মায়ার তখন একটা স্থূল আবরণ জন্মিয়াছে।

আমরা বলিয়াছি, ব্রহ্ম নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহার শক্তি, জ্ঞানেরই ক্রিয়ামাত্র। নির্ম্মলজ্ঞানের এই ক্রিয়ার সুতরাং তিনটী অবস্থা। ক্রিয়োন্মুখ বা অব্যক্তাবস্থা, ক্রিয়ার সূক্ষ্মাবস্থা এবং ক্রিয়ার স্থূল বা ঘনীভূত অবস্থা। প্রথম অবস্থায় ক্রিয়া সত্ত্ব-প্রধান, দ্বিতীয়াবস্থায় রজঃ প্রধান এবং তৃতীয়াবস্থায় তমঃ প্রধান। জ্ঞানের ক্রিয়ার এই তিন প্রকার অবস্থায়, জ্ঞানেরও তিনরূপ অবস্থা প্রকাশ পায়। একই জ্ঞান, ক্রিয়াভেদে ত্রিবিধাবস্থা ধারণ করে। ক্রিয়ার এই তিন অবস্থা বা উপাধি যোগে জ্ঞানও উপাধিগ্রস্ত বলিয়া ভ্রম হয়। ক্রিয়োন্মুখাবস্থায় জ্ঞান নির্ব্বিশেষ; বিশেষ ভাবে ক্রিয়া প্রকাশ

পায় না বলিয়া,জ্ঞানও এ অবস্থায় নির্ব্বিশেষ, বা অতি-সাধারণ ভাবে সমস্তের জ্ঞান থাকে। গাঢ় সুষুপ্তি অবস্থায় মনুষ্যের জ্ঞান যেরূপ সত্বামাত্র অনুভব করে ; এ অবস্থায়ও তদ্রূপ নির্ব্বিশেষ সত্বাত্মক জ্ঞানমাত্র। ঈশ্বর এ অবস্থায়, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। যেহেতু তিনি এ অবস্থায় নির্ব্বিশেষ ভাবে ভবিষ্যৎ-কালে প্রকাশিত সমস্ত শক্তি ও ক্রিয়ার বিষয় অবগত আছেন। তিনি এ অবস্থায় সর্ব্বনিয়ন্তা (Actuator)। যেহেতু যে যে প্রাণী ও বস্তু যে যে শক্তি লইয়া তাঁহার শক্তিতে লীন হইয়াছিল, তিনি এই ক্রিয়োন্মুখ অবস্থায়, সেই সেই প্রাণী ও বস্তু প্রভৃতির সেই শক্তি ও ক্রিয়াদির বিকাশ করেন। অর্থাৎ তিনি বিলীন বুদ্ধির বৃত্তি সকল (ইচ্ছা দ্বেষাদি) এবং তাহা হইতে ইন্দ্রিয় শক্তি-গুলিও রূপরসাদির আবির্ভাব করাইয়া দেন। এই জন্যই মহাত্মা শঙ্কর বলিয়াছেন যে, "ঈশ্বর প্রাণীর কর্ম্ম বা অদৃষ্টানুসারেই নিয়োগ করেন বা ফল প্রদান করিয়া থাকেন"। এই ঈশ্বর যেমন সৃষ্টিকালে পূর্ব্বনিহিত শক্তি ও ক্রিয়াদির বিকাশ করাইয়া দেন, তেম্‌নি তিনি সর্ব্বাবস্থায় সমস্ত শক্ত্যাদিকে নিজের আলোকে আলোকিত করিয়া থাকেন। নতুবা কোন শক্তি বা ক্রিয়া প্রকাশই পাইত না। এই জন্যই তিনি "নিয়ন্তা" নামেও অভিহিত। এই জন্যই তিনি জগতের মূল কারণ। অতএব ব্রহ্ম এই জগতের বীজস্বরূপ এবং মায়া এই জগদ্বৃক্ষের উৎপত্তি-শক্তি। বীজে যেরূপ ভবিষ্যৎ বৃক্ষের সত্বা অন্তর্নিহিত থাকে, অব্যক্ত-মায়াতেও তদ্রূপ ভবিষ্যৎ সত্বা সমূহের অস্তিত্ব অন্তর্নিহিত থাকে। ঈশ্বর উহাদিগের অন্তর্লীন শক্ত্যনুসারে উহাদের বিকাশ করাইয়া থাকেন। "প্রাগুৎপত্তেঃ স্তিমিতং অনিস্পন্দং সৎকার্য্যাভিমুখং ঈষদুপজাত প্রবৃত্তি তৎসৎ সমভবৎ (ঈশ্বর)। ততোপি লব্ধ পরিস্পন্দং অন্তরনামরূপ ব্যাকরণেন অঙ্কুরীভূতমিব বীজমভূৎ (হিরণ্যগর্ভ)। ততোঽপি ক্রমাৎ স্থূলীভবৎ সমবর্ত্তত (বিরাট্)। সর্ব্বেষাং ঈশ্বরাধিষ্ঠিতানা মেব নিয়মেন প্রবৃত্তিঃ" (শঙ্করভাষ্য ; ছাঃ উপনিষৎ। ন সতঃ সদন্তরং উৎপদ্যতে, সদেব সংস্থানান্তরেণাবতিষ্ঠতে ; যথা সর্পঃ কুণ্ডলী ভবতি" (Ibid)। এই ঈশ্বর গীতায় "পরমপুরুষ" নামে অভিহিত হইয়াছে।

নিজ অব্যক্তশক্তি হইতে এইরূপে জগদ্বিকাশ, বেদান্তমতে, ঈশ্বরসাপেক্ষ। তাঁহার সংকল্প নিত্য-সত্য। কাজেই তাঁহার সংকল্পবশতঃই সেই সেই রূপে ও আকারে পদার্থ সমূহ সৃষ্ট হইয়াছে। সাংখ্য বলেন, প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তি হইলেও, ইহা ঈশ্বর হইতে একটী পৃথক্ পদার্থ। কার্য্য উৎপন্ন হইতে, এই প্রধানের সহিত ঈশ্বরের সংযোগ বা ইচ্ছা আবশ্যক করে না। অন্তর্নিহিত শক্তিবলে, প্রধান আপনা আপনিই নিয়মিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া জগৎরূপে দেখা দেয়। এই স্থলেই বেদান্তের সহিত সাংখ্যের প্রধান পার্থক্য। কার্য্যমাত্রেই, ব্রহ্মশক্তির অবস্থার বিকাশ বলিয়া, বেদান্তমতে এক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থের পৃথক্ সত্বা নাই। সূক্ষ্মাদিরূপে প্রত্যেক শক্তি বা কার্য্যের প্রত্যেক বিকাশই বেদান্তের নিকটে এক মাত্র চৈতন্যেরই বিকাশ। এইরূপ ভাবে বিকাশের হেতুই ঈশ্বরেচ্ছা। তিনি এইরূপেই নিজশক্তিকে বিকাশ করিয়া থাকেন, শক্তি ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া, তিনি নিজশক্তি দ্বারা আবৃত হইয়া পড়েন। শক্তির নানাবিধ

নিজেই অবস্থাত্মক উপাধি যোগে, ব্রহ্মও নানারূপ উপাধিগ্রস্ত হইয়া পড়েন। ইহাই বেদান্তের মায়াবাদ।

এখন আমরা পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত "অধ্যাত্ম-যোগ" প্রভৃতির সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইব। শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

মানুষ ও সমাজ।

সমাজ, মানব জীবনের অচ্ছেদ্য, অখণ্ডনীয়, অপরিহার্য্য, অবশ্য কর্ত্তব্য নিয়ম-পত্র। কেহ কেহ ব্যক্তিগত নির্ব্বিবাদ স্বাধীনতার পক্ষপাতী। কোন কোন দার্শনিক বলেন "মানুষ জন্মাবধিই স্বাধীন"—অর্থাৎ জন্মাবধিই সমাজের রীতি নীতি, বিধিব্যবস্থা, ব্যবহার ও শাসনের অন্তর্ভূত নহে। একটু বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, ইহা প্রকৃত সত্য নহে—কেবল তাঁহাদিগের উষ্ণ মস্তিকের স্বেচ্ছাকৃত কল্পিত সত্য মাত্র। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, কোন্ স্থান হইতে, কাহার আজ্ঞায়, কি প্রকারে মানুষের এই কল্পিত স্বাধীনতার উৎপত্তি—যদি কেহ জানিতে চাহে যে, কে মানুষকে সমাজশাসনের বাহিরে লইয়া গিয়াছে, কে তাহাকে এই নির্ব্বিবাদ-স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত দার্শনিকগণ নিরুত্তর। তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ এই বিশেষ অধিকারে অধিকারী। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। জন্মের পর হইতেই যদি আমরা একটী শিশুর চরিত্র আলোচনা করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, চরিত্রের প্রত্যেক অঙ্ক, প্রত্যেক চিত্র, এমন কি, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু পর্য্যন্ত, কোন না কোন জাতীয়, স্থানীয় এবং পারিবারিক ঘটনাবলীর অমানুষী ক্ষমতার ছায়া মাত্র। মানুষ, সমাজের অনুলিপি—প্রতিবিম্ব—নিখুঁৎ অবিকৃত চিত্র।

কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, সদ্যপ্রসূত শিশুর হৃদয় যেন মসিরেখা-বিহীন একখানি সাদা কাগজ। সেই কাগজে, শিক্ষার দ্বারা তোমার যাহা অভিরুচি, তুমি তাহাই অঙ্কিত করিতে পার। নবজাত শিশু যেন কুম্ভকারের হস্তে মৃত্তিকা। তাহাকে যে ছাঁচে ইচ্ছা সেই ছাঁচেই ঢালিতে পার—ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যেমন ইচ্ছা, তাহাকে তেমনি করিয়া গড়িয়া লইতে পার। কিন্তু যে ছাঁচে তুমি তাহাকে ঢালিতে চাহিতেছ, তোমাকে তাহা কে দিয়াছে? অতীত ঘটনাবলীর অবিনশ্বর চিত্র যেন জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই মনুষ্য হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে—মনুষ্যের আত্মাতে মুদ্রিত হয়। অতীত রীতি-নীতি প্রভৃতির সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ জন্মিবার পর কেবল তাহাতে একটী রং ফলান হয় মাত্র। তাহারা মূলে ঠিক একই থাকে, কেবল তাহাদিগের বর্ণনা নূতন—ভাষা নূতন—অভিব্যক্তি নূতন।

পাঁচ জনে মিলিয়া একটী ব্যবসা আরম্ভ করিলে, সেই ব্যবসায়ে তাহাদের প্রত্যেকেরই যেমন এক একটী অংশ থাকে—তাহাদিগের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চেষ্টা, যত্ন ও উদ্যমে যেমন সেই আরব্ধ-কার্য্য দিন দিন উন্নতি লাভ করে—মনুষ্য বিশেষ বা জাতি বিশেষের স্বেচ্ছাকৃত সমাজ-বন্ধনেও তাহাদিগের তেমনি এক একটী অংশ আছে। সেই সমাজের শিক্ষা দীক্ষা, উন্নতি অবনতি, ধর্ম্ম কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি সকল

বিষয়েই তাহাদিগের অংশ লক্ষিত হয়। এই অংশিত্ব যে শুধু জীবিত মনুষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিভক্ত, তাহা নহে। ভূত, ভবিষ্যৎ; বর্ত্তমান এই তিন কালকে সমাজ এক সূতায় গাথিয়া রাখিয়াছে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের এক একটী নিয়ম মানবসাধারণের সেই অথণ্ডনীয় আদিম বন্ধনের অনুবর্ত্তী। বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ জগৎ, বর্ত্তমান মানব মণ্ডলী ও যাহারা এখনও ভবিষ্যতের অন্ধকার যবনিকার অন্তরালয়ে লুক্কাইত রহিয়াছে, তাহাদিগের প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতিহাসের সংযোগ সূত্র। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন সূত্র সমষ্টিই তাহাদিগের নৈতিক ও প্রাকৃতিক বন্ধনের দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল। সমাজ, অতীতের জীবন্ত স্মরণ-চিহ্ন—বর্ত্তমানের সুদৃঢ় শৃঙ্খল—ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শক ধ্রুবতারা। যতদিন মানুষ—ততদিন সমাজ—যত দিন ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, ততদিন সমাজের আয়ু এবং বিস্তৃতি।

শিক্ষাই আমাদিগের চরিত্র গঠন করে। জ্ঞান,পার্থক্য, স্বাতন্ত্র, স্বাধীনতা,শিক্ষা হইতেই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষার এই সমস্ত সুফল যে মানুষকে সমাজ শাসনের বাহিরে কোন অবাধ-স্বাধীনতার একটী কল্পনাময় রাজ্যে লইয়া যাইয়া থাকে, তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। শিক্ষা মানুষকে সমাজের অন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়—বাহিরে লইয়া যায় না। শিক্ষা কি? পিতা মাতা বা শিক্ষক কেবল শিক্ষার উপায় এবং পথগুলির ব্যাখ্যা করেন মাত্র, শিখাইতে পারেন না। মানবজীবনের যে সময়ে কেহ শিক্ষার কথা কল্পনাতেও আনিতে পারে না, তাহার শিক্ষা সেই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। এবং মানুষ যখন মনে করে যে, তাহার শিক্ষা শেষ হইয়াছে, শিক্ষার রাজ্যে তখনও সে শিশু। সমাজের ভাষা এবং সাহিত্যেই সেই সমাজের অন্তর্নিহিত মানবের শিক্ষার সোপান প্রোথিত থাকে। সেই ভাষা এবং সাহিত্যই যে আবার কত যুগযুগান্তরের বিভিন্ন গবেষণার ফল, তাহা কে বলিতে পারে? জন্মগ্রহণের পর শিশু আপনার সুবিধামত সংসার-চিত্র অঙ্কিত করে না। কোম্‌তে (Comte) বলেন যে, যে মানব নিজকে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন বিবেচনা করে, সে তাহার সেই অসৎ,ধৃষ্টতা পূর্ণ, কল্পিত সত্যটী ভাষায় প্রকাশ করিলেই তাহা তাহার আত্ম-প্রতিবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কথাটী অতিশয় প্রবীণ এবং সত্য। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ভাষা মানুষের নিজের নহে—সমাজের সম্পত্তি। সে কেবল সেই সাধারণ সম্পত্তির একজন অংশীদার মাত্র। ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় ভাষার সৃষ্টি হয় না। যুগান্তর ধরিয়া সমাজের প্রভূত যত্নে তাহার সৃষ্টি, পরিবর্ত্তন, উন্নতি ও পরিবর্দ্ধন হইয়া থাকে। শুধু ইহাই নহে। আমরা সাধারণ কথায় বলিয়া থাকি, অমুক ব্যক্তি অমুক পুস্তক খানি প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু পুস্তক প্রণয়ন কেবল পূর্ব্বগামী শত শত নরনারী পরিত্যক্ত নানা বিষয়ক উপাদানের পুনরোক্তি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এই স্থানে মনে রাখিতে হইবে যে, সেই পূর্ব্বগামী নরনারীও কোন সমাজ বিশেষের অঙ্গ, অন্ততঃ মানব সাধারণের ভিতর অবস্থিত। তাই ইমারসনের (Emerson) মতে সকলেই 'রচনা-চোর' (plagiarist)। মৌলিকতা কাহারও নাই।

কথাটা শুনিতে যেমনই বোধ হউক, কিন্তু অমূলক নহে। নৈতিক শিক্ষাও ঠিক এই প্রকার। আমরা কাহাকেও নীতি শিখাইতে পারি না। যে সমাজ যত পুরাতন, যত উন্নত, সেই সমাজে শিক্ষার উপাদান তত অধিক এবং সুন্দর প্রণালীবদ্ধ।

অমানুষী ক্ষমতা এবং অভুতপূর্ব্ব শক্তি সম্পন্ন যে সকল ব্যক্তি আমাদের সমাজে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাও সমাজবহির্ভূত নহেন। তাঁহারা ও সমাজ নির্ম্মাতা নহেন—সমাজই তাঁহাদিগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। বুদ্ধ বল, চৈতন্য বল—যাহার ইচ্ছা তাহারই নাম কর, সকলেই সমাজের দাস। তবে তাঁহারা এত বড় হইলেন কিসে? কিসে তাঁহাদিগের এত গৌরব, এত শক্তি হইল? তবে কেমন করিয়া তাঁহারা সমাজে এত ভয়ানক ভয়ানক বিপ্লব ঘটাইতে সমর্থ হইলেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে,কেবল তাঁহাদিগের সময়োপযোগী অভাব বোধ—সেই অভাব নিরাকরণে সমাজ-হৃদয়ে তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি এবং সমাজের অন্ধ, উন্মত্ত, উচ্চাশা সমূহে তাঁহাদিগের প্রাণপন সহানুভূতি। সমাজের বিক্ষিপ্ত, অসংযুক্ত, অসম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষার সমষ্টি করণই মহাত্মাদিগের এক মাত্র কার্য্য। তাঁহারা যে সকল নূতন নূতন, অশ্রুতপূর্ব্ব, ঐশ্বরিক সত্য সকল আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাহা প্রকৃত আবিষ্কার নহে। সে কেবল লোকচক্ষুর অন্তরালে নিহিত অথচ পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত সত্য সমূহের নির্দ্দেশ মাত্র। সমাজাকাশে যাহা আবছায়াময় থাকে—সমাজের চিত্রপটে যাহা ক্ষীণ,লোকলোচন-বহির্ভূত,তাঁহাদিগের মন্ত্রময় তুলিকা কেবল তাহাতে নানা রকমের বর্ণ অর্পণ করে মাত্র। বাতাসেই শব্দের উৎপত্তি হয়। তবে নর-কর্ণগোচর করিবার নিমিত্ত একটী যন্ত্রের আবশ্যক। মহাত্মাগণ সমাজের সেই যন্ত্র-স্বরূপ।

মানুষ প্রত্যেক কার্য্যে—প্রত্যেক কথায়, এমন কি প্রতি পাদবিক্ষেপে সমাজের অধীন—সমাজের বিনামূল্যে ক্রীতদাস। সমাজই মনুষ্য—মনুষ্যচরিত্র এবং তাহার ইতিহাসই সমাজ। যাঁহারা সমাজবন্ধন ছিড়িয়া ফেলিতে চাহেন, তাঁহারা বাতুল। আরিষ্টটল বলিতেন যে, যাহারা আপনাকে সমাজের বহির্ভূত মনে করে, তাহারা হয় পরমেশ্বর, না হয় সামান্য পশু। ইহা একটী সরল সত্য। ব্যক্তি বিশেষের চরমোৎকর্ষ এবং সে যে সমাজভুক্ত, সেই সমাজের চরমোৎকর্ষ এতদুভয় পরস্পর পরস্পরের মধ্যে নিহিত। মনের ক্রমাভিব্যক্তি এবং উৎকর্ষ সমাজের অনুবর্ত্তী।

মানুষের কার্য্য বিশেষ আলোচনা করিতে বসিলে, আমরা হয় তাহাকে ভাল বলি, না হয় মন্দ বলি। কিন্তু বিচার করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের মনোমধ্যে 'ভাল' এবং মন্দ এই দুইটীর পার্থক্য স্পষ্ট পরিস্ফুট থাকে। কোন একটী কার্য্য সৎ অথবা অসৎ ইহা বলিবা মাত্রই আমরা স্বীকার করিয়া লই যে, আমাদিগের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ, আমাদের বিচার-বুদ্ধি, এমন কি আমাদিগের জীবন পর্য্যন্ত কতকগুলি প্রতিষ্ঠিত বিধি এবং রীতি নীতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাহাদিগের সহিত তুলনা করিয়া মতামত প্রকাশ করার নামই ভালমন্দ, সদসৎ বিচার। সদসৎ বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই আবার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই রীতি-নীতি, বিধি-নিষেধ প্রভৃতি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে

পারে—অন্তর্নির্দ্দিষ্ট ও বহির্নির্দ্দিষ্ট। সামাজিক এবং রাজকীয় বিধিই বহির্নির্দ্দিষ্ট। আমরা সকলেই এই বিধিবদ্ধ। যদি কেহ এই বিধি অতিক্রম করিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে উন্মাদ ভিন্ন আর কি বলিব?

অনেকে বলেন, আমাদের সমাজ কুসংস্কার ও যুক্তিবিহীন অন্ধবিশ্বাসে পরিপূর্ণ—আমাদের সমাজ ভ্রমান্ধ! তাঁহাদিগের কথা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না। কুসংস্কার বা বিষয় বিশেষে অন্ধবিশ্বাস কিছু কিছু থাকিতে পারে। সকল দেশের—সকল সমাজেই তাহা আছে। কিন্তু সেই জন্য সমাজকে পদদলিত করা—অতলজলে নিক্ষেপ করা—আপনাকে সেই সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত, সুদৃঢ়, শৃঙ্খলবন্ধনের বহির্ভূত মনে করা জ্ঞানীর কার্য্য নহে—মূর্খের কার্য্য। আর সেই জন্য বর্ত্তমান সমাজ-শাসন না মানিয়া, বর্ত্তমান সমাজকে বালকের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকার মত, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে একটী সম্পূর্ণ নবসমাজের সৃষ্টির কল্পনা করা ততোধিক মূর্খের কার্য্য। অন্ধবিশ্বাস দুর্ব্বল হৃদয়ের ধর্ম্ম। কুসংস্কার যদি কিছু থাকে, তবে তাহা থাকিতে দাও। যদি সম্ভব হয়, ধীরে ধীরে তাহা দূর কর। তাই বলিয়া একেবারে গোড়া কাটিয়া ফেলিও না। অংশবিশেষ যদি দূষিত হইয়া থাকে, তবে তাহারই নিরাকরণের চেষ্টা দেখ; সম্পূর্ণ ধ্বংশ করিও না। তাহা করিতে গেলে, মহাবিপ্লব উপস্থিত হইবে। ভগ্ন-প্রাসাদ সংস্করণের মত, ভালটুকু যেমন আছে, তেমনি রাখিয়া তাহারই সহিত মেল মিলাইয়া খারাপের স্থানে ভাল আনিয়া বসাও। তোমার ভগ্ন-প্রাসাদ সম্পূর্ণ হইবে—সুশ্রী হইবে—সুদৃঢ় হইবে। আমাদের সমাজ কত পুরাতন। কত ঝড় তুফান ইহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। যাহা পুরাতন—যাহা কালের তীক্ষ্ণ অঙ্কুশাঘাত সহিয়াও টিকিয়া আছে, সময়ের কঠিন অগ্নি-পরীক্ষায় আজ পর্য্যন্তও কৃতকার্য্য হইয়াছে—তাহার ভিতর কিছু না কিছু সত্য অবশ্যই আছে। তুমি নাই বলিলে তাহা শুনিব কেন? কত অতীত বংশ—কত অতীত সম্প্রদায়ের বিচক্ষণতার ফল বর্ত্তমান সমাজ। যদি তাহাদিগের উপর ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে, তবে সমাজকে ভক্তি শ্রদ্ধা কর—নষ্ট করিওনা। উন্নত কর—সে তোমাদেরই উন্নতি। যদি তোমরা এখন পূর্ব্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত বিধি নিয়মগুলি অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদিগকে অপমান করিতে কুণ্ঠিত না হও, তবে তোমাদের পরে যাহারা আসিবে, তাহারও যে আবার তোমাদের মস্তকে দারুণ পদাঘাত করিবে। তাই বলিতেছিলাম, সমাজকে সম্মান করিয়া অতীত পুরুষকে সম্মান কর।

সমাজবন্ধনই জাতীয়-বন্ধনের মূল ভিত্তি। মানুষ সর্ব্বপ্রথমে আপন আপন পরিবারস্থিত আত্মীয়দিগকে ভালবাসিয়াই ভালবাসিতে শিক্ষা করে। স্নেহ সর্ব্বপ্রথমে আপন গৃহে আরম্ভ হয়। তারপর তাহার বিস্তৃতি। জলাশয়ের মধ্যে একখানি ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়া কখনও দেখিয়াছ কি? প্রথমে একটী ক্ষুদ্র বৃত্ত, তার পর তা অপেক্ষা একটী বড় বৃত্ত, তারপর আরও বড় আর একটী; এমনি করিয়া বৃত্তের পর বৃত্ত ক্রমশঃ আকারে বড় হইয়া অবশেষে তটভূমি আঘাত করে। স্নেহধর্ম্মের গতিও সেই রূপ। সর্ব্বপ্রথমে আপনার জন—তারপর

আপন সমাজ—তারপর জাতি—তাহার পর মানবসাধারণ। অবশেষে এই নিঃস্বার্থ বিশ্বপ্রেম হইতেই ঈশ্বর প্রেমের অভ্যুত্থান হয়। তুমি যদি সমাজ শাসন না মানিলে, সমাজবন্ধন ছিড়িয়া ফেলিতে চাহিলে—তোমার সমাজকে অন্ধসংস্কারাপন্ন বাতুলের লীলাক্ষেত্র বলিয়া মনে করিলে, তাহা হইলে তোমার নিকট হইতে জাতীয় ভালবাসার আশা কোথায়? তাহা হইলে মানবমণ্ডলীর সহিত তোমার প্রাণপণ সহানুভূতির পরিচয় কোথায়? যদি জাতির সহিত তোমার স্নেহই না থাকিল—যদি আপন জাতিকে আপনার পরিবারের মতই না ভাবিতে পারিলে—যদি তাহার দুঃখে তোমার কঠিন প্রাণ কোমলই না হইল, তবে সে জাতির উন্নতির আশা আকাশকুসুম, জাগ্রতস্বপ্ন—মরুভূমে মরীচিকা।

আজ একটী ভাল কাজ করিয়া তুমি আত্মশ্লাঘা কর—বুঝি সেই কাজটী করিয়া তোমার সমাজকে তুমি চিরকৃতজ্ঞ করিলে—সমাজের কতই না জানি উপকার করিলে। সমাজের উপকার দূরে থাকুক, তোমারি আপনার উপকার হইল। তুমি ভিন্ন সমাজ কে? সমাজ ছাড়া তুমি কে—তুমি কোথায়—তোমার অস্তিত্ব কোথায়? তুমিই সমাজ—সমাজই তুমি।

সমাজের সহিত আমাদের এতদূর দৃঢ় বন্ধন। কিন্তু সমাজের শিরে বসিয়া আমাদিগের নেতারা কেবল নিদ্রা যাইতেছেন। নিদ্রায় বিগতচেতন নহে—যেখানেই তাঁহাদিগের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আছে, সেইখানেই, শুধু সেই খানেই সচেতন। সমাজ তাঁহাদিগকে চালাইবে কি, তাঁহারাই সমাজকে তাড়না করিতেছেন। এ যে কি বিষম ধৃষ্টতা, তাহা অনমুমেয়! আমাদের সমাজ অর্থের দাস—পদগৌরবের গোলাম! কেন এমন হইল? কে এমন করিল? কে আমাদের সমাজকে ভাসাইল? তোমার অর্থ আছে, সমাজ তোমাকে মাথায় রাখিবে। তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, কেহ তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করিবে না। কিন্তু হায়, আমি অন্নের কাঙ্গাল! তাই সমাজ আমার শত্রু! আমারই বুক চিরিয়া সমাজ,—আর সেই সমাজ আমারই শত্রু! আমি কাঁদিব, সমাজ হাসিবে। আমি মরিব—অত্যাচার পীড়িত, বেদনামথিত, বিনাকারণে পদদলিত হইয়া আমি মরিব—সমাজ তাহা সহিবে। অটল, অচল হিমাচলের মত স্থির, নিষ্কম্প হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিবে যে, তাহারই পদতলে মাথা রাখিয়া, মরিতে মরিতেও আমি তাহারই শরণাগত হইয়াছি। সমাজ বিচলিত হইবে না—আমি যে অন্নের কাঙ্গাল—আমি যে দুর্ব্বল—আমি যে নিঃসম্বল। তুমি অর্থোন্নত, তাই তোমার ঘৃণাজড়িত পদাঘাত সমাজের শিরোভূষণ—গৌরবের ধন। তুমি যাহা খুসি তাহাই কর। তুমি যে অর্থপিশাচ—সমাজ তাহা দেখিবে না। তুমি যে অর্থের জন্য একজনের জাতিকুল খাইতে বসিয়াছ—একজনের করুণ ক্রন্দন, শত অনুরোধ, সহস্র প্রার্থনা চরণে ঠেলিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে যাইতেছ—একটী কণ্টকবিদ্ধ প্রভাত—শিশিরনিষিক্ত, পরিত্যক্ত, অনাঘ্রাত, স্ফুটনোন্মুখী পবিত্র কুসুম তোমার অর্থকলুষ, ঘৃণালাঞ্ছিত হস্তে শতখণ্ডে ছিঁড়িয়া ফেলিতেছ—মসি মলিন করিতেছ, শেষে সমাজের দিকে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া এক ফুৎ-

কারে সেই ছিন্নদল কুসুম লোকলোচন-বিরহিত অন্ধকারে, সংসার-কারাবাসের একটী চিরতিমিরময় নির্জ্জন কক্ষে, তামসময়ী রজনীর সুপ্ত বক্ষে নিক্ষেপ করিতেছ—সমাজ তাহা সহিবে! আর আমি যদি দুর্ব্বল হইয়া তোমার কার্য্যে বাধা দিতে চাই—যদি তোমার বিপক্ষতাচরণ করি, তবে আমিই ঘৃণ্য হইব—অপরাধের পসরা মাথায় করিয়া তোমার ও তোমার সমাজের ভ্রূকুটি-কুটিল নয়নের ভয়ে মস্তক হেট করিয়া জীবনের ভার বহিব—মরমে মরিয়া থাকিব! আর যদি আমার তেমন সৎসাহস (!!) থাকে, তবে চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া, অনুগ্রহ পাইবার আশায়—ভিক্ষা পাইবার আশায়—তোমারই পদলেহন করিব! এ-ই সমাজ—এ-ই বন্ধন—এ ই শাসন!

সমাজে সকলেই স্ব স্ব প্রধান। তুমি নেতা, কিন্তু কেহ তোমাকে মানে না, কেহ তোমার কথা শুনে না। তবে তুমি নেতা কেন? সমাজের যাহারা অঙ্গ, তাহাদিগের স্বার্থসিদ্ধির সুবিধা হয় বলিয়া তুমি নেতা। তোমার দোহাই দিয়া—তোমার নামের দোহাই দিয়া—তাহারা যাহা খুসি তাহাই করিতে পারে বলিয়া তুমি নেতা। তুমি পলায়ন করিতে চাও—পারিবে না। তোমার ইচ্ছা থাকিলে কি হয়—সমাজ তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, পরিত্যাগ করিবে না। সাধ করিয়া আপন পায়ে আপনি কে কুঠারাঘাত করিতে ইচ্ছা করে? কিন্তু প্রকৃতই—

"সমাজের শুভ চাহে যারা,
সমাজ না তাহাদের চায়;
পর হেতু সরবস দিয়া
উপেক্ষা লাঞ্ছনা তারা পায়।"

ব্যক্তিগত অত্যাচারের বিচার আছে। কিন্তু সামাজিক অত্যাচারের বিচার এখানে হয় না। সকলেই দানব—সকলেই পিশাচ—কে কাহার বিচার করে? তবে কি আর বিচার নাই? আছে—অবশ্যই আছে। যে দেশে সমাজ নাই, সমাজ-শাসন নাই, অর্থলোলুপ প্রবঞ্চক নেতৃত্বের কলুষিত মিথ্যা ধর্ম্মভাব নাই—যেখানে সকলেই সমান, সেই খানে বিচার আছে। কিন্তু তাহা থাকিলে কি হইবে? মানুষের সহিষ্ণুতার একটী সীমা আছে। ব্যক্তিগত অত্যাচার সসীম, কিন্তু সামাজিক অত্যাচার অসীম—অনন্তমেয়। তাই সহ্য করিতে করিতে মানুষ পাগল হইয়া উঠে। তাহার মনে হয়, এ অত্যাচার বুঝি আর শেষ হইবে না। ইহার বুঝি আর বিচার নাই। তাই তাহার মনে হয়, বুঝি ধর্ম্ম নাই—বুঝি ঈশ্বর সকলের নহেন, বুঝি পরমেশ্বর বলিয়া কেহ নাই। তাহা থাকিলে এতদিন বিচার হইত—ইন্দ্রের বজ্র আসিয়া এতদিন সমাজকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিত। এমনি করিয়া ক্রমশঃ তাহার বিবেচনা শক্তি রহিত হইয়া আইসে। অবশেষে তাহার উদ্বেলিত হৃদয়ে একটী ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়া রাজকীয় বিধি, ধর্ম্মের বিধি, সকল বিধিব্যবস্থার সহিত মহা গোলযোগ বাধায়। তাই বলিতেছিলাম, সামাজিক অত্যাচারের ফল— ঈশ্বরে অবিশ্বাস, ধর্ম্মে অনাস্থা, জীবনে মরণে অশান্তি।

চিরদিনই কি এমনি ছিল? চিরদিনই কি সমাজ নিদ্রিত? কে বলিল নিদ্রিত? সমাজের শাসনদণ্ডের চালনায় মানুষ কাঁপিয়াছে—দেশ কাঁপিয়াছে—রাজা ভীত হইয়াছেন। সমাজের ভয়ে চোর সাধু হইয়াছে—লম্পট সন্ন্যাসী হইয়াছে—ভণ্ড সংসার ছাড়িয়া কাননের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

আজি সমাজের এ শিথিলশাসন কেন? হিংসা, দ্বেষ, গৃহ বিবাদ এ সকলেরই মূল শিথিলশাসন। আগে কি কথায় কথায় রাজদ্বারে অভিযোগ হইত? অভিযোগ অনুযোগের সংখ্যা এখন এতই বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, কে তাহার গননা করে? কেন এমন হইল? কে এমন করিল? আমি বলিব, শিথিলসমাজশাসন আর সমাজের সহিত ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নির্দ্ধারণে অপারদর্শীতা।

অনেক সময় লোকনিন্দা আমাদিগকে পাপ হইতে বিরত করে—লজ্জা সৎপথ প্রদর্শন করে। কোন ব্যক্তিবিশেষ একটী কার্য্য করিতে বসিলে, তাহাকে নানা রকম বিবেচনা করিতে হয়। লোকনিন্দা, ভয়, লজ্জা প্রভৃতি তাহাকে স্তব্ধ করিয়া তোলে। কিন্তু সমাজকে আবার কে নিন্দা করিবে? সকলে মিলিয়াই যে সমাজ। তাই সমাজের কার্য্যে বাধা দিবার কেহ নাই, সমালোচনা করিবার কেহ নাই, নিন্দা করিবার কেহ নাই। তাই সমাজ স্বেচ্ছাচারী। তাই সমাজ, অত্যাচারের অবাধ বাণিজ্যের "ফর্ম্মাণ" পাইয়া উল্লাসিত পিশাচের আনন্দে আনন্দিত। যাহারা শাসক, তাহারাই যদি পাষণ্ড হয়, তবে শাসিতের আর আশা কোথায়?

যে সমাজ এত শিথিল—এত ঘৃণিত—এত নীচ—সে সমাজ অধঃপাতে যাউক। যাহারা সেই সমাজের নেতা, তাহাদিগের মস্তকে শত সহস্র বজ্র পতিত হউক। অনন্ত নরক তাহাদিগকে গ্রাস করিবে। যদি ধর্ম্ম থাকে, তবে একদিন না একদিন সেই সমাজের বিচার অবশ্যই হইবে। সে দিন সমাজের বুকে এমন অনল জ্বলিবে যে সমস্ত পৃথিবীর বারি একত্র করিলেও তাহার নির্ব্বাণ হইবে না।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

সংশয় ও বিশ্বাস।

সংশয় ভাল, না, মন্দ? সংশয় ভাল ও মন্দ দুই। সংশয় ভাল কেন? সংশয় দ্বারা মানবহৃদয় হইতে কুসংস্কার ও ভ্রান্তি দূর হয়। জ্ঞানোন্নতির একটি কারণ, সংশয়। পৃথিবী এক স্থানে স্থির হইয়া আছে, সূর্য্য তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, প্রাচীন কালে এই মত প্রচলিত ছিল। যদি এই মতে গ্যালিলিওর সংশয় না হইত, তাহা হইলে, তিনি ইহার সত্যাসত্য অনুসন্ধানে কখনই প্রবৃত্ত হইতেন না, এবং ইহার সত্যাসত্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইলে, প্রকৃত তত্ত্বের কখন আবিষ্ক্রিয়া হইত না।

সংশয় ও তন্নিবন্ধন সত্যানুসন্ধানদ্বারা বিগত দুই শতাব্দীর মধ্যে ইয়োরোপীয় সমাজে, নানা বিষয়ে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। বিগত দুই শতাব্দীর মধ্যে, সভ্য জগতে যে, জ্ঞানোন্নতি হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ, সংশয়।

লোকে সংশয়প্রণোদিত হইয়া স্বাধীনভাবে আলোচনা করাতে, ইয়োরোপীয় সমাজে, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম এই তিন বিষয়েই বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। সংশয় ও অবিশ্বাসদ্বারা বহুল পরিমাণে রাজনৈতিক উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে যেমন লোকে, রাজা ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় বিশ্বাস করিত, এখন সেরূপ করে

না। এখন লোকের আত্মনির্ভর ও স্বাধীন-চিন্তা বৃদ্ধি হইয়াছে। ইয়োরোপের বড় লোকেরা সাধারণ লোককে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া, আপনারা যে সকল অধিকার ভোগ করিয়া আসিতে-ছিলেন, সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিল যে, তাহা অন্যায়। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, বড় লোকের অধিকার ও প্রভুত্ব পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস ও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতা যে ক্রমশঃ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইহার মূল কারণ সংশয় ও প্রচলিত প্রথায় অবিশ্বাস। সংশয়প্রণোদিত অনুসন্ধান ও তজ্জনিত স্বাধীনভাবদ্বারা ইয়োরোপে রাজাদিগের স্বেচ্ছাচারিতা অনেক পরিমাণে দমন হইয়াছে। এই সংশয়জনিত অনুসন্ধান দ্বারা ধর্ম্মযাজকদিগের কুসংস্কার হ্রাস হই-য়াছে।

পূর্ব্বে লোকে বিজ্ঞান বিষয়ে, বিনা প্রমাণে, যাহা তাহা বিশ্বাস করিত। এখন অখণ্ডনীয় প্রমাণ ব্যতীত কিছুই বিশ্বাস করিতে চাহে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে, লোকে পূর্ব্বে, মতামত বিষয়ে, স্বাধীনতা দিত না। যাঁহার যাহা বিশ্বাস, তাহা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করিবার অধিকার ছিল না। বিশ্বা-সের জন্য সামাজিক শাস্তি ও রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইত। বিশ্বাসের জন্য শত শত লোকের প্রাণ গিয়াছে। এখন, আর সে অবস্থা নাই। এখন ধর্ম্মযাজকদিগের কুসং-স্কার ও গোড়ামি পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হইয়াছে। এই সকল পরিবর্ত্তনের মূল কারণ সংশয় ও তজ্জনিত স্বাধীন অনুসন্ধান।

স্পেন দেশের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে, এ বিষয়টি পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা সেখানে একেবারেই নাই। সাধারণ মতের বিরুদ্ধে কেহ কিছু লিখিয়া প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হয়। এইরূপে সেখানে সংশয় ও স্বাধীন চিন্তা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, স্পেন দেশে জ্ঞানোন্নতি প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু ইংলণ্ড ও ফরাসি দেশের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখুন। এই দুই দেশে সংশয় ও তজ্জনিত স্বাধীন চিন্তা সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ হয়, ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতররূপে বিস্তারিত হয়। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, লোকে স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধান করি-তেছে, এবং জ্ঞানের আশ্চর্য্য উন্নতি সংসা-ধিত হইয়াছে। *

যে সন্দেহবাদদ্বারা সত্যানুসন্ধান বর্দ্ধিত হয়, কুসংস্কার বিদূরিত হয়, দর্শন ও বিজ্ঞান উন্নতিপথে অগ্রসর হয়, সে সন্দেহবাদকে শ্রদ্ধা করি। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, সুসভ্য জগতে, বর্ত্তমান সময়ে, দর্শনশাস্ত্রের যে উন্নতি হইয়াছে, হিউমের সন্দেহবাদ তাহার প্রধান কারণ।

হিউমের সংশয়বাদদ্বারা দর্শন শাস্ত্রের যে, কতদূর উন্নতি হইয়াছে, তাহা সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হ্যামিলটন্ তাঁহার দার্শ-নিক বক্তৃতা গ্রন্থে শত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া-ছেন। হিউমের সময়ে দর্শন শাস্ত্রের যেরূপ অবস্থা ছিল, তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। হিউম তাঁহার সুতীক্ষ্ণ তর্কাস্ত্রে সে সময়ের দর্শন শাস্ত্রকে শত খণ্ডে খণ্ডিত করিলেন। যে সকল যুক্তির উপরে,সে সময়ের দার্শনিক মত দণ্ডায়মান ছিল, তাহার অসারতা প্রদ-

* Vide Bucklie's History of civilization in England. Vol. I. pp. 308 309.

র্শন করিলেন। যে সকল সত্য,সকল জ্ঞানের মূল তাহাও এক ফুৎকারে শূন্যে উড়াইয়া দিলেন। কাহার সাধ্য তর্কযুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হয়! সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাঁহার যুক্তি সকল খণ্ডন করিবার জন্য অনেক বৃথা চেষ্টা হইল। রীড প্রভৃতি দার্শনিকগণ তাঁহার মতের বিরুদ্ধে গ্রন্থ লিখিলেন।

কিন্তু হিউমের সংশয়বাদের সুমহৎ ফল, ক্যাণ্টের দর্শনশাস্ত্র। ক্যাণ্ট নিজে বলিয়াছেন যে, হিউমের সংশয়বাদই তাঁহাকে দার্শনিক বিষয়ে চিন্তা করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল।* এইরূপে ইয়োরোপায় দর্শন শাস্ত্র উন্নতি পথে অগ্রসর হইল। সংশয়বাদই এই উন্নতির মূল কারণ।

বিশ্বাস ও সন্দেহের তিন অবস্থা। প্রথম অবস্থা বিশ্বাস। দ্বিতীয় অবস্থা সংশয়, এবং তৃতীয় অবস্থা আবার বিশ্বাস। বিশ্বাসে আরম্ভ, বিশ্বাসে শেষ। প্রথম অবস্থায় মানুষ সন্দেহ করিতে জানে না। যাহা দেখে, যাহা শুনে, সহজে বিশ্বাস করে। বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ হইলে, মানুষ আলোচনা করে, বিচার করে, সন্দেহ করে। এই যে সন্দেহ, ইহা বিচারশক্তির বিকাশের চিহ্ন। ইহা উন্নতির অবস্থা। উন্নতির অবস্থা হইলেও ইহা মধ্য অবস্থা মাত্র। ঐ স্থানেই শেষ নহে। সংশয় প্রণোদিত আলোচনা দ্বারা মানুষ যখন সত্যলাভ করে, তখন আবার বিশ্বাসে উপনীত হয়।

বলিয়াছি, সংশয় ভাল, কিন্তু উহা অভাব পক্ষে ভাল। চিরস্থায়ী সংশয়, রোগ বিশেষ।

অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল পূর্ব্বে এদেশে সংশয়বাদ অতি অল্পই ছিল। সাধারণতঃ লোকে চিরাগত সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চলিত। ক্রমে সংশয়বাদ আসিল।

এই সংশয়বাদ এদেশের পক্ষে উপকারী। এই সংশয়ের প্রথম ও প্রধান কারণ কি? পাশ্চাত্য জ্ঞান। এই পাশ্চাত্য জ্ঞান, যুবকদিগের মধ্যে, যত প্রচারিত হইতে লাগিল, তত তাঁহারা এ দেশের সকল বিষয়ের বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। কি সামাজিক, কি ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, সকল বিষয়ে, কি ভাল, কি মন্দ, তাহার আলোচনা চলিতে লাগিল। চিরাগত প্রথা ও বিশ্বাস সম্বন্ধে, সংশয় ও তজ্জনিত বিচার ও প্রতিবাদ, নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃষ্ট হইতে লাগিল। বলিয়াছি যে, সংশয়ের ফল ভাল হইয়াছে। কিন্তু কেবলই যেভাল হইয়াছে, এমন নহে। ভাল, ও মন্দ দুই হইয়াছে। ভাল অনেক হইয়াছে, মন্দও হইয়াছে।

অনেক স্থলে সংশয় প্রথমে উপযুক্ত সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকে। উহা কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। কিন্তু ক্রমে আপনার উপযুক্ত সীমা উল্লঙ্ঘন করে। সংশয়বাদ একটা ঝোঁক হইয়া দাঁড়ায়। ভাল, মন্দ সকল বিষয়েই লোকে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করিতে থাকে। ক্রমে ধর্ম্মের ও সমাজ-তত্ত্বের যাহা মূল সূত্র, তাহা লইয়া টানাটানি হইতে থাকে। এমন বিষয় থাকে না, যাহাকে সংশয়বাদী ও অবিশ্বাসী আক্রমণ করেন না। ক্রমে ক্রমে সকল বিষয়েই সংশয় ও অবিশ্বাস উৎপন্ন হয়। সংশয়ী ক্রমে ক্রমে, অল্পে অল্পে, বিশ্বজনীন সংশয়ে উপনীত হয়।

"ছিল ঢেঁকি, হ'ল তুল।
কাট্‌তে কাট্‌তে নির্ম্মূল।

* "Hume roused me from my dogmatic slumber."

যাহা সকল জ্ঞানের মূল, তাহাতেও লোকে সংশয় প্রকাশ করিতে থাকে। এই পরিদৃশ্যমান জগতের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত সংশয় প্রকাশ করে। "এজগৎ কি আছে? না এ সকল স্বপ্ন দেখিতেছি?" মনের বিকৃত অবস্থায় এরূপ সংশয়ও হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষাও নিকটতর ও স্থিরতর বিষয়েও সংশয় হয়। এতদূর অস্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ উপস্থিত হয় যে, আপনার অস্তিত্বে পর্য্যন্ত আপনি সন্দেহ প্রকাশ করিতে থাকে। "আমি কি আছি? আমার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? এইরূপ অদ্ভুত সংশয়ও মানুষ প্রকাশ করে।"

বাস্তবিক আপনার অস্তিত্বে আপনি সন্দেহ করার ন্যায় নির্ব্বোধের কার্য্য আর কি আছে? কেহ যদি বলে, "আমি কি আছি? আমার অস্তিত্বের প্রমাণ কি?" এই সন্দেহের উত্তরে বলি, "তুমি যদি নাই, তবে সন্দেহ করে কে? তুমি যদি নাই, তবে তোমার সন্দেহও নাই।" সন্দেহ আত্মহত্যা করিল!

সকল বিষয়েই তর্ক চলেনা। এক জন দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে, আমি যে আছি তাহার প্রমাণ এই যে, আমি চিন্তা করিতেছি। কিন্তু বাস্তবিক কি, এই যুক্তিতে আমর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইল? আমার অস্তিত্বের প্রমাণ হইল, আমার চিন্তা। কিন্তু আমার চিন্তার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? সে প্রমাণের আবার প্রমাণ কি? আবার তাহার প্রমাণ কি? এই রূপে অনন্ত শ্রেণী চলিয়া যাইবে, কিছুই প্রমাণ হইবে না। এক স্থানে থামিতেই হইবে। মূল সত্যে বিশ্বাস করিতেই হইবে। সকল তর্কের সীমা আছে। সকল তর্কের ভিত্তি, মূল সত্য। নতুবা কোন তর্ক সম্ভব হয় না।

এমন এক সময় ছিল, যখন এ দেশে সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ, অবিশ্বাস অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। অনেক বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত লোক এই শ্রেণীভূক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মবিশ্বাসীদিগকে নির্ব্বোধ মনে করিতেন। ধর্ম্মবিশ্বাসী হইলেই নির্ব্বোধ হয়, এমন নহে, এবং সন্দেহবাদী হইলেই যে, বুদ্ধিমান হয়, সকল স্থলে তাহাও নহে। বরং কোন কোন স্থলে সন্দেহে বুদ্ধির অভাব পকাশ পায়। বুঝিবার শক্তির অভাবে সংশয় আসে, এমন কি হয় না?

বুদ্ধিশক্তির প্রতি, তর্কশক্তির প্রতি, অতিরিক্ত শ্রদ্ধা এবং হৃদয়ের কোমল ভাব নিচয়ের প্রতি অবজ্ঞা, অনেক স্থলে সংশয়বাদ ও অবিশ্বাসের পূর্ব্ব চিহ্ন। অনেকের নিকট বুদ্ধিই 'সর্ব্বেসর্ব্বা।' হৃদয়বান সংশয়বাদী দেখিয়াছি। কিন্তু ইহাও সত্য যে, অনেক স্থলে তর্কের প্রাবল্য ও হৃদয়ের শুষ্কতা, সংশয়বাদ ও অবিশাসের পূর্ব্বাবস্থা। ওজন ঠিক্ থাকে না বলিয়া অনেক স্থলে সংশয়বাদ আসে। সত্যলাভ করিতে হইলে আন্তরিক প্রকৃতির সামঞ্জস্য আবশ্যক। এস্থলে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, সুপ্রসিদ্ধ মিল সাহেবের চরিত্রে কি সামঞ্জস্য ছিল না? তাঁহার হৃদয় ও বিচারশক্তি কি সমভাবে উন্নত হয় নাই? তবে তিনি সংশয়বাদী হইলেন কেন?

মিল সাহেব সম্বন্ধে কথা এই যে, তাঁহাকে মাতৃদুগ্ধ পানের সঙ্গে সঙ্গে সংশয়বাদ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। জন ষ্টুয়ার্ট মিল যখন শিশু, তখন জেম্‌স্ মিল তাঁহাকে

শিক্ষা দিতেন, "পরমেশ্বর যদি জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে সৃষ্টি করিল কে?" এই প্রকার ভাব তাঁহার হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইত। মিল যে সম্পূর্ণ নাস্তিক না হইয়া, তাঁহার শেষ গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রকৃতি দেখিয়া বোধ হয় যে, ইহার এক জন কর্ত্তা আছেন, ইহাই তাঁহার অনেক প্রশংসার কথা।

চরিত্রের অবনতি, অনেক স্থলে সংশয়বাদ ও অবিশ্বাসের কারণ। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, "The wish is father to the thought." এ কথার মর্ম্ম এই যে, যাহার যেরূপ ইচ্ছা তাহার মনের ভাব বা বিশ্বাস তদনুরূপ হইয়া থাকে। অনেক লোক, ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, কেননা, ধর্ম্ম তাহাদের বিরুদ্ধে। তাহাদের যেরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ চরিত্র, তাহাতে তাহারা ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে, আশ্চর্য্য কি?

ঈশ্বর পাপের শাস্তা। অতএব কোন দুষ্কার্য্যকারীর সহজেই মনে হইতে পারে যে, ঈশ্বর না থাকিলেই ভাল। এখানে যদি পাপের শাস্তি না হয়, পরকালে পাপের শাস্তি পাইতে হইবে। অতএব পরকাল না থাকিলেই ভাল। এইরূপ ইচ্ছা হইতে ক্রমে, মনে মনে, তদনুরূপ চিন্তার উদয় হয়। "কে বলিল ঈশ্বর আছেন? তাহার প্রমাণ কি? কত বড় বড় লোক নাস্তিক ছিলেন? ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ থাকিলে তাঁহারা কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন না? পরকাল আছে কে বলিল? পরকাল কল্পনামাত্র। স্বর্গ, নরক সকলই কল্পনা। লোককে ভয় দেখাইবার জন্য ঈশ্বর, ও পরকাল কল্পিত হইয়াছে।"

শিশুরা কোন ভয়ের বিষয় দেখিলে অনেক সময় চক্ষু মুদ্রিত করে। দুষ্কর্ম্মীদিগের পক্ষে ঈশ্বর ও পরকাল অস্বীকার করাও সেই রূপ। ব্যাধ যখন মৃগশিশুকে আক্রমণ করে, মৃগশিশু বেগে পলাইতে থাকে। যখন দেখে, ব্যাধ একান্ত নিকটে আসিয়াছে, আর পলাইবার উপায় নাই, তখন সে একটা ঝোঁপের মধ্যে তাহার মুখ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া চক্ষু মুদিয়া থাকে। কিন্তু চক্ষু মুদিয়া থাকিলে কি ব্যাধের হস্তে নিস্তার আছে? ব্যাধ আসিয়া তাহাকে অক্লেশে ধরিয়া ফেলে। পারলৌকিক শাস্তিভয়ে যে দুষ্কর্ম্মী, পরকাল ও ঈশ্বর অস্বীকার করে, তাহারও অবস্থা অবিকল সেইরূপ।

হৃদয়ের বিকৃতি যে, অবিশ্বাস ও সংশয়ের একটি কারণ, তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। স্বার্থপরতা যাহার মজ্জাগত হইয়াছে, সে নিষ্কামধর্ম্মের কি বুঝিবে? যকৃতের দোষ প্রযুক্ত যাহার ন্যাবা হইয়াছে, সে সকল বস্তুকে হরিদ্রা বর্ণ দেখিবে; কিন্তু যাহার শরীর সুস্থ, সে সেরূপ দেখিবে কেন? যাহার অরুচি রোগ হইয়াছে, শর্করার আস্বাদ তাহার নিকট তিক্ত; কিন্তু নীরোগ ব্যক্তির সেরূপ হইবে কেন? সেইরূপ, পাপবিকারে যাহার হৃদয় বিকৃত হইয়াছে, সে যদি উচ্চতর সত্য অনুভব করিতে না পারে, আধ্যাত্মিক রোগে যাহার অধ্যাত্মচক্ষু রুগ্ন হইয়াছে, সে যদি সত্য দেখিতে না পায়, তাহা কাহার দোষ? সে রূপ লোকের সহিত তর্ক করিয়াই বা কি হইবে? তাহার চিকিৎসা আবশ্যক। ন্যাবা রোগগ্রস্ত, যদি বলে, সকলই হরিদ্রা বর্ণ হইয়া গিয়াছে, সে কথা লইয়া তাহার সহিত তর্ক করিলে কি হইবে? তাহাকে চিকিৎসকের হস্তে দেও। রোগ

জ্ঞান হইলে, সে আপনিই বুঝিবে যে, জগতের পদার্থ সকল হরিদ্রা বর্ণ হইয়া যায় নাই, তাহার রোগের জন্য ঐরূপ দেখাইতেছিল।

স্বাভাবিক জ্ঞান মনুষ্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি। সকল ধর্ম্মের সাধারণ অংশ। মূল সত্য মানিতেই হইবে। এস্থলে কেহ বলিতে পারেন, "তবে তুমি তর্ককে ভয় কর? আপনার বিশ্বাসকে রক্ষা করিবার জন্য জ্ঞানালোককে দূরে রাখিতে চাও?" তর্ককে ভয় করি না। জ্ঞানালোককে দূরে রাখিতে চাহি না। তবে এ কথা বলি যে, কুতর্কদ্বারা অনেক অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। কিন্তু সুতর্ক বা সুযুক্তি মঙ্গলফল প্রসব করে।

জ্ঞান ও বিশ্বাসের সামঞ্জস্য চাই। জ্ঞানকে ছাড়িয়া যে বিশ্বাস, তাহা কুসংস্কার মাত্র। আবার কুতর্কের প্রাবল্যে নাস্তিকতা। কুতর্কের প্রভাবে কত লোক নাস্তিক হইয়া যায়। আবার অতীতসাক্ষী ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, জ্ঞানচর্চ্চার অভাবে জগতে চিরদিন কুসংস্কার ও উপধর্ম্ম প্রবল হইয়াছে।

যুক্তিকে ভয় করি না। বিশ্বাসের ভিত্তি দেখাইয়া দেয় কে? যুক্তি। যুক্তি বলিয়া দেয় যে, সকল তর্কের মূলে, তর্কের অতীত মূল সত্য আছে। নতুবা তর্ক বা যুক্তি সম্ভব হইত না। জ্যামিতি বিদ্যার মূলে স্বতঃসিদ্ধ সত্য না থাকিলে, আদৌ স্বতঃসিদ্ধ সত্য মানিয়া না লইলে, জ্যামিতির একটী প্রতিজ্ঞাও প্রমাণ হইত না। পাটিগণিতের মূলে স্বাভাবিক সংখ্যাজ্ঞান না থাকিলে পাটীগণিত সম্ভব হইত না। সকল বিদ্যার মূলে, তর্কের অতীত মূল সত্য আছে, নতুবা কোন বিদ্যা, কোন জ্ঞান, সম্ভব হইত না। কিন্তু যে গুলিকে মূল সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে, সে গুলি যে বাস্তবিক মূল সত্য, তাহা প্রতিপন্ন হওয়া চাই।

কেহ কেহ বলেন, শিক্ষাদ্বারা সকল জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু মানুষকে যে শিক্ষা দেওয়া যায়, শিক্ষা দেওয়া যে সম্ভব, ইহা দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে, মূল সত্য বা সহজজ্ঞান আছে। জন্মান্ধকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা এবং বধীরকে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া কি সম্ভব? যে সময়ে গায়ক তাঁহার তম্বুরায় তাল দিতেছেন, ঠিক্ সেই সময়ে বাদক তাঁহার মৃদঙ্গে আঘাৎ করিতেছেন, আবার সমজ্‌দার শ্রোতৃবর্গ ঠিক্ সেই সময়ে মস্তক নাড়িয়া 'হাঃ' বলিতেছেন। এক মুহূর্ত্তে, এক সঙ্গে, এই সমস্তগুলি কেমন করিয়া হয়? এক নিমেষ এদিক্ ওদিক্ হয় না। সোমের ঘরে যখন তাল পড়ে, কেমন এক সঙ্গে সকল গুলি হইয়া যায়! তাহাতে কত আনন্দ! কলিকাতার এক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বাবু ইহা কিছুতেই বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন, উহা সাজোস! সকলে পরামর্শ করিয়া ঠিক্ এক মুহূর্ত্তে ঐরূপ করে! সঙ্গীতের স্বাভাবিকত্ব অনুভব করিবার শক্তি যাঁহার বিকশিত হয় নাই, তিনি ঐ প্রকার বলিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

স্বাভাবিক জ্ঞান অস্বীকার করিলে, তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। জন্মান্ধ যদি বলে যে, আকাশে সূর্য্য নাই, তাহাতে সূর্য্যের সত্তা অপ্রমাণ হয় না।

প্রকৃত ধর্ম্মজীবনে কিরূপ হয়? প্রথম, স্বাভাবিক বিশ্বাস। দ্বিতীয়, জ্ঞান। তৃতীয় দর্শন। পরমেশ্বরপ্রদত্ত স্বাভাবিক বিশ্বাস

লইয়া মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে। ক্রমে স্বাভাবিক বিশ্বাস বিকশিত হয়, এবং অভিজ্ঞতা, আলোচনা ও শিক্ষা দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞানের উচ্চতম অবস্থায় সত্য প্রত্যক্ষ হয়। ধর্ম্মজীবনে সত্য প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। নতুবা কিছুই হইল না। একটী চলিত কথা আছে, "পরের মুখে ঝাল খাইওনা।" ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণ সত্য। প্রত্যক্ষ ভিন্ন, দর্শন ভিন্ন, সত্য সম্ভোগ ভিন্ন, যথার্থ জ্ঞান হয় না "

"যা না দেখ নিজ নয়নে,
তা শুননা গুরুর বচনে।"

আমাদের দেশের সম্প্রদায় বিশেষে এই বচনটী প্রচলিত আছে। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, গুরুবাক্য অগ্রাহ্য করিবে। একথার তাৎপর্য্য এই যে, গুরু যাহা উপদেশ দিবেন, তাহার আলোচনা করিবে, সাধন করিবে। যতক্ষণ না সেই উপদেশ তোমার জীবনে পরিণত হয়, যতক্ষণ না উহা আত্মার আয়ত্ত হয়, ততক্ষণ কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না। গুরু যে উপদেশ দি বেন, যতক্ষণ না উহা তোমার আয়ত্তীকৃত, প্রত্যক্ষীভূত হয়, ততক্ষণ তুমি নিশ্চিন্ত হইতে পার না। গুরুমুখে যে সত্য রহিয়াছে, তাহাতে কি তোমার পরিত্রাণ হইবে? সত্যকে নিজস্ব করিয়া লও।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কৃষ্ণদত্ত এবং দ্বারবঙ্গের রাজবংশ।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে সুকবি কৃষ্ণদত্ত মিথিলায় আবির্ভূত হইয়া, 'পুরঞ্জন চরিত' ও 'কুবলয়াশ্বীয়' নামে দুই খানি নাটক প্রণয়ন করেন। এই দুই খানি নাটক ভিন্ন, কৃষ্ণদত্তের রচিত 'শাস্ত্র সংগ্রহ' নামে স্মৃতি এবং 'চণ্ডিকাচরিতচন্দ্রিকা' নামে কাব্য-গ্রন্থ মিথিলায় পাওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণদত্ত দারভাঙ্গার রাজা পুরুষোত্তম ঠাকুরের সভাসদ ছিলেন। তাঁহার রচিত 'পুরঞ্জন চরিত' নাটক রাজা পুরুষোত্তমের সভায় অভিনীত হয়। তিনি দারভাঙ্গার রাজা পুরুষোত্তম ঠাকুর বলিয়া আমাদের অনুমান হয়। দারভাঙ্গার বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহেশ ঠক্কুর, কৃষ্ণদত্তের উল্লিখিত পুরুষোত্তমের পিতামহ। পুরুষোত্তমের পিতার নাম শোভাকর ঠাকুর। ১৫৯৫ হইতে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শোভাকর পৈতৃক জমিদারী শাসন করিয়া পরলোক গমন করেন। শোভাকরের ছয় পুত্রের মধ্যে পুরষোত্তম জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ১৬০৭-৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পুরুষোত্তম পৈতৃক পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দারভাঙ্গার বিস্তীর্ণ জমিদারী শাসন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পুরুষোত্তমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুন্দর ঠাকুর দারভাঙ্গায় রাজত্ব করেন। দ্বারবঙ্গের রাজা পুরুষোত্তম ঠাকুরের বিষয় অবগত থাকাতেই, বোধ হয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র কৃষ্ণদত্তের নাটকোক্ত পুরুষোত্তমকে উড়িষ্যার সূর্য্যবংশীয় রাজা পুরুষোত্তম দেব বলিয়া অনুমান করিয়াছেন *। তাঁহার এই অনুমান ভ্রান্ত ও অমূলক বলিয়া, আমাদের নিকট বোধ হইতেছে। মৈথিল কবি কৃষ্ণদত্তের পক্ষে স্বদেশ ছাড়িয়া উড়িষ্যা গমনের কোন প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। সূর্য্য বংশীয়

* Dr. R. L. Mitras "Notices of Sanskrit Mss., VI. 20.

কপিলেন্দ্রদেবের পুত্র পুরুষোত্তম দেব ১৪৭৮-১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার রাজত্ব করেন। পুরুষোত্তম দেবের পুত্র সুবিখ্যাত প্রতাপরুদ্র দেব (১৫০৩-৩২ খ্রীঃ) প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। কৃষ্ণদত্ত খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মিথিলায় আবির্ভূত না হইলে, মিথিলা পরিত্যাগ করিয়া উড়িষ্যা দেশে রাজা পুরুষোত্তম দেবের সভায় গমন করা কৃষ্ণদত্তের পক্ষে সম্ভবপর বোধ হয় না। কৃষ্ণদত্ত খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর গ্রন্থকার বলিয়া আমাদের অনুমান হইতেছে। জন্মভূমি মিথিলার রাজসভা ত্যাগ করিয়া, আশ্রয়লাভের জন্য উড়িষ্যার রাজসমীপে গমন করা, কৃষ্ণদত্তের পক্ষে সম্ভবপর বোধ হয় না। উড়িষ্যার রাজসভায় কৃষ্ণদত্তের গ্রন্থ নীত ও অভিনীত হইলে, উড়িষ্যা দেশ হইতে 'পুরঞ্জন চরিতের অস্তিত্ব একবারে বিলুপ্ত হইত না।

দারভাঙ্গার রাজবংশের সহিত কবি কৃষ্ণদত্তের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে বিধায়, এস্থলে রাজবংশের বিবরণ সংক্ষেপে প্রদান করিয়া, কৃষ্ণদত্তের প্রণীত পুস্তকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর আরম্ভে মহেশ ঠকুর নামে এক জন সুপণ্ডিত ও নানা শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ, মধ্যভারতের অন্তর্গত জব্বলপুরের সন্নিহিত নর্ম্মদার তীরবর্ত্তী খণ্ডলা হইতে সপরিবারে মিথিলায় আগমন করিয়া উপনিবিষ্ট হন *। ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজা ভৈরব সিংহ হরিনারায়ণ সেই সময়ে মিথিলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই ভৈরব সিংহ সুবিখ্যাত রাজা শিবসিংহের পিতৃব্য হরিসিংহের পৌত্র। পূর্ব্ব পুরুষদিগের ন্যায় রাজপণ্ডিত কামেশ্বর ঠাকুরের বংশধর রাজা ভৈরব সিংহ বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। এই হরিনারায়ণ ভৈরব সিংহ ও তাঁহার পুত্র রামভদ্র সিংহ রূপনারায়ণের সভায় অবস্থিতি করিয়া, বাচপতি মিশ্র বিবিধ স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

অতি অল্পকালের মধ্যেই নবাগত মহেশ ঠাকুর আপনার বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা ও শাস্ত্রজ্ঞতার পরিচয় দিয়া মিথিলার রাজসভায় প্রতিপত্তি লাভ করেন। মহেশ ঠকুর সুবিখ্যাত স্মার্ত্তপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম চন্দ্রপতি ও মাতার নাম ধীরা দেবী। ভগীরথ নামে মহেশের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে উভয় ভ্রাতায় বহুতর গ্রন্থ রচনা করেন। রত্নপাণি মিশ্র স্বপ্রণীত 'ক্ষয়মাসাদিবিবেক' গ্রন্থে মহেশ ঠকুরের রচিত 'তিথিতত্ত্বচিন্তামণি' ও 'মলমাস সারিণী' নামে দুইখানি স্মৃতিগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। মহেশ ঠকুরের কৃত 'স্মৃতিসংগ্রহসার' ও 'মন্ত্যালোকদর্পণ' পাওয়া গিয়াছে। গঙ্গেশ্বর উপাধ্যায়ের প্রণীত 'তত্ত্বচিন্তামণির' ভাষ্যরূপে জয়দেব (পক্ষধর) মিশ্রের 'মন্ত্যালোক' রচিত হয়। এই 'মন্ত্যালোক' অবলম্বনে, মহেশ ঠকুর 'মন্ত্যালোকদর্পণ' প্রণয়ন করেন। ১৬৬৯ সংবতের (১৬১২খ্রীঃ) শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে ও রবিবারে লিখিত 'মন্ত্যালোকদর্পণ' পাওয়া গিয়াছে। এই পুস্তকের আরম্ভে মহেশ ঠকুর আপনার পিতামাতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

"গৌর্য্যা গিরীশাদিব কার্ত্তিকেয়ো }
যো ধীরয়া চন্দ্রপতেরলম্ভি।

* Sir W. Hunter's "Imperial Gazeteer of India" (1885), IV. 127.

আলোকমুদ্দীপয়িতুং নবীনং
স দর্পণং ব্যাতনুতে মহেশঃ॥" (দ্রব্যালোকদর্পণ)

উদয়নাচার্য্যের 'কুসুমাঞ্জলি' অবলম্বনে বর্দ্ধমান উপাধ্যায় 'কুসুমাঞ্জলি প্রকাশ'রচনা করেন। বর্দ্ধমানের ভাষ্য অবলম্বনে, মহেশ ঠক্কুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগীরথ "কুসুমাঞ্জলি প্রকাশ প্রকাশিকা" প্রণয়ন করেন। ভগীরথ স্বরচিত গ্রন্থের প্রথম ও শেষভাগে 'মহাদেব নামে মহেশ ঠক্কুরের উল্লেখ করিয়াছেন।

ধীরা ধবলিভবানী যমজনি চন্দ্রাদ ভগীরথং তনয়ং।
তস্য বৃত্তাবেতস্যাং সখঃ সন্তোষমাচরত॥
আসীদনুপমঃ পৃথ্ব্যাং মহাদেবং কুলাগ্রণীঃ।
অনুজ স্তস্য কৃতবান ইমাং ব্যাখ্যাং ভগীরথঃ॥"
(কুসুমাঞ্জলি প্রকাশ প্রকাশিকা)

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক দুইটী ভগীরথ ঠক্কুরের প্রণীত "কিরণাবলী প্রকাশ প্রকাশিকা" গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। উদয়নাচার্য্যের 'গুণকিরণাবলী অবলম্বনে, বর্দ্ধমান উপাধ্যায় যে ভাষ্য প্রণয়ণ করেন, ভগীরথ ঠক্কুর সেই ভাষ্যের টীকা রচনা করেন। কালক্রমে চন্দ্রপতির পুত্র মহেশ ঠক্কুর প্রাচীন রাজবংশের প্রধান পুরোহিতের পদে নিযুক্ত হন। শিবসিংহের পিতৃব্যের বংশধর রাজা প্রতাপরুদ্র দেব অনুমান ১৫৪৭-৫৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্বের পর নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের মৃত্যুর পর, প্রাচীন ব্রাহ্মণ রাজবংশ বিলুপ্ত হয়।

এক জনপ্রবাদ মতে রাজপুরোহিত মহেশ ঠাকুর দিল্লীতে গমন করিয়া আপনার বিদ্যা, বুদ্ধি, ও শাস্ত্রজ্ঞতার পরিচয় প্রদানে সম্রাট আকবরকে প্রীত করেন। দিল্লীশ্বরের সামন্তরাজরূপে মহেশ ঠাকুর সম্রাটের অনুগ্রহে মিথিলার শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হন, এই প্রতিভাশালী মহেশ ঠাকুরই দারভাঙ্গার রাজবংশের আদি পুরুষ। অন্য জনশ্রুতি অনুসারে মহেশের শিষ্য রঘুনন্দন ঠাকুর দিল্লীশ্বর হইতে মিথিলার অন্তর্গত হাতীপরগণার শাসনকর্ত্তার ভার প্রাপ্ত হন। হাতীপরগণা বর্ত্তমান দারভাঙ্গা জিলায় অবস্থিত রহিয়াছে। স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, রঘুনন্দন স্বোপার্জ্জিত হাতী পরগণার আধিপত্য স্বীয় গুরু মহেশ ঠাকুরের হস্তে অর্পণ করেন। এই শেষোক্ত জনপ্রবাদই আমাদের নিকট অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া প্রতীত হয়। মহেশ ঠক্কুরের পিতা চন্দ্রপতি ঠাকুর সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মিথিলায় সপরিবারে উপনিবিষ্ট হন।

হাতী পরগণার আধিপত্য লাভের পর, মহেশ ঠক্কুর ভওয়ারা গ্রামে আপনার আবাসস্থল মনোনীত করেন। ভওয়ারা গ্রাম মধুবনীর পোয়া ক্রোশ দক্ষিণে হাতী পরগণায় অবস্থিত রহিয়াছে। মহেশ ঠক্কুরের অধস্তন পঞ্চম বংশধর রাজা রঘুসিংহ (১৭০০-৩৬খ্রীঃ), ভওয়ারা গ্রামে ইষ্টকময় প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ভওয়ারার বর্ত্তমান বাজারের দক্ষিণে,সেই দুর্গের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। শতাধিক বৎসরেরও অধিককাল ভওয়ারা গ্রামে দ্বারবঙ্গের রাজবংশের বাসস্থল প্রতিষ্ঠিত থাকে। ১৭৬২ খ্রীঃ রাজা প্রতাপসিংহ দারভাঙ্গা নগরে স্বীয় রাজধানী স্থাপিত করেন। তদবধি দ্বারবঙ্গ জনাকীর্ণ নগরীতে পরিণত হইতে আরম্ভ হয়। এই নগর সমগ্র ত্রিহুতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জনসংখ্যায় দ্বারভাঙ্গার অধিবাসীর পরিমাণ ৪৭৪৫০ জন নিরূপিত হয়। ১৮৮১

খ্রীঃ ৬৭৯৫৫ জন এবং ১৮৯১খৃঃ ইহার অধিবাসী ৭৩৫৬১ জন নির্ণীত হইয়াছে।

পূর্ব্বে দ্বারবঙ্গ মুসলমান-প্রধান নগর ছিল। কাহারও মতে দরভাঙ্গি খাঁ নামে মুসলমান সেনাপতির দ্বারা এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। কাহারও মতে মুসলমান অধিকারে ইহা বঙ্গদেশের প্রবেশ দ্বার বলিয়া পরিগণিত ছিল। সেই সময়ে এক ফৌজদারের অধীনে দ্বারবঙ্গ নগরে মুসলমান সেনানিবাস সংস্থাপিত ছিল। ১৬৬১ খ্রীঃ দ্বারবঙ্গের ফৌজদার মির্জ্জা খাঁ সসৈন্যে পালামৌর রাজা অনন্ত রায়ের দমনে বিহার *প্রদেশের সুবাদার ও মোগল সেনাপতি* দাউদখাঁর বিশেষ সাহায্য করেন। এক্ষণে নগরের মুসলমান অধিবাসী সংখ্যা হিন্দুর এক চতুর্থ অংশ মাত্র। দ্বারবঙ্গনগর ছোট বাগমতী নদীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। নগরের নিম্ন দিয়া এই নদী উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইতেছে। নগরে যে সকল জলাশয় আছে, তন্মধ্যে গঙ্গাসাগর ও লক্ষ্মীসাগর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ১৮৬১ খ্রীঃ দ্বারবঙ্গ নগরে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। ১৮৬৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বহেরা নামক স্থানে ইংরেজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত উপবিভাগ বর্ত্তমান থাকে। এই বর্ষে উপবিভাগীয় রাজকার্য্যালয় দ্বারবঙ্গে আনীত হয়। ১৮৭৫ খ্রী দ্বারবঙ্গ স্বতন্ত্র জিলায় প্রধান নগরে পরিণত হয়।

হাতী পরগণা হইতে রাজবংশের আধিপত্য ও ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে মিথিলায় বিস্তারিত হয়। সমগ্র মিথিলা কস্মিন্ কালেও তাহাদের পদানত হয় নাই। দ্বারবঙ্গের মোগল ফৌজদারের অধীন তাঁহার করদ সামন্তগণের মধ্যে মহেশ ঠাকুর ও তাঁহার বংশধরেরা পরিগণিত ছিলেন। দারভাঙ্গার রাজবংশ কথনও স্বাধীনতা অবলম্বনে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা যথা নিয়মে মুসলমান ফৌজদারকে করদানে সন্তুষ্ট রাখিতেন এবং অবনত মস্তকে তাহার আদেশ পালন করিতেন। তাঁহারা যত্নের সহিত ফৌজদারের সহিত সর্ব্ববিধ সংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দীতা পরিত্যাগ করিয়া, জমিদারী শাসন করিতেন। এই ব্রাহ্মণ জাতীয় জমিদার বংশ দক্ষিণ বিহারের ক্ষত্রিয় রাজাদিগের ন্যায় ভুজবীর্য্য ও পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক কস্মিন্ কালেও প্রাদেশিক মুসলমান শাসন*কর্ত্তার প্রতিকূলতা প্রদর্শন করে নাই।* এই নিমিত্ত দারভাঙ্গার প্রতি বিহারের শাসনকর্ত্তার দৃষ্টি কথনও আকৃষ্ট হয় নাই। ক্ষুদ্রতা, অক্ষমতা ও প্রভুভক্তির নিমিত্ত বাঙ্গলার ইতিহাসে দারভাঙ্গার রাজবংশের উল্লেখ মাত্র দেখা যায় না। মহেশ ঠাকুরের সময় হইতে তাঁহার প্রপৌত্র নিরপৎ ঠাকুরের শাসনকাল পর্য্যন্ত, দারভাঙ্গার রাজবংশের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ বাঙ্গালার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এই দেড় শত বর্ষের মধ্যে রাজবংশের নামমালা ভিন্ন, সাময়িক ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কোনও প্রসিদ্ধ ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় না। মহেশ ঠাকুরের বংশধরগণের মধ্যে নিরপৎ ঠাকুরের পুত্র রঘুসিংহ সর্ব্ব প্রথম 'রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া, ভওয়ারা গ্রামে প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। হাতী পরগণার অধিকার প্রাপ্তির অল্পকাল পরে ১৫৫৮ খ্রীঃ মহেশ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। মহেশ ঠাকুরের পাঁচ পুত্রের মধ্যে, রামচন্দ্র ও অচ্যুতানন্দ পিতার জীবিত কালেই কালগ্রাসে পতিত হন। মহেশের দ্বিতীয় পুত্র

গোপাল ঠাকুর পৈতৃক পদ প্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসর পরে ধর্ম্মাত্মা গোপাল ভওয়ারা পরিত্যাগ করিয়া বারাণসী নগরে গমন করেন। তথায় ১৫৮৫ খ্রীঃ গোপালের মৃত্যু হয়। গোপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরমানন্দ (১৫৮৫-৯৫ খ্রীঃ) ও শোভাকর ঠাকুর (১৫৯৫-১৬০৭ খ্রীঃ) তাঁহার পর জমিদারী শাসন করিতে থাকেন। ১৬০৭ খ্রীঃ শোভাকরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরুষোত্তম পৈতৃক পদে অধিষ্ঠিত হন। সুকবি কৃষ্ণদত্ত ও লক্ষ্মীনারায়ণ পুরুষোত্তম ঠাকুরের সভায় বিদ্যমান ছিলেন।

পুরুষোত্তমের ভ্রাতা নারায়ণ ঠাকুরের বংশধরেরা ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত দারভাঙ্গায় রাজত্ব করিতেছেন। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে পুরুষোত্তম ঠাকুরের মৃত্যু ঘটে। অনন্তর তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা সুন্দর ঠাকুর ভ্রাতার পদে আসীন হন। ১৬৪২-১৭৬০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত সুন্দর ঠাকুর ও তাঁহার অধস্তন বংশধরেরা জমিদারী শাসন করিতে থাকেন। সরসরাম নামে বৈষ্ণব কবি সুন্দর সিংহের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন*। রাজা সুন্দর ঠাকুরের মৃত্যুর পূর্ব্বে ১৬৬১খ্রীঃ দারভাঙ্গার ফৌজদার মির্জ্জা খাঁ চৈনপুরের জাইগীরদার তহব্বর খাঁ এবং খরজপুরের রাজা বিরুজের সহিত পালামৌর রাজা অনন্ত রায়ের দমন এবং পালামৌ অধিকারে, বিহারের সুবাদার দাউদ খাঁর বিশেষ সহায়তা করেন। এই মির্জ্জা খাঁ গোরখপুরের ফৌজদার ইলাবর্দ্দি খাঁর সহিত সম্মিলিত হইয়া, ১৬৬৪খ্রীঃ দারভাঙ্গার উত্তরস্থ পার্ব্বত্য মোরঙ্গ প্রদেশ আক্রমণ করেন। সমগ্র প্রাচীন মিথিলা এই সময়ে মির্জ্জা খাঁর শাসনাধীনে ছিল। সারণ, চম্পারণ, ত্রিহুত ও হাজিপুর এই চারি সরকারে উত্তর-বিহার বিভক্ত ছিল। ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে সুন্দর ঠাকুরের মৃত্যু ঘটে।

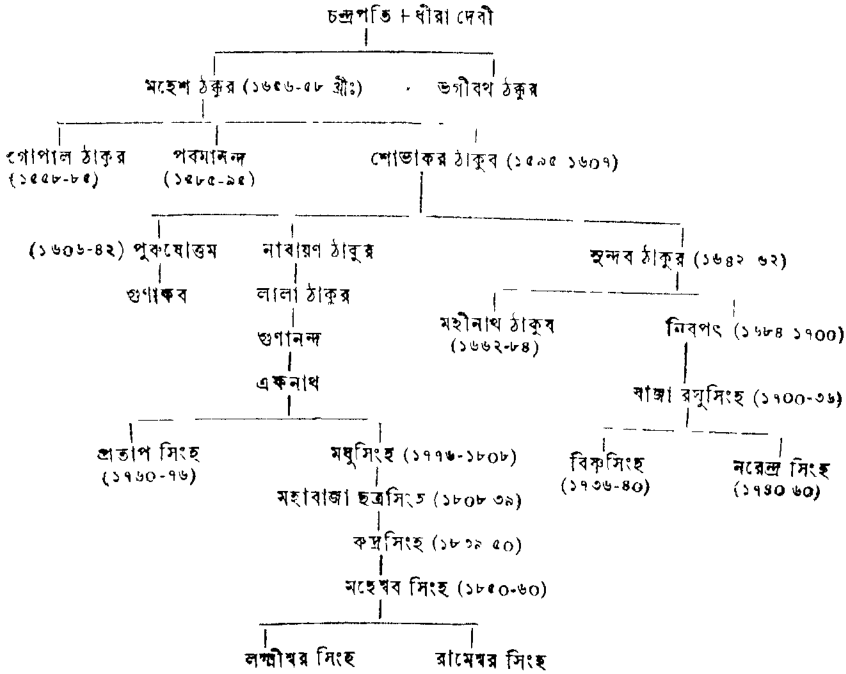
সুন্দর ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র মহীনাথ (১৬৬২-৮৪ খ্রীঃ) এবং নিরপৎ ঠাকুর (১৬৮৪-১৭০০ খ্রীঃ) পৈতৃক জমিদারী শাসন করিতে থাকেন। নন্দীপতি, রমাপতি, মহীপতি, চতুর্ভুজ, চক্রপাণি, জয়ানন্দ ও কবিশেখর ভঞ্জন নামে বৈষ্ণব কবি, তাঁহাদের শাসনকালে ত্রিহুতে আবির্ভূত হন। ১৭০০ খ্রীঃ নিরপৎ ঠাকুরের মৃত্যুর পর, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রঘুসিংহ পৈতৃক পদে উপবিষ্ট হন। এই রঘুসিংহ ভওয়ারার আবাসবাটী মৃণ্ময় প্রাচীরে বেষ্টিত করিয়া, তথায় এক মৃন্ময় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ভওয়ারায় অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। এই রঘুসিংহই দারভাঙ্গা রাজবংশের আধিপত্য প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কেহই তাঁহার ন্যায় পরাক্রান্ত হইতে পারেন নাই।

সুলতান আজিম উস্মানের অধীনে নবাব মহাবৎ জঙ্গ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিহারের শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। পাটনা নগরে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। নবাব মহাবৎজঙ্গকে প্রভূত পরিমাণে নজর দিয়া, রঘুসিংহ 'রাজা' উপাধি প্রথমত গ্রহণ করেন। এক লক্ষ টাকা বার্ষিক জমায় রাজা রঘুসিংহ সরকার ত্রিহুতের ইজারাদারী পদে অধিষ্ঠিত হন। নবাবের দেওয়ানের পদে রাজা ধরণীধর নামে একজন বিচক্ষণ হিন্দু কর্ম্মচারী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা রঘুসিংহ এই পরাক্রান্ত দেওয়ান ধরণীধরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা

*"কবি বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবি," ১৩২পৃষ্ঠা।

বার্ষিক প্রদানের অঙ্গীকার দ্বারা আপনার বশে আনয়ন করেন। রাজা ধরণীধরের সাহায্যে নির্ব্বিবাদে রাজা রঘুসিংহ ত্রিহুত শাসন করিতে থাকেন।

আমরা এইস্থলে দারভাঙ্গার রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বংশাবলী প্রদান করিয়া, ভ্রাতুষ্পুত্র একনাথ ঠাকুরের সহিত রাজা রঘুসিংহের গৃহবিবাদের বিষয় বর্ণন করিব।



সুন্দর ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণের প্রপৌত্র একনাথ ঠাকুর আপনার পিতৃব্য রাজা রঘুসিংহের জমিদারীর অংশলাভের জন্য বিবাদ আরম্ভ করিলেন। পিতৃব্যের সর্ব্বনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, একনাথ ঠাকুর পাটনার নবাব সমীপে গমন করিলেন। ত্রিহুতের ইজারাদারী হইতে রাজা রঘুসিংহ প্রজাবর্গের প্রতি অত্যন্ত দৌরাত্ম দ্বারা প্রভূত লাভ করিতেছেন, এই কথা একনাথ ঠাকুর নবাব মহাবৎ জঙ্গকে জ্ঞাপন করিলেন। ১৬৮৫ খ্রীঃ সরকার ত্রিহুতের বার্ষিক রাজস্ব ৭৬৯২৮৭ সিক্কা টাকা নির্দ্ধারিত ছিল বলিয়া একনাথ নবাবকে জানাইলেন। এই সংবাদে নবাব মহাবৎ জঙ্গ রাজা রঘুসিংহের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, স্বয়ং ত্রিহুতে উপনীত হইলেন। নবাব রাজার যাবতীয় সম্পত্তি অধিকার করার ঘোষণা করিলে, রঘুসিংহ ভওয়ারার মৃণ্ময় দুর্গ হইতে পলায়ন করিলেন। নবাব রঘুসিংহের নিরাশ্রয় পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া, পাটনায় লইয়া আসিলেন। এইরূপে একনাথ ঠাকুরের সহিত বিরোধে রাজা রঘুসিংহের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। রঘুসিংহকে পদচ্যুত ও হৃতসর্ব্বস্ব করিয়া, একনাথ ঠাকুরের ভাগ্যে ত্রিহুতের আধিপত্য লাভ ঘটিয়া উঠে নাই।

নবাব মহাবৎ জঙ্গের ক্রোধ কিছুকাল পরে প্রশমিত হইল। নবাব রাজা রঘুসিংহকে অভয়দান করিয়া পাঠাইলেন।

নবাবের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, রঘুসিংহ আত্মসমর্পণ করিলেন। অনন্তর নবাব তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া, রাজা রঘুসিংহের হস্তে ত্রিহুতের শাসনভার পুনরায় অর্পণ করিলেন। রঘুসিংহ সরকার ত্রিহুতের রাজস্ব-সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কয়েক খানি গ্রাম নিষ্কর উপভোগের জন্য প্রাপ্ত হইলেন। 'সায়েব' করের কিয়দংশ স্বয়ং গ্রহণ করিতে রাজা রঘুসিংহ আদিষ্ট হইলেন। রাজস্ব-সংগ্রাহকের পদে নিযুক্ত হইয়া, রাজা রঘুসিংহ যথারীতি ত্রিহুত শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন পূর্ব্বক যথাসাধ্য তাহাদের কষ্ট দূরীভূত করিয়া, প্রজাপুঞ্জের আশীর্ব্বাদ সহ পাটনার নবাবের অনুগ্রহ লাভ করিলেন। আমরণ রাজা রঘুসিংহ ত্রিহুতের শাসনকার্য্য দক্ষতা ও কৌশলের সহিত নির্ব্বাহ করেন। নবাব মুরসিদ কুলি খাঁর সময়ে (১৭০৭ ২৫খ্রীঃ) রাজা রঘুসিংহ ত্রিহুতের শাশনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ১৭৩৬ খ্রীঃ রাজা রঘুসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষ্ণুসিংহ পৈতৃক পদে নিযুক্ত হন। ১৭৪০ খ্রীঃ অপুত্রক অবস্থায় বিষ্ণুসিংহের মৃত্যু হয়। বিষ্ণুসিংহের শাসনকালে, বিহারের শাসনকর্ত্তা নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ নামে মুরসিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করিয়া ১৭৩৯-৫৬ খ্রী পর্য্যন্ত অতি দক্ষতার সহিত বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন।

রাজা বিষ্ণু সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্র সিংহ ত্রিহুতের শাসনকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। নরেন্দ্র সিংহের বিশ্বস্ততা ও কার্য্যদক্ষতায় নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ বিশেষরূপে প্রীত হন। নবাবের আদেশ ক্রমে তিনি নিম্নোলিখিত মতে দস্তরাত (সায়ের জমা) গ্রহণের অধিকার প্রাপ্ত হন। ইহাতে জমিদারীর রাজস্বের উপর দশ টাকা শতকরা হারে মালিকানা, এবং প্রজার প্রদত্ত প্রতি কবুলীয়তের টাকায় শতকরা দুই টাকা হিসাবে সুদ এবং প্রতি টাকায় দুই আনা হারে দস্তরী গ্রহণ করিতে নরেন্দ্র সিংহ অধিকার প্রাপ্ত হন। ইহা ভিন্ন সরকার ত্রিহুতের অন্তর্গত ১০২ পরগণার প্রতি মৌজায় বার্ষিক দেড় টাকা হারে জমা লওয়ার অধিকারী হন। এই নরেন্দ্র সিংহের সময়ে চন্দ্র ঝা মৈথিল ভাষায় 'রামায়ণ' অনুবাদ করেন এবং মংগ্রৌনী গ্রামের লাল ঝা মৈথিল কবিতা রচনা করিয়া কনৈল গ্রাম নিষ্কর উপভোগের জন্য প্রাপ্ত হন। অদ্যাপি সেই গ্রাম লাল ঝার বৃদ্ধপ্রপৌত্রের অধিকারে রহিয়াছে। বক্সী গোকুলনাথ ঝার ভুজবীর্য্যে রাজা নরেন্দ্র সিংহ কনরপী ঘাটের যুদ্ধে বিহারের বিখ্যাত শাসনকর্ত্তা রাজা রামনারায়ণকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধ-কাহিনী মৈথিল ভাষায় কবি লাল ঝার দ্বারা 'কনড়পী ঘাট লড়াই' নামে বর্ণিত হইয়াছে। দারভাঙ্গা জিলার সর্ব্বত্র এই গীত শুনা যায়*। রাজা নরেন্দ্র সিংহের সময়ে পলাসীর যুদ্ধের পর ইংরেজ অধিকার বঙ্গদেশে বদ্ধমূল হয়।

রাজা নরেন্দ্র সিংহের কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই। এই নিমিত্ত তিনি একনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপ সিংহকে দত্তক রূপে গ্রহণ করেন। ১৭৬০ খ্রীঃ নরেন্দ্র সিংহের মৃত্যুর পর রাজা প্রতাপ সিংহ ত্রিহুতের শাসনভার প্রাপ্ত হন। ১৭৬২ খ্রীঃ প্রতাপ সিংহ পৈতৃক আবাসস্থল

* Journal of Asiatic society of Bengal for 1885. purt I. p. 16.

ভওয়ারা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, দারভাঙ্গা নগরে আপনার বাসস্থল নির্ম্মাণ করেন। সেই সময়ে বর্ত্তমান প্রকাণ্ড ও সুন্দর রাজবাটীর সূত্রপাত হয়। বর্ত্তমান রাজবাটী প্রায় ৯০ বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া অবস্থিত। ১৬৭৩ খ্রীঃ নবাব কাশিম আলি খাঁ রাজা প্রতাপ সিংহের বাজে (দস্তরাত) গ্রহণের অধিকার দৃঢ়ীভূত করেন। ১৭৬৫ খ্রীঃ; ১২ আগষ্ট তারিখে ইংরেজরাজ বাঙ্গালা ও বিহারের দেওয়ানী পদ লাভ করিয়া বঙ্গদেশে আপনাদের অব্যাহত প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৬৬ খ্রীঃ ত্রিহুতের অন্তর্গত ৩টী পরগণা মহম্মদ রেজা খাঁর সহিত ১৪২০৭১ টাকায়, মহেন্দ্র নারায়ণের সহিত এক পরগণা ৬৫:১২ এবং দমন সিংহের সহিত অন্য এক পরগণা ৪৪৯৮৩ টাকায় বন্দোবস্ত হয়। ১৭৭১ খ্রীঃ কলিকাতার ইংরেজ গবর্ণর ভান্সিটার্ট সাহেব দ্বারা রাজা প্রতাপ সিংহ পদচ্যুত হইয়া, স্বীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত হন। রাজা প্রতাপ সিংহ এক হাজার টাকা মাসিক বৃত্তি পাইতে থাকেন। রাজার যাবতীয় ভূসম্পত্তি, নানাকর, মালিকানা ও দস্তরাৎ গ্রহণের কার্য্য ইংরেজরাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া রাজা নরেন্দ্র সিংহের বিধবা পত্নীকে ভরণ পোষণের জন্য দশ খানি গ্রাম নিষ্কর প্রদান করেন। সেই সময়ে প্রতাপ সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মধুসিংহ দুইখানি নিষ্কর উপভোগের জন্য প্রাপ্ত হন। ১৭৭৬ খ্রীঃ সম্রাট সাহ আলম হইতে রাজা প্রতাপ সিংহ পূর্ণিয়া জিলার অন্তর্গত ধরমপুর পরগণার আধিপত্য লাভ করেন। ১৭৭৬ খ্রীঃ রাজা প্রতাপ সিংহের মৃত্যু ঘটে। রাজা প্রতাপ সিংহের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পর, মধু সিংহ ভ্রাতার পদে অধিষ্ঠিত হন। মধুসিংহের সময়ে (১৭৭৬ ১৮০৮ খ্রীঃ) ইংরেজরাজের সহিত নানা বিষয়ে বিবাদ, বিসংবাদ ও মনোমালিন্য সংঘটিত হয়। মধুসিংহের তেজস্বিতা ইংরেজরাজের বিরাগ উৎপাদন করে। বিগত আট বৎসরের দস্তরাৎ পাওয়ার দাবীতে রাজা মধুসিংহ ১৭৭৮ খ্রীঃ কলিকাতায় ইংরেজ গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবর নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। গবর্ণর জেনারেলের আদেশে পাটনার কোষাগার হইতে, রাজা মধুসিংহের প্রার্থিত ১৯১০০০ টাকা প্রদত্ত হয়। ইহাতে স্থানীয় রাজপুরুষেরা মধুসিংহের প্রতি একান্ত বিরক্ত হয়। ১৭৮২ খ্রীঃ সরকার ত্রিহুতের অন্তর্গত ১০২ পরগণার মধ্যে ৮৪ পরগণা ২০০২২৯ সিক্কা টাকা বার্ষিক জমায় রাজা মধুসিংহের সহিত বন্দোবস্ত হয়। পাটনার কালেক্টর বেথাবষ্ট সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে লিখিয়া পাঠান যে, রাজা মধুসিংহ জমিদারীর শাসনকার্য্যে একান্ত অক্ষম। ১৭৮৮ খ্রীঃ বার্ষিক রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হওয়াতে, মধুসিংহ পাটনায় আনীত হইয়া, কারারুদ্ধ হন। এই বৎসর মে মাসে পাটনার ইংরেজ কালেক্টর মধুসিংহের বিরুদ্ধে অনেক কথা কলিকাতায় লিখিয়া পাঠান, মধুসিংহের উপদ্রব, উৎপীড়ন, ও অত্যাচারে ত্রিহুত জনশূন্য হইয়া উঠিয়াছে। রাজা মধুসিংহ জমিদারী শাসনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তাঁহার দস্তরাৎ গ্রহণের অধিকার রহিত করিয়া, রাজাকে পূর্ব্ববৎ মাসিক হাজার টাকা বৃত্তি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। ১৭৮৯ খ্রীঃ রাজা মধুসিংহ ২৯৫:৮১ টাকা বার্ষিক কর আদায়ের অঙ্গীকারে আপনার পৈতৃক

জমিদারীর বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। অঙ্গীকার অনুসারে এই রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হইলে, ১৭৬৯ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে রাজা মধুসিংহের হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া অন্যত্র বন্দোবস্তের উদ্যোগ হয়। জমিদারগণের সহিত দশশালা বন্দোবস্ত প্রদানের আদেশ প্রচারিত হইলে, কালেক্টরের প্রস্তাবিত রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকারে, রাজা মধুসিংহ ত্রিহুতের জমিদারীর বন্দোবস্ত লইতে অসম্মত হন। মালিকানা ও দস্তুরাৎ গ্রহণের অধিকার না পাইলে, প্রস্তাবিত রাজস্ব আদায়ে আপনার অসমর্থতা জ্ঞাপন করেন। এই নিমিত্ত ১৭৯০ খ্রীঃ দুই জন মুসলমান ঠিকাদারের সহিত রাজা মধুসিংহের জমীদারী ইজারার বন্দোবস্ত হয়। ফৈজ উদ্দিন ও বরকত উল্লা খাঁ নামে পাটনার দুই জন ধনী ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান এই জমিদারীর ইজারা গ্রহণ করেন।

রাজা মধুসিংহের ষড়যন্ত্রে প্রজাগণ স্ব স্ব দেয় কর প্রদানে বিলম্ব করিতে লাগিল। ইহাতে ইজারাদারগণের যথেষ্ট ক্ষতি হইতে লাগিল। ১৭৯১ খ্রীঃ নবেম্বর মাসে ফৈজ উদ্দিন খাঁ আপনার অংশের ইজারাদারী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অশ্ব হইতে পতিত হওয়াতে, পাটনায় বরকত উল্লা খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ত্রিহুতের ইজারাদারী গ্রহণে অসম্মত হয়। রাজা মধুসিংহ নিরূপিত রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস না হইলে, জমিদারী শাসনের ভার গ্রহণে অসম্মত হয়েন। অনন্তর ১৭৯৩-১৮০০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ইজারাদারের সহিত রাজার জমিদারী বন্দোবস্ত প্রদত্ত হয়। ১৮০০ খ্রীঃ ইজারার মিয়াদ অতীত হয়। কলিকাতা রেভিনিউ বোর্ডের আদেশে, মালিকানা ও দস্তুরাৎ বাদে ১৬৮৫০৬ টাকায় রাজার সহিত বন্দোবস্ত করিতে পাটনার কালেক্টর অপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। রাজা মধুসিংহ ১৪৮২২৭ টাকায় বন্দোবস্ত লইতে সম্মত হন। কালেক্টর ইহাতে অসম্মত হইয়া, পুনরায় বিভিন্ন ইজারাদারের নিকট জমিদারীর শাসনভার অর্পণ করেন। কিছু কাল পরে রাজা মধুসিংহ পূর্ব্ব প্রস্তাবিত বার্ষিক রাজস্বের অপেক্ষা দশ হাজার টাকা অধিক দিতে সম্মত হইলে, বোর্ডের আদেশে তাঁহার সহিত জমিদারীর বন্দোবস্ত হয়। দারভাঙ্গা রাজের জমিদারী দারভাঙ্গা, মজফরপুর, ভাগলপুর, মুঙ্গের ও পূর্ণিয়া জিলায় বিস্তারিত রহিয়াছে। এই সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর বার্ষিক আয় ২৩৮০০০০ টাকা এবং রাজস্ব ৪২৮২১০ টাকা বলিয়া ১৮৮৫ খ্রীঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১৮০৮ খ্রীঃ দারভাঙ্গার রাজা মধুসিংহের মৃত্যুর পর, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ছত্র সিংহ জমিদারীর শাসনভার প্রাপ্ত হন। পিতার জীবদ্দশাতেই ছত্রসিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিষণ সিংহের মৃত্যু হয়। ছত্রসিংহের পৈতৃক পদ প্রাপ্তির সময়ে, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতারা বিভিন্ন পরগণার আধিপত্য প্রাপ্ত হন। এইরূপে জবদী পরগণা কিরাত সিংহের, পাহারপুর গোবিন্দ সিংহের এবং পচ্ছী পরগণা রঘুসিংহ ও সম্পৎ সিংহের হস্তগত হয়। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ছত্রসিংহ 'মহারাজা' উপাধি প্রথমতঃ প্রাপ্ত হন। বিখ্যাত পণ্ডিত রত্নপাণি মিশ্র এই ছত্রসিংহের সভায় থাকিয়া, বিবিধ গ্রন্থ সংস্কৃতে রচনা করেন। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৮৬৯ খ্রীঃ

বার্দ্ধক্য ও অক্ষমতা প্রযুক্ত ছত্রসিংহ সাংশরিক ব্যাপার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রসিংহের প্রতি সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর শাসনভার অর্পণ করেন। পারিবারিক প্রথা ও চিরন্তন আচার অনুসারে রুদ্রসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাসুদেব সিংহ জবৈল পরগণা পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে উপভোগের জন্য প্রাপ্ত হন। নিঃসন্তান অবস্থায় কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের মৃত্যু হইলে, তাঁহাদের অধিকারস্থ ভূসম্পত্তি জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হইতে থাকে।

ছত্রসিংহের মৃত্যুর পর বাসুদেব ভ্রাতার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন, হিন্দু দায়াধিকার ব্যবস্থা অনুসারে তিনি পৈতৃক জমিদারীর অর্দ্ধভাগের অধিকারী, এই হেতুবাদে বাসুদেব সিংহ ২৪৪৬৯৫৮ টাকার দাবীতে মহারাজ রুদ্র সিংহের নামে ত্রিহুত জিলার জজ আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। পারিবারিক প্রথামতে জ্যেষ্ঠানুক্রমে মহারাজ রুদ্রসিংহই জমিদারীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী। কনিষ্ঠ ভ্রাতা আপনার ভরণপোষণের উপযোগী ভূসম্পত্তি ভিন্ন আর কিছুই পাওয়ার অধিকারী নহেন। এই হেতুবাদে জিলার জজ রাট্রে সাহেব বাসুদেব সিংহের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টে নিম্নতন বিচারালয়ের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে। এই মোকদ্দমা উপলক্ষে মহারাজ রুদ্রসিংহ অনেক ক্ষতি ও ঋণগ্রস্ত হন।

১৮৫০ খ্রীঃ মহারাজ রুদ্রসিংহের মৃত্যু হয়। মহেশ্বর, গণেশ্বর, নেত্রেশ্বর ও গোপেশ্বর নামে চারি পুত্র রাখিয়া, রুদ্রসিংহ কালগ্রাসে পতিত হন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহেশ্বর সিংহ রাজপদ প্রাপ্ত হন। দশ বৎসর কাল নির্ব্বিবাদে জমিদারী শাসন করিয়া, ১৮৬০ খ্রীঃ ২০শে অক্টোবর তারিখে ঝঞ্ঝারপুরে মহারাজ মহেশ্বর সিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তাঁহার জমিদারীর বার্ষিক আয় ষোল লক্ষ টাকা ছিল। ৭০ লক্ষ টাকা দেনা রাখিয়া, মহেশ্বর সিংহ পরলোক গমন করেন। লক্ষ্মীশ্বর ও রামেশ্বর নামে তাঁহার দুইটী শিশু সন্তান ছিল।

পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীশ্বর পৈতৃক পদে অভিষিক্ত হন। বালক মহারাজা ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামেশ্বর শিক্ষা লাভের জন্য বারাণসী নগরে প্রেরিত হন। সেখানে কর্ণেল ম্যাকনেটন্ সাহেবের তত্ত্বাবধানে উভয় ভ্রাতা সযত্নে শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। ইংরেজরাজ স্বহস্তে রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে রাজ্যের দেনা সত্তর লক্ষ টাকা পরিশোধ হয় এবং বার্ষিক আয় চারি লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়। ১৮৭৩ খ্রীঃ রাজকোষে ৫৪৭৬০০০ টাকা সঞ্চিত হয়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় এই সঞ্চিত অর্থের ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রজাবর্গের প্রাণরক্ষণে ও দাতব্য কার্য্যে ব্যয়িত হয়। ১৮৭৯ খ্রীঃ মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া, স্বহস্তে রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করেন। তিনি সর্ব্বতোভাবে বঙ্গদেশীয় জমিদারবর্গের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহের অকালমৃত্যুতে সমগ্র ভারতবর্ষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। মৃত মহারাজের প্রেতাত্মার তৃপ্তিসাধন উপলক্ষে দরিদ্র লোকের অভাব ও দুর্দ্দশা মোচনের জন্য

বর্ত্তমান মহারাজা রামেশ্বর সিংহ অকাতরে লক্ষাধিক মুদ্রা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ব্যয় করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদানুসরণ করিয়া, বর্ত্তমান মহারাজ স্বদেশের সেবায় আপনার জীবন উৎসর্গীকৃত করিলে সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার যশের সৌরভে পূর্ণ হইবে। ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া, স্বদেশের সেবায় নিযুক্ত রাখুন।

দারভাঙ্গা রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। এক্ষণে পুরুষোত্তম ঠাকুরের সভাসদ সুকবি কৃষ্ণদত্তের রচিত গ্রন্থের সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া, প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ভাগবত পুরাণের অন্তর্গত বিষ্ণুভক্ত পুরঞ্জনের উপাখ্যান অবলম্বনে, সুকবি কৃষ্ণদত্ত পাঁচ অঙ্কে 'পুরঞ্জনচরিত নাটক' প্রণয়ন করেন। নাটকের আরম্ভে তুইটী শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়া, কৃষ্ণদত্ত স্বরচিত নাটকের বিষয় অবতারণা করিয়াছেন।

"সূত্রধারঃ। ... ... নিরুপাধি-পরোপকার জাগরুক যশোভার ঘনসার প্রসার সুরভীকৃত সংসারস্য পরমরমণীয়াকারস্য শ্রী দিবাকর-পুরুষোত্তমস্য সভায়াং...সুখোপবিষ্টানাং-শিষ্টানাং দেশবিদেশবাস্তব্যানাং শাস্ত্রিণাং ব্রাহ্মণানাং রাজকার্য্যভারিণাং ব্যাপারিণাঞ্চ মণ্ডলী সমুল্লসতি। তদত্র নবীনং কিমপি নাটকমভিনেতব্যমিতি। ... ... যৎ কিল মৈথিল কৃষ্ণদত্তকবিনা পুরঞ্জনচরিতং নাম নাটকং নির্ম্মায় অস্মাসু সমর্পিতং, তদভিনয়েনারাধনমস্য সংভবিষ্যতি।"

এই 'পুরুষোত্তম' পদদ্বারা উড়িষ্যার মহারাজ পুরুষোত্তম দেব বর্ণিত হইলে, 'গজপতি' 'নরপতি' প্রভৃতি বিশেষণ নামের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই প্রযুক্ত হইত। পুরঞ্জন চরিত নাটকের যে প্রতিলিপি দারভাঙ্গার অন্তর্গত সারদাপুরে পণ্ডিত হর্ষনাথ ঝার গৃহে বিদ্যমান,আছে, তাহা মৈথিল অক্ষরে ১৭০১ শকাব্দে দ্বিজ হেমনাথের দ্বারা লিখিত হয়।

"শাকেঽব্দে ধরণী বিষমুনিধরা-সম্ভাষমানে শুভে
মাঘে মাসি দিবামনৌ মকরগে বিশে স্তিথৌ সাদরং।
শ্রীমন্মৈথিলকৃষ্ণদত্তকৃতিনা যন্নির্ম্মিতং নাটকং
প্রালেখীত্তদিদং মুদা দ্রুততরং শ্রীহেমনাথ দ্বিজঃ॥"
(পুরঞ্জনচরিত)

কৃষ্ণদত্ত শত অঙ্কে "কুবলয়াশ্বীয়"নাটকে কুবলয়াশ্ব নামে ব্রাহ্মণ কুমারের সহিত মদালসা নাম্নী যুবতীর প্রেম বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

"কৃষ্ণদত্ত ইতি মৈথিল কবিঃ
বালভাববুলভাৎ কুতূহলাৎ।
নাটকং যদভিনব্যমাতনোৎ॥"
কোঽত্র সম্প্রতি গুণাগুণগ্রহঃ॥" (কুবলয়াশ্বীয়)

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত বিখ্যাত 'চণ্ডী মাহাত্ম্য' অবলম্বনে, কৃষ্ণদত্ত একাদশ সর্গে "চণ্ডীচরিত চন্দ্রিকা" নামে কাব্য রচনা করেন। 'শাস্ত্রসংগ্রহে' কৃষ্ণদত্ত বিবিধ দর্শনের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া ভগবানের প্রতি ভক্তিই মুক্তিলাভের উপায়—এই মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

"আধায় হৃদি বিশেশং বিশেষাং হিতসাধকং।
ক্রিয়তে কৃষ্ণদত্তেন সর্বশাস্ত্রস্য সংগ্রহঃ।"(শাস্ত্রসংগ্রহ)

কৃষ্ণদত্তের পিতামাতার নাম বা বাসস্থলের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তিনি দারভাঙ্গার রাজা পুরুষোত্তম ঠাকুরের সভায় বিদ্যমান থাকিয়া, যে চারি খানি পুস্তক রচনা করেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। প্রসঙ্গক্রমে দ্বারবঙ্গের বিখ্যাত রাজবংশের বিবরণ এই প্রবন্ধে সংগৃহীত হইয়াছে।

কৃষ্ণদত্তের সমসাময়িক রাজপণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ। লক্ষ্মী নারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীদত্ত একবিংশতি সর্গে 'পাণ্ডবচরিত" নামে মহা-

কাব্য রচনা করেন। চন্দ্রদত্ত নামে অপর এক বৈষ্ণব মৈথিল কবি সুপ্রসিদ্ধ জয়দেব গোস্বামীর 'গীতগোবিন্দ কাব্যের অনুকরণে "শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী" ও "কাশীগীতা' রচনা করেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।*

শ্রীম—কথিত।

[শ্রীবিবেকানন্দ, শ্রীগিরীশ ঘোষ ইত্যাদির সহিত ঠাকুর রামকৃষ্ণের অবতার সম্বন্ধে কথা ও তাঁহার নানাবিধ ভাবাবেশ।]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[রাজপথে।]

গিরীশের নিমন্ত্রণ। রাত্রেই যেতে হবে। এখন রাত ৯টা হবে। বলরামও, ঠাকুর খাবেন বলে, রাত্রে খাবার প্রস্তুত করেছেন। পাছে বলরাম মনে কষ্ট করেন, ঠাকুর গিরীশের বাড়ী যাইবার সময় তাই বুঝি বলিলেন —বলরাম, তুমিও খাবার পাঠিয়ে দিও।

দুতালা হইতে নীচে নামিতে নামিতেই ভগবদ্ভাবে বিভোর। যেন মাতাল। সঙ্গে—নারাণ, মাষ্টার। পশ্চাতে রাম, চুনী ইত্যাদি অনেক। একজন ভক্ত বলিলেন, সঙ্গে কে যাবে? ঠাকুর বলিলেন, একজন হলেই হলো।

নামিতে নামিতেই বিভোর। নারাণ হাত ধরিতে গেলেন, পাছে পড়িয়া যান। ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নারাণকে বলিলেন, হাত ধরলে লোকে মাতাল মনে করবে, আমি অমনি চলে যাব।

বোস পাড়ার তেমাতা পার হলেন—কিছুদূরেই শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষের বাড়ী। এত শীঘ্র চলছেন কেন? ভক্তেরা পশ্চাতে পড়ে থাকৃছে। না জানি হৃদয় মধ্যে কি অদ্ভুত দেবভাব হইয়াছে। বেদে যাহাকে বাক্যমনের অতীত বলিয়াছেন, তাঁহাকে চিন্তা করিয়া কি পাগলের মত পাদবিক্ষেপ করিতেছেন? এইমাত্র যে বলরামের বাড়ীতে বলিলেন যে, সেই পুরুষ বাক্য-মনের অতীত নহেন; তিনি শুদ্ধমনের, শুদ্ধ-বুদ্ধির, শুদ্ধআত্মার গোচর। তবে বুঝি সেই পুরুষকে সাক্ষাৎকার করছেন। এই কি দেখছেন—"যো কুছ্ হায় সো তুঁহি হায়?"

এই যে নরেন্দ্র আসিতেছেন। নরেন্দ্র নরেন্দ্র বলিয়া পাগল; কৈ নরেন্দ্র ত সম্মুখে আসিলেন, ঠাকুর ত কথা কহিলেন না। লোকে বলে, এর নাম ভাব, এইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের হইত। কে এ ভাব বুঝিবে?

গিরীশের বাড়ী প্রবেশ করিবার গলির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে ভক্তগণ। এইবার—নরেন্দ্রকে সম্ভাষণ করিলেন।

নরেন্দ্রকে বললেন, "ভাল আছ, বাবা? আমি তখন কথা কইতে পারি নাই।"—কথার প্রতিঅক্ষর করুণামাখা। তখনও দ্বারদেশে উপস্থিত হন নাই; হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

* শ্রীযুক্ত ম: প্রতিবারই দয়া করিয়া অন্ত কাগজে প্রকাশের-পূর্ব্বে কথামৃত নব্যভারতে দিয়া থাকেন। এই অংশ অন্য কাগজে অগ্রে প্রকাশিত হইয়াছে। নব্যভারতের পাঠকগণের নিকট ইহা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া প্রকাশ করিতে দিয়াছেন। ন, স।

নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, একটা কথা—এই একটী (দেহী ?) ও একটী জগৎ!

'জীব জগৎ' এসব কি ভাবে দেখিতেছিলেন, তিনিই জানেন। অবাক্ হয়ে দেখছিলেন। দু একটী কথা উচ্চারিত হইল, যেন বেদবাক্য—যেন দৈববাণী—অথবা, যেন অনন্ত সমুদ্রের তীরে গিয়াছি ও অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়েছি, আর যেন অনন্ত-তরঙ্গমালোত্থিত অনাহত শব্দের একটী দুটী ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[ভক্ত মন্দিরে]

দ্বারদেশে গিরীশ; ঠাকুর রামকৃষ্ণকে গৃহ মধ্যে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে যেই নিকটে এলেন, অমনি গিরীশ দণ্ডের ন্যায় সম্মুখে পড়িলেন। আজ্ঞা পাইয়া উঠিলেন, ঠাকুরের পদধূলা গ্রহণ করিলেন ও সঙ্গে করিয়া দুতালায় বৈঠকখানার ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তেরা সসব্যস্ত হয়ে আসন গ্রহণ করিলেন—সকলের ইচ্ছা তাঁহার কাছে বসেন ও তাঁহার মধুর কথামৃত পান করেন।

[সংবাদপত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

আসন গ্রহণ করিতে গিয়া ঠাকুর দেখিলেন, একখানা খবরের কাগজ রহিয়াছে। খবরের কাগজে বিষয়ীদের কথা, বিষয়কথা, পরচর্চ্চা, পরনিন্দা তাই অপবিত্র—তাঁহার চক্ষে। তিনি ইসারা করিলেন, ওখানা যাহাতে স্থানান্তরিত করা হয়। কাগজখানা সরানো হবার পর আসন গ্রহণ করিলেন।

(নিত্যগোপাল)

নিত্যগোপাল প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিত্যগোপালের প্রতি) ওখানে——?

নিত্য। আজ্ঞা হাঁ, দক্ষিণেশ্বরে যাইনি, শরীর খারাপ, ব্যথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেমন আছিস্?

নিত্য। ভাল নয়—

শ্রীরামকৃষ্ণ। দুই এক গাম নীচে থাকিস্।

নিত্য। লোক ভাল লাগে না। কত কি বলে—ভয় হয়।—এক এক বার খুব সাহস হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হবে বৈ কি? তোর সঙ্গে কে থাকে?

নিত্য। তারক।* ও সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকে; ওকেও সময়ে সময়ে ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ন্যাঙ্‌টা বল্‌তো, তাদের মঠে একজন সিদ্ধ ছিল।—সে আকাশ তাকিয়ে চলে যেতো—গণেশগর্জ্জী—সঙ্গী যেতে বড় দুঃখ—অধৈর্য্য হয়ে গিয়েছিল।

বলিতে বলিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। আবার কি ভাবে অবাক্ হয়ে রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে বলিলেন, 'তুই এসেছিস্? আমিও এসেছি!' এ কথা কে বুঝিবে? এই কি দেব-ভাবা?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[পার্ষদ সঙ্গে।]

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ), গিরীশ, রাম, হরিপদ, চুনী, বলরাম, মাষ্টার্ ইত্যাদি অনেকে ছিলেন।

[অবতার সম্বন্ধে বিচার]

নরেন্দ্র মানেন না যে, মানুষে ঈশ্বর

* তারক—শিবানন্দ।

অবতার হন্। এদিকে গিরীশের অনন্ত বিশ্বাস যে, তিনি যুগে যুগে অবতার হন, আর মানব-দেহ ধারণ করে মর্ত্তলোকে আসেন। ঠাকুরের ভারি ইচ্ছা যে, এসম্বন্ধে দুজনে বিচার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (গিরীশের প্রতি) একটু ইংরাজিতে দুজনে বিচার করো—আমি দেখবো।

বিচার আরম্ভ হইল। ইংরাজিতে হইল না—বাঙ্গালাতেই হইল—মাঝে মাঝে দু একটা ইংরাজি কথা। নরেন্দ্র বলিলেন, ঈশ্বর অনন্ত। তাঁকে ধারণা করা আমাদের সাধ্য কি? তিনি সকলের ভিতরই আছেন—শুধু একজনের ভিতর এসেছেন, এমন নয়।

[Doctrine of Equality]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। ওরও যা মত, আমারও তাই মত। তিনি সর্ব্বত্র আছেন। তবে একটা কথা আছে—শক্তি বিশেষ। কোন খানে অবিদ্যা শক্তির প্রকাশ, কোন খানে বিদ্যাশক্তির। কোন আধারে শক্তি বেশী, কোন আধারে শক্তি কম। তাই সব মানুষ সমান নয়।

রামদত্ত। এ সব মিছে তর্কে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত ভাবে)। না, না; ওর একটা মানে আছে।

গিরীশ। (নরেন্দ্রের প্রতি)। তুমি কেমন করে জানলে, তিনি দেহ ধারণ করে আসেন না?

নরেন্দ্র। তিনি অবাঙ্মনসোগোচরং।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না; তিনি শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। শুদ্ধবুদ্ধি, শুদ্ধআত্মা, একই। ঋষিরা এই শুদ্ধবুদ্ধি, শুদ্ধআত্মা দ্বারা সেই শুদ্ধ আত্মাকে সাক্ষাৎকার করেছিলেন।

গিরীশ (নরেন্দ্রের প্রতি)। মানুষে অবতার না হলে, কে বুঝিয়ে দেবে? মানুষকে জ্ঞানভক্তি দিবার জন্য তিনি দেহ ধারণ করে আসেন। না হলে কে শিক্ষা দিবে?

নরেন্দ্র। কেন? তিনি অন্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। হাঁ, হাঁ, অন্তর্যামীরূপে তিনি বুঝাবেন।

তারপর ঘোরতর তর্ক হ'তে লাগলো। Infinity তার কি অংশ হয়? Hamilton কি বলেন? Herbert Spencer কি বলেন? Tyndall, Huxley বা কি বলে গেছেন, এই সব কথা হ'তে লাগলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। দেখ ইগুণ * আমার ভাল লাগছে না। আমি তাই সব দেখছি! বিচার আর কি করবো? দেখছি—তিনিই সব হয়েছেন।

(রামানুজ ও বিশিষ্টদ্বৈতবাদ)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাও বটে; আবার তাও বটে। এক অবস্থায় অখণ্ডে—মনবুদ্ধি হারা হয়ে যায়। নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অখণ্ডে লীন হয়—তার কি করে বল দেখি?—

গিরীশ (হাসিতে হাসিতে)। ঐটে ছাড়া প্রায় সব বুঝেছি কি না! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার দু' থাক না নাম্‌লে* কথা কইতে পারি না।

"বেদান্ত, শঙ্কর যা বুঝিয়েছেন, তাও আছে, আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।

* তাঁহার ব্যবহৃত সুমিষ্ট কথা—"ই গুণো" অর্থাৎ—এই গুলি।

নরেন্দ্র। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি)। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আছে—রামানুজের মত। কি না, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। সব জড়িয়ে একটী।

"যেমন একটী বেল। এক জন খোলা আলাদা, বীজ আলাদা আর শাঁস আলাদা করেছিল। বেলটী কত ওজনে জানবার দরকার হয়েছিল। এখন শুধু শাঁস ওজন কর্‌লে, কি বেলের ওজন পাওয়া যায়! খোলা, বীচি, শাঁস সব এক সঙ্গে ওজন করতে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বীচি নয়, শাঁসটিই সার পদার্থ বলে বোধ হয়। তার পর বিচার ক'রে দেখে, যে বস্তুর শাঁস, সেই বস্তুরই খোলা আর বীচি, আগে নেতি নেতি করে যেতে হয়,—জীব নেতি, জগৎ নেতি, এইরূপ বিচার করতে হয়; ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু। তারপর, অনুভব হয়, যারই শাঁস তারই খোলা, বীচি,—যা থেকে ব্রহ্ম ব্রহ্ম বল্‌ছো, তাই থেকেই জীবজগৎ। যারই নিত্য (Absolute), তারই লীলা (Relative)। তাই রামানুজ বল্‌তেন, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

(ঈশ্বর দর্শন—God-vision.)

(মাষ্টারের প্রতি) "আমি তাই দেখছি সাক্ষাৎ—আর কি বিচার করবো? আমি দেখছি, তিনিই এই সব হয়েছেন—তিনিই জীব ও জগৎ হয়েছেন! তবে চৈতন্য না লাভ করিলে চৈতন্যকে জানা যায় না। শুধু মুখে বল্লে হবে না, 'এই আমি দেখছি তিনি সব হয়েছেন। তাঁর কৃপায় চৈতন্য লাভ হওয়া চাই চৈতন্য লাভ করলে সমাধি হয়, মাঝে মাঝে দেহ ভুল হয়ে যায়, কামিনী কাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না, ঈশ্বর-কথা বই আর কিছু ভাল লাগে না, বিষয়-কথা শুন্‌লে কষ্ট হয়। চৈতন্য লাভ কর্‌লে তবে চৈতন্যকে জান্‌তে পারা যায়।

(অবতার ও প্রত্যক্ষ Revelation.)

বিচারান্তে ঠাকুর রামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলিলেন,—

"দেখেছি, বিচার করে এক রকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান করে এক রকম জানা যায়। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন—সে এক। তিনি যদি দেখিয়ে দেন—এর নাম অবতার,—তিনি যদি তাঁর মানুষ-লীলা দেখিয়ে দেন, তাহলে আর বিচার কর্‌তে হয় না, কারুর বুঝিয়েও দিতে হয় না। কি রকম জান? যেমন অন্ধকারের ভিতর দেশলাই ঘস্‌তে দপ্‌ করে আলো হয়। সেই রকম দপ্‌ করে আলো যদি তিনি দেন, তা হলে সব সন্দেহ মিটে যায়। এরূপ বিচার করে কি তাঁকে জানা যায়?

[কালী * ও ব্রহ্ম। †]

তখন ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন ও কুশল প্রশ্ন ও কত আদর করিলেন।

নরেন্দ্র। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। কৈ, কালীধ্যান তিন চার দিন করলুম্, কিছুই তো হলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ক্রমে হবে। কালী আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী। কালী আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্ম বলে কই? যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, তখন

* কালী—God in his relations to the conditioned.

† ব্রহ্ম—The unconditiond, the Absolute.

শক্তি বলে কই, কালী বলে কই? যাঁকে তুমি ব্রহ্ম বল্‌চো, তাঁকেই কালী বল্‌ছি।

"ব্রহ্ম আর কালী অভেদ। যেমন অগ্নি আর তাঁর দাহিকাশক্তি। অগ্নি ভাব্‌লেই দাহিকাশক্তি ভাব্‌তে হয়, দাহিকাশক্তি ভাবলেই অগ্নি ভাবতে হয়। কালী মান্‌লেই ব্রহ্ম মান্‌তে হয়, আবার ব্রহ্ম মান্‌লেই কালী মান্‌তে হয়।

"ব্রহ্ম ও শক্তি (কালী) অভেদ। ঐ শক্তি ঐ কালী আমি বলি।"

এদিকে রাত হয়ে গেছে। গিরীশের থিয়েটর যেতে হবে। তাই হরিপদকে বলিলেন, 'ভাই একখান গাড়ী যদি ডেকে দিস—থিয়েটর্ যেতে হবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। দেখিস্ যেন আনিস্। (সকলের হাস্য) হরিপদ (হাসিতে হাসিতে)। আমি আনতে যাচ্চি—আর আন্‌বো না?

(ঈশ্বর লাভ ও কর্ম্ম; 'রাম ও কাম')

গিরীশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আপনাকে ছেড়ে আবার থিয়েটর এখন যেতে হবে—

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, ইদিক্ উদিক্ দুদিক রাখতে হবে; "জনক রাজা ইদিক্ উদিক্ দুদিক্ রেখে খেয়েছিল দুধের বাটী।"

[সকলের হাস্য।]

গিরীশ। থিয়েটর্ গুলো ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই মনে কর্‌ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, না, ও বেশ আছে, অনেকের উপকার হচ্চে।

নরেন্দ্র। এইতো ঈশ্বর বল্‌ছে, অবতার বল্‌ছে। আবার থিয়েটরে টানে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[সমাধি মন্দির]

ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে কাছে বসাইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার সন্নিকটে আরো সরিয়া গিয়া বসিলেন। নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই—তায় কি এসে যায়? ঠাকুরের ভালবাসা যেন আরো উথলিয়া পড়িল। গায়ে হাত দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের প্রতি)। "মান্ কর্‌লি তো কর্‌লি, আমরা ও তোর মানে আছি (রাই)।"

(বিচার ও ঈশ্বর লাভ)

(নরেন্দ্রের প্রতি)। "যতক্ষণ বিচার, ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই। তোমরা বিচার কর্‌ছিলে; আমার ভাল লাগে নাই।

"নিমন্ত্রণ বাড়ীর শব্দ কতক্ষণ শুনা যায়, যতক্ষণ লোকে খেতে না বসে। যাই লুচি তরকারী পড়ে, অমনি বার আনা শব্দ কমে যায় (সকলের হাস্য)। আরো কম্‌তে থাকে। দই পাতে পড়্‌লে কেবল সুপ্ সাপ্। ক্রমে ক্রমে খাওয়া হয়ে গেলেই নিদ্রা।

"ঈশ্বরকে যতটুকু লাভ হবে, ততই বিচার কম্‌বে। তাঁকে লাভ হলে, আর শব্দ—বিচার থাকে না। তখন নিদ্রা—সমাধি।

এই বলিয়া নরেন্দ্রের গায়ে হাত বুলাইয়া, মুখে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, 'হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ।"

কেন এরূপ করিতেছিলেন? ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি নরেন্দ্রের মধ্যে সাক্ষাৎ নারায়ণ দর্শন করিতেছিলেন? এরই নাম কি মানুষে ঈশ্বর দর্শন?

কি আশ্চর্য্য! দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের সংজ্ঞা যাইতেছে। ঐ দেখ, বহির্জগতের হুঁস চলিয়া যাইতেছে। এরি নাম বুঝি অর্দ্ধবাহ্যদশা—যাহা শ্রীগৌরাঙ্গের হইত? এখনো নরেন্দ্রের পায়ের উপর হাত—যেন ছল করিয়া নারায়ণের পা টিপিতেছেন—আবার গায়ে হাত বুলাইতেছেন। এতো গা টেপা, পা টেপা কেন? একি নারায়ণের সেবা কর্‌ছেন, না শক্তি সঞ্চার কর্‌ছেন?

দেখিতে দেখিতে আরো ভাবান্তর হইল। এই আবার নরেন্দ্রের কাছে হাত জোড় করে কি বল্‌ছেন;

বল্‌ছেন—"একটা গান (গা)—তাহলে ভাল হব—উঠ্‌তে পারবো কেমন করে—গোরা প্রেমে গর্গর মাতোয়ারা (নিতাই আমার)—

কিয়ৎক্ষণ আবার অবাক্; চিত্রপুত্তলিকার মত চুপ করে রহিলেন। আবার ভাবে মাতোয়ারা হয়ে বল্‌ছেন।—

"দেখিস্ রাই যমুনায় যে পড়ে যাবি—কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদিনী।"

আবার ভাবে বিভোর। বলিলেন,

"সখি সে বন কত দূর!
(যে বনে আমার শ্যাম সুন্দর)
(ঐ যে কৃষ্ণ গন্ধ পাওয়া যায়)
(আমি চলিতে যে নারি)"

এখন জগৎ ভুল হয়েছে—কাহাকেও মনে নাই—নরেন্দ্র সম্মুখে, কিন্তু নরেন্দ্রকে আর মনে নাই—কোথায় বসে আছেন, কিছুই হুঁস্ নাই। এখন মন প্রাণ ঈশ্বরে গত হয়েছে। 'মদ্গত অন্তরাত্মা'।

'গোরা প্রেমে গর্গর মাতোয়ারা'—এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া দণ্ডায়মান। আবার বসিলেন; বসিয়া বলিতেছেন—

"ঐ একটা আলো আসচে—দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু কোন্ দিক্ দিয়ে আলোটা আস্‌চে এখনো বুঝতে পারছি না।"

এইবার নরেন্দ্র গান গাইলেন—

সব দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে।
মোহিলে প্রাণ॥
সপ্ত লোক ভুলে শোক, তোমারে পাইয়ে।
কোথায় আমি অতি দীন হীন॥

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের আবার বহির্জগৎ ভুল হইয়া আসিতে লাগিল। আবার নিমীলিত নেত্র। স্পন্দহীন দেহ। সমাধিস্থ।

সমাধিভঙ্গের পর বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে নিয়ে যাবে?" বালক যেমন সঙ্গী না দেখ্‌লে অন্ধকার দেখে, সেইরূপ।

অনেক রাত হইয়াছে। ফাল্গুন কৃষ্ণা-দশমী—অন্ধকার, রাত্রি। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে সেই কালী বাড়ীতে যাইবেন—গাড়ীতে উঠিলেন। ভক্তেরা গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া। তিনি উঠিতেছেন—অনেক সন্তর্পণে তাঁকে উঠান হইল। এখনো 'গর্গর মাতোয়ারা।'

গাড়ী চলিয়া গেল। ভক্তেরা—যে যার আলয়াভিমুখে যাইতেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[ভক্ত হৃদয়ে]

মস্তকের উপরে তারাকামণ্ডিত নৈশ-গগন—হৃদয়পটে অদ্ভুত রামকৃষ্ণছবি—স্মৃতি মধ্যে ভক্তের মজ্‌লিস্—সুখ-স্বপ্নের ন্যায় নয়নপথে সেই প্রেমের হাট—কলিকাতার রাজপথে গৃহাভিমুখে ভক্তেরা যাইতেছেন। কেহ সরস বসন্তানিল সেবন করিতে

করিতে সেই গানটী আবার গাইতে গাইতে যাচ্চেন,

"সব দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে।
মোহিলে প্রাণ ॥"

কেউ ভাবতে ভাবতে যাচ্চেন, সত্য সত্যই কি ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ করে আসেন? তবে অবতার কি সত্য? অনন্ত ঈশ্বর চৌদ্দ পোয়া মানুষ কেমন করে হবেন? অনন্ত কি সান্ত হয়? বিচার তো অনেক হ'ল। কি বুঝলাম? বিচারের দ্বারা কিছুই বুঝলাম না। ঠাকুর রামকৃষ্ণতো বেশ বল্লেন 'যতক্ষণ বিচার—ততক্ষণ বস্তুলাভ হয় নাই, ততক্ষণ ঈশ্বরকে পাওয়া যায় নাই।' তা ও বটে! এই তো এক ছটাক বুদ্ধি, এর দ্বারা আর কি বুঝবো! ঈশ্বরের কথা? এক সের বাটীতে কি চার সের দুধ ধরে? তবে অবতারে বিশ্বাস কিরূপে হয়? ঠাকুর বল্লেন, ঈশ্বর যদি দেখিয়ে দেন দপ্ করে, তাহলে এক দণ্ডেই বুঝা যায়। Goethe মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন, "Light! More Light!" তিনি যদি দপ্ করে আলো জ্বেলে দেখিয়ে দেন! তবে—

ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ

যেমন Palestineএ মূর্খ ধীবরেরা Jesus কে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন, অথবা যেমন শ্রীবাসাদি ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন।

"যদি দপ্ করে তিনি না দেখান্, তাহলে উপায় কি? কেন? যে কালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলছেন ও কথা, সে কালে অবতারে বিশ্বাস করবো। তিনিই শিখিয়েছেন,—বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস।—গুরুবাক্যে বিশ্বাস!

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথ হারা।"

"আমার তাঁর বাক্যে ঈশ্বরকৃপায় বিশ্বাস হয়েছে—আমি বিশ্বাস করবো। অন্যে যা করে করুক—আমি এই দেবদুর্ল্লভ বিশ্বাস কেন ছাড়বো? বিচার থাক্। জ্ঞান চচ্চড়ি ক'রে কি আর একটী Faust হব? আবার কি, গভীর রজনী মধ্যে বাতায়নপথে চন্দ্রকিরণ আসিবে, আর আমি একাকী ঘরের মধ্যে "হায় কিছু জানিতে পারিলাম না, Science Philosophy বৃথা অধ্যয়ন করিলাম, এ জীবনে ধিক্" এই বলিয়া বিষের শিশি লইয়া আত্মহত্যা করিতে বসিব? না Alastor এর মত অজ্ঞানের বোঝা বইতে না পেরে শিলাখণ্ডের উপর মাথা রেখে মৃত্যুর অপেক্ষা করিব? না, আমার এ সব ভয়ানক পণ্ডিতদের মত এক ছটাক্ জ্ঞানের দ্বারা এ রহস্য ভেদ করতে যাবার প্রয়োজন নাই। আর এক সের বাটীতে চার সের দুধ ধরলো না বলে মরিতে যাবারও দরকার নাই। বেশ কথা,—গুরুবাক্যে বিশ্বাস! হে ভগবন্, আমায় ঐ বিশ্বাস দাও, আর মিছামিছি ঘুরাইও না। যা হবার নয়, তা খুঁজতে যাইও না। আর ঠাকুর যা শিখিয়েছেন, 'যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়—অমলা অহেতুকী—ভক্তি; আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। কৃপা করে এই আশীর্ব্বাদ কর।'

"আবার, কোন ভক্ত ঠাকুর-রামকৃষ্ণের অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে সেই তমসাচ্ছন্ন রাত্রিমধ্যে রাজপথ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন, "কি ভালবাসা! গিরীশ থিয়েটরে চলে যাবেন, তবু তাঁর বাড়ীতে যেতে হবে। শুধু তা নয়। এমনও বলছেন না যে, 'সব ত্যাগ কর—আমার জন্য গৃহ, পরিজন,

বিষয়কর্ম্ম সব ত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন কর।' বুঝেছি—এর মানে এই যে, সময় না হলে ছাড়লে কষ্ট হবে; ঠাকুর যেমন নিজে বলেন, ঘায়ের মামড়ী—ঘা শুকুতে না শুকুতে ছিঁড়লে, রক্ত প'ড়ে—কষ্ট হয়; কিন্তু ঘা শুকিয়ে গেলে মামড়ী আপনি খসে পড়ে যায়। সামান্য লোকে, যাদের অন্তর্দ্দৃষ্টি নাই—তারা বলে, এক্ষুণি সংসার ত্যাগ কর। ইনি সদ্‌গুরু, অহেতুক কৃপাসিন্ধু, প্রেমের সমুদ্র, জীবের কিসে মঙ্গল হয়, এই চেষ্টা নিশিদিন করিতেছেন।

আর গিরীশের কি বিশ্বাস! দুদিন দর্শনের পরই বলেছিলেন, প্রভু তুমিই ঈশ্বর—মানুষ দেহ ধারণ করে এসেছ—আমার পরিত্রাণের জন্য। গিরীশ ঠিক তো বলেছেন, ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ না করলে ঘরের লোকের মত কে শিক্ষা দেবে; কে জানিয়ে দেবে যে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু; কে ধরায় পতিত দুর্ব্বল সন্তানকে হাত ধরে তুলবে; কে কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত পাশবস্বভাবপ্রাপ্ত মানুষকে আবার পূর্ব্ববৎ অমৃতের অধিকারী করিবে? আর তিনি মানুষ রূপে সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ালে, যারা তদ্‌গতান্তরাত্মা, যাদের ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে না—তাঁরা কি করে দিন কাটাবেন? তাই "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ সম্ভবামি যুগে যুগে।"

"কি ভালবাসা!—নরেন্দ্রের জন্য পাগল, নারাণের জন্য ক্রন্দন। বলেন, 'এরা ও অন্যান্য ছেলেরা—রাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাবুরাম ইত্যাদি—সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছেন। এ প্রেম তো মানুষ-জ্ঞানে নয়; এ প্রেম দেখ্‌ছি—ঈশ্বর-প্রেম। ছেলেরা—শুদ্ধ-আত্মা, স্ত্রীলোক অন্যভাবে স্পর্শ করে নাই বিষয় কর্ম্ম ক'রে ক'রে এদের লোভ, অহঙ্কার, হিংসা ইত্যাদির স্ফূর্ত্তি হয় নাই—তাই ছেলেদের ভিতর ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ। কিন্তু এ দৃষ্টি কার আছে? ঠাকুরের অন্তর্দ্দৃষ্টি; সমস্ত দেখিতেছেন—কে বিষয়াসক্ত—কে সরল, উদার, ঈশ্বর-ভক্ত। তাই এরূপ ভক্ত দেখলেই সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে সেবা করেন। তাদের নাওয়ান্, খাওয়ান্, শোয়ান্, তাদের দেখিবার জন্য কাঁদেন; কলিকাতায় ছুটিয়া ছুটিয়া যান্; লোকের খোসামোদ করে বেড়ান্—কলিকাতা থেকে তাদের গাড়ী ক'রে আন্‌তে; গৃহস্থ ভক্তদের সর্ব্বদা বলেন—ওদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াইও, তাহলে তোমাদের ভাল হবে। একি মায়িক স্নেহ? না, বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রেম?—মাটীর প্রতিমাতে এ'তো * ষোড়শোপচারে ঈশ্বরের পূজা ও সেবা হয়, আর—শুদ্ধনরদেহে হয় না?

"নরেন্দ্রকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাহ্যজগৎ ভুলে গেলেন; ক্রমে দেহী নরেন্দ্রকে ভুলে গেলেন; apparent manকে (বাহ্যিক মনুষ্যকে) ভুলে গেলেন—Real manকে (প্রকৃত মনুষ্যকে) দর্শন করিতে লাগলেন; অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মন লীন হইল—যাঁকে দর্শন ক'রে কখন অবাক্ স্পন্দহীন হয়ে চুপ করে থাক্‌তেন—কখন বা ওঁ ওঁ বলতেন; কখন বা মা মা করে বালকের মত ডাক্‌তেন। নরেন্দ্রের ভিতর—তাঁকে বেশী প্রকাশ দেখতেন, নরেন্দ্র নরেন্দ্র করে পাগল!

'নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই,—তার আর, কি হয়েছে? ঠাকুরের দিব্যচক্ষু;

* যেখানে এ'র মাথায় হসন্তর মত চিহ্ন থাকিবে (এ), সেখানে এ'র উচ্চারণ করিবেন, যেমন এক—য়্যাক—এক।

তিনি দেখিলেন যে, এ অভিমান হতে পারে। তিনি যে—বড় আপনার লোক, তিনি যে—আপনার মা, পাতানো মা ত নন্; তিনি কেন বুঝিয়ে দেন না, তিনি কেন দপ্ করে আলো জ্বেলে দেখিয়ে দেন না?—তাই বুঝি ঠাকুর বল্লেন,—

"মান করলি ত করলি, আমরা ও তোর মানে আছি।"

"আত্মীয় হতে যিনি পরমাত্মীয়; তাঁর উপর অভিমান করেন না ত কার উপর অভিমান করবেন? ধন্য নরেন্দ্রনাথ, তোমার উপর এই পুরুষোত্তমের এত ভালবাসা! তোমাকে দেখে এত সহজে ঈশ্বরের উদ্দীপন!'

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, সেই গভীর রাত্রে, রামকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে ভক্তেরা গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

কোজাগর নিশা।

এস দেবি, বিশ্বরমে, বঙ্গের ভবনে।
শত সৌন্দর্য্যের উৎস উথলিছে আজি
তব শুভ আগমনে, বাজে ঘরে ঘরে
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঝরির রব সুমধুর।
প্রণমে তোমারে দাস, এস দয়াময়ি!
মূঢ়জন বলে তোমা অর্থের কিঙ্করী;
কবির সর্ব্বস্ব তুমি, আনন্দ রূপিনী!
ঊষার তরুণরাগে উন্মীলিত হাসে
নীলাকাশ, সে ত তব চরণ-পরশে!
ফুটে ফুল, দোলে লতা, গোভে বিহঙ্গম,
নগ, নদী, কান্তারের শোভা মনোরম,
রবি, শশী, তারা হাসে সুনীল আকাশে,
তোমারি প্রসাদে দেবি! তুমি শ্রীরূপিনী,
এ বিশ্বের সৌন্দর্য্যের অনন্ত ভাণ্ডার!

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন।

কবি ও বৈদান্তিক।

পিঠা পিঠি ভাই বোন্ করে মারামারি,
দাড়াইয়ে বড় ভগ্নী অদূরে তাহারি;
সে কহিছে—"রে অবোধ শিশু দুটী শোন্,
এক মায় পেটে তোরা হ'লি ভাই বোন্।
তবে কেন অহঃক্ষণ ছুতা নাতা তরে
মারামারি কাটাকাটি এত পরস্পরে?
সহোদর ভাই বোন্ কি সম্পর্ক, মরি!
এমন কি হয় আর ত্রিভুবন ভরি।"
মা ছিল নিকটে ব'সে, সকলি শুনিল,
বড় মেয়েটীরে তার সম্বোধি কহিল,—
"তুইও ছেলে মানুষ, কি বুঝিস্ বল্,
কি জানিস্ সংসারের, এখনো সরল।
পিঠা পিঠি ভাই বোনে এ রীতি সতত;
তোর দাদা-সাথে তুই করেছিস্ কত।
যখন এরাও বড় হইবে সময়ে,
বুঝিবেক কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উভয়ে।
তোরা কি এখন আর দুটী বোন্, ভাই
ঝগড়া করিস্ নিয়ে মোর এক মাই?
জামাই বাচিয়া র'ন্, আশীর্ব্বাদ করি,
কোলে, কাখে ছেলে তোর দেখে যেন মরি।
তখন বুঝিবি কিবা ছেলের স্বভাব,
এই ঢুলাঢুলি—এই গলাগলি ভাব।"
"দেখ্, ভাল হবে না," বলিয়া লাজ পেয়ে
ঠোক্না মারিয়া মায় ঘরে গেল মেয়ে।
বৈদান্তিক পিতা ছিল বসি বারান্দায়,
চস্মা চোখে পুথী নিয়ে পাতা উল্টায়।
সে কহে গম্ভীর ভাবে উদ্দেশি জায়ারে,

অহো! কি আবদ্ধ সবে মায়ার আগারে।
সবাই তোমরা ভুল করেছ বিষম,
মায়ে ঝিয়ে ভ্রান্তি নিয়ে কে কাহার কম॥
রজ্জু দেখি সর্প বলি ভ্রম সবাকার,
দুই চন্দ্র—দ্বাদশ আদিত্য যে প্রকার।
দেখিয়া উড্ডীন ধূলি 'বায়ু দেখি' বল,
মেঘ হেরি ভাব "দেখি আকাশ মণ্ডল।"
সূক্ষ্ম দৃষ্টি করি যদি দেখ এ সংসার,
দেখিবে এ কিছু নহে—দৃষ্টির বিকার।
তুমি আমি ছেলে মেয়ে দেখিছ যে সব,
কাহারো অস্তিত্ব নাই—মায়ার বিভব।
তবে কেন আত্মপর ভেদাভেদ জ্ঞান?
যাহা নাই, তাহে কেন উপাধি প্রদান?
কাহারো সম্পর্ক নাই কিছু কারো সহ,
জলের বুদ্বুদ জলে মিশে অহরহঃ।"
বেদান্তী ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এক জন,
সুকবি সে সুরসিক—কাব্যেতে মগন।
গৃহ-অভ্যন্তরে বসি খুলি বাতায়ন,
দেখিল শুনিল সব, কহিল তখন,—
"শোন বৈদান্তিক ভায়া, কি দেখিলে ভুল;
মানিলাম এ সংসার ভ্রান্তির সঙ্কুল,
মানিলাম এ জগতে যা আছে, তা নাই;
মানিলাম সব মিথ্যা ভ্রান্তি সত্য ভাই,
মানিলাম মিছা একে অপরের তরে,
মমতার বন্ধনেতে জ্ব'লে পু'ড়ে মরে;—
কিন্তু ভাই বৈদান্তিক কর অবধান,
এই যে দেখিছ তুমি আত্ম-পর-জ্ঞান,
এই যে দেখিছ তুমি মমতা-বন্ধন,
এও হতে পারে তব ভ্রান্তির সৃজন।
আমি বলি এ সংসারে কেহ কারো লাগি,
মিছে ভ্রান্তি বশে নাহি হয় দুঃখ-ভাগী।
আমি বহি, সুখ দুঃখ, কর্ম্মাকর্ম্ম বোধ
ধর্ম্মাধর্ম্ম, শত্রু মিত্র, বিষাদ প্রমোদ,—
কেহ কিছু নাহি ভাবে, সবে জানে মায়া,
সবে জানে এ জগৎ ছায়া হ'তে ছায়া।
তুমি শুধু মায়া বশে একে দেখ আর,
দুই চোখে দুই চস্‌মা ভায়া হে তোমার;—
এক চোকে বৈদান্তিক—অপরে সংসারী,
একি নয় ভ্রান্তি তব বল না বিচারি!

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাকারেতে নিরাকার।

কোথা গেলে প্রেমময়
তোমারে দেখিতে পাব,
কি সাধনে জীবনের
এ পিপাসা মিটাইব?
ধূলা খেলা দিয়া প্রভু
নয়ন রেখেছ ঢেকে,
মরমের এ পিপাসা
জ্বলে উঠে থেকে থেকে!
পরম পদার্থ তুমি
মানব তোমার ছায়া,
তোমারি প্রেমের খেলা
নর নারী—পতি জায়া।
পৃথিবীর কীট আমি
তোমারে না দেখি চোকে,
কেবল যা কিছু দেখি
মানবের প্রেম-মুখে।
প্রেমিকের প্রেম-দৃষ্টি
তব প্রেম জ্যোতি স্ফুরে,
তোমারি লাবণ্য থাকে
প্রেমমাখা মুখ জুড়ে;
তোমারি মধুর বাণী
প্রেমালাপ সম্ভাষণ,
অমৃত পরশ তব
পূত প্রেম আলিঙ্গন।
বড় ভালবাস তুমি
লুকাইতে আপনারে,

তাই ঢাক প্রেম-আঁখি
লজ্জা আর অশ্রুধারে ;
কিন্তু একবার করি
নয়নে নয়ন দান,
রূপের সাগরে ডুবে
হাবু ডুবু করে প্রাণ !
বুদ্বুদের পাছে আছ
তুমি প্রেম-পারাবার,
বিমোহিত হযে হেরি
সাকারেতে নিরাকার,
অরূপ রূপের ছটা
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় ;

এই কি তোমার রূপ,
বল বল প্রেমময় ?
প্রেমময় তোমা লাগি
আকুল হয়েছে প্রাণ,
হৃদয় যে ভেঙ্গে চূরে
হয়ে গেল খান খান !
আশা আর নিরাশায়
ডুব ডুব করে বুক,
প্রেমময় প্রেমানন্দে
দেখাও হে প্রেমমুখ।

প্রেমানন্দ।

সত্য এবং সাহিত্য।

মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা সুখের স্বপ্ন—"আমি বড়", সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিন্তা—"আমি ভাল।" "আমি বড়" এবং "আমি ভাল" এই রব চতুর্দ্দিকে। কেবল আজই যে এই রব পৃথিবীতে শোনা যাইতেছে, তাহা নয় ; চিরকাল এই রব সর্ব্বত্র নিনাদিত হইতেছে। খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, রুসো, ভল্টেয়ার, ম্যাটসিনি এই রবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তবুও, আজও, চতুর্দ্দিকে কেবল এই রবই শুনিতেছি। আমি কুলে বড়, আমি ঐশ্বর্য্যে বড়, আমি পদে বড়—তোমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম কর, আমার পদলেহন কর, আমার ঐশ্বর্য্যে এবং পদে পুষ্পবর্ষণ কর। আমি ব্রাহ্মণ, আমার বিরুদ্ধে তুমি কথা বলিতে সাহস করিতেছ ? তুমি সদ্গোপজাত ডাক্তার, তোমার এতবড় আস্পর্দ্ধা, তোমাকে হেয়, অবজ্ঞেয়, লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হইতেই হইবে ! আমি ঐশ্বর্য্যের,—মণিরত্ন-মালা-বিভূষিত তৃপ্তি-নিকেতনের একমাত্র রাজাধিরাজ, তুমি দীন দুঃখী সম্পাদক, তোমার এত সাহস যে, আমার বিরুদ্ধে কথা বল, তোমার ভিটা মাটী উচ্ছিন্ন করিয়া আমি কর্ম্মনাশার জলে তোমাকে বিসর্জ্জন দিয়া তবে ছাড়িব। আর আমি মহামান্যা মহারাণী ভারতেশ্বরীর অন্যতম মন্ত্রী, তুমি সামান্য হইতেও অতি সামান্য টুথ পত্রের সম্পাদক, তোমার এত সাহস যে আমার বিরুদ্ধে লেখ, এবার লাঞ্ছনার মুকুট পরাইয়া কলঙ্কের বাজারে তোমাকে বিক্রয় করিব। আজ কাল চতুর্দ্দিকে কেবল এইরূপ দম্ভ, অহঙ্কার এবং তীব্র তেজের কথা শুনিতেছি। ইংলণ্ডে উদার নৈতিক সম্প্রদায় নিষ্প্রভ হইতেছেন, আভিজাত্যভাব প্রধান সম্প্রদায় দিন দিন মস্তকোত্তোলন করিতেছেন ; আমেরিকা—চির সাম্য এবং স্বাধীনতার পক্ষপাতী আমেরিকা ফিলিপাইন দ্বীপের গৌরবে আজ মাতোয়ারা, আজ প্রধানের প্রধান হওযার জন্য লালায়িত হইতেছেন, আর জর্ম্মনি এবং রুষিয়া তেজ এবং গর্ব্বের রত্নমুকুট মস্তকে তুলিয়া কি আস্ফালন করিতেছেন, কি তাণ্ডব নৃত্যে মাতিতেছেন, সকলেই জানেন। মনুষ্যের অহঙ্কারকে বিনাশ করিতে যে সত্যসেবী সাহিত্য বিদ্যমান, সে সাহিত্য আজ নিস্তেজ কেন ? তুমি বল, দিন দিন পৃথিবীতে সাম্য এবং স্বাধীনতার রাজত্ব আসিতেছে ; আমি দেখিতেছি, সাম্য এবং স্বাধীনতা দিন দিন সুদূরপরাহত হইতেছে। দরিদ্রের সন্তান আজ টাকায় ক্রীত হইয়া উচ্চ রাজ সিংহাসন পাইয়াছেন, তিনিও, পূর্ব্বের কথা ভুলিয়া আজ দরিদ্র-পীড়নে বদ্ধপরিকর। চেম্বরলেন লর্ডের সন্তান না হইয়াও, আজ উচ্চ পদে বসিয়া তাঁহার এক সময়ের দলের লোককেই পীড়ন করিতে বদ্ধপরিকর। বঙ্গদেশের বড় বড় জমীদার, বড় বড় রাজ পরিবারের ইতিহাস সংগ্রহ কর—অনেক স্থলেই দেখিতে পাইবে, পোষ্যপুত্রের রাজত্ব।

দরিদ্র ভিন্ন কে আপন পুত্রকে বিক্রয় করে? দরিদ্রের সন্তানগণ আজ রাজা হইয়া কিরূপে দরিদ্র নিষ্পেষণে বদ্ধপরিকর হইতেছেন, একবার চিন্তা কর। কত দরিদ্রের কন্যা আজ দৈববলে রত্ন সিংহাসনে বসিয়া কিরূপ দরিদ্র-নিষ্পেষণ-মন্ত্রণায় যোগ দিতেছেন, চিন্তা কর এবং চিন্তা কর—পদগৌরবে মত্ত কত শত শত লোক কত প্রকারে দরিদ্র, অসহায়, নির্ধন এবং বিপন্নের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। ক্ষমতা পাইয়া তাহার অপব্যবহার করে না, লক্ষের মধ্যে একজন; আর অধিকার পাইয়া, তাহার মমতা পরিত্যাগ করে, সহস্রের মধ্যে একজন। রাজার অত্যাচার, জমীদারের অত্যাচার, মহাজনের অত্যাচার, পুলিসের অত্যাচার, হাকিমের অত্যাচার, ব্রাহ্মণের অত্যাচার,—অত্যাচারে অত্যাচারে এদেশ যায় যায় হইয়াছে। বীরত্ব, সাহস, সততা, ধর্ম্মচিন্তা, এই নিষ্পেষণের যুগে দরিদ্রের হৃদয়ে স্থান পাইবে, কথনও আশা করিতে পার না। যে সাহিত্য নীলকরের অত্যাচার হইতে দেশকে রক্ষা করিয়াছিল, সে সাহিত্য আজ কোথায়? যে সাহিত্য আমেরিকার দাস প্রথার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল, সে সাহিত্য আজ কোথায়? জীবন সংগ্রাম, বড় বিষম সংগ্রাম। এ দেশের নিম্নশ্রেণীর আর উদ্ধারের পথ নাই। মহাত্মা বিদ্যাসাগর বহুদর্শিতার বলে সাহসের সহিত বলিয়াছিলেন, "এদেশের নিম্নশ্রেণীর গতি ফিরিবে না। তাহাদিগকে আমরা পশুর ন্যায় মনে করি। মানুষের দ্বারা মানুষের উপকার হওয়া সম্ভব, পশুর উপকার হইবে কিরূপে?" এ সকল অতি সত্য কথা। এদেশে নীলকরের অত্যাচার দমন হইয়াছে বটে, কিন্তু এদেশে জমীদারের অত্যাচার, পুলিস ও হাকিমের অত্যাচার, ধনী ও মহাজনের অত্যাচার কমিয়াছে কি? একজন সাধুলোক এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, এদেশে দরিদ্রের ঘরে টাকা ও সুন্দরী স্ত্রী নিরাপদ নয়। সুন্দরী স্ত্রী হরণের দুই চারিটি কাহিনী আজ কাল সংবাদ পত্রে বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু শত শত কাহিনী অলিখিত এবং অঘোষিত রহিয়া যাইতেছে। দরিদ্র ব্যক্তি দরিদ্রের স্ত্রী বা কন্যা অপহরণ করিলে সে ঘটনা বিবৃত হইতে পারে, কিন্তু ধনী ব্যক্তি যদি পরস্ত্রী হরণ করে, সে কাহিনী লিখিতে পারে, এমন সম্পাদক এদেশে বিরল। দশ বা শত খানি পত্র পাইয়া ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে দেশের সম্পাদক লিখিতে পারেন, "হাজার হাজার পত্র পাইয়াছেন," টাকার লোভে নানা কলুষিত বিজ্ঞাপন পত্রিকাস্থ করিয়া যাঁহারা দেশকে ডুবাইবার পথ পরিষ্কার করিতে একটুও কুণ্ঠিত হন না, তাঁহারা ধনীর দোষ কীর্ত্তন করিবেন, কথনও আশা নাই। এখনকার কাগজের অধিকাংশ সম্পাদক ব্যবসাদারীতে ডুবিয়াছে—চিন্তা কেবল টাকা, টাকা, টাকা; লোকের হিত, দেশ রক্ষা, এ সকল কথা ভাবিবার সময় এ নহে! বিলাসিতার স্রোতে মজাইবার জন্য কত প্রকার তৈলের আবিষ্কার হইয়াছে, সে সকলের প্রচারক এ দেশের পত্রিকা সকল। গ্রাহক জুঠাইবার জন্য কত কলুষিত পুস্তক উপহার প্রদত্ত হইতেছে এবং কত জঘন্য গল্পের রচনা হইতেছে! সাপ্তাহিক কাগজেও গল্পের রাজত্ব বিস্তৃত হইতেছে। আর যাঁহারা নীতি ও ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী, পবিত্রতা যাঁহাদের মুখের অনাহত শব্দ, তাঁহারাও যে সে কাজে টাকার খাতিরে লিখিতেছেন, এবং জাতীয় সাহিত্য গেল গেল বলিয়া চিৎকার করিতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"জাতীয় সাহিত্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে।" বাস্তবিকই ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত। সাহিত্যের জন্য সাহিত্যের আদর নাই। বাহ্লাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া সত্যের খাতিরে লেখনী চালনা করে অতি অল্প লোক। সত্য কথা লিখিবার, বলিবার রুচি নাই, ভাষা নাই, ভাষার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নাই। স্বার্থ এবং অর্থের গোলামগিরি করিয়া কথনও সাহিত্যসেবা চলে না। সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য, সাহিত্য কেহ লেখে না। সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির খাতিরে কেহ তাহা কেনেও না। লেখক লেখেন—কেবল টাকার জন্য; গ্রাহক তাহা গ্রহণ করেন, কেবল লাভের জন্য। উপহার এবং ছবির প্রলোভন বড় শক্ত প্রলোভন। সাহিত্যে এইরূপ অরাজকতার দিনে অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদের আশা করা

ঘোরতর মূর্খতা। শুনিতেছি, ইহার উপর আবার বড় বড় ঘরের পার্ব্বণীর বন্দোবস্ত আছে। ইহার উপর আবার লাইবেলের ভ্রুকুটী আছে। সুতরাং অত্যাচার কাহিনী এদেশে অবিবৃত,অলিখিত থাকিবেই থাকিবে। আর সত্য ঘোষিত না হইলে নিম্নশ্রেণীই বা কেমনে রক্ষা পাইবে?—এবং সাহিত্যেরই বা কিরূপে শ্রীবৃদ্ধি হইবে?

সম্প্রতি কাগজে পড়িতেছিলাম, বুয়র যুদ্ধের পূর্ব্বে বিলাতের ল্যাবুসিয়র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ক্রুগার প্রভৃতির প্রতিনিধির সহিত যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা লইয়া পার্লিয়ামেণ্টের মহাসভায় চেম্বরলেন বিষম আন্দোলন তুলিয়াছেন। মনে করিয়াছিলাম, ল্যাবুসিয়র ভীত হইবেন; কিন্তু ভয় দূরে থাকুক, তিনি যেরূপ সাহসিকতার সহিত উত্তর দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অবাক্ হইতে হয়। তিনি প্রথমে ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে—"চেম্বরলেন মনে করেন যে, প্রত্যেক এম-পিই তাঁহার পত্রের কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য।"* তিনি উত্তর দিবার সময়ে যে সব শক্ত কথা চেম্বরলেনকে শুনাইয়া দিয়াছেন, তাহা কেবল এই মহাত্মারই যোগ্য।—যথা—

"For what I may have written or said to Mr. Montague White I am responsible to the house of commons, of which I am a member; to my constituents, who have done me the honour to send me there, and to the law. To you I owe no sort of explanation."

এইরূপে আরম্ভ করিয়া যে সকল তীব্র ভর্ৎসনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, এরূপ একজন সাহসী লোক যদি এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিত, এদেশের কত শ্রীবৃদ্ধি হইত। শান্তিস্থাপন উদ্দেশে পত্র সকল লিখিত হইয়াছিল, ইত্যাকার কথা লিখিয়া শেষে এই বীর লিখিতেছেন—

"If it is too much to hope that you will act on this suggestion, I would venture to urge that at least you should publish the correspondence between yourself & Mr. Hawksley in regard to your alleged knowledge of the contemplated Rhodes-Jameson conspiracy of 1894."

এরূপ ভাবে সত্যের ঘোষণা করিতে এ যুগে কেবল ল্যাবুসিয়রই সক্ষম। কিন্তু এদেশে এরূপ লোক নাই বলিলেই হয়। দুটী কথা এই উপলক্ষে আমাদের মনে জাগিতেছে। প্রথমতঃ চেম্বরলেন যে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পদ-গৌরবের উন্মত্ততা প্রকাশ পাইয়াছে; এবং ল্যাবুসিয়রের প্রত্যুত্তরে আভিজাত্য এবং পদগৌরবের মস্তকে পদাঘাত করা হইয়াছে। আমরা সাহিত্যের জন্য সাহিত্যের কথা বলিতেছিলাম। যে সাহিত্য সত্য, স্বাধীনতা ও সাহসিকতার পবিত্র বাতাসে সৃজিত হয়। এদেশে জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় না কেন? তাহার উত্তর এই,সত্য, স্বাধীনতা ও সাহসিকতার অভাব। সত্য কথা লিখিতে যাহারা ভীত, কুণ্ঠিত, লজ্জিত, তাহাদের দ্বারা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে না। ভল্টেয়ার, রুসো, থিওডোর পার্কার বা ম্যাটসিনির লেখা পাঠ কর, দেখিবে, স্বাধীনতার কি তেজোময় স্ফুলিঙ্গ তাঁহাদের লেখা হইতে নির্গত হইতেছে। লিখিবার সময়, তাঁহারা ভাবেন নাই, কেহ তাঁহাদের লেখা পাঠ করিবে কি-না; ভাবেন নাই, অর্থ সমাগম হইবে কি না,—ভাবেন নাই, কে কি বলিবে, বা কে কি করিবে? নির্ব্বাসন বা কারাদণ্ড, উপেক্ষা বা উপহাস, ঘৃণা বা নিন্দা, অত্যাচার বা নিষ্পেষণের ভয় থাকিলে তাঁহারা ঐরূপ পবিত্র সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে পারিতেন না। সহায় যায়, সম্পদ যায়, মান যায়, সম্ভ্রম যায়—জীবন যায় বা প্রাণ যায়—এ কিছুরই গণনা তাঁহাদের মনে স্থান পাইত না; যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, তাহা লিখিবেনই লিখিবেন। টেক্সটবুক-কমিটির মুখ চাহিয়া, বা দশজনের প্রশংসার আশা রাখিয়া, বা বিশ জন গ্রাহক চটিবেন, এইরূপ ভয়ে যাঁহারা লেখনী চালনা করেন,তাঁহাদের

* "Mr. Chamberlain really seems to have reached such a point of self-complacency that he considers that anything in the shape of disapproval of any folish policy, he may deem it to be to his personal interest to adopt, is high treason; and if this delusion increases we shall have him like the Roman Emperors, insisting upon being treated as a divinity.

"It is essentially a Chamberlain notion that the Colonial Secretary has a right to call upon M. P. 's to explain to him anything that they may have written." *Truth.*

দ্বারা কখনও পবিত্র সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না। যেখানে সত্যের অবমাননা, সেখানে সাহিত্য নিস্তেজ, স্ফূর্ত্তিহীন; যেখানে ভীরুতা, সেখানে সাহিত্য মৃতবৎ; যেখানে কাপুরুষতা, সেখানে সাহিত্য মলিন ও নিষ্প্রভ। যে নিজে মৃত, সে অন্যকে জাগাইবে কিরূপে? যে নিজে রুগ্ন, সে অন্যকে বাঁচাইবে কিরূপে? মিথ্যা, ভীরুতা এবং কাপুরুষতার সম্মিলনে এদেশের সাহিত্য মলিন এবং নিষ্প্রভ, নিস্তেজ এবং মৃতবৎ। এ দেশকে জাগাইবে কে? তুমি বল, জাগিবে, জাগিবে, জাগিবে; আন্দোলনে জাগিবে। জাতীয় ভাবার উদ্দীপনা ভিন্ন কখনও কোন দেশ জাগিয়াছে কি? যে কোন শক্তিশালী দেশে যাও, দেখিবে, সে খানেই সাধারণকে মাতাইবার জন্য উদ্দীপনাময় জাতীয় সঙ্গীত রচিত হইয়াছে। সে সঙ্গীত শ্রবণে আপামর সাধারণের শোণিত উষ্ণ হয়, মানুষ কারাবাস বা নির্ব্বাসন যন্ত্রণা এবং মৃত্যু ভয় পরিত্যাগ করে। ম্যাটসিনির লেখা পাঠ করিবার মানসে, সে দিনও, কত শত শত লোক জীবন পাত করিয়াছিল, সে কথা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। আর আজ যে উদ্দীপনা মন্ত্রে ট্রান্সভাল মাতোয়ারা, সে উদ্দীপনাও জাতীয় সাহিত্য হইতে। সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির দিনে ভারত জাগিয়াছিল, ইতালি, গ্রীস জাগিয়াছিল, সে দিন ফ্রান্স জাগিয়াছিল, এবং আজ ইংলণ্ড জাগিয়াছে। পাশব বলে যদি দেশ জাগিত, তবে জর্ম্মণি ও রুষিয়া, আজ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইত। না—তাহা অসম্ভব। পৃথিবীর সকল অত্যাচার নিবারণের জন্য জাতীয় ভাষা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। মানুষকে পশুত্ব হইতে দেবত্বে উন্নীত করিতে, সাহিত্য ভিন্ন আর উপায় নাই। লেখনীর ক্ষমতা শত সহস্র ম্যাক্সিমকে পরাস্ত করে, তাহা চিরকাল দুর্জ্জয় ক্ষমতা এজগতে বিস্তার করিয়াছে। ধর্ম্মোত্থানের ইতিহাস পাঠ কর—সেখানেও এই কথারই পরিচয় পাইবে। মানুষকে জাগাইতে হইলে—চাই জাতীয় ভাষা; চাই—জাতীয় সাহিত্য। জাতীয় সাহিত্যকে তুচ্ছ করিয়া, দূরে ফেলিয়া, অবহেলা এবং ঘৃণা করিয়া এদেশ যদি জাগিতে পারে, তবে চিরকালের পোষিত এই মহাসত্য—সাহিত্য ভিন্ন দেশের উত্থান অসম্ভব, অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। সেই দিন, সাহিত্যের রাজ্য এই ধরা হইতে তিরোহিত হইবে এবং সেই স্থলে পাশব বলের গৌরব ঘোষিত হইবে। কিন্তু যাহা কখনও হয় নাই, তাহা কি কখনও হইবে? এইরূপ সত্যমূলক পবিত্র সাহিত্য সৃজনের পক্ষে সকলের বিশেষ চেষ্টার আবশ্যক। ব্যবসাদারী, লাভলোকসান গণনা, ভয় সঙ্কোচ লজ্জা যে সাহিত্যে, সে সাহিত্যকে বর্জ্জন করিয়া খাটী সাহিত্য সৃজনের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, বড় ছোট সকলকে এক সাম্যের আসনে বসিতে হইবে। ম্যাটসিনির ন্যায় বলিতে হইবে—"We cannot logically declare the children of God to be equal before God and unequal before man."

ঈশ্বরের নিকট সকলে এক, মানুষের নিকটেও এক। কোন না কোন বিষয়ে প্রতি জনই বড়; বড়ত্বের আবার বড়াই কিসের? বিধাতার সৃষ্ট নরনারী সকলেই কোন না কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। সেই শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠায় বিধাতার প্রতিষ্ঠা—সকল মিলিয়া পূর্ণত্বের সৃষ্টি—মহানের উদ্ভব। কাহাকেও বাদ দিলেই অংশ হইয়া পড়িল। সকলে মিলিয়া সমষ্টিতে পূর্ণ হইয়া, সত্য, স্বাধীনতা এবং সাহসিকতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এবং তাহার উপরে জাতীয় সাহিত্যরূপ মহাদুর্গ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ব্যবসাদারী বুদ্ধি পরিহার করিয়া, লাভ গণনার কুহক ভুলিয়া—সেই দুর্গে নির্ভয়ে কেবল সত্যের সাধনা করিতে হইবে। সত্য—সত্য—কেবল সত্য। সত্য চির সুন্দর, চির উজ্জ্বল, চির মহিমান্বিত। সত্যে ভূষিত, সত্যে উজ্জ্বল এবং সত্যে মহিমান্বিত হইয়া এই হতভাগ্য, পরপদ-লাঞ্ছিত দেশ যদি একবার পবিত্র সাহিত্যের সেবা করিতে পারে, যাহা হওয়ার হইবে, যাহা পাওয়ার, পাওয়া যাইবে। আর যদি, তাহা না হয়, এই নিমগ্ন দেশকে তুলিবার আর উপায় নাই।

রাজার দাসত্বে, ব্রাহ্মণের দাসত্বে, ধনীর দাসত্বে, আভিজাত্যের দাসত্বে এদেশের অনেক শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে, এখন আর সঙ্কোচ বা ভয় করিলে চলিবে না।

তরী অগাধ সলিলে যখন নিমগ্ন হয়, তখন জ্যাত্যাভিমান, পদাভিমান বা ধনাভিমান বজায় রাখিবার জন্য পরস্পরের সাহায্য হইতে বঞ্চিত থাকিলে যে দশা হয়, এই পতিত, এই নিমগ্ন দেশে এখন ঐ সকল অভিমান ধরিয়া বসিয়া থাকিলে তদ্রূপই হইবে। উচ্চ, নীচ, বড়, ছোট সকলে না মিলিলে কখনও দাবাগ্নি নির্ব্বাণ করা যায় না। পতিত এবং নিমগ্ন যাঁহারা, তাঁহাদের আবার অভিমান কিসের ? বিপদ যাঁহাদের ঘরে দ্বারে, তাঁহাদের আবার ভয় কিসের? ম্লেচ্ছের পদানত যে, তাহার আবার ব্রাহ্মণত্ব কিসের? পরাধীন যে, তাহার আবার ধনগৌরব এবং পদ গৌরব কিসের? এক কথায় মৃত যে শ্মশানের চুল্লীতে দাহ হইবার জন্য যে নীয়মান, তাহার পক্ষে এ সকল অভিমানের কথা শোভা পায় না। এখন, এই অবস্থায় সকল ভেদাভেদ ভুলিয়া—সত্য, স্বাধীনতা এবং সাহসিকতার ভিত্তির উপর সাহিত্যের দুর্গ নির্ম্মাণে চেষ্টিত হও,—যাহার যে শক্তি থাকে, ঢালিয়া দেও। লেখক, লেখ ; পাঠক, অর্থ দিয়া সাহায্য কর। যে দিন এইরূপ সাহিত্যের উন্নতি-কল্পে পয়সা এবং রক্ত ব্যয় করাকে, এ দেশের লোক ধর্ম্ম করা হইল, মনে করিবে, সেই দিন উন্নতির সুপ্রভাত আসিবে। আমাদের মনে হয়, আর সকল আন্দোলন নির্ব্বাণ হউক, কঠোর সাধনার বাজ্যে লেখনী আর মসী অসিরূপে বাঁচিয়া থাক্—আর বাঁচিয়া থাক্ সত্য, স্বাধীনতা, এবং দুর্জ্জয় সাহস। লেখনী এবং মসী বর্ষণে সত্য-বিদ্যুতের ঔজ্জ্বল্যে সমস্ত পাপ ও অত্যাচার, পরাধীনতা ও অন্ধকার তিরোহিত হইবে—সুপ্রভাত আসিবে।

সাবিত্রীতত্ত্ব-সমালোচনা।*

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥"

হিন্দুর ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশক কঠোপনিষদে উপরি উদ্ধৃত মহাবাক্যটী দেখিতে পাওয়া যায়। এই মহাবাক্যে যে কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, পরবর্ত্তী ভগবদ্গীতাদি হিন্দুর ধর্ম্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থ-সমূহে সেই বাক্যেরই সম্প্রসারণ বা ব্যাবৃতি করা হইয়াছে। এই একটী মাত্র মহাবাক্যেই ধর্ম্মের মূল সূত্র গ্রথিত হইয়াছে। মানবে দুইটী শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় ;—একটী শারীরিক, অন্যটী মানসিক। এই দুই শক্তি লইয়াই মানব গঠিত। শব্দ স্পর্শরূপরসাদি বিষয় ও বিষয়গ্রাহক ইন্দ্রিয়, এবং তাহাদের চালক মন ও বুদ্ধি। উপনিষদের উপদেশ এই যে, বিষয় ও ইন্দ্রিয় নিকৃষ্টতর ; তদপেক্ষা উচ্চতর বৃত্তি মন এবং বুদ্ধি। বিষয়-সেবা এবং ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন মানুষ যত করিবে, ততই মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি সমধিক উচ্চতর শক্তিগুলি নিষ্প্রভ হইতে থাকিবে ; এবং

* সাবিত্রী তত্ত্ব—শ্রীচন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

বুদ্ধিজ্ঞানাদি উচ্চতর আধ্যাত্মিক শক্তিগুলির যতই অনুশীলন হইতে থাকিবে, ততই বিষয়েন্দ্রিয়াদি নিম্নতর শক্তিগুলি মলিন হইতে থাকিবে। অতএব ইন্দ্রিয়াদির সংযম ও বিষয়-ভোগেচ্ছাব দমন করিয়া যাহাতে মানবের অন্তর্নিহিত মানসিক এবং তদপেক্ষাও উচ্চতব বুদ্ধিবিষয়ক আধ্যাত্মিক শক্তিগুলির অনুশীলন হইতে পাকে, ততই মানবাত্মাব আধ্যাত্মিক যোগ্যতার বৃদ্ধি ও উন্নতি হইতে থাকে। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে ধর্ম্ম সাধনের দ্বার-দেশেই ইন্দ্রিয় নিগ্রহের এবং সংযমানুশীলনের ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। ইন্দ্রিয় সেবা ও বাহ্যিক-বিষয় ভোগ যত করা যায়, ততই মানবের চিত্ত তাহাতেই বেশী আসক্ত হইতে থাকে, তদ্দ্বারা চিত্ত ক্রমশই বিষয়াভিমুখী এবং মলিন ও নিষ্প্রভ হইতে থাকে। সংযম ব্যতীত চিত্ত সংস্কারের দ্বিতীয় পন্থা নাই। ইন্দ্রিয়-সেবা যতই বাড়াইবে, ইন্দ্রিয়ের শক্তিও ততই অসমার্জ্জিত, মলিন ও নিষ্প্রভ হইতে থাকিবে। পেট পুরিয়া, 'গণ্ডেপিণ্ডে' আহার বাড়াইয়া দেও, দেখিবে, তোমার পাকস্থলী লুপ্ত হইয়াছে, অজীর্ণতা উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তি প্রভৃতি উচ্চতর মানসিক ও আধ্যাত্মিক-শক্তিগুলিও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও একথা ঠিক্ খাটে। হিন্দুশাস্ত্রের এই তত্বটী অতীব হৃদয়-গ্রাহী ও প্রামাণ্য। হিন্দু-উপনিষদের সারভূত এই মহোপদেশটী হৃদয়ে লইয়া চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার "সাবিত্রী-তত্ব" লিখিয়াছেন। আমরা তাঁহার সাবিত্রী-তত্ব বিশেষ মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছি এবং অতীব আহ্লাদ সহকারে বলিতেছি যে, তিনি অতি পরিস্ফুটভাবে এই তত্বটী সাবিত্রী চরিত্রে অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এজন্য সমগ্র হিন্দুজাতি চন্দ্রনাথ বাবুর নিকটে ঋণী। চন্দ্রনাথ বাবু মহাজ্ঞানী, উত্তম দার্শনিক এবং স্বজাতি-প্রেমে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ। সাবিত্রীতত্বে তিনি যে ভাবে হিন্দুশাস্ত্রের, হিন্দুকবির অন্তর্দৃষ্টির ও আধ্যাত্মিকতার ও ধর্ম্ম-প্রাণতার সূক্ষ্মতত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সমগ্র বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয়। তিনি যে ভাবে পুরাকালের হিন্দুরমণীর চরিত্র-বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছেন, যে অসীম সাহসের সহিত—উৎসাহের সহিত—জাতীয় ধর্ম্মের সারতত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া স্বীয় অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিতেছেন, তজ্জন্য সমগ্র হিন্দুসমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা তাঁহার "হিন্দুত্ব" ও "শকুন্তলাতত্ব" পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম, তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ও চিন্তাশীল। তাঁহার অন্তদৃষ্টি অতি সূক্ষ্ম ও চরিত্র বিশ্লেষণে তিনি সিদ্ধহস্ত। একরূপ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি অতি অল্পই এদেশে আছেন। কিন্তু এদেশের দুর্ভাগ্য যে, এহেন মনস্বী ব্যক্তিকেও কতিপয় অহম্মুখ, পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি দ্বারা নিগৃহীত হইতে হইতেছে!

সাবিত্রী তত্বে অনেক বিষয়ের সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রায় সমস্ত সমালোচনাতেই চন্দ্রনাথ বাবুর সংযত লেখনী চমৎকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। আমরা এস্থলে কয়েকটী মাত্র সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়া দেখাইব, চন্দ্রনাথবাবু কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার মত লোকের নিকটে আমরা যেরূপ আশা করিয়াছিলাম, সাবিত্রীতত্বে আমরা তাহাই পাইয়াছি। ইহাতেও তাঁহার প্রতিভা দীপ্যমান ভাস্করের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

এ পুস্তকে তিনি কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে সাবিত্রীর জন্ম,বিবাহ, বধূত্ব, পাতিব্রত্য, ঘনার অলৌকিকত্ব প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ের অবতারণা করিয়া সকল গুলি তেই হিন্দুপ্রণালীর শ্রেষ্ঠতা সমর্থিত করিয়াছেন। কিরূপ যুক্তিতে ও কিরূপ সংযত সাহসিকতার সহিত এগুলি প্রমাণিত করিয়াছেন, পাঠক তাহা তাঁহার গ্রন্থেই পড়িয়া দেখিবেন, আমরা এ স্থলে দুই একটী কথার আলোচনা করিব মাত্র।

সাবিত্রীর বিবাহ নামক প্রস্তাবে, চন্দ্রনাথ বাবু দেখাইয়াছেন যে, যৌবনোদ্‌গমের পূর্ব্বেই হিন্দুগ্রন্থে কন্যা-বিবাহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে স্থলে কন্যার যৌবনোন্মেষ দেখা দিত, সেই সেই স্থলেই কন্যার পিতামাতা কন্যার বিবাহ দিবার জন্য কিঞ্চিৎ ব্যস্ত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। ঋগ্বেদের দুইটী ঋক্ উদ্ধৃত করিয়াও তিনি দেখাইয়াছেন যে, কন্যার যৌবন লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই যখন ব্যস্ততা ও ব্যাকুলতা লক্ষিত হইত, তখন অতি প্রাচীনকাল হইতেই যৌবনের পূর্ব্বেই প্রায়শঃ বিবাহ দেওয়াই নিয়ম ছিল। তাঁহার মতে, যৌবনোন্মেষের পরে কন্যার মনে পুরুষসম্ভোগেচ্ছা প্রভৃতি চিত্ত বৈকল্য উপস্থিত হওয়া সম্ভব। পাপ মনে, কেবল অনুষ্ঠানে নহে। এই জন্যই হিন্দুগণ যৌবনোদ্‌গমের পূর্ব্বেই বিবাহ দিতেন। হিন্দুরা শারীরিক শক্তিলাভকে বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন না। যাহাতে কন্যার মন ও চিত্ত মলিন না হয়, যাহাতে কন্যার আধ্যাত্মিক শক্তিগুলি কলুষিত না হয়, হিন্দুর প্রধান দৃষ্টি সেই দিকেই ছিল। বাস্তবিক পক্ষে, প্রকৃতি গঠন করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম কার্য্য। যাহাতে মানসিক-প্রকৃতি বিশুদ্ধ থাকে, যাহাতে প্রকৃতির স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে,—তাহা হইলেই শারীরিক সুস্থতাও অবিকৃত না থাকিয়া পারে না। কেননা, দৈহিক স্বাস্থ্য অন্তঃপ্রকৃতির স্বাস্থ্যের উপরেই নির্ভর করে। অন্তঃ-প্রকৃতিতেই শারীরিক স্বাস্থ্যবলাদির মূলসূত্র নিহিত। অন্তঃ-প্রকৃতি বলীয়ান্ থাকিলে, দৈহিক বলাদিও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সেই সুস্থ, অবিকৃত, বলীয়ান্ অন্তঃপ্রকৃতি হইতে পিতামাতার যে সন্তান জন্মে, সে সন্তানও কাজেই অকলুষিত, সংযত ও বলীয়ান্ হইবেই। চন্দ্রনাথ বাবুর বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ মত।

অলৌলিকত্ব অধ্যায়ে, চন্দ্রনাথ বাবু আর একটী মহৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সেটী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া আমরা প্রস্তাব শেষ করিব। আমরা এ প্রস্তাবের শীর্ষভাগে যে তত্ত্বের কথা বলিয়াছি, চন্দ্রনাথ বাবুর সমগ্র গ্রন্থ সেই তত্ত্বেরই সম্প্রসারণ হইলেও, এই অধ্যায়ে তিনি দেখাইয়াছেন যে, আধ্যাত্মিক শক্তি, জড়-শক্তির পরাক্রমকে পর্য্যুদস্ত, সুসংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে সমর্থ। জড় শক্তি ও চৈতন্য শক্তি উভয় লইয়াই মানুষ। চন্দ্রনাথ বাবু বলেন যে, জড়শক্তি চৈতন্য শক্তিরই রূপান্তর মাত্র, অথবা জড়শক্তি চৈতন্যশক্তি দ্বারাতেই চালিত ;—সুতরাং উভয়ের মধ্যে একটা দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। জড়বিজ্ঞান কেবল মাত্র জড়শক্তির উপরের খোসা লইয়া ব্যস্ত আছে; কেবলমাত্র বাহিক কয়েকটা নিয়মমাত্র আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু জড়ের অন্তর্নিহিত বা পরিচালক চৈতন্য-শক্তির ক্রিয়া অতীব নিগূঢ় ; আধ্যাত্মিক শক্তির বল অতীব ভয়ানক ; তদ্দ্বারা

জড়শক্তিকেও পরিবর্ত্তিত করান যাইতে পারে। জড়ের সাধারণ নিয়মানুসারে যাহা অসম্ভব বলিয়া গণ্য, অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক-শক্তির প্রভাবে তাহা সম্ভব হইতে পারে। এই যুক্তি দ্বারা তিনি দেখাইয়াছেন যে, সাবিত্রীর আধ্যাত্মিক-বলের অনুশীলনা-জনিত প্রাথর্য্য হেতু, জড়শক্তি পরাভূত হইয়াছিল, —সত্যবানের নিয়তি, অকালমৃত্যু ঘটিতে পারে নাই;—নিজেরও অকাল বৈধব্য ঘটিতে পারে নাই। প্রহ্লাদ, আধ্যাত্মিক শক্তির বলেই, অগ্নিজল প্রভৃতি জড়শক্তির পরাক্রম ব্যর্থ করিতে পারিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বাবুর মতে, ইহাই হিন্দু পৌরাণিকের দৃঢ়বিশ্বাস ও হিন্দু-পুরাণেরমূল-পৌরাণিকত্ব। বাস্তবিক, হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এইরূপ। কর্ম্মফল অপরিত্যাজ্য হইলেও, তাহা কর্ম্মান্তর দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে। সে কর্ম্মান্তর, উচ্চতর মানসিক শক্তির অনুশীলনা-জনিত দৃঢ়তা। মানুষের কর্ম্মদ্বারাই স্ব স্ব প্রকৃতি গঠিত হয়, আবার কর্ম্মদ্বারাই সেই গঠিত প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়। ইহা অতীব সত্য কথা। এ কথা মিথ্যা হইলে, হিন্দুশাস্ত্রের মুক্তিবাদও মিথ্যা হয়! যাহার অন্তর্দৃষ্টি যত প্রবল;—সংযম, ধর্ম্মশীলতা, ইন্দ্রিয়সংযম, চিত্তের সংস্কার প্রভৃতি উচ্চতর বৃত্তি গুলি যাহার যত পরিষ্কৃত, উন্নত, সে ততই নিকৃষ্ট-জড় হইতে উন্নত-স্তরে অবস্থিত। যে যত ঐ বৃত্তি গুলির অনুশীলন করিতে পারিবে, তাহার আত্মা তত শক্তিশালী হইবে। শারীরিক বৃত্তি গুলির অনুশীলন বৃদ্ধি পাইলেই ঐ সমস্ত উচ্চতর বৃত্তি মলিন হইয়া গিয়া মানবাত্মার আধ্যাত্মিক হীনতা ও কলুষতা জন্মিবে। সমস্ত সাবিত্রী তত্ত্বে চন্দ্রনাথ বাবু এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। সাবিত্রীর আধ্যাত্মিকতা, এবং দৈহিক শক্তি অপেক্ষা তাঁহার আধ্যাত্মিক-শক্তিময়তা প্রদর্শনই যেন গ্রন্থকারের প্রধান লক্ষ্য। প্রতি অধ্যায়েই এই কথাটী বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আহার, বিহার ও ইন্দ্রিয়াদির সংযম করিয়া, অর্থাৎ মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সকলের তীক্ষ্ণতা সম্পাদন করতঃ, অশ্বপতি সাবিত্রীর ন্যায় কন্যারত্ন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন; সত্যবানের দারুণ নিয়তি জানিয়াও সাবিত্রী যে তাঁহাকে পতিত্বে মনে মনে বরণ করিয়াছিলেন এবং পিতার কথাতেও সে সংকল্প পরিত্যাগ করেন নাই—ইহাও সেই আধ্যাত্মিক শক্তির প্রাচুর্য্যেরই পরিচায়ক। এই শক্তির প্রাথর্য্যই সাবিত্রীর বধূধর্ম্মে প্রকটিত; এই শক্তি বলেই প্রেমে চাঞ্চল্যহীনতা ও ব্রতসম্পাদনে দৃঢ়সংকল্পতা। সেই সর্ব্বলোক ভয়ঙ্কর তমসাচ্ছন্ন রজনীতে, অতি ভীষণ অরণ্যানীমধ্যে, পতির মৃত্যুর পর সেই অমানব পুরুষের সহিত কথোপকথনাদিও সেই শক্তির বলেই হইয়াছিল। সেই শক্তির বলেই, মানুষের বিধাতৃবিহিত নিয়তি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। এই এইরূপ সাবিত্রীর প্রতি কার্য্যেই, অতি বিস্ময়কর মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রাবল্য গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থকার সাবিত্রীর এই মনোময়তা, আধ্যাত্মিক শক্তিশীলতা ও জড় বা দৈহিক শক্তির প্রতি আস্থা-রাহিত্য,—অতি উত্তম রূপে দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। এবং অন্য সমস্ত বাদ্ দিয়া, কেবল এই একমাত্র গুণেই এই মহাগ্রন্থ একখানি উৎকৃষ্ট 'ধর্ম্ম-গ্রন্থরূপে বঙ্গের ঘরে ঘরে আদৃত হওয়া আবশ্যক।

সাবিত্রীতত্ত্বে আরো অনেক কথা আছে। আমরা হিন্দুমাত্রকেই এই পুস্তক পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। যাঁহারা এ দেশের কিছুই ভাল নহে বলেন, তাঁহাদিগকেও এ পুস্তক পড়িয়া দেখিতে বলি। আমরা চন্দ্রনাথ বাবুর চিন্তাশীলতায় ও অন্তর্দৃষ্টিতে মুগ্ধ হইয়াছি। বিধাতা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব জন্ম

এই ঘোর তমোবৃত সংসারে অসংখ্য যুগের পর এক এক জন বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। শাক্যসিংহের পূর্ব্বেও এই পৃথিবীতে অনেক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ত্তমান নাই। অধুনা যে কাল অতিবাহিত হইতেছে, বৌদ্ধশাস্ত্রে উহাকে মহাভদ্র কল্প বলে। এই কল্পের অতীত কাল মধ্যে ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ ও শাক্যসিংহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ক্রকুচ্ছন্দ খ্রীঃ পূঃ ৩১০১ অব্দে, কনকমুনি খ্রীঃ পূঃ ২০৯৯ অব্দে, কাশ্যপ খ্রীঃ পূঃ ১০১৪ অব্দে এবং শাক্যসিংহ খ্রীঃ পূঃ ৬২৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের পূর্ব্বে আর একশত বিশ (১২০) জন তথাগত প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহাদের পূর্ব্বে অশীতি কোটী বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই অনাদি সংসারে সর্ব্বশুদ্ধ কয়জন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত।

আমি এস্থলে অন্যান্য বুদ্ধগণের জীবন-চরিত পরিত্যাগ করিয়া গৌতম বুদ্ধ বা শাক্যসিংহের পূর্ব্ব জন্মের বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণন করিব।

একদা ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন, ব্রহ্মলোকের অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, পৃথিবীতে অসংখ্য কল্প মধ্যে কোন বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন নাই; ও সেখানে সকলই অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন। অনেক সংবৎসর মধ্যে পৃথিবীতে পুণ্যবান লোক সকল জন্মিতে না পারায় সেখান হইতে কেহই মরণানন্তর ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারেন নাই। এই জন্য ব্রহ্মলোক প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

তখন ব্রহ্মা চতুর্দ্দিক্ বিলোকন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, পৃথিবীতে এমন কি কেহ আছেন, যিনি কালক্রমে বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারিবেন। তদনন্তর তিনি ধ্যানযোগে দেখিতে পাইলেন, পদ্ম যেমন বিকাশ লাভ করিবার আশয়ে সূর্য্যের উদয় প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ ঘোরতমসাচ্ছন্ন পৃথিবীতেও কয়েক জন জ্ঞানবান্ লোক বুদ্ধত্ব লাভের প্রত্যাশায় কালযাপন করিতেছেন। তিনি আরও দেখিতে পাইলেন, বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যে সকল প্রার্থী পৃথিবীতে বিদ্যমান আছেন, তন্মধ্যে এক জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তখন ব্রহ্মা তাঁহাকেই মনোনীত করিলেন। তিনিই পরিশেষে গৌতম বুদ্ধ বা শাক্যসিংহ এই নাম ধারণ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা যখন তাঁহাকে মনোনীত করেন, সেই সময়ে তিনি পৃথিবীতে নিতান্ত দরিদ্রাবস্থায় কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন। তাঁহার একমাত্র বৃদ্ধা ও বিধবা মাতা ছিলেন। গৌতম বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অতি কষ্টে নিজের ও বিধবা মাতার আহার সংস্থান করিতেন। এক সময়ে সৌভাগ্যবৃদ্ধির আশয়ে গৌতম সুবর্ণভূমি নামক দেশে গমন করিবার মানস করেন। তিনি নাবিকদিগকে কয়েকটী রজতখণ্ড পুরস্কার প্রদান করিয়া বলিলেন, "হে নাবিকগণ! তোমরা আমাকে ও আমার বৃদ্ধা মাতাকে জলযানে আরোপিত করিয়া

সুবর্ণ ভূমিতে লইয়া যাও। তোমাদের অনুকম্পা ব্যতীত আমরা পূর্ব্বোবর্ত্তী সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিব না।” নাবিকগণ তাঁহার বাক্যানুসারে তাঁহাদিগকে অর্ণবযানে আরোপিত করিল কিন্তু কিয়ৎদূর যাইতে না যাইতেই ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে যান জলমগ্ন হইল। উত্তালতরঙ্গে গৌতম নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া তাঁহার মাতার জীবন কিসে রক্ষা পায়, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। হিংস্র জলজন্তুসমূহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি স্বীয় মাতাকে পৃষ্ঠে উপবেশিত করিয়াই মহাসমুদ্র সন্তরণ করিবার প্রয়াস করিলেন।

গৌতমের এইরূপ দৃঢপ্রতিজ্ঞত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রহ্মা ভাবিলেন, গৌতমই বুদ্ধত্বলাভের যথার্থ অধিকারী। গৌতম ও ব্রহ্মের সহায়তায় স্বীয় মাতার সহ সমুদ্রের পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন, বুদ্ধত্ব লাভ করিতে হইলে যে সকল গুণের আবশ্যক, গৌতমে তাহার সমস্তই বিদ্যমান আছে। গৌতমের মনও তখন বুদ্ধত্ব লাভের জন্য কৃতনিশ্চয় হইল। কিয়ৎকাল পরে গৌতমের মৃত্যু হয় ও তিনি ব্রহ্মলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত গৌতমের যে দিন মনঃপ্রণিধান জন্মিয়াছিল, সেই দিন হইতে অসংখ্য বৎসর অতীত হইয়াছিল ও সংসারে একলক্ষ পঁচিশ হাজার বুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু গৌতম তখনও সম্বুদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই।

সর্ব্বভদ্রকল্পে গৌতম ধন্তদেশীয় সম্রাটের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন এবং এই কল্পেই তাঁহার বাক্‌প্রণিধান জন্মে। এই কল্পে তিনি বলিয়াছিলেন, “আমি বুদ্ধ হইব, বুদ্ধত্বলাভ করা আমার অভীপ্সিত।”

সারমন্দকল্পে গৌতম পুষ্পবতী নগরীতে রাজা সুনন্দের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই কল্পে তিনি তৃষ্ণাঙ্কর বুদ্ধের নিকট হইতে অনিয়ত বিবরণ (অনিশ্চিত আশ্বাস) ও দীপঙ্কর বুদ্ধের সমীপে নিয়ত বিবরণ (নিশ্চিত আশ্বাস) লাভ করেন। তৃষ্ণাঙ্কর বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, গৌতম কালক্রমে বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারেন এবং দীপঙ্কর বলিয়াছিলেন, গৌতম অবশ্যই বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন।

গৌতম সারনন্দ কল্পে সুরুচি ব্রাহ্মণ, *অতুলনাগরাজ, অতিদেব ব্রাহ্মণ ও সুজাত* ব্রাহ্মণ নামে যথাক্রমে পরিচিত ছিলেন। বরকল্পে তিনি যক্ষ, সিংহ ও সন্ন্যাসীরূপে যথাক্রমে প্রাদুর্ভূত হন। মন্দকল্পে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব প্রাপ্ত হন। তদনন্তর অসংখ্য কল্প অতীত হয়, ও সংসার ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন হয়।

এই সময়ে গৌতম দেব, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি নানা যোনি পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। “পঞ্চসত পঞ্চাস-জাতক” নামক পালিগ্রন্থে গৌতমের ৫৫০ জন্মের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। ইহার মধ্যে তিনি ৮৩ বার সন্ন্যাসী, ৫৮ বার মহারাজ, ৪৩ বার বৃক্ষদেবতা, ২৬ বার ধর্ম্মোপদেশক, ২৪ বার রাজামাত্য, ২৪ বার পুরোহিত ব্রাহ্মণ, ২৪ বার যুবরাজ, ২৩ বার ভদ্রলোক, ২২ বার পণ্ডিত, ২০ বার ইন্দ্র, ১৮ বার মর্কট, ১৩ বার বণিক্‌, ১২ বার ধনী, ১০ বার, মৃগ, ১০ বার সিংহ, ৮ বার হংস, ৬ বার হস্তী, ৫ বার কুক্কুট, ৫ বার ভৃত্য, ৫ বার সুবর্ণ গরুড়, ৪ বার অশ্ব, ৪ বার বৃষ, ৩ বার কুম্ভকার, ৩ বার অন্ত্যজজাতি, ২ বার মৎস্য, ২ বার হস্তিপক, ২ বার ইন্দুর, ১ বার কুকুর, ১ বার সর্পচিকিৎসক, ১ বার সূত্রধার

১ বার কর্ম্মকার, ১ বার ভেক, ১ বার শশক, ইত্যাদিরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

উপরে যে তালিকা প্রদত্ত হইল, উহা সম্পূর্ণ তালিকা নহে। গৌতমবুদ্ধ অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সকলের আমূলবৃত্তান্ত সংগ্রহ করা নিতান্ত দুরূহ। তিনি এক এক জন্মে এক এক প্রকার সৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কোন জন্মে দান, কখনও শীল, কোন সময়ে নৈষ্ক্রম, কখনও বা প্রজ্ঞা, এবং সময়ান্তরে বীর্য্য ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা এই সকল সদ্‌গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। উক্ত দশটী গুণের নাম দশ পারমিতা। গৌতম কখনও সাধারণ ভাবে এই দশপারমিতার অনুষ্ঠান করিতেন। যখন তিনি সমধিক যত্নে এই সকলের অনুষ্ঠান করিতেন, তখন ঐ সকলের গুণ উপপারমিতা নামে অভিহিত হইত। আর যখন তিনি অতীব নৈপুণ্যের সহ ঐ সকল সম্পন্ন করিতেন, তখন উহাদিগকে পরমার্থ পারমিতা বলিত।

গৌতম বুদ্ধ খদিরাঙ্গার জন্মে নিজের চক্ষুঃ, মস্তক, মাংস, সন্তান, স্ত্রী ও সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া দান পারমিতার (১) অনুষ্ঠান করেন। ভূরিদত্ত জন্মে তিনি ত্রিবিধ শীল পারমিতা (২) সম্পন্ন করেন। চুল্য—সুত্ত সোম জন্মে তিনি কাঞ্চন, মণি, মাণিক্য, দাস ও দাসী ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং এই জন্মে তাঁহার নিষ্ক্রম পারমিতা (৩) অনুষ্ঠিত হয়। শক্কুভক্ক জন্মে তিনি প্রজ্ঞাপারমিতা (৪) সমাচরণ করেন। মহজনক জন্মে তিনি বীর্য্য-পারমিতার (৫) পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। ক্ষান্তিবাদিজন্মে তিনি লোকের অন্যায় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার অম্লান চিত্তে সহ্য করিয়া ক্ষান্তি পারমিতার (৬) উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। মহাসুতসোম জন্মে তিনি সত্য-পারমিতা (৭) নিষ্পন্ন করেন। তেমিজন্মে তিনি অবিচলিত প্রতিজ্ঞায় শ্রেয়োধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অধিষ্ঠান পারমিতা (৮) সম্পন্ন করেন। নিগ্রোধমৃগজন্মে তিনি লোকের দুঃখ দেখিয়া তাহাদের প্রতি পরম-সহানুভূতি প্রকাশপূর্ব্বক মৈত্রী পারমিতা (৯) সম্পন্ন করেন। তিনি শরজন্মে শত্রু ও মিত্র, উপকারী ও অপকারী, জ্ঞাতি ও অপরিচিত প্রভৃতি সকলের সমভাব প্রদর্শন করিয়া চিত্তের অবিষমভাব বা উপেক্ষা পারমিতা (১০) দর্শন করেন।

এক একটী পারমিতার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান করিতে বুদ্ধ দশটী পারমিতা বিশেষ নৈপুণ্যের সহ নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম "দশভূমীশ্বর" হইয়াছিল।

কর্ম্মের বিচিত্র পরিণাম বশতঃ গৌতম বুদ্ধ নানা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কখনও অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই। তির্য্যগ্ যোনিতে সমুদ্ভূত হইয়াও তিনি বুদ্ধোচিত কর্ম্মের সমাচরণ করিয়াছিলেন। নিম্নে বুদ্ধদেবের যে কয়েকটী জন্মের বিষয় বিবৃত হইল, উহা পাঠ করিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন, গৌতম বুদ্ধ পশ্বাদি জাতিতে জন্মিয়াও সত্য, ক্ষান্তি ইত্যাদি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন নাই।

মর্কট-জন্ম—এক সময়ে গৌতম মর্কটরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৮০,০০০ মর্কটের অধিপতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে বনখণ্ড মধ্যে তাঁহার রাজ্য অবস্থিত ছিল। তাঁহার সাম্রাজ্যের সমীপে কোন ক্ষুদ্র গ্রামে একটা প্রকাণ্ড

তেঁতুলের গাছ ছিল। মর্কটগণ ঐ গাছের তেঁতুল খাইবার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করিলে গৌতম তাহাদিগকে বলিলেন:—"হে মর্কট প্রজাগণ! তোমরা শিষ্টতা ত্যাগ করিও না। ঐ তেঁতুলের গাছটী গ্রামবাসীরা বহুযত্নে সংবর্দ্ধন করিয়াছে, এবং ঐ তেঁতুল যাহাতে শীঘ্র নষ্ট না হয়, তজ্জন্য উহারা সতর্ক রহিয়াছে। যদি ঐ তেঁতুল গাছের কোন স্বামী না থাকিত এবং উহা যদি বনমধ্যে সামান্যভাবে মনুষ্যের যত্ন-ব্যতীতও জন্মিত, তাহা হইলে তোমরা অনায়াসে উহার ফল খাইতে পারিতে। কিন্তু এক্ষণে ঐ তেঁতুলে তোমাদের কোন স্বত্ব নাই, অতএব উহার প্রতি তোমরা লোভ করিও না। প্রজার দোষে রাজার সুনাম নষ্ট হয়। তোমরা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করিলে লোকে আমাকেই অকর্ম্মণ্য রাজা বলিয়া অবধারণ করিবে। অতএব তোমরা সাবধান হও।"

তখন মর্কটগণ তাঁহার কথায় কোন উত্তর করিল না। পরিশেষে রাত্রিকালে নিশীথ সময়ে প্রায় ৫০০ মর্কট একত্রিত হইয়া নিঃশব্দে ঐ তেঁতুল ভক্ষণের নিমিত্ত গমন করিল। তাহারা পরস্পর বলিল, "ভাই! আমরা নিঃশব্দে তেঁতুল গাছে চড়িয়া উহার ফল খাইব, রাত্রিকালে কেহই জানিতে পারিবে না।" কিন্তু উহারা বৃক্ষের উপর বসিয়া তেঁতুল খাইতে খাইতে এমন হর্ষান্বিত হইয়াছিল যে, তাহারা তাহাদের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারে নাই। উহারা হুপ্ হাপ্ করিয়া পরস্পরের মনের হর্ষ প্রকাশ করিতেছিল, তখন গ্রামবাসীরা মর্কটের শব্দ শুনিয়া প্রত্যেকে এক এক খানি লগুড়হস্তে করিয়া বৃক্ষতলে আগমন করিল। তাহারা বলিল "আমরা প্রভাতকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিব, মর্কটগণ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেই আমরা সকলে মিলিয়া উহাদের প্রাণনাশ করিব।" ক্রমে ঐ সংবাদ মর্কটরাজ গৌতমের কর্ণগোচর হইল। তিনি ভাবিলেন, আমার সদুপদেশ সত্ত্বেও মর্কটগণ তেঁতুলের লোভ ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাহাদের জীবন এক্ষণে ঘোর বিপদাপন্ন। যাহা হউক, প্রজাকে রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য। অতএব কোন উপায় অবলম্বন করিয়া উহাদিগকে রক্ষা করি।"

তখন গৌতম গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে শিশু, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক সকলেই সুষুপ্ত। আর গ্রামের বয়স্ক লোক সকল লগুড় হস্তে করিয়া তেঁতুল গাছের সমীপে গমন করিয়াছে, গ্রামের মধ্যে সমস্তই নিঃশব্দ; কেবল একটী গৃহে একটী বৃদ্ধ স্ত্রীলোক খক্ খক্ করিয়া কাশিতেছে, তাহার নয়নে নিদ্রা নাই, সে কখনও উঠিতেছে, কখনও বসিতেছে এবং কখনও বা শয্যায় শয়িত হইতেছে। তখন গৌতম সেই বৃদ্ধার গৃহে অগ্নিসংযোগ করিলেন, গৃহ জ্বলিয়া উঠিল। বৃদ্ধা চীৎকার করিতে করিতে গৃহের বাহিরে আসিল। সে অগ্নিনির্ব্বাণের কোন উপায় চিন্তা না করিয়া কেবল উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তেঁতুল গাছের তলায় যে সকল লোক দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা বৃদ্ধার রোদনধ্বনি শুনিয়া লগুড় ত্যাগ করিল ও বেগে গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নিনির্ব্বাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। মর্কটগণ এই অবসরে নিরাপদে স্বীয় আলয়ে প্রতিগমন করিল। এই জন্মে গৌতম প্রজ্ঞাপারমিতা সম্পন্ন করেন।

কাঠ্‌বিড়াল-জন্ম—কোন সময়ে গৌতম কাঠ্‌বিড়াল রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন নদীর তীরস্থিত বৃক্ষের উপরে তাঁহার আবাস ছিল। তিনি তাঁহার শিশু শাবকদিগের প্রতি সাতিশয় যত্ন করিতেন। এক সময়ে ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে ঐ বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া নদী মধ্যে পতিত হয়। স্রোতোবেগে ঐ বৃক্ষ ও শাবক সমূহ সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন হয়। তখন গৌতম প্রতিজ্ঞা করিলেন, সমুদ্রশোষণ করিয়া শাবকদিগকে উদ্ধার করিবেন। তিনি স্বীয় পুচ্ছ সমুদ্র মধ্যে অভিষিক্ত করিয়া তীরভূমিতে উহা কম্পন করিতে লাগিলেন। সাত দিন ক্রমাগত এইরূপে লেজ ভিঁজাইয়া জল ছিটাইতেছেন, এমন সময়ে দেবরাজ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সাধু কাঠ্‌বিড়াল! তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, এইরূপ ভাবে লেজ জলে ভিঁজাইয়া তীরে জলের ছিট্‌ দিয়া কতকালে তুমি সমুদ্র শোষণ করিবে? সমুদ্র ৮৪ হাজার যোজন গভীর। তোমার ন্যায় লক্ষ লোক এইরূপ চেষ্টা করিলেও সমুদ্র শোষণ করিতে পারিবে না।"

তখন কাঠ্‌বিড়ালরূপী গৌতম দেবরাজকে বলিলেন, "হে বীরপুরুষ! যদি সকল লোকই তোমার ন্যায় সাহস সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে তোমার বাক্য সার্থক হইত। তোমার কতদূর বিক্রম আছে, তাহা তোমার কথা দ্বারাই বুঝা গিয়াছে। যাহা হউক, তোমার ন্যায় ভীরু, কাপুরুষ ও নির্ব্বোধের সহ কথা বলিয়া আমার ফল নাই, তোমার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও, আমার কার্য্যে বিঘ্ন করিও না! আমি যাহা আরব্ধ করিয়াছি, তাহা সম্পন্ন না করিয়া বিরত হইবনা।"

তখন দেবরাজ ঐ কাঠ্‌বিড়ালের অদম্য সাহস দেখিয়া চমকিত হইলেন এবং দেবগণের সাহায্যে শাবকদিগকে সমুদ্র হইতে উত্তোলন করিয়া আনিলেন। গৌতম এই জন্মে বীর্য্য পারমিতা সম্পন্ন করেন।

সিংহ-জন্ম—এক সময়ে গৌতম সিংহজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন পর্ব্বতের উপবিভাগে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সন্নিকটে পঙ্কপরিবেষ্টিত এক হ্রদ বিদ্যমান ছিল। সেই পঙ্কাবৃত স্থানে হরণ প্রভৃতি জন্তু চরিয়া বেড়াইত। একদিন সিংহরূপী গৌতম ক্ষুধার্ত্ত হইয়া একটী হরিণের অনুসরণ করিতে করিতে হ্রদের তীরস্থিত পঙ্কমধ্যে নিমগ্ন হন এবং তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার তাঁহার কোন উপায় থাকে না। অনন্তর একটী শৃগালকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "ভদ্র! আমি অতি কষ্টে অনাহারে কালযাপন করিতেছি। আমার পদদ্বয় এই পঙ্কমধ্যে এমন ভাবে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে যে, আর উহা তুলিবার আমার সাধ্য নাই। আমি সাতিশয় বিপদাপন্ন, অতএব ভাই তুমি অনুকম্পা করিয়া আমাকে পঙ্ক হইতে উত্তোলন কর।" শৃগাল বলিল, "আপনি বলবান্‌ ও বিক্রমশীল জন্তু। আপনি এক্ষণে যেরূপ ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন, তাহাতে আমি আপনার সমীপে গমন করিতে সাহস করি না। আপনাকে রক্ষা করিতে যাইয়া শেষে আমার জীবন হারাইব, এইরূপ আমার আশঙ্কা হইতেছে।" তখন সিংহ তাহাকে নানা প্রকারে অভয়দান করিল ও পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিল। তদনুসারে শৃগাল নিকটবর্ত্তী হ্রদ হইতে সিংহের পদদেশ পর্য্যন্ত একটী পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করিল। হ্রদের জল সেই প্রণালী দ্বারা সিংহের পাদদেশে প্রবলবেগে আগমন

করায় কর্দ্দম জলবৎ তরল হইল। সিংহ নির্ব্বিঘ্নে কর্দ্দম হইতে উত্থিত হইয়া শৃগালকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ করিতে লাগিল। তদবধি সিংহ ও শৃগাল বহুকাল একত্র এক গহ্বরে সপরিবারে বাস করিয়াছিল। সিংহ কখনও উক্ত শৃগালকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করে নাই। এই জন্মে গৌতম সত্য পারমিতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

বেশ্মান্তর-জাতক— জম্বুদ্বীপে জয়াতুরা নগরাতে সঞ্জনামক রাজা বাস করিতেন। তাঁহার প্রধান মহিষীর নাম স্পৃশতী। তাঁহাদের বেশ্মান্তর নামক এক পুত্র জন্মে। বাল্যকাল হইতে উক্ত পুত্র দানশীলতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করে। চৈত্যরাজকন্যা মাদ্রিদেবীর সহ বেশ্মান্তরের বিবাহ হয়। এই সময়ে কলিঙ্গ দেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। কলিঙ্গরাজ শুনিলেন, বেশ্মান্তরের যে শ্বেতহস্তী আছে, উহা বৃষ্টি ও জল উৎপাদন করিতে পারে। কথিত আছে,উক্ত হস্তীর একমাত্র আস্তরণের মূল্য ২৪ লক্ষ টাকা। কিয়ৎকাল পরে কলিঙ্গরাজ ৮ জন ব্রাহ্মণকে জয়াতুরা নগরীতে প্রেরণ করেন। উপোষধ দিবসে বেশ্মান্তর দরিদ্র ও ভিক্ষুদিগকে অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি দান করিতেছেন, এমন সময়ে উক্ত ৮ জন ব্রাহ্মণ যাইয়া বলিল "মহারাজকুমার! আপনার যে শ্বেতহস্তী আছে, উঁহাই আমরা ভিক্ষাস্বরূপে প্রাপ্ত হইবার আশয়ে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।" বেশ্মান্তর বলিলেন "হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা এই শ্বেতহস্তী গ্রহণ করুন। আপনারা আমার চক্ষুঃ, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি আর যাহা যাচ্ঞা করিবেন,আমি তাহাও আহ্লাদ সহকারে প্রদান করিতেছি।" "আমাদের অপর কিছুই প্রার্থনীয় নাই" এই বলিয়া তাহারা উক্ত হস্তী লইয়া কলিঙ্গ দেশে প্রতিগমন করিল।

নগরবাসিগণ এই হস্তি দান ব্যাপার অবগত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল ও রাজপ্রাসাদে যাইয়া নিবেদন করিল "মহারাজ! আমরা শ্বেতহস্তী হইতে অনেক উপকার লাভ করিয়াছি। আপনার পুত্র সেই অমূল্য হস্তিরত্ন ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করিয়া আমাদের মহানিষ্ট সাধন করিয়াছেন।" মহারাজ তখন স্বীয় পুত্রকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিবার জন্য মানস করিলেন। তখন প্রজাগণ বলিল "মহারাজ! আপনার পুত্রের অপর কোন শাস্তি প্রদান করিবার প্রয়োজন নাই। উঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেই আমরা আহ্লাদিত হইব।" তদনুসারে বেশ্মান্তর বঙ্কগিরিতে নির্ব্বাসিত হইলেন। সহস্র নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার স্ত্রী মাদ্রিদেবী তাঁহার অনুগমন করিলেন। এদিকে মহারাণী স্পৃশতী, স্বীয় পুত্রের নির্ব্বাসনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুর্ম্মনায়মান হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,"আমি কিছুকালের পর তোমার পুত্রকে পুনরায় গৃহে আনয়ন করিব।"

যখন বেশ্মান্তর ও মাদ্রিদেবী গৃহত্যাগ করেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের যে কোন সম্পত্তি বা বস্ত্রালঙ্কারাদি ছিল,সমস্তই দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন। বেশ্মান্তর সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া কেবল স্বীয় স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা সমভিব্যাহারে এক রথে আরোহণ করিয়া বঙ্কগিরির অভিমুখে ধাবমান হন। তাঁহার মাতা যে কিছু ধন তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই তিনি দরিদ্র-

দিগকে বিতরণ করেন। পথমধ্যে দুইজন ব্রাহ্মণ আসিয়া বেশ্মান্তরকে বলিল, "মহাশয় যে অশ্বদ্বয় আপনার রথ বহন করিতেছে উহা পাইলে আমরা পরম উপকৃত হই।" কিছু দূর যাইতে না যাইতে আর একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিল "মহাশয়! আপনার রথ খানি পাইলে আমার দরিদ্রতার কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হয়।" উক্ত ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনানুসারে বেশ্মান্তর স্বীয় রথ ও অশ্বদ্বয় বিতরণ করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর বেশ্মান্তর পুত্রটীকে ও মাদ্রিদেবী কন্যাটীকে ক্রোড়ে লইয়া বহুকষ্টে পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে চৈত্যদেশের রাজা তাঁহাদিগকে আহ্বান করেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্যে গমন করেন নাই।

অনন্তর তাঁহারা বঙ্কগিরিতে উপস্থিত হন। সেখানে বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাদের নিমিত্ত দুই খানি ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করেন। বেশ্মান্তর ও মাদ্রিদেবী যথাক্রমে ঐ দুই গৃহে সংযতভাবে বাস করিতেন। সন্তানগণ মাতার অনুপস্থিতিতে পিতার নিকট থাকিত। তাঁহাদের এইরূপ ভাবে ৭ মাস অতীত হইল, একদিন যূজক নামক একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশ্মান্তরের নিকট আসিয়া বলিলেন "মহাশয়! আমি অনেক কষ্টে একশত মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া অমুক ব্রাহ্মণের নিকট ন্যস্ত রাখিয়াছিলাম, কিন্তু সে ব্যক্তি আমার সমস্ত টাকা ব্যয় করিয়া নিজের আহার্য্য সংস্থাপন করিয়াছে। সে অত্যন্ত দরিদ্র সুতরাং আমার মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিতে না পারিয়া অমিত্রতপা নাম্নী তাহার কন্যা আমাকে সম্প্রদান করিয়াছে। আমার উক্ত পত্নী (অমিত্রতপা) একাকিনী সমস্ত গৃহকার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন না। আমার স্ত্রীর নিকট শুনিয়াছি, আপনার জালীয় নামক একটী পুত্র ও কৃষ্ণাজিনা নাম্নী কন্যা আছে। আমি ঐ দুইটীকে লইতে ইচ্ছা করি। উহারা আমার পত্নীর দাস ও দাসী হইয়া সমস্ত গৃহকার্য্য করিবে। তাহা হইলে আমার পত্নী কিছু শান্তি অনুভব করিতে পারেন, আমি ও গৃহযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই।" এই কথা শুনিয়া বেশ্মান্তর বলিলেন "মহাত্মন! আমার সন্তান দুইটী দ্বারা যদি আপনার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তাহা হইলে আমি সন্তোষ সহকারে উহাদিগকে আপানার হস্তে অর্পণ করিতেছি। এই সময়ে জালীয় ও কৃষ্ণাজিনা বনমধ্যে পলায়ন করিয়াছিল ও তাহাদের মাতা মাদ্রিদেবী তখন বনে ফলমূলাদি অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন। তখন বেশ্মান্তর সন্তান দুইটীকে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। জালীয় আসিয়া বেশ্মান্তরের পাদতলে নিপতিত হইয়া বলিল "পিতঃ আমাদের মাতা এক্ষণে বনমধ্যে ফল ও কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন, তিনি যতক্ষণ গৃহে প্রত্যাগমন না করেন, তত ক্ষণ আপনি আমাদিগকে বনে বিসর্জ্জন দিবেন না।"

তখন ভিক্ষু ব্রাহ্মণ ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল, "এইরূপ মিথ্যাবাদী লোক কোথায়ও দেখি নাই। আপনি জগতে দয়াশীল বলিয়া খ্যাত, অথচ সন্তান দুইটী দান করিতে স্বীকার করিয়াও দিতেছেন না, ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

ভিক্ষুর কথা শুনিয়া বেশ্মান্তর স্বীয় পত্নীর অনুপস্থিতিতেও অগত্যা সন্তান দুইটী দান করিলেন। উহারা পর্ব্বতের উপরিভাগে পথমধ্যে নানাবিধ কষ্ট অনুভব

করিতেছিলেন। বেশ্মান্তর স্বচক্ষে উহা দেখিতে লাগিলেন।

মাদ্রিদেবী অরণ্য হইতে প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত অবগত হইলেন ও অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বেশ্মান্তর তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "বুদ্ধত্ব লাভ করা সহজ নহে, আমি স্বীয় পুত্র ও কন্যা দান করিয়া যদি দান পারমিতা সম্পাদন করিতে পারি, তাহা হইলে ইহা আমার পরম লাভ বলিতে হইবে। এই অকিঞ্চিৎকর দান দেখিয়া তুমি বিস্মিত হইও না।"

অনন্তর দেবরাজ মনে করিলেন, বেশ্মান্তর যেরূপ দানশীল, তাহাতে তিনি স্বীয় পত্নীকেও বিতরণ করিয়া ফেলিতে পারেন, অতএব আমি ইহার কোন প্রতিবিধান করি। অনন্তর তিনি এক ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া বেশ্মান্তরের নিকট গমন করিলেন ও বলিলেন:—মহাশয়, আমি বৃদ্ধ ও রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, সেবা শুশ্রূষা করিবার কেহই নাই। আপনার পত্নী যদি আমার দাসী হইয়া আমার সেবা করেন, তাহা হইলে আমি সুখী হইতে পারি।"

উক্ত বৃদ্ধব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বেশ্মান্তর মাদ্রিদেবীর মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মাদ্রিদেবী স্বামীর অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, "যদি আমাকে বিতরণ করিয়া আপনি বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে ইহা আমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে।"

অতঃপর বেশ্মান্তর উক্তব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আপনি আমার পত্নীকে গ্রহণ করুন। এই সামান্য দান আমার বুদ্ধত্ব লাভের সহায় হউক।" তখন ব্রাহ্মণ রূপী দেবরাজ বলিলেন, বেশ্মান্তর আমি আহ্লাদ সহকারে মাদ্রিদেবীকে গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে উঁহাতে আপনার কোন স্বত্ব থাকিল না। আমি উঁহাকে আপনার নিকট কিছু কালের জন্য গচ্ছিত রাখিয়া যাইতেছি।" এই বলিয়া ভিক্ষুরূপী দেবরাজ অন্তর্হিত হইলেন।

ওদিকে যূজক ব্রাহ্মণ জালীয় ও কৃষ্ণাজিনাকে লইয়া জয়াতুরা নগরীতে উপনীত হইল। সঞ্জ স্বীয় পৌত্র ও পৌত্রীর সন্ধান পাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন ও যূজক ব্রাহ্মণকে প্রচুর পরিমাণে আহার প্রদান করিলেন। অতিভোজনে যূজগের প্রাণবিয়োগ ঘটে। সঞ্জ মহাসমৃদ্ধি সহকারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন। সঞ্জ কিয়ৎকাল পরে বহুজন সমভিব্যাহারে বঙ্কগিরিতে গমন করিয়া বেশ্মান্তর ও মাদ্রিদেবীকে গৃহে প্রত্যানয়ন করেন। পূর্ব্বোক্ত শ্বেতহস্তীর প্রভাবে কলিঙ্গদেশে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হওয়ায় উক্ত দেশবাসিগণ হস্তীটী সঞ্জকে প্রত্যর্পণ করেন। বেশ্মান্তর, মাদ্রিদেবী, মহারাজ সঞ্জ, মহারাণী স্পৃশতী, জালীয় ও কৃষ্ণাজিনা সকলেই পুনর্মিলিত হইলেন। বেশ্মান্তর দেহত্যাগানন্তর তুষিত নামক স্বর্গে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। এই জন্মে গৌতম দান পারমিতা সম্পাদন করেন। শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য।

অযাচিতা।

একটী গজলের এক চরণ এই ;—

"ফিনজাদি পিচকারীয়ে ম'য়তো সারী ভিজগয়ী"

ইহার অর্থ এই,— কেগো আমাকে পিচকারী মারিলে, আমি যে একেবারেই (সর্ব্বাঙ্গে) ভিজিয়া গেলাম।

সুন্দরী, শুভ্র শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া

এক মনে রাজপথের জনতার মধ্য দিয়া সংসারের কাজে চলিয়াছিল, হঠাৎ কোথা হইতে তাহার গায়ে আবীর-রঞ্জিত পিচকারীর চোট আসিয়া পড়িল, সে চকিত হইল, অপ্রতিভ হইল, থমকিয়া দাঁড়াইল। চাহিয়া দেখিল, তাহার শুষ্ক বস্ত্র সমগ্র ভিজিয়া গিয়াছে, সমস্তই লাল হইয়া গিয়াছে, ভিজিতে কিছুই বাকী নাই, বস্ত্রত ভিজিয়াইছে, সে নিজেও একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। আপনার দিকে চাহিয়া দেখিল, সে যাহা ছিল, তাহা নাই, সে যে কাজে যাইতেছিল, সে কাজ ভুলিয়া গেল। ভূত ভুলিল, ভবিষ্যত ভুলিল, সে যে অতর্কিতে সহসা একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে, ইহাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে অন্তরে কেমন একটী উদাসভাবের সঞ্চার হইল, উর্দ্ধ দিকে চাহিল, আসে পাশে চাহিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না; তখন একটু বিস্ময় ও বিষাদ ভরে, একটু আবদার ও আদরের ভাবে, কাতর করুণ মাধুর্য্য মাখা কণ্ঠে, আপনাপনি গাহিল ;—

"কিনভারি পিচকারীরে ম'য়তো সারী ভিজগয়ী,"

আহা, কেগো উহাকে ভিজাইয়া দিলে? বেচারী যেন অনাথ হইয়াছে। সে যে ভাবে চাহিয়াছিল, তাহার আর সে ভাব নাই, ঐ দেখ আর চলিতে পারিতেছে না, ভিজা কাপড়ে অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে যাইবে, কি পশ্চাতে যাইবে, ভাবিয়া পাইতেছে না। তাহার মনে কোনও ভয় ছিল না, সন্দেহ ছিল না, আশঙ্কা ছিল না, সঙ্কোচ ছিল না, সে আত্মরক্ষার জন্য সময় পায় নাই, হঠাৎ অদৃশ্য হস্তের এক পিচকারীতে সে সমগ্র ভিজিয়া গেল।

গানটী সংসারের ভাবে রচিত নহে। রচনাকর্ত্তা একজন সাধক কবি। একটী পিচকারীতে একজন লোক ভিজিয়া গিয়াছে, ইহা বর্ণনা করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কেন? তিনি এই সঙ্গীতটীর মধ্যে যে মধুর রস ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহা পার্থিব রস নহে, উহা স্বর্গীয় সুধা। উপরি উক্ত সঙ্গীতার্দ্ধের প্রত্যেক শব্দে সেই সুধা জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। সংসারে দেখিতে পাই, এক শ্রেণীর লোকেরা বহু তপস্যা করিয়া ধর্ম্ম সাধন করেন, এবং সেরূপ বহু সহস্র সাধকের মধ্যে কদাচিৎ দুই এক জন অভীষ্ট ফল লাভ করেন। সে ফল তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার অতীত নহে, সে ফল লাভ করিয়া তাঁহারা চমকিত হইয়া যান না, কারণ তাঁহারা যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহাই পাইয়াছেন। কিন্তু অন্য এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা সংসার লইয়াই ব্যস্ত, সংসারের কোলাহলেই মগ্ন, সংসারাতীত কোন বস্তুর প্রতি তাঁহাদের প্রলোভন নাই, সংসার-রাজপথে, বিষয়ের শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহারা আপন মনে চলিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ কোথা হইতে স্বর্গীয় সুগন্ধিপূর্ণ লাল রঙ্গের ভক্তিজলের পিচকারী আসিয়া তাহাদের উপর পড়িল, পলকে একবারে সমগ্র ভিজাইয়া দিল, আপনার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কি হইয়াছে, একেবারে যে ভিজিয়া গিয়াছে; তাঁহার রং একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। সেতো এরূপ আশা করে নাই, এরূপ আকাঙ্ক্ষাও করে নাই, সে ত শুষ্কবস্ত্র পরিয়া বিষয় কার্য্যে চলিয়াছিল, হঠাৎ কে তাহাকে ভিজাইয়া দিল? কে ভিজাইয়া দিল, চারিদিক চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না। সে সাধনা করে নাই, ইন্দ্রিয় নিগ্রহের চেষ্টা করে নাই, বিষয়-বাসনা

পরিহার করিবার সংকল্প করে নাই, সংসারা-তীত কোন বস্তুর কখনও প্রত্যাশা করে নাই, কিন্তু হঠাৎ ভিজিয়া গিয়া সে অপ্রস্তুত হইয়াছে। এমনই ভিজিয়াছে যে, তাহার সংসার তাপ একেবারে নিভিয়া গিয়াছে, সমস্ত শরীর শীতল হইয়াছে, তাঁহার দৃঢ় সংকল্প,সংসারোদ্যম, আশা ভরসা একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে। তখন আপনাকে অনাথ ও অপ্রস্তুত ভাবিয়া কে তাহাকে ভিজাইল, তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ গাহিল ;—

"কিনভারি পিচকারীরে মঁয়তো সারী ভিজগয়ী"

মানব জাতির ইতিহাসে এরূপ সঙ্গীত অনেকবার গীত হইয়াছে। যখন ধনমদে অন্ধ,দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ লালা বাবুর ঘোরবিষয় কোলাহলের মধ্যে "আর দিন নাই" এই সঙ্কেত বাক্যে এক মুহূর্ত্তে বাসনা পুড়িয়া ছাই হইল, তখন তাঁহার অন্তস্তল হইতে এই সঙ্গীতই গীত হইয়াছিল ,—

"কিনভারি পিচকারীরে মঁয়তো সারীভিজগয়ী"

যখন নবদ্বীপ দস্যু জগাই মাধাই অব ধৌত নিত্যানন্দকে হরিনামের বিনিময়ে দুরন্ত আঘাৎ প্রদান করিল এবং প্রেমদাতা নিতাই চাঁদের রক্তবিন্দু সেই দুরন্ত দস্যু-দ্বয়কে সর্ব্বপ্রকার সংসার-জ্বালা হইতে উদ্ধার করিল,তখন সেই দুই ভাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া এই গানই গাহিয়া-ছিল ;—

"কিনভারি পিচকারীরে মঁয়তো সারী ভিজগয়ী"

খ্রীষ্টীয় অবতার যিশুদেবের ক্রুশারোহণে উল্লসিত হইয়া, নিরীহ সাধু ষ্টীফেনের রক্ত-পাতের সাহায্য করিয়া, ভীত,ব্যস্ত,পলায়িত খ্রীষ্টশিষ্যবর্গের নির্যাতন মানসে পল তাঁহা-দের পশ্চাদ্ধাবিত হইল, দুরন্ত প্রতিহিংসা, নিদারুণ রক্তপিপাসা তখন তাহার ধমনীতে বিদ্যুদ্বেগে বহিতেছিল, এই অবস্থায় যখন তাহার নিকট হঠাৎ অপূর্ব্ব আলোক প্রকা-শিত হইল, যখন সে অভূতপূর্ব্ব ভাবাবেশে অন্ধ হইয়া নূতন জীবন লাভ করিল, যখন দুরন্ত পল সেণ্টপল হইল, তখন তাহার অন্তর হইতে হিব্রুভাষায় এই সঙ্গীতই গীত হইয়াছিল ,—

'কিনভারি পিচকারীরে মঁয়তো সারী ভিজগয়ী"

আবার আরব ক্ষেত্রে বীরবর ওসমান তীক্ষ্ণ-ধার তরবারী হস্তে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্ম-দের মস্তক ছেদন জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া চলিয়াছেন,পথিমধ্যে সহোদরার মুখে কোরা-ণের একটী বয়ান শ্রবণ করিয়া তাঁহার জীবন আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তখন তাঁহারও হৃদয় হইতে আরব্যভাষায় এই সঙ্গীতই গীত হইয়াছিল।

'কিনভারি পিচকারীরে মঁয়তো সারী ভিজগয়ী"

যাঁহারা এই সঙ্গীত গাহিয়াছেন, গাহি-তেছেন—বর্ত্তমানেও তাঁহাদের সংখ্যা বিরল নহে। সংসারে কতকগুলি লোকের জীবন-নাটকে আশ্চর্য্যরূপে পট পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এই ভীষণ নরকের দৃশ্য অভিনীত হইতেছিল, দেখিতে দেখিতে স্বর্গের পট পড়িয়া গেল। আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলেই চমকিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিই বল, বা ইহজন্মের কর্ম্মফলই বল, যে কোনও ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া তর্ক-যুদ্ধকে পরিতৃপ্ত কর, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি বুঝি, জীবনে যাঁহারা এই সঙ্গীত গাহিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। যেদিন শুনিয়াছি, সেই দিন হইতে কাণে সেই সঙ্গীত বাজিয়া আছে, নিশিদিন কেমন এক অদৃশ্য মূর্ত্তি, কেমন এক নীরব ভাষায়, কেমন এক মধুমাখা কণ্ঠে, কেমন এক

আধ আধ স্বরে আমার কাণের কাছে সদাই যেন গাহিতেছে ;—

"কিনভারি পিচকারীরে মঁয়তো সারী ভিজগয়ী'

এই ভাবে যে ভিজিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, এইরূপ কৃপার নাম "অযাচিতা"।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

ভারতের স্বাধীন রাজগণের স্বাধীনতা।

মেটিারীর রামদাস বাবুর যেমন প্রভূত বল ছিল, তেমনি সুবিশাল বপুখানি * একদা রথের মেলাতে তিনি মাতঙ্গারোহণে কৃষ্ণনগরে আগমন করায় দেশ বিদেশ হইতে সমাগত দর্শকবৃন্দ স্তম্ভিত ভাবে হাঁ করিয়া তাঁহার প্রতি তাকাইতেছিল দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, —"ওরূপ একদৃষ্টে কি দেখিতেছ ? তোমরা কি কখন হাতী দেখ নাই ? তদুত্তরে সহাস্য বদনে তাহারা বলে, "বাবু হাতী আমরা অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু হাতীর উপর হাতী কখন দেখি নাই, তাই এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার অবাক্ হইয়া দেখিতেছি।" ঐরূপ অবাক্ হইয়া কি আমরা আজ বৃটীশ সাম্রাজ্যের দিকে তাকাইতেছি না ? কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমরাও ঐ রথযাত্রীদের মত বলিব,—"বিস্ময়-বিমুগ্ধভাবে অনিমেষনেত্রে আমরা আজ বৃটীশ সিংহের দিকে তাকাইয়া আছি। ইহার বিশেষ হেতু এই যে, সিংহ অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু সিংহের পৃষ্ঠে সিংহ কখন দেখি নাই। তাই আজ হতভম্ব হইয়া হাঁ করিয়া বৃটীশ পশুরাজের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে হইয়াছে। এরূপ অভি-

---

* অনেকেই জানেন, বর্দ্ধমান ও নদীয়া এই দুই জেলার সীমান্ত স্থানে ভাগীরথী তীরে মেটিরী নামে একখানি গণ্ডগ্রাম আছে। এই গমনোন্মুখ শতাব্দীর মাঝামাঝি তথাকার জমীদার বংশের রামদাস বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। মেটিরীর রামদাস বাবুর নাম সে সময়ে জানিত না, এমন লোক বাঙ্গলায় কম ছিল। বিপুল ধন সম্পত্তি, প্রজারঞ্জনাদি সদ্গুণ, "রায় বাহাদুর" "রাজাবাহাদুর" ছিঃ এ ছাই ইত্যাদি খেতাব, এ সকল কোন কারণে তিনি যশস্বী ছিলেন না। ইদানীং যাহা নিতান্ত বিরল হইয়া পড়িয়াছে, তাহারই জন্য রামদাস বাবুর প্রতিপত্তি—রামদাস বাবু সুবিখ্যাত বীর-পালোয়ান ছিলেন। রামদাস বাবু, আসানন্দ ঢেঁকি, যে কয় জন বীরপুরুষের সে সময়ে অভ্যুদয় হয়, তাঁহাদিগকে দেখিলে বিদেশীয়গণ অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন যে,দারুণ অখ্যাতিগ্রস্ত বাঙ্গালী জাতির মধ্যেও বীরের জন্ম অসম্ভব নয়। রামদাস বাবুর দৈহিক শক্তি সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য, একটী মাত্র ঘটনার উল্লেখ দ্বারা তাঁহার পরিচয় দিব। এক বৎসর বর্ষাকালে ভাগীরথীকূলে ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়া তাঁহাদের গঙ্গাতীরস্থ রামসীতার মন্দির সঙ্কটাপন্ন হয়। এক দিন সন্ধ্যাকালে এরূপ অবস্থা যে বিলক্ষণ বুঝা গেল, নিশাবসানে দেবমন্দির বা তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানের চিহ্নমাত্রও কাহারও নয়নগোচর হইবে না। রামদাস গৃহে উপস্থিত নাই, স্থানান্তরে গিয়াছেন, তাঁহার দেব-ভক্ত পিতা বড়ই ব্যাকুল হইলেন, কি উপায়ে মন্দিরস্থ চারিটী বিপুল ধাতব বিগ্রহ রক্ষা পায়। সে সময়ে গ্রামে এমন কোন বন্দোবস্তের উপায় ছিল না, যাহাতে সত্বর ঐ দশবার মণ মাল তফাৎ করা যায়। আর এক আধঘণ্টার মধ্যেই বিগ্রহ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সহ মন্দির গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইবে, এমন সময় রামদাস গৃহে উপনীত হইয়া বৃত্তান্ত শুনিবামাত্র মন্দিরে গমন করত, দুই বগলে দুইটী করিয়া বিগ্রহ এবং ক্রমে অন্যান্য সামগ্রী চকিতের ন্যায় বাসভবনে আনিয়া ফেলিলেন।

নব দৃশ্য শুধু আমরা কেন সমগ্র সংসার কখন দেখে নাই। ইতিহাসে এবং বর্ত্তমানে বিস্তর সাম্রাজ্যের বৃত্তান্ত জ্ঞাত আছি, কিন্তু এক সাম্রাজ্যের উদরস্থ আর এক বিশাল সাম্রাজ্য, ইহা সংসারের জ্ঞানে নাই,' কেহ কখন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে সমর্থ হয় নাই। এরূপ অঘটন কেবলমাত্র দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত ইংরাজ বাহাদুর অধুনা ঘটাইয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে চমক্ লাগাইয়াছেন।" পাঠক ভাবিয়া দেখুন, এই বিদ্যুৎ, রেল, সভ্যতা, আলোকের সময়ে আয়তন, প্রকৃতি সংখ্যা, ধনসম্পত্তি, বলবুদ্ধি-কৌশল, রাজনীতি, অক্ষুণ্ণ প্রতাপ, নগরাদির সংখ্যা সমৃদ্ধি ও সৌষ্টব, ইত্যাদি বিষয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের যেরূপ প্রাধান্য, তাহার সহিত পুরাকালের সাম্রাজ্য সমূহের তুলনাই হয় না, আধুনিক গুলি ত ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। তবে এই পেটাও সাম্রাজ্য বাদ দিলে উপনিবেশাদি লইয়া শ্বেতদ্বীপ কোন্ পদবীতে দাঁড়াইতে পারেন, সেটা আমাদের বিচার্য্য বিষয় নহে। সুতরাং অন্যান্য অংশের কথা রাখিয়া এখন প্রকৃত প্রস্তাবে আসা যাউক।

ব্রহ্মার সৃষ্টি অবধি মুসলমান বাদশাহী পর্য্যন্ত কোন সময়ে এই সসাগরা সদ্বীপা ভারতক্ষেত্র একজন সম্রাটের ষোল আনা বশীভূত থাকিয়া এক আইনে এক নিয়মে সুশাসিত হয় নাই। অনেক মহামহাবীর চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই সফলকাম হইতে পারেন নাই। পুরাণাদির প্রমাণে জানা যায় যে, কেবল মাত্র যুধিষ্ঠির যাহা কিছু করিতে পারিয়াছিলেন, নচেৎ তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে কেহই ভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিতে সক্ষম হন নাই। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে দেখা যায় যে, এ দিকে ব্রহ্ম শ্যাম প্রভৃতি এবং ওদিকে গান্ধারাদি বহুদেশ হইতে নৃপতিগণ আমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞস্থলের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। উহাকে অনায়াসে আমরা প্রেমের দরবার বলিতে পরি, ধর্ম্ম,প্রেম ও রাজনীতি এই তিনটী একত্রিত ভাবে উক্ত সভা আহ্বান করিয়াছিল। যে সকল নরপাল সমাহূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ভাবে আপন আপন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের রাজধানীতে আসিয়া যে শ্রেণীর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা মহতের নিকট ক্ষুদ্রের মস্তকাবনমন মাত্র। উহা ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের লিটন দরবারের মত নয়। সাদৃশ্যের মধ্যে এইটুকু যে, উভয় দরবার একই স্থানে বসিয়াছিল। ভারতের করদ মিত্র রাজ্যগুলির উপর সম্পূর্ণরূপে আধিপত্য সংস্থাপনই শেষদরবারের উদ্দেশ্য। এক স্থানে সকলকে সমবেত করিয়া উপযুক্ত মর্য্যাদা রবাবের সহিত ঘোষণাপত্র প্রচার দ্বারা সাম্রাজ্যের দৃঢ়ীকরণ জন্যই এই বিপুল আয়োজন করা হয়। অনেকে হয়ত সে সময় খেয়াল না করিয়া থাকিবেন যে, দরবারের প্রারম্ভে সমবেত আহূত ব্যক্তিগণকে "Princes and Noblemen" বলিয়া সম্বোধন করা হয়, কিন্তু শেষকালে তাঁহাদিকেই 'Nobles and Gentlemen' আখ্যা দ্বারা উপসংহার সম্পন্ন হয়। তৎপূর্ব্বে নিজাম প্রভৃতি কয়েকজন নরপতির কুইনের সঙ্গে সমান ২১ তোপ সেলামী ছিল। উক্ত দরবার হইতে এম্প্রেসের ১০১ তোপ এবং বড়লাট সাহেবের ৩১তোপ নির্দ্ধারিত হয়। ঐ সময় হইতে 'মহারাজা'

খেতাবটাও খুব সস্তা হইয়া পড়ে ; তৎপূর্ব্বে ওরূপ ছিল না। তাহাতে বড়ই অসামঞ্জস্যের কারণ হইয়াছে, সন্দেহ নাই :—দুই লক্ষ টাকা মাত্র বার্ষিক আয়, এমন একজন সাধারণ জমীদার হয়ত বাবু পদবী হইতে ধীরে ধীরে "মহারাজা বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হইলেন, অথচ সহস্র বৎসরের প্রাচীন সিংহাসনে উপবিষ্ট প্রকৃত স্বাধীন নরপতির বংশধরকে 'রাজা' 'রাও' বা 'ঠাকুর' আখ্যাতে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে। অবশ্য কালমাহাত্ম্যে দেশীয় ভূপতিগণ নিজেদের দোষেই অবনত হইয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া হাজার সমৃদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ জমীদার শ্রেণীর বৃটীশ প্রজাপেক্ষা তাঁহারা সম্মানার্হ, সে বিষয়ে আপত্তি করিবার ত কোন কারণ দেখা যায় না।

এখন দেখা যাউক, আমাদের দেশীয় ভূপালগণের বর্ত্তমান অবস্থা কি ? মুসলমান সম্রাটের পূর্ব্বে উহারা কিরূপ ভাবে রাজত্ব করিতেন, সে বিষয়ে আমরা বেশী কিছু জানি না। বাদশাহী আমলে উহারা দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করিয়াও পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহাদি এবং স্বরাজ্য আপন খেয়াল অনুযায়ী শাসন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। দিল্লীতে মধ্যে মধ্যে কিছু কর পাঠান পর্য্যন্ত সম্পর্ক ছিল; তদ্ব্যতীত বাদশাহের পক্ষ হইতে তাঁহাদের উপর কোন প্রকারের দৃষ্টি ছিল না। রাজাদের ত ওরূপ উন্মুক্ত অবস্থা ছিলই, সম্রাটের নিযুক্ত সুবাদারগণও ঐ প্রকার স্বাধীন ভাবে শাসন করিতেন। ক্রমে উক্তরূপের দরাজ হাত-পা-ছড়ান পদ হইতে বর্ত্তমান সাম্রাজ্যের কিহাল হইয়াছে, আলোচনা করা যাউক। মুসলমান শাসন হইতেই তাঁহাদের সিংহাসনের নাম "গদী" হইয়াছে। গদী শব্দ সর্ব্বপ্রকার উচ্চাসনের প্রতিই ব্যবহার করা যায়; মঠের মহান্তদিগের আসনকেও গদী বলে, বড় বড় পুরাতন জমীদারের পদকেও গদী বলে। তক্ত্ অর্থাৎ সিংহাসন শব্দ কেবল দিল্লীর প্রতিই প্রযুজ্য ছিল। সেই গদী শব্দ উহাদের রাজাসন সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ও বিষয়ে বাদশাহী ও ইংরাজী আমলে তাঁহাদের পক্ষে কোন তারতম্য ঘটে নাই। তারতম্য ঘটিয়াছে, আসল জায়গায়। প্রথম প্রথম কোম্পানির সময়ে এই নরপতিগণের প্রধান প্রধান গুলিকে মিত্র ভূপাল রূপে গণনা করা হইত, কারণ তখন উহাদের বিশেষ প্রতাপছিল, কোম্পানি বাহাদুরকে মধ্যে মধ্যে উহাদের সাহায্যে অনেক কার্য্য উদ্ধার করিতে হইত; সুতরাং এরূপ বাধ্যবাধকতা সত্ত্বে প্রয়োজন সাধন জন্য সর্ব্বদা উহাদের মুখাপেক্ষা না করিয়া উপায় ছিল না। দিল্লী টুটিবার পরেও সময়ে সময়ে বড় রাজারা অনেক স্থলে কোম্পানির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেও ছাড়েন নাই। সে এক স্বতন্ত্র অবস্থা ছিল। ক্রমে ক্রমে বৃটীশ কামানের প্রখর তেজ দেশ মধ্যে যত প্রচারিত হইতে লাগিল, উহারাও সেই পরিমাণে বৃটীশ সিংহের নিকট মস্তক অবনত করিতে থাকিলেন। ধীরে ধীরে এরূপ বাঁধা বাঁধি হইয়া উঠিল যে, অস্ত্রধারণের বীরোচিত কার্য্য হইতে উহাদিগকে অবসর লইতে হইল। তাহার পর যে সকল সৈন্য সামন্ত রহিল, তাহারা কেবল মাত্র শোভা সৌষ্টব সম্পাদনে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ইংরাজের শীতল ছায়ায় রাজারা নিরাপদে নিশ্চিন্তভাবে কালাতিপাত করিতে পাওয়ায় ক্রমে বিলাসিতা বৃদ্ধি পাইয়া বীর

বংশধরদিগকে কোমল শয্যাভোগী সুকুমার ননীর পুতুল করিয়া তুলিল। রাজ্য শাসনের বিশেষ গুরুতর ভারগুলি প্রকারান্তরে ইংরাজ রেসিডেণ্টগণের হস্তে ন্যস্ত হইল, মোটামুটি সাধারণ কার্য্য সমূহ দেওয়ান, মন্ত্রী, কৌন্সিল দ্বারা চলিতে লাগিল, রাজার বিশেষ আর কোন কাজ নাই। ভারতের একঘেয়ে ভোগবিলাসে ক্রমে অরুচি বোধ হইবারই কথা; তখন ইউরোপীয় ভোগ বিলাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন। ক্রমে ঘন ঘন বিলাত গমন আরম্ভ হইল। টাকার দুঃখ নাই; ইচ্ছা করিলেই বড় বড় আরামের জাহাজ পাওয়া যায়, তবে আর ভাবনা কি? এ কথা খেয়ালে আসে নাই যে, তাঁহাদিগকে ইংরাজ বাহাদুর বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া আপনাপন পদে অবিষ্ঠিত রাখিয়াছেন,কেবল সাম্রাজ্যের শোভা রক্ষার্থ। সম্রাট নাম রাখিতে গেলে, তাঁহার অধীনে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতি না রাখিলে ভাল দেখায় না। এটাও খেয়াল করেন নাই যে, নামে স্বাধীন রাজা হইলেও তাঁহারা "দোলতে ইংলিশীয়া"—নিজ নিজ পৈতৃক রাজ্যের সুশাসন কার্য্য সম্পাদনার্থ ইংরাজরাজ কর্ত্তৃক তৎপ্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত স্থায়ী লেপ্টেনাণ্ট-গবর্ণর স্বরূপ। তবে বহুকাল হইতে যে সকল ভূপালোচিত সত্ব সম্ভোগ করিয়া আসিতেছেন,তন্মধ্যে আভ্যন্তরিক কতকগুলি এখনও রক্ষিত হইয়াছে. ইহার জন্য উঁহাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সুবিচক্ষণ, প্রজাবৎসল, বড়লাট কর্জ্জন বাহাদুর এসম্বন্ধে অতি সমীচীন মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছেন।* বড় লাটের উক্ত শাসন বাক্য প্রচারের পরে বোধ হয় নরপতি মহোদয়গণের সংজ্ঞা হইয়া থাকিবে যে, তাঁহারা কোথায়। এ তাবৎ বোধ হয় তাঁহাদের জ্ঞান ছিল যে, রেসিডেণ্টের মন যোগাইতে কোন প্রকার ত্রুটি করিতেছেন না, সিমলা দার্জ্জিলিঙ্গ শৈলে বড় বড় সাহেব মেমদিগকে খানা, বল্, ভেট দিতেছেন, মধ্যে মধ্যে দেশ বিদেশে বৃটীশ সিংহের জয় ঘোষণাতে হুলুধ্বনি,আতস্ বাজী উড়াইতেছেন, সময়ে সময়ে রাজরাজেশ্বরীর সুখ দুঃখে যথা বাহিত হর্ষ বিষাদ প্রকাশ করিয়া মামুলী এক এক খান লম্বা লম্বা নিবেদন পত্র তাঁহার নিকট পেশ জন্য লাট সকাশে পাঠাইতেন; আর কি চাই? আবার সকল দোষ ত্রুটি হজম করিবার জন্য মোটা মোটা বেতনে শ্বেতাঙ্গ পুরুষগণকে কর্ম্মচারীও নিযুক্ত করিয়াছেন, তবে আর কিসের আশঙ্কা? নিজের সর্ব্বপ্রকার আলস্য, শিথিলতা, জড়তা, ঔদাসীন্য, অমনোযোগ, অনুপস্থিতি,সমস্ত নিশ্চয় উপেক্ষিত হইবে। তদতিরিক্ত যখন মধ্যে মধ্যে বিলাত গমন দ্বারা খোদ বড় কর্ত্তা ষ্টেট সেক্রেটারী মহোদয়কেও নানা প্রকারে খুশী করিয়া আসিতেছেন, স্বয়ং ভারতেশ্বরীর প্রাসাদে সম্মানিত হইয়া প্রত্যাগমন করিতেছেন, তখন ত সাতখুন মাপ, আর কে পায়! এযাবত বড়লাটগণ কখন কেহ কিছু বলেন নাই,

* "The Government of India hold very strongly to the opinion that the first and paramount duty of a Native Prince or Chief lies towards his own State and people. By the *protection and authority* of the Supreme Government, he is guaranteed a security of *tenure* in his exalted station. In return for these advantages the Government are entitled to claim that the ruler shall devote his best energies, not to the pursuit of pleasure, nor to the cultivation of absentee interests or amusements, but to the welfare of his own subjects and administration:—India Govt. Resolution, Dated 20 July, 1900."

তাহাতেও প্রশ্রয় পাইবার কথা। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি কর্জ্জন কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া, এক মাত্র ইংরাজ শাসনের উদার প্রজাবৎসল রাজনীতির বশবর্ত্তী হইয়া, বিনা মুখাপেক্ষায় সরল ভাষায় উহাদিগকে বুঝাইতে অগ্রসর হইয়াছেন যে, ব্যক্তিগত খুশী খোসামোদে আসল কাজে ক্রটি উপেক্ষা করা বৃটিশ শাসন প্রণালীর নীতি বিরুদ্ধ।

কর্জ্জন বাহাদুর তাঁহার অনুশাসন পত্রে ঐ কয়টী কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। উনি এ পর্য্যন্ত বলিতে ক্রটি করেন নাই যে, সর্ব্বদা সখের জন্য ইউরোপ গমনাগমন করিলে দেশীয় রাজাদের মতিগতি খারাপ হইয়া থাকে—the result is a collection of questionable proclivities in the mind of the returned traveller—বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহা আমাদের ভূপতিগণের পক্ষে অনিবার্য্য ফল বলিয়া বিশ্বাস করিতেই হইবে। আমাদের দেশে দশ হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের কোন ব্যক্তির যদি একটী মাত্র পুত্র থাকে, তাহা হইলে সেই সবে ধন-নীলমণির ভাগ্যে কিরূপ শিক্ষালাভ ঘটিতে পারে, অনায়াসেই বুঝা যায়। সে ক্ষেত্রে বিপুল ধনরত্ন বিশাল রাজ্যের উত্তরাধিকারী যুবরাজগণের বিদ্যোপার্জ্জন সম্বন্ধে আর কি বক্তব্য হইতে পারে। এই সকল ব্যক্তি আপনাদের পদমর্য্যাদা ও ঐশ্বর্য্যের জাঁকজমক প্রদর্শন করিতে যখন ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি রাজ্যে উপনীত হন, তখন তাঁহাদের অদৃষ্টপূর্ব্ব সহচর অনুচরের সংখ্যা, হাবভাব, পোষাক পরিচ্ছদ এবং তাঁহাদের নিজেদের বেশ ভূষা প্রভৃতির চাকচিক্য চমক্ দেখিয়া অন্যান্য অভিপ্রায় ব্যতীত শুধু কৌতুহল চরিতার্থ জন্য যে উচ্চনীচ কত শ্রেণীর কত প্রকার নরনারী তাঁহাদের সংসর্গে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। ওরূপ স্থলে মাথা ঠিক রাখা প্রবল মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণের পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠে, উঁহাদের কথা আর কি বলিব। লাট সাহেব যে বলিয়াছেন "temptations of European society" দ্বারা তাঁহাদের অধিকাংশের চিত্তের অবস্থা মন্দের দিকে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, এখন একটা কথা উঠিয়াছে, এবং তাহা নিতান্ত অসঙ্গত নয় যে, এ প্রকারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়া দেশীয় রাজাদের ইউরোপগমনসম্বন্ধে অনুজ্ঞা প্রচার করা কতদূর সাধারণ নীতির অনুযায়ী হইতে পারে। একজন সামান্য প্রজা বা জমীদার শ্রেণীর লোকের উপর ত ওরূপ হুকুম প্রচার করা যাইতে পারে না; তবে কি ইঁহারা তাহাদের অপেক্ষাও পরাধীন? এখানে বিচার্য্য এই যে,পদমর্য্যাদাতে যত উচ্চে উঠিতে চাও, ততঃ আপনাকে পরাধীন করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। একজন নিম্ন শ্রেণীর লোক অনায়াসে একখান গামছা স্কন্ধে ফেলিয়া পথে বাহির হইতে পারে বলিয়া তুমি আমি তাহা পারিব না। আবার আমরা যে ভাবে পথে বেড়াইতে পারি, একজন রাজা মহারাজা তাহা পারেন না। ইহা ত গেল সাধারণের সমালোচনার মুখাপেক্ষা-জনিত পরাধীনতা। এক জন উকীল যে পোষাকে হাইকোর্টে দাঁড়াইয়া কাজ করিতে পারেন, একজন বারিষ্টর সে পোষাকে পারে না, ইহা

রাজকীয় নিয়মের পরাধীনতা। এইরূপ পরাধীনতা কত প্রকার আছে। অধিক আর কি বলিব, অনেক বিষয়ে ভারতেশ্বরী আপন সাম্রাজ্যের নিয়মাদির পরাধীন। ইচ্ছা ও অর্থ বল থাকিলে তুমি আমি অনায়াসে কাহারও মতামত না গ্রহণ করিয়া ভূপ্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারি; কিন্তু অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী বৃটীশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়া ভিক্টোরিয়ারও স্বাধীনতা টুকু নাই। পার্লামেণ্টের বিশেষ অনুমোদন ব্যতীত উনি তাহা পারেন না, এবং পার্লামেণ্টও বিশেষ বিশেষ কারণে উক্ত বিষয়ে হয়ত কখনই মত দিবেন না। সুতরাং জানিতে হইবে যে, পরাধীনতা নানারূপে নানা শ্রেণীর লোকের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে। উহা জীবমাত্রের এক কঠিন প্রভু।

দেশীয় রাজগণের জানা উচিত যে, উঁহাদের প্রজাবর্গ বা মোসাহেবগণ * যত প্রকার চাটুবাক্য দ্বারা উঁহাদিগকে স্বর্গে তুলুন কেন, বাস্তবিক তাঁহারা ট্রষ্টী বই কিছু নন। দায়িত্ব উঁহাদের ভয়ানক; তাহা লাট বাহাদুর বিলক্ষণ স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। "রাজার জন্য প্রজা" এ কথা বহুদিন অসার বাক্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছে; এখনকার নীতি "প্রজার জন্যই রাজা।" সেকাল আর নাই, Divine right of kings"—"দিল্লীশ্বরে বা জগদীশ্বরোবা" এখন বাতুলাশ্রমে আশ্রয় লইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে প্রজাহিতবিরোধী নরপতিগণের প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা বিহিত, তাহা ব্রাজীলের সম্রাট ডম্ পিদ্রোর ক্ষেত্রে ব্রাজীলীয় প্রজাগণ দেখাইয়াছেন। তিনি ত সম্রাট ছিলেন। ব্রাজীল দূরের কথা; ভারতে দেশীয় রাজগণ সম্বন্ধে সর্ব্বদা কিরূপ বিচার ও আদেশ হইতেছে, তাহা ত আর কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হইবে না।

* বিশ বৎসরের অধিক হইল লেখক রাজপুতানা, মালব, গুজরাট, কাঠিয়াড়, কচ্ছ প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যসমূহ পর্য্যটন কালে কোন স্থলে উক্ত মোসাহেব বা হজুরী মহাপুরুষগণের অত্যাচার সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ স্বতঃ তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, এবং যে গুলি প্রত্যক্ষ দেখিতে পান, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে বিষম ব্যাপার। স্থান বিশেষে স্বয়ং নরপতির আদেশ বা অনুমোদনে উৎপীড়ন হইতে দেখা গিয়াছে। পদচ্যুত পুরবন্দরের বৃদ্ধ রাণা (এখন মৃত) একজন বিশেষ দৃষ্টান্ত। তিনি ধরা পড়িয়াছিলেন বলিয়া কেবল মাত্র তাঁহারই নাম করা হইল। পুলিস ও রাজস্ব বিভাগের জোর, জুলুম, পীড়ন ত নিত্য নৈমিত্তিক গা-সওয়া ব্যাপার। রেসিডেণ্ট প্রভৃতির নিকট সব নালিস পঁহুছাইতে পারে, এমন সাধ্য কাহার? উক্ত হজুরীগণ রাজার চিরসঙ্গী রাজপ্রাসাদেই রাজভোগে অতি সুখে কালাতিপাত করেন। সকলেই বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করত সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছেন; কোন কোন রাজা উঁহাদের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রধান কার্য্য রাজ্যের ছোট বড় সমস্ত সংবাদ রাজার কর্ণগোচর করত তাঁহার হর্ষ বিষাদ জন্মাইয়া প্রীত বা ক্রুদ্ধ করা। এই শ্রেণীর মধ্যে একজন প্রধান থাকেন, তাঁহার নাম হজুরীখাশ বা প্রাইবেট সেক্রেটারী। রাজ্য মধ্যে ভাল মন্দ ঘটাইতে তাঁহার ক্ষমতা প্রায় সর্ব্বশক্তিমানের কাছাকাছি। "এ রাজার প্রতি অবিচার হইল," "এ রাজার প্রতি অন্যায় হইল," বলিয়া আমরা যে মধ্যে মধ্যে চীৎকার করি, সেই কেবল মাত্র আমাদের একদেশদর্শিতার জন্য। এক বার স্বাধীন রাজ্য গুলির অভ্যন্তরের কাণ্ড কারখানা দেখিয়া যাইলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, বৃটীশ প্রজা কত নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ।

উপসংহারে ইহা বক্তব্য যে, সমস্ত দিক বিচার করিয়া ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধি স্বরূপে বড় লাট কর্জ্জন বাহাদুর যে অনুশাসন পত্র ঘোষণা দ্বারা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে দোষের কিছু নাই, তাঁহার যুক্তি গুলি সহজ ও সমীচীন, এবং তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ। সুতরাং উহা দ্বারা সমূহ ইষ্টেরই সম্ভাবনা। সাধারণ গেজেট ওরূপ শাসন বাক্য প্রচারিত হওয়ায় অনেকের মনে দুঃখ হইয়া থাকিবে। বড় ঝড় বড় বড় গাছেই অতি তীব্রভাবে লাগিয়া থাকে। যাহা হউক, এখন দেশীয় রাজগণকে লাট সাহেবের উপদেশানুযায়ী কাজ করিতে দেখিলে আমরা সুখী হইব, এবং তাঁহাদের প্রজাবর্গ সুখ সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে থাকিবে।

শ্রীচন্দ্র শেখর সেন।

দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন।

এই দর্শন শাস্ত্র ভারতে কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, দর্শন শাস্ত্রের প্রয়োজন ও উৎপত্তির কারণ কি, তাহা আমরা এক্ষণে আলোচনা করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মনুষ্য সমাজ উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে না পারিলে ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্র চর্চ্চার অধিকারী হয় না। প্রথমে ধর্ম্মের স্থাপনা হয়। ধর্ম্মের শেষ পরিণতি দর্শনশাস্ত্র। সুতরাং যে সমাজ স্বাভাবিক ক্রমোন্নতি নিয়মবশে ক্রমে উন্নত হয়, ও যদি বাহিরের অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নত সমাজের সম্পর্ক বিনা স্বতঃ বা স্বাভাবিক চেষ্টায় সে সমাজ উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারে, তবে সে সমাজে দর্শন শাস্ত্র ধর্ম্ম ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হয় (১)। আমাদের দেশে ধর্ম্ম বুঝাইতে, বেদ বুঝাইতেই দর্শনশাস্ত্রের প্রথম সৃষ্টি হয়। ইউরোপে মধ্যযুগের অধিকাংশ দর্শনশাস্ত্রই খ্রীষ্টধর্ম্মতত্ত্ব প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা প্রচার করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল। বৌদ্ধদর্শনও বৌদ্ধ ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য সৃষ্ট হয়। গ্রীসদেশে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই। তাহার কারণ, গ্রীসদেশে দর্শন শাস্ত্রের স্বতঃ স্ফূর্ত্তি হয় নাই, ভারতের দর্শন আলোচনার অনুকরণে গ্রীক পণ্ডিতগণ দর্শন চর্চ্চা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক, ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিত্তিতে এদেশে দর্শনশাস্ত্র কিরূপে ও কি প্রয়োজনে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা এস্থলে মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। সেকথা বুঝিতে হইলে ধর্ম্মতত্ত্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে ও বেদ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা জানিতে হইবে।

আমাদের অন্তঃকরণের তিন প্রকার বৃত্তি, তাহা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন।

(১) ফরাশি দার্শনিক কুঁজে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

"Religion is the foundation of every civilization. Religion is the cradle of Philosophy. ...... Religion contains Philosophy."

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন,

"The whole of Indian Philosophy appears to be only an interpretation, more or less free of the religious books of India." Cousin's History of Philosophy Vol I.p32

সেই তিন বৃত্তি—জ্ঞান, কর্ম্ম ও চিত্ত (২) সেই জন্য মানুষ জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা, কর্ত্তা ও ভোক্তা। মানুষের এই সকল শক্তির ক্রম বিকাশ হয়। বালকের বা অসভ্য সমাজের লোকের এই সকল শক্তি পরিমিত। মানুষ যতক্ষণ স্বার্থ বা বাসনা চালিত হয়, কেবল সুখজ বিষয় সংগ্রহ ও দুঃখজ বিষয় পরিহার হেতু প্রবৃত্ত হয়, ততক্ষণ তাহার জ্ঞান শক্তির প্রকৃত বিকাশ আরম্ভ হয় না। বাসনা সংযত করিয়া, আপনাকে ভুলিয়া মানুষ যখন বাহ্য বিষয় আলোচনা করিতে শিক্ষা করে, কর্ত্তা ও ভোক্তা অবস্থা ভুলিয়া জ্ঞাতা হইতে চেষ্টা করে, তখন তাহার জ্ঞানের বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। তখন সে দ্রষ্টা হইতে পারে। তাহার পর যখন জ্ঞানের অজ্ঞানাবরণ উন্মোচিত হয়, তখন সে প্রকৃত দ্রষ্টা হয়। (৩)

এই দৃষ্টি দুই রূপ-স্বতঃস্ফূর্ত্ত আর যুক্তি ও প্রমাণ হইতে জাত। স্বতঃস্ফূর্ত্ত দৃষ্টি বাহ্য ও আন্তর প্রত্যক্ষজ। স্থূল বিষয় বাহ্য দৃষ্টির অন্তর্গত, আর বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর সূক্ষ্ম বিষয় আন্তর দৃষ্টির অন্তর্গত। মানুষের এই বাসনা-বিহীন স্বরূপ দৃষ্টিতে বাহ্যজগৎতত্ত্ব প্রথম প্রতিভাত হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিশেষতঃ চক্ষু দ্বারা এই জগৎ-জ্ঞান লাভ হয়। ক্রমে এই জগৎ দৃষ্টি হইতে দ্রষ্টার স্বরূপ জানিবার চেষ্টা হয়। ক্রমে দ্রষ্টা ও দৃষ্টের অর্থাৎ বিষয় ও বিষয়ীর একত্ব অনুভূত হয়।

এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত বাহ্য দৃষ্টি হইতে চিত্ত-রঞ্জিনী বিদ্যার সৃষ্টি হয়। আর স্বতঃস্ফূর্ত্ত সূক্ষ্ম বা আন্তর দৃষ্টি হইতে ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি হয়। প্রমাণজ বাহ্যদৃষ্টি হইতে প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর প্রমাণজ আন্তর দৃষ্টি হইতে দর্শনের উৎপত্তি হয়। সুতরাং স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্তর প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ অনুভূতি হইতে যে ধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞানে প্রতিভাত হয়, প্রমাণজ আন্তর দৃষ্টি হইতে সেই তত্ত্ব লাভ করাই দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই আন্তর প্রত্যক্ষ স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব বিনা যুক্তি ও প্রমাণে অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হয়, তাহাই বেদ। (৪)

পণ্ডিতগণ জানেন, বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষিগণ সাধারণ মনুষ্য ছিলেন না। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, সপেনহরের ন্যায় আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এই সকল ঋষিগণ মহাপুরুষ অতিমানবশক্তিসম্পন্ন ছিলেন।

(২) কেহ কেহ জ্ঞানকে বৃত্তি বলেন না, কেননা জ্ঞান আত্মার স্বরূপ। তাঁহারা জ্ঞানের পরিবর্ত্তে বুদ্ধিকেই অন্তঃকরণ বৃত্তি বলেন। বেদান্ত মতে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারিটিই অন্তঃকরণ বৃত্তি। ইংরাজিতে যাহাকে understanding বা (intellect) বলে, তাহাই এই বুদ্ধি। জ্ঞান বলিলে transcendental Reason বুঝায়। কোন কোন বৈদান্তিকের মতে মন ও বুদ্ধি কেবল এই দুইটীই মূল অন্তঃকরণ বৃত্তি। বৈদান্তিকগণের মতে অন্তঃকরণ বৃত্তি প্রকৃতিজ বা অজ্ঞানজ, আর জ্ঞান আত্মারই স্বরূপ। এ সকল বিষয় যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

(৩) এই অজ্ঞানাবরণ কাহাকে বলে, তাহা যথা স্থানে বিবৃত হইবে।

(৪) বেদেই উল্লিখিত আছে, "যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞের দ্বারা বেদলাভে যোগ্য হইয়া ঋষিস্থিত সেই সেই বেদ লাভ করিয়াছেন।" এইরূপে বেদ ক্রমে প্রচারিত হইয়াছিল।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

অতএব বিশ্বাস করা উচিত, প্রাচীনেরা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাবে দেবতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভাষণাদি

নির্ম্মল ছিল, সেই পরিমাণে তিনি সত্য লাভ করিয়াছিলেন। চিত্তপূর্ণরূপে নির্ম্মল না হইলে পূর্ণসত্য এরূপে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে চিত্তে স্ফূর্ত্ত হইতে পারে না। ভোক্তা কর্ত্তা ভাব একেবারে লোপ হইয়া পূর্ণজ্ঞাতা ভাবের বিকাশ না হইলে পূর্ণজ্ঞান চিত্তে প্রতিফলিত হয় না। এই কথা বুঝিতে হইলে এই সম্বন্ধে মনে করিতে হইবে যে, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা চিৎস্বরূপ। জীব চিৎজ্ঞান স্বরূপ। জ্ঞান এই চিতের ধর্ম্ম বা স্বভাব। কিন্তু জীবজ্ঞান অজ্ঞান আবরণে আবরিত। ইন্দ্রিয় বৃত্তি, প্রাণ বৃত্তি ও অন্তঃকরণ বৃত্তিতে মানুষের আত্মা অধ্যাসিত। আত্মা এই অজ্ঞানাবরণ দূর করিয়া আত্মস্বরূপে অবস্থান করিতে না পারিলে আত্মাতে সত্য প্রতিভাত হয় না। দর্পণ মলাবৃত থাকিলে তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না। এই মলা দূর করিলে তবে তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়িবে। জ্ঞানস্বরূপ আত্মার মলা যে পরিমাণে নষ্ট হয়, সেই পরিমাণে তাহাতে সত্য প্রতিভাত হয়। এই তত্ত্ব এস্থানে আর বিস্তারিত বুঝাবার আবশ্যক নাই।

যিনি এইরূপ নির্ম্মল চিত্ত হইতে পারেন, তাঁহারই জ্ঞানে সত্য স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয় (১)। আর যাঁহারা মানব সমাজের জ্ঞানোন্মেষের প্রথম সময়ে সকলের অগ্রণী হইয়া চিত্তের নির্ম্মলতা হেতু এই সত্য প্রথমে দর্শন করিয়া প্রচার করেন, সেই মহাপুরুষদের সংগৃহীত সত্য সকল অবলম্বন করিয়া, তাহার অনুসরণ করিয়া যে সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, সেই মহাপুরুষদের সংগৃহীত সেই মহাবাক্য সকলই বেদ। কিন্তু বেদ বলিতে মানব দৃষ্টির প্রথম বিকাশ অবস্থা হইতে পূর্ণ বিকাশ অবস্থা পর্য্যন্ত আগমন করিতে যতগুলি বিভিন্ন স্তর দিয়া

করিতে সমর্থ ছিলেন। যোগসূত্রেতেও আছে,—মন্ত্র জপের দ্বারা ইষ্টদেবতার দর্শন হয়। যাহার ফল প্রত্যক্ষ, যাহার দ্বারা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়, কেবল মাত্র সাহস অবলম্বন করিয়া তাহার প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। শ্রুতিও যোগের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। * * যে যোগী যোগজনিত তেজোময় শরীর প্রাপ্ত হন, তাঁহার জরা মৃত্যু থাকে না। আমাদের শক্তির সহিত ঋষির শক্তি তুলিত হইতে পারে না।

(বেদান্তদর্শন ভাষ্য ১।৩।৩৩সূত্র)

পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ সপেনহরের কথা এস্থলে পুনরুল্লিখিত হইল :—

"Yet in the early ages, those who stood nearer to the beginning of the human race, had both greater energy of the intuitive faculty of knowledge, and a truer disposition of mind, so that they were capable of a purer, and a more direct comprehension of the inner being of nature,...... · Thus orginated in the primitive ancestors of the Brahmans—Rishis, the almost superhuman conceptions, which were afterwards set down in the upanishads of the Vedas." World as Will and Idea, Vol II, p 362.

"Those sublime authors of the upanishads of the Vedas, who can scarcely be thought of as mere men. Do, Vol III p. 265.

(১) ইউরোপীয় দার্শনিকপণ্ডিতগণের মধ্যে ফরাসি দার্শনিক কুজে এই তত্ত্ব ধারণা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"Inspiration is distinct from reflection It is the perception of truth, without the intervention of the will, and without mixture of personality. It is revelation, and is characterised by enthusiasm. It comes directly from God—the Eternal Reason."

"Truth in itself is as independent of man, in whom it appears. Its true subject is universal and absolute reason, that incorruptible intelligence of which ours is a fragment. But fallen as it (reason) is in man, and thereby in relation with the senses, passions and imagination, it has become fallible."
Cousin's History of Philosophy Vol I.

ক্রমে ২ অগ্রসর হইতে হয়,সেই সকল স্তরে প্রকাশিত সমস্ত সত্য সংগ্রহকেই বুঝায়।

যখনই যে কোন দেশে যে কোন কালে যে কোন মানব সমাজ অসভ্য পশুতুল্য অবস্থা হইতে,স্বপ্নময় অবস্থা হইতে জাগরিত হইয়া উন্নতির স্তরে আরোহণ করিতে আরম্ভ করে, ও ক্রমে ক্রমে উন্নতির শেষ সীমায় অগ্রসর হইতে থাকে, তখনই সেই সমাজে উন্নতির বিভিন্নস্তরে বিভিন্ন মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এই সকল সত্য আবিষ্কার করিতে থাকেন। এবং সমাজ সেই সকল সত্য অবলম্বন করিয়া বা তাহার অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। সমাজ যত উন্নত হয়, সেই পরিমাণে এই সকল সত্য লাভ করিতে থাকে। সেই পরিমাণে সেই সমাজে বেদোক্ত তত্ত্ব প্রতিভাত হয়। উন্নতির শেষ সীমায় আসিলে তবে সমগ্র বেদ লাভ করিতে পারা যায়।

বেদান্তমতে ব্যবহারিক জগৎ অনাদি। ইহার সৃষ্টিলয় অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত। এ জগতে কোথাও সৃষ্টি কোথাও লয় ক্রিয়া অবিরত চলিতেছে; আবার কখন এক সৃষ্টি লয় হইতেছে,আবার নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইতেছে। এই সৃষ্টি লয় প্রবাহ বরাবর চলিয়া আসিতেছে। যে নিত্য অনন্ত জ্ঞানে অনন্ত কাল ও স্থান প্রতিভাসিত, সেই অনন্ত জ্ঞানে এই সৃষ্টি লয় প্রবাহও নিত্য পরিকল্পিত। এক সৃষ্টির পরে যখন নূতন সৃষ্টি হয়, তখন সেই নূতন সৃষ্টি অতীত সৃষ্টির অনুরূপ হয়। এই জন্য শাস্ত্রে আছে,

"সূর্য্য চন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।"

সুতরাং সেই নূতন সৃষ্টি প্রবাহ অতীত সৃষ্টি প্রবাহের বাসনা বীজ হইতে জাত বলিয়া তাহার অনুরূপ হয়। এই জন্য সেই নূতন সৃষ্টিতে মানবের অনুরূপ জাতির সৃষ্টি হয় এবং সেই জাতি ক্রমোন্নীত হইয়া আবার সেই অতীত সৃষ্টির ন্যায় বেদ লাভ করিতে পারে। এই জন্য বেদ নিত্য। এই জন্য বেদ সমষ্টি মানবের জ্ঞান বা বুদ্ধি শক্তি হিরণ্য গর্ভ হইতে প্রত্যেক সৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়। ইহা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। এতত্ত্ব পরে উল্লিখিত হইবে।

যে সকল জাতি উন্নত হইয়া ক্রমে ক্রমে এই বেদ লাভ করিতে থাকে, সেই জাতির মধ্যে এই বেদ স্মরণ হেতু পরম্পরা প্রাপ্ত হইয়া প্রচলিত থাকে। এই জন্য বেদের আর এক নাম শ্রুতি। কখন কখন কোন জাতি মধ্যে সেই সকল সত্য কোন মহাপুরুষ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাকে চিরস্থায়ী করিয়াছেন। কোন কোন জাতি মধ্যে স্মৃতি লোপ হেতু ঐ সকল শ্রুত সত্য লোপ হইয়া যায়। সমাজ উন্নতির উচ্চ স্তরে আসিলে তবে এই সকল সত্য সংগৃহীত হয়। যদি এত দূর উন্নতির স্তরে আসিবার পূর্ব্বে সমাজের অবনতি আরম্ভ হয়, তবেই সেই জাতির বেদ ক্রমশঃ লোপ হয়। আমাদের দেশে আর্য্যসমাজে সংগৃহীত এই বেদ শ্রুতিরূপে ধারাবাহিক চলিয়া আসিয়াছিল। শেষে বেদব্যাস তাহা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি এরূপে বেদ সংগ্রহ না করিলে হয়ত এত দিনে তাহার লোপ হইত। অন্য কোন জাতির মধ্যে বেদের পূর্ণ সংগ্রহ নাই। সে সকল জাতির বেদ লুপ্ত হইয়াছে বা আংশিক ভাবে প্রবর্ত্তিত আছে মাত্র।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মনুষ্য সমাজ উন্নতির বিভিন্ন স্তর দিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকে। ক্রমে উন্নতির শেষ স্তরে আসিয়া উপনীত

হয়। সুতরাং এই সকল ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ব্যবহারিক সত্যের ক্রমে আবিষ্কার হয়। এই জন্য বেদের বিভিন্ন স্তর আছে। এই বিভিন্ন স্তরে সেই স্তর অনুযায়ী সত্যের আলোচনা থাকে। এই বেদ সমগ্র মানব জাতির জ্ঞানের ইতিহাস—মানব প্রকৃতির ইতিহাস। নিম্নতম সভ্য জাতির মধ্যে যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এই বেদে পাওয়া যায়, আর আধুনিক সভ্য সমাজ যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার মূল কথা গুলিও এই বেদে পাওয়া যায়। সকল প্রকার দার্শনিক মতের মূল এই বেদে দেখা যায়। সকল সমাজেই ও সকল কালেই মানবের জ্ঞানের ইতিহাস সমান। এক নিয়মেই মানব জ্ঞান বিভিন্নস্তর অতিক্রম করিয়া শেষ স্তরে উপনীত হয়। এই জন্য স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের ইতিহাস সর্ব্বত্র সমান। *

আমরা দেখিয়াছি যে, যখন মানব সমাজ প্রকৃতির দ্বারা পূর্ণ অভিভূত, "মানুষ শুধু জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত, যখন মানুষে ও পশুতে বিশেষ প্রভেদ থাকে না, তখন সে জাতির জ্ঞানে কোন তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি হয় না। সে জাতির জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানাবরিত থাকে। তত্ত্বের প্রথম স্ফূর্ত্তি হইবার জন্য চিত্তের যে পরিমাণে নির্ম্মলতা আবশ্যক, যতটুকু আন্তর দৃষ্টির প্রয়োজন, এরূপ অসভ্য সমাজে কোন লোকের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। যখন প্রকৃতি অনেক পরিমাণে আয়ত্ব হয়—সমাজ বিধিবদ্ধ হয়, মানুষ স্বার্থ চিন্তার কঠোর নিগড় কতক পরিমাণে ভঙ্গ করিয়া—কেবল ভোক্তা ও কর্ত্তার অবস্থা অতিক্রম করিয়া দ্রষ্টা হইতে শিক্ষা করে, তখন হইতে চিত্তে সত্য প্রতিভাত হইতে থাকে,—বেদ লাভ হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমে বাহ্য জগতের দিকে প্রধানতঃ দৃষ্টি পতিত হয়। প্রকৃতিকে বহুত্ব পূর্ণ নানা শক্তির ক্রিয়াভূমি মনে হয়। সেই সকল শক্তির অনন্ত মহতী লীলা দেখিয়া মনে অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হয়। ক্ষুদ্র আমি সেই শক্তির অধীন—আমরা সীমাবদ্ধ, আর সেই সকল শক্তি অসীম—অনন্ত ক্ষমতাময়ী মনে হয়। এই জন্য এই সময় জ্ঞানে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অধিক স্ফূর্ত্তি হয়। যাঁহারা আদি দ্রষ্টা, তাঁহারাই আদি কবি। তাঁহারা জীবের সসীমত্বকে প্রকৃতির অসীমত্বের অন্তর্গত করিয়া লন। এই সসীমত্বকে অসীমত্বের অন্তর্গত করাই ধর্ম্মের মূল ভিত্তি।

এই সকল বিশ্বব্যাপী প্রাকৃত শক্তির আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিয়া মন যে অদ্ভুত রসে আপ্লুত হয়, এই সকল শক্তির যে স্তুতি গান করিতে প্রবৃত্তি হয়, এই সকল শক্তিকে আমাদের সুখ দুঃখের নিয়ন্তা বলিয়া যে প্রথম ধারণা হয়, এবং আমাদের সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখ হ্রাস করিবার জন্য তাহাদের যে উপাসনা করিতে মতি হয়, তাহারই প্রথম ফল বেদ মন্ত্র। ইহাই বেদের প্রথম স্তর। ক্রমে মানবের অন্তর্দৃষ্টির আরও স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। মানব মৃত্যুতে আপনার বা পূর্ব্বপুরুষের অভাব কল্পনা করিতে পারে না—আর সেরূপ অভাব ধারণা করিতে ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিও হয় না। কাজেই মানুষ তখন পরকালের অস্তিত্ব অনুভব করে। এ সংসারে সুখ লাভ ও দুঃখ দূর করিতে

---

* এই জন্য কোন কোন আর্য্যপণ্ডিতের মতে "অসংখ্য শাখাসমন্বিত, দেব তির্য্যক্ মনুষ্য বর্ণ ও বর্ণাশ্রম প্রভৃতি নানা প্রবিভাগের হেতু, সর্ব্বজ্ঞানের আকর সুতরাং সর্ব্বজ্ঞকল্প ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র সমূহ...।" শাঙ্করভাষ্য (১। ১৩ সূত্র)

মানুষ যেমন স্বভাবতঃই ব্যস্ত থাকে, সেই রূপ পরকালের সুখ লাভের জন্যও চেষ্টা করে। এই চেষ্টা হইতে জাত ক্রিয়াই যজ্ঞ। এই ক্রিয়া কাণ্ডই বেদের দ্বিতীয় স্তর। সুতরাং বেদের প্রথম স্তরে স্তুতি ও উপাসনা এবং তাহার দ্বিতীয় স্তরে যজ্ঞেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। (১)

মানব কখন শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে পার্থক্য ধারণা করিতে পারে না। এই জন্য শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে, শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কদাচ কোন প্রভেদ নাই। প্রথমে মানব দৃষ্টিতে যে প্রকৃতির নানা রূপ শক্তির ক্রিয়া প্রতিভাত হয়—সেই সকল শক্তিকে বিভিন্ন মনে হয়। এবং প্রত্যেক শক্তির অন্তরে শক্তিমান অধিষ্ঠিত আছেন, ইহা ধারণা হয়। তখন এই শক্তিমানকে মানুষ আপনার তুলনায় জীব প্রকৃতি সম্পন্ন মনে করে। এই জন্য মানুষ প্রথম অবস্থায় প্রস্তরে, বৃক্ষে, পর্ব্বতে, নদীতে, সমুদ্রে—সর্ব্ব স্থলে এক এক পৃথক্ শক্তিমানের আবির্ভাব অধিষ্ঠান কল্পনা করে ও এই শক্তিমান বা শক্তির অধিষ্ঠাতাকেই দেবতা বলে।

---

(১) বেদের এই অংশকে কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বলে। ইহা বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা বেদান্ত হইতে, পারমার্থিক অর্থে নিকৃষ্ট। কেননা, ইহা জ্ঞানের নিম্ন স্তরের অন্তর্গত এবং অপক্কাত্ম নিকৃষ্ট অধিকারীর উপযুক্ত। এই জন্য গীতায় বলা হইয়াছে যে, ইহা জন্মকর্ম্মফলপ্রদ, ভোগ ও ঐশ্বর্য্য সাধক ক্রিয়া বিশেষ বহুল, ইহা ভোগ ও ঐশ্বর্য্য আসক্তি সম্পন্ন লোকের পক্ষে উপাদেয়। ভগবদ্গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় ৪২।৪৪ শ্লোক, গীতায় আরও একস্থানে উল্লিখিত আছে, এই বেদ সংসার বিষয় প্রকাশ্য—

"ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন।"

সুতরাং জ্ঞানের শেষ সীমায় বা বেদান্তে আরোহণ করিতে হইলে এই কর্ম্মাত্মক বেদের অধিকার অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। শঙ্করাচার্য্যও এই কথা বলিয়াছেন। তিনি বেদান্তদর্শন ভাষ্যের ১অধ্যায়ের ২ পাদের ২১ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন,

"বিদ্যা দ্বিবিধ—পরা ও অপরা, তন্মধ্যে ঋগ্বেদ প্রভৃতি অপরা। যাহার ফল অভ্যুদয়, তাহাই অপরা। যাহার ফল মুক্তি (বা জ্ঞান) তাহাই পরা।"

শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যের অন্যত্র বলিয়াছেন,

"অদ্বৈত প্রবোধ প্রস্ফুটিত না হওয়া পর্য্যন্তই লৌকিক ও বৈদিক প্রমাণ প্রমেয়াদি ব্যবস্থার সত্য বলিয়া গণ্য থাকে।"

যদিও শাস্ত্রীয় ব্যবহারে বুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ম্মকারীরাই অর্থাৎ মনুষ্যেরাই অধিকারী, কেন না আপনার বা আত্মার পরলোক সম্বন্ধে জ্ঞান ব্যতীত তদ্রূপ ব্যবহারে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তথাপি সেই সেই ব্যবহারে অধ্যাসিক জ্ঞান ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানের...... অপেক্ষা নাই।"

শঙ্করাচার্য্য অন্যত্র বলিয়াছেন,

"প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি শাস্ত্র সমুদায়ই অবিদ্যাশ্রিত জীবের বিষয় বা সমস্তই জীবভাবের অন্তর্গত, অর্থাৎ সমস্তই জীবের পরিকল্পিত। "সমস্ত শাস্ত্রই অবিদ্যাপর।

ইহা শুধু গীতা বা শাঙ্কর ভাষ্যের কথা নহে। শ্রুতিতেও এই কথা আছে। ১অধ্যায়ের ২ পাদের ২২ সূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন,—

"শ্রুতি প্রথমে কর্ম্ম বিদ্যার উপদেশ করিয়া পশ্চাৎ তাহার নিন্দা করিয়াছেন। যথা এ সকল প্রব (নশ্বর) অদৃঢ (অনিত্য ফলদাতা) যজ্ঞরূপ অষ্টাদশ সাধ্য। ... ... যে মূঢ় এ সকলকে শ্রেয়স্কর মনে করে, কেবল উহাতেই সন্তুষ্ট হয়, সে বার বার জরা মরণ প্রাপ্ত হয়। (মুণ্ডক উপনিষদ ১।২।৭)।

জৈমিনি মুনি পূর্ব্বমীমাংসায় বলিয়াছেন, এই বেদ ক্রিয়ার বা ধর্ম্মের বোধক ও সেই সম্বন্ধেই বেদের প্রামাণ্য।

এই শক্তির বহুত্ব জন্য শক্তিমান দেবতার বহুত্বও বেদে কল্পিত হইয়াছিল। এই জন্য চলিত কথায় তেত্রিশ কোটী দেবতার উল্লেখ আছে। যাহা হউক, এই সকল বিভিন্ন শক্তির মধ্যে একত্ব দর্শন হইতে লাগিল—অনেক শক্তিকে একরূপ শক্তির বিভিন্ন বিকাশ বলিয়া অনুভূত হইল। তখন এই দেবতার সংখ্যা পরিমিত হইল। তখন বজ্র, অগ্নি, বৃষ্টি,সূর্য্য প্রভৃতি শক্তিকেই মূল শক্তি ধারণা করিয়া সেই সকল শক্তির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বা শক্তিমান ইন্দ্র, বৈশ্বানর, বরুণ, আদিত্য প্রভৃতি নামে স্তুত হইতে লাগিলেন। তাহার পর এই বিভিন্ন শক্তি কোন একমাত্র শক্তির বিভিন্ন বিকাশ, ইহা ধারণা হইল। কিন্তু মূল শক্তি কোনটী, তাহার সম্বন্ধে তখনও স্থির ধারণা হইল না। কেহ বা অগ্নির প্রাধান্য, কেহ বা তেজের প্রাধান্য, কেহ বা বজ্রের প্রাধান্য অনুভব করিলেন, কেহ অগ্নিই একমাত্র শক্তি, অন্য শক্তি তাহা হইতে সৃষ্ট, ইহা প্রণিধান করিলেন—কেহ বা বজ্রই একমাত্র শক্তি,অন্য শক্তি তাহা হইতে উদ্ভূত, ইহা স্থির করিলেন। এই জন্য বেদে কোন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ইন্দ্রের প্রাধান্য, কোন মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি অগ্নির প্রাধান্য ইত্যাদি কীর্ত্তন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের সপ্তবিংশতি শ্লোকের ব্যাখ্যা কালে শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া এই কথা দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দেবতার সংখ্যা কত? এই প্রশ্নের পর শ্রুতি বলিয়াছেন, তিন, তিন, তিনশত ও তিন সহস্র (৩৩০৬) এই উক্তির পর পুনর্ব্বার দেবতার স্বরূপ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন উত্থাপন পূর্ব্বক, তদুত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন, দেবতা তেত্রিশ অর্থাৎ অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যৌ, চন্দ্রমা ও নক্ষত্র, এই অষ্ট বসু, মন প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ মাস অবয়ব যুক্ত দ্বাদশ আদিত্য ইন্দ্র ও প্রজাপতি—এই তেত্রিশ। পূর্ব্বোক্ত ৩৩০৬ দেবতা এই ৩৩ দেবতার মহিমা বা বিভূতি। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, "ঐ তেত্রিশ দেবতা ছয় দেবতার মহিমা—ছয় দেবতার অন্তর্গত। সেই ছয় দেবতা আবার তিনের অন্তর্গত। সেই তিন দেবতা এক দেবতার অন্তঃর্ভূত। সেই এক দেবতা প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ।" (পণ্ডিত শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত শাঙ্কর ভাষ্যানুবাদ)।

এই শক্তির একত্ব দ্রষ্টা ঋষিগণের মধ্যে আবার কেহ আকাশকেই আদি শক্তি ও তাহা হইতে জগৎ সৃষ্ট, কেহ বায়ুকেই আদি শক্তি ও তাহা হইতে জগৎ সৃষ্ট,কেহ অপ্ বা জলকে আদি তত্ত্ব ও তাহা হইতে জগৎ সৃষ্ট, এইরূপ নানা ভাবে এই এক সত্য ধারণা করিয়াছেন। ‡ এই সকল তত্ত্ব দ্রষ্টা মহর্ষিদিগের মধ্যে দীর্ঘতমা, প্রজাপতি, বিশ্বকর্ম্মা, ভরদ্বাজ, কবয় প্রভৃতির নাম এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

---

‡ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে অনেক সূক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা হইতে এই তত্ত্বের সহজেই উপলব্ধি হয়। এ বিষয়ে ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে আরও দুই একস্থান উদ্ধৃত হইল—

(১) দেবতারা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বকালে বৃহস্পতি নামক দেব কর্ম্মকারের ন্যায় দেবতাদিগকে নির্ম্মাণ করিলেন। অবিদ্যমান্ হইতে বিদ্যমান্ উৎপন্ন হইল।" (১০।৭২)

(২) "পক্ষী একই আছেন, বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ তাহাকে কল্পনা পূর্ব্বক অনেক প্রকার বর্ণনা করেন।" (১০।১১১)

অতএব দেখা গেল যে, মানবের স্বতঃসিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি চিত্তের ক্রমবর্দ্ধিত নির্ম্মলতা হেতু, ক্রমে তীক্ষ্ণ হইয়া যখন তাহা পূর্ণ বিকশিত হয়। তখন এই জগতের বহুত্ব জ্ঞানের পরিবর্ত্তে একত্ব জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ রূপে আবির্ভূত হয়, জগতকে জ্ঞানের সীমা মধ্যে আবদ্ধ করিতে পারিলে, জগতের সসীমত্ব উপলব্ধি হয়, এবং তাহা হইতে জগদাধার জ্ঞানের অতীত অসীমত্বের ধারণা হয়। আর সেই অসীমত্ব সেই একত্ব হইতে জগতের মহত্বের একীকরণ হয়।

এইরূপে মানবের আদিকবি ঋষিগণ বাহ্য বিষয়ে স্বতঃসিদ্ধ দৃষ্টি বলে—অবশেষে ব্রহ্ম তত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। আন্তর বিষয়ও সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ দৃষ্ট হেতু আত্মতত্ব সম্বন্ধে সত্য সকল উপলব্ধি হওয়ায়, এই ঋষিদিগের অন্তরে আত্মতত্বের ক্রম বিকাশ হইয়াছিল। দেহাতিরিক্ত, মরণের অতীত—আত্মার সহিত এই ব্রহ্মের সারূপ্য জ্ঞান বা সোহহং জ্ঞান ক্রমে ধারণা হইল। মানুষ প্রথমে আপনাকে অপূর্ণ, সসীম শক্তির অধীন—জরা মরণাদি দুঃখবদ্ধ মনে করে। মানুষ যাহার দ্বারা আপনাকে সীমাবদ্ধ মনে করে, তাহাকেই অনন্ত অসীম জ্ঞান করে, তাহারই স্তুতি উপাসনা করে। জ্ঞানের প্রথম অবস্থায় প্রকৃতির সেই শক্তিকেই অসীম বলিয়া ধারণা ছিল। প্রকৃতি হইতে ব্রহ্ম ধারণার পর আপনাকে সে অসীম ব্রহ্মের অন্তর্ভূত-ব্রহ্মকেই আপনার বিশ্রাম স্থান, দুঃখ নিবৃত্তির স্থান মনে করিয়া তাঁহারই সহিত আপনার সম্বন্ধ ধারণায় রত হইল। ইহাই বেদের শেষ স্তর। ইহাই বেদান্ত। ইহাই মানব দৃষ্টির বা জ্ঞানের শেষ সীমা। এই স্থানে আসিয়া জ্ঞানের বিশ্রাম হয়—ইহার পর আর অগ্রসর হইতে পারে না।

কিন্তু চিত্তের পূর্ণ নির্ম্মলতা লাভ করিয়া স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বলে সকলেই জ্ঞানের এই শেষ স্তরে আসিতে পারে না। সকল মানবের শক্তি সমান নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মানুষের অন্তঃকরণ বৃত্তি তিন রূপ। তাঁহার কর্ম্মবৃত্তি, চিত্তবৃত্তি ও জ্ঞানবৃত্তি আছে। মানব উন্নতির স্তরে আসিয়া আপ-

(৩) সেই বলই বা কি, সেই বৃক্ষই বা কি, যাহা হইতে উপাদান সংগ্রহ পূর্ব্বক এই দ্যুলোক ও ভূলোকও নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।" (১০।৩১)

(৪) "তিনি অনাদি স্বয়ম্ভূ এবং পবিত্র।" (১০।১৮)

(৫) সেই সুধীর পিতা উত্তমরূপ দৃষ্টি করিয়া, মনে মনে আলোচনা করিয়া জলাবৃত্তি পরস্পর সম্মিলিত এই দ্যাবা পৃথিবীকে সৃষ্টি করিলেন। (১০।৮১)

(৬) তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে) কেবল সেই একমাত্র বস্তু, বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সর্ব্ব প্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। * * * তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। সর্ব্ব প্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হইল। (১০।১২৯)

(৭) এই নানা সৃষ্টি কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভুর স্বরূপ পরম ধামে আছেন। অথবা তিনিও না জানিতে পারেন। (১০।১২৯)

(৮) যিনি ইহা (ব্রহ্মাণ্ড) সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা বুঝিতে পার না, তোমাদিগের অন্তঃকরণ তাহা বুঝিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই। কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন হইয়া লোকে নানা প্রকার জল্পনা করে। (১০।৮২) শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের বঙ্গানুবাদ।

নার সাধ্য, প্রকৃতি ও অধিকার মত এই সকল বৃত্তির অনুশীলন করে। মানুষের এই তিন বৃত্তির সমান স্ফূর্ত্তি হয় না। কোন মনুষ্য চিত্তবৃত্তি প্রধান, কোন মানুষ কর্ম্ম-বৃত্তি প্রধান, অতি অল্প লোকেই জ্ঞানবৃত্তি প্রধান। জ্ঞানবৃত্তির উৎকর্ষ বিশেষ অনুশীলন সাপেক্ষ। যাহার যে বৃত্তির প্রাধান্য আছে, সে-ই সে বৃত্তি চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করে। কর্ম্মবৃত্তি-প্রধান লোক ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইলে যজ্ঞ দান তপ প্রভৃতি ধর্ম্ম চর্চ্চা করিতে সহজেই নিরত হয়। চিত্ত বৃত্তি প্রধান লোক উপাসনা রত হয়, আর জ্ঞান বৃত্তি প্রধান লোক জ্ঞানালোচনায় স্বাভাবিক অনুরক্ত হয়।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, বেদেরও এই অনুসারে তিন স্তর। বেদে ক্রিয়া, উপাসনা ও জ্ঞান এই তিনেরই বিষয় নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু মানুষ আপন অধিকার মত ইহার কোন না কোন বিষয় গ্রহণ করে। যে নিম্নাধিকারী, সে কর্ম্মে রত। যে মধ্যাধি-কারী, যে উপাসনা-পরায়ণ। কেবল যিনি উচ্চাধিকারী, তিনিই জ্ঞান চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। সর্ব্ববৃত্তির পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য কদাচিৎ সম্ভব। এই অধিকারের পার্থক্য হইতেই আশ্রম ও ধর্ম্ম বিভাগ। সে তত্ত্বের এস্থলে আলোচনার আবশ্যক নাই।

আমরা দেখাইয়াছি যে, মানুষের জ্ঞান, চিত্ত ও কর্ম্ম বৃত্তির অনুশীলন কল্পে উন্নতির প্রথম স্তর হইতে শেষ স্তরে যাইতে হইলে যত বিভিন্ন প্রকার উপাসনা, কর্ম্ম ও তত্ত্ব জ্ঞানের বিকাশের সম্ভব, বেদে প্রায় তাহার সমুদায়ই বিধিবদ্ধ আছে। সুতরাং পরে একমাত্র বেদ অবলম্বন করিয়াও সমাজে বিভিন্ন অধিকার ও বিভিন্ন স্ফূর্ত্তি হেতু বিভিন্নরূপ ধর্ম্মাদি চর্চ্চার উৎপত্তি হয় এবং তদনুসারে সমাজও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ক্রমে এই সকল সম্প্রদায় মধ্যে সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়। সকলে আপন আপন গন্তব্য পথের প্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করে।

অতি পূর্ব্বকালে ভারতে ঐরূপ সময় উপস্থিত হইয়াছিল। আর্য্য সমাজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল। তখন নানা-রূপ যজ্ঞাদি কর্ম্ম, নানা প্রকার উপাসনা ও নানা প্রকার মত সমাজে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তখনও আর্য্য সমাজ বেদানুশাসিত ছিল। তাহার পর এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়া সমাজের কতক পরিমাণে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং ক্রমে ধর্ম্ম গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল। বেদেও এইরূপ সামা-জিক অবস্থার আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু এই বিশৃঙ্খলা বেদব্যাসের সময় অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। মহাভারতের অনুগীতায় তাহার উল্লেখ আছে। ‡

‡ উদ্ধে দেহাদ্ব্যন্তোকে নৈতদস্তীতি চাপরে।
কেচিৎ সংশয়িতং সর্ব্বং নিঃসংশয়মথাপরে॥
অনিত্যং নিত্যমিত্যেকে নাস্ত্যস্তীত্যপিচাপরে।
একরূপং দ্বিধেত্যেকে ব্যামিশ্রমিতিচাপরে॥
মন্যন্তে ব্রাহ্মণাদেবা ব্রহ্মজ্ঞাস্তত্ত্ববাদিনঃ।
একমেকে পৃথক্ চান্যে বহুত্ব মপি চাপরে॥
দেশকালাবুভৌ কেচিৎ নৈতদস্তীতি চাপরে।
*　　*　　*
কর্ম্মকেচিৎ প্রশংসন্তি প্রশান্তিং চাপরেজনাঃ।
কেচিন্মোক্ষং প্রশংসন্তি কেচিদ্ভোগান পৃথগ্বিধান্॥
*　　*　　*
যজ্ঞমিত্যপরে বিপ্রাঃ প্রদানমিতিচাপরে।
তপস্ত্বন্যে প্রশংসন্তি স্বাধ্যায়মপরেজনাঃ॥

বড় সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, সেই সময়ে একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া একা সেই সমাজের গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুদয়ে আর্য্যসমাজে কি এক অদ্ভুত শক্তি সঞ্চারিত হইয়া মানবকে উন্নতির চরম সীমায় লইয়া গিয়াছিল, তাহা কল্পনা করাও অসাধ্য। এই মহাপুরুষের শক্তি বলে ভারতে ধর্ম্মসম্বন্ধে, জ্ঞান সম্বন্ধে মহা যুগান্তর উপস্থিত হয়। এই সময়েই বেদব্যাস সেই মহাশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া বেদ সঙ্কলন করেন। সাধারণের শিক্ষার জন্য মহাভারত রূপ অদ্ভুত গ্রন্থ ও পুরাণাদির প্রণয়ন করেন। তাঁহার শিষ্য বৈশম্পায়ন, শুক, লোমহর্ষণ, জৈমিনি, পৈল, সুমন্তু প্রভৃতি ঐ সকল গ্রন্থ সাধারণে প্রচার করিবার সহায় হন। এইরূপে আপামর সাধারণকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবার জন্য, বৈদিক ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ সাধারণে বুঝাইয়া দিবার জন্য, গল্প বা ইতিহাস ছলে চিত্তাকর্ষণকারী কাব্যের উপাদেয় আবরণে মহাভারত ও অনেক বর্ত্তমান পুরাণাদির এই সময় সৃষ্টি হইল। *

বেদব্যাস কেবল বেদ সংগ্রহ করিয়া তাহার স্থায়িত্ব সম্পাদন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বেদের উপনিষদ বা বেদান্ত অংশ সামঞ্জস্য করিয়া যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা বেদান্তমত সংস্থাপন করিয়া বেদান্ত দর্শন রূপ অদ্বিতীয় দর্শন শাস্ত্র সৃষ্টি করিলেন। সেইরূপ তাঁহার শিষ্য জৈমিনি মুনি বেদের কর্ম্ম কাণ্ড সামঞ্জস্য করিয়া পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শন প্রণয়ন করিলেন। তাহার অব্যবহিত পরে এই উভয় মীমাংসা দর্শনের অনুকরণে অন্যান্য তৎকাল-প্রচলিত দার্শনিক মত সকল পরিস্ফুট হইয়া ক্রমে বিধিবদ্ধ হইল। আর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান কর্ম্ম উপাসনা সক-

জ্ঞানং সন্ন্যাসমিত্যেকে স্বভাবং ভূতচিন্তকাঃ।
সর্ব্বমেকে প্রশংসন্তি ন সর্ব্বমিতি চাপরে।
মহাভারত, অনুগীতা (অশ্বমেধপর্ব্ব) ৪৯।২-১২

অর্থাৎ ঐ সময়ে "কেহ বলিতেন, দেহান্তে অস্তিত্ব থাকে, কেহ বলিতেন থাকে না; কেহ সংশয় চিত্ত ছিলেন, কেহ বিশ্বাসী ছিলেন; কেহ (জগৎপাতের) অনিত্যত্ব, কেহ নিত্যত্ব, কেহ বা অনস্তিত্ব মানিতেন। কেহ একরূপ (অদ্বৈত), কেহ দ্বিধা (দ্বৈত), কেহবা ব্যামিশ্র (দ্বৈতাদ্বৈত) স্বীকার করিতেন; কেহ ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মজ্ঞ ও তত্ত্ববাদীদের মান্য করিতেন (কেহ জগতের) একত্ব, কেহ পার্থক্য, কেহ বা বহুত্ব স্বীকার করিতেন; কেহ দেশকালের অস্তিত্ব মানিতেন, কেহ তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না।

কেহ কর্ম্ম প্রশংসা করিতেন, কেহ শান্তি প্রশংসা করিতেন; কেহ মোক্ষ প্রশংসা করিতেন, কেহ বা নানাবিধ ভোগের প্রশংসা করিতেন। কোন বিপ্র যজ্ঞ, কেহ দান, কেহ জপ, কেহ স্বাধ্যায়, কেহ জ্ঞান, কেহ সন্ন্যাস প্রশংসা করিতেন, কোন ভূতচিন্তাকারী স্বভাব মানিতেন। কেহ সকল (বিষয়ই) প্রশংসা করিতেন, কেহ কিছুই প্রশংসা করিতেন না।

দেশকালাবুভৌ কেচিৎ নৈতাদস্তীতি চাপরে—

ইহা হইতে দেখা যায় যে দেশ (Space) কালের (time) অনস্তিত্ব ও জ্ঞাতার বিষয়ানুভবসহ তাহাদের নিত্য কল্পিতত্ব, আমাদের দেশে এ তত্ত্ব বহুকাল পূর্ব্ব হইতে প্রকাশিত ছিল। ইহা জর্ম্মাণ দার্শনিক ক্যাণ্টের (Kant) প্রথম আবিষ্কৃত নহে।

* এই সময়ে পানিনী, ভগবান পতঞ্জলি প্রভৃতিও আবির্ভূত হইয়াছিলেন। স্বয়ং পতঞ্জলি এই পানিনী কৃত ব্যাকরণের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। আবার বেদব্যাসও পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্য রচনা করেন। পতঞ্জলি, পানিনী, উপবর্ষ ও বেদব্যাস সকলে সমসাময়িক ছিলেন, ইহা না ধরিলে এই গোলযোগের মীমাংসা করা সহজ হয় না। একাধিক পানিনী, ব্যাস বা পতঞ্জলির কল্পনা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

লের সামঞ্জস্য করিয়া, সকলের পূর্ণ পরিণতির অবস্থা দেখাইয়া দিয়া, মানবের মুক্তির প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া, মানবের প্রকৃত গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিয়া, সকল অবস্থার, সকল মানবের, সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থের উপায়ভূত সর্ব্বাবয়ব সম্পূর্ণ, সর্ব্ব ধর্ম্মের আকর—সকল আকাঙ্খার নিবৃত্তির স্থান, প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম প্রতিপাদক অমৃতময়ী গীতা তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এই এক মহাপুরুষের প্রভাবে সমাজ মধ্যে কি অদ্ভুত শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল, জ্ঞান ও ধর্ম্মের কি অদ্ভুতরূপে শেষ পরিণতি হইয়াছিল—তাহা এখন ধারণা করা সম্ভব নহে। এই জন্য সেই সময়ে ব্যাস প্রমুখ আর্য্য সমাজ এই মহাপুরুষের পূর্ণ ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (১) এস্থলে এ বিষয় আর বিস্তার করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

সে যাহা হউক, উপরে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহা হইতে এই বুঝা যায়, বৈদিক ঋষিগণ স্বতঃসিদ্ধ দৃষ্টি বা প্রতিভাবলে বাহ্য ও আন্তর বিষয় সম্বন্ধে যে সকল সত্য দর্শন করিয়াছিলেন, সেই সকল বেদোক্ত সত্য যুক্তি ও প্রমাণ বলে লাভ করিবার জন্যই প্রথমে প্রকৃত দর্শন শাস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বেদান্ত দর্শনের পূর্ব্বেই প্রায় সকল প্রকার দার্শনিক মত প্রচলিত ছিল। বেদ হইতেই সে সকল মত সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে উপযুক্ত প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা সেই সকল মত তখনও স্থাপিত হয় নাই। যখন রীতিমত প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা সেই সকল মত দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতে আরম্ভ হইল, তখনই দর্শন শাস্ত্রের প্রথম উৎপত্তি হইল। (২) প্রথমেই বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড বুঝাইবার জন্য—বৈদিক কর্ম্ম তত্ত্ব সকল সামঞ্জস্য করিয়া তাহার মীমাংসা করিবার জন্য, পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শন এবং বেদান্তের জ্ঞানকাণ্ড বুঝাইবার জন্য, তাহার মীমাংসা করিবার জন্য বেদান্তদর্শনের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই ভারতে প্রকৃত দার্শনিক যুগ আরম্ভ হয়। অতএব আমাদের দেশে ধর্ম্ম বুঝাইতে—বৈদিক তত্ত্ব বুঝাইতেই দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল।

এই দার্শনিক যুগে অনেক লোকই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই স্বতঃসিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি থাকে না। যোগ ও সাধনা বলে এই স্বতঃসিদ্ধ দৃষ্টির স্ফূর্ত্তি করা যায় বটে, কিন্তু সাধারণ লোক সে পথ অবলম্বন করিতে সক্ষম হয় না। কাজেই সে সময় তত্ত্ব সকল

(১) মহাপুরুষগণ তাঁহাদের সমসাময়িক লোকের দ্বারাই অবতার বা ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন। পরবর্ত্তী মানবগণ সুদূরবর্ত্তী পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহাদের পূর্ণশক্তি, পূর্ণ মহত্ত্ব ধারণা করিতে পারে না, তাঁহাদের মহাকর্ষণ, দূরত্ব হেতু ভালরূপ অনুভব করিতে পারে না। বুদ্ধ, চৈতন্য, খ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি এইরূপে তাঁহাদের সমকালিক লোকের দ্বারা ঈশ্বর জ্ঞানে পূজিত হইয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার সময়ের লোকের দ্বারা ঈশ্বর জ্ঞানে পূজিত হন নাই, পরে এরূপে পূজিত হইয়াছিলেন, একথা ইতিহাসবিরুদ্ধ। এবিষয়ের বিশেষ উল্লেখের এস্থলে প্রয়োজন নাই।

(২) (বেদান্ত দর্শনে আছে যে শ্রবণ,মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তত্ত্বলাভ করিতে হয়। তত্ত্ব কথা কেবল শ্রবণ করিলেই তাহার জ্ঞান লাভ হয় না। যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা তদ্বিরোধী তত্ত্ব খণ্ডন ও সেই তত্ত্ব স্থাপন করিতে হয়, ইহাই মনন। ঐ মনন দর্শন শাস্ত্র সিদ্ধ।

যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা স্থাপন করিবার প্রয়োজন হয়। যখন বেদের পরস্পর আপাত-বিরোধী ও বিসংবাদী মতের দ্বারা জ্ঞানার্থীর মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, যখন এই সকল মতের মধ্যে কোনটী ত্যাজ্য ও কোনটী গ্রহণীয়, তাহা কেবল বেদ হইতেই সিদ্ধান্ত করিবার উপায় না থাকে, যখন বিশ্বাসের স্থলে সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন কোন প্রতিভাশালী পণ্ডিত ঐ সকল মতের মধ্যে মত বিশেষ অবলম্বন করিয়া অন্য প্রমাণ ও যুক্তি বলে সেই মতের সত্যতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন। দর্শন শাস্ত্র এই চেষ্টার ফল হইতেই এদেশে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা তত্ত্ব সংস্থাপন জন্য এ দেশে দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। এদেশে ধর্ম্ম সংস্থাপনই দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন ছিল। দর্শনশাস্ত্রের অন্য প্রয়োজন আছে, তাহা পরে উল্লিখিত হইবে।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত নৌকাবিহার, আনন্দ ও কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[সমাধি মন্দিরে।

আজ কোজাগর লক্ষ্মীপূজা। শুক্রবার ২৭এ অক্টোবর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর রাম-কৃষ্ণ সেই পূর্ব্ব পরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও হরলালের সহিত কথাবার্ত্তা করিতেছেন। এমন সময়ে একজন আসিয়া বলিলেন, কেশব সেন জাহাজে করিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। কিয়ৎক্ষণ পরে কেশবের শিষ্যেরা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, মহাশয়, জাহাজ আসিয়াছে, আপনার যাইতে হইবে, চলুন একটু বেড়িয়া আসিবেন, কেশব বাবু জাহাজে আছেন, আমাদের পাঠালেন।

বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর নৌকা করিয়া জাহাজে উঠিতেছেন—সঙ্গে বিজয়। নৌকায় উঠিয়াই বাহ্য জ্ঞানশূন্য। সমাধিস্থ।

মাষ্টার জাহাজে দাঁড়াইয়া এই সমাধিস্থ চিত্র দেখিতেছেন। তিনি বেলা ৩টা সময় কেশবের জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা হইতে আসিতেছেন। বড় সাধ দেখিবেন, ঠাকুর ও কেশবের মিলন, তাঁহাদের আনন্দ। বড় সাধ শুনিবেন, তাঁহাদের কথাবার্ত্তা। কেশব তাঁহার সাধু চরিত্রে ও বক্তৃতা বলে মাষ্টারের ন্যায় অনেক বঙ্গীয় যুবকদিগের মন হরণ করিয়াছেন। অনেকেই তাঁহাকে পরম আত্মীয় বোধে হৃদয়ের ভালবাসা দিয়াছেন, কেশব ইংরাজি পড়া লোক—ইংরাজি দর্শন, সাহিত্য পড়িয়াছেন। তিনি আবার দেব দেবী পূজাকে অনেক বার পৌত্তলিকতা বলিয়াছেন। এইরূপ লোক ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, আবার মাঝে মাঝে দর্শন করিতে আসেন; এটি বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। তাঁহাদের মনের মিল কোন খানে বা কেমন করিয়া হইল, এ রহস্য ভেদ করিতে মাষ্টারাদি

অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিরাকারবাদী বটেন, কিন্তু তিনি আবার সাকারবাদী—নিরাকার ব্রহ্মের চিন্তা করেন, আবার দেবদেবী প্রতিমার সম্মুখে ফুল, চন্দন দিয়া পূজাও করেন ও প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্যগীত করেন। আবার খাট বিছানায় বসেন, লালপেড়ে কাপড়, জামা, মোজা, জুতা পরেন; কিন্তু সংসার করেন না। ভাব সমস্তই সন্ন্যাসীর মত, তাই লোকে পরমহংস বলে। এদিকে কেশব নিরাকারবাদী; স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসার করেন, ইংরাজিতে লেক্‌চার দেন, সংবাদ পত্র লেখেন ও বিষয় কর্ম্মও করেন।

জাহাজে সমবেত কেশব-প্রমুখ ব্রাহ্মভক্তগণ জাহাজ হইতে ঠাকুর বাড়ীর শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। জাহাজের পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে বাঁধা ঘাট ও ঠাকুর বাটীর চাঁদ্‌নি। জাহাজের আরোহিদের বাম্‌পার্শ্বে চাঁদনির উত্তরে দ্বাদশ শিব মন্দিরের ক্রমান্বয়ে ছয় মন্দির। আরোহিদের দক্ষিণ পার্শ্বেও ছয় শিব মন্দির। শরতের নীল-আকাশ-চিত্রপটে ভবতারিণী মন্দিরের চূড়া ও উত্তর দিকে পঞ্চবটী ও ঝাউ গাছের মাথাগুলি দেখা যাইতেছে। বকুলতলার নিকট একটি নহবৎখানা ও কালী বাড়ীর দক্ষিণ প্রান্তভাগে আর একটি নহবৎখানা দেখিতেছেন ও দুই নহবৎখানার মধ্যবর্ত্তী উদ্যান পথও তাহার ধারে ধারে সারি সারি পুষ্প বৃক্ষ। শরতের নীলাকাশের নীলিমা জাহ্নবী জলে প্রতিভাবিত হইতেছে। বহির্জগতে কোমল ভাব, ব্রাহ্মভক্তদের হৃদয়-মধ্যে কোমল ভাব। ঊর্দ্ধে সুন্দর সুনীল অনন্ত আকাশ, সম্মুখে সুন্দর ঠাকুর বাড়ী, নিম্নে পবিত্র সলিলা গঙ্গা- যাঁহার তীরে আর্য্য ঋষিগণ ভগবানের চিন্তা করিয়াছেন; আবার আসিতেছেন একটি মহাপুরুষ, যিনি সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন! এইরূপ দর্শন মানুষের কপালে সর্ব্বদা ঘটে না। এরূপ স্থলে সমাবিষ্ট মহাপুরুষে কাহার ভক্তির না উদ্রেক হয়, কোন্ পাষাণ হৃদয় না বিগলিত হয়?

কেশব! তুমি দাঁড়াইয়া নৌকার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছ। তুমি স্থিরনেত্র হইয়া না জানি কি ভাবিতেছ! তুমি কি ভাবিতেছ যে সংসারে বড় ভয়, 'নির্লিপ্ত গৃহস্থ' হওয়া বড় কঠিন? জীবনে তুমি অনেক পরীক্ষায় পড়িয়াছ, আত্মীয় বিচ্ছেদ, কন্যার বিবাহের পর শিষ্য বিচ্ছেদ, লোকনিন্দাদি নানা কষ্ট তুমি পাইয়াছ। তাহাই কি দাঁড়াইয়া ভাবিতেছ—"গৃহস্থাশ্রম বড় কঠিন? এই সাধু মহাত্মার ন্যায় জীবন যাপন করা কিরূপ হয়? আর দলে প্রয়োজন কি, অনেক হইল! ইনিত বলেন, 'গেড়ে ডোবায় দল হয়' আর 'গুরুগিরি করা ভাল নয়।' আহা এ মহাপুরুষের কি জীবন! যিশু পিতা ২ করিয়া পাগল হইয়াছিলেন, ইনিও মা মা করিয়া পাগল! সদা প্রেমে বিহ্বল! তাঁহারি ন্যায় শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ! তাঁহারি ন্যায় সর্ব্বত্যাগী, তাঁহারই ন্যায় সর্ব্বভূতহিতেরত, তাঁহারি ন্যায় জীবের মঙ্গলের জন্য ফিরিতেছেন, তাঁহারই ন্যায় সদা যোগী, ভাবস্থ হইয়া ঈশ্বরের সহিত কথা কন। শুনিয়াছিলাম, প্রত্যক্ষ দর্শন ও ভগবৎবাণী শ্রবণ কথা। এই মহাপুরুষের জীবনে তাহাই দেখিলাম। আর ইনি প্রার্থনা করেন, ভাবা কি সরল! যেন পাঁচ বৎসরের ছেলে মার সহিত কথা কহিতেছে। ঈশ্বরের প্রতি কি ভালবাসা! এঁকে

দেখিয়া গৌরাঙ্গের প্রেম, তাঁহার ভাব মহাভাব ইত্যাদি বিশ্বাস হইল।"

কেশব! এই মহাপুরুষের আর একটি কথা কি ভাবিতেছ? 'গভীর বনে ফুল ফুটিলে মৌমাছি আপনি সন্ধান করিয়া যায়, ফুল কাহাকেও ডাকে না; মৌমাছিরা আপনি যায়'। একথা শ্রবণ করিয়া তাহাই বুঝি ভাবিতেছ, "সেজে গুজে লেক্‌চার দেওয়া আর কেন? যাহাতে দেবদুর্লভ ভক্তিমধু হৃদয়-কুসুম মধ্যে জন্মায়, তাই চেষ্টা করি। এই মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, 'ঈশ্বরের আদেশ না পাইয়া লেক্‌চার বিড়ম্বনা মাত্র।' হয়ত আবার ভাবিতেছিলে, 'রামের ইচ্ছা' সেই কথা; যে কথা একদিন শুনে তুমি বলেছিলে, মহাশয়, অতদূর নয়, তাহা হলে সত্য সত্যই আর দল্‌টল্ থাকেনা। কেন ঠাকুরকে এত শুদ্ধ ভাবিতেছিলে বুঝি ভাবিতেছ ইঁহারই কথা 'মৌমাছি কেবল ফুলে বসে মধু পানের জন্য, এ সব মাছি মধুতেও বসে, সন্দেশেও বসে, ও পচা ঘায়ে ও বিষ্ঠায়ও বসে।' এ মহাপুরুষ মৌমাছির থাক, গৃহস্থ ভক্তেরা সামান্য মাছির থাক্।

আবার কি ভাবিতেছ,—"এ পুরুষ সমাধিস্থ, আমাদের এইরূপ সমাধি হয় না কেন? বটে বটে নানা কর্ম্ম করিতে গেলে কেমন করে সমাধি হবে? ইনিই বলেন, নেউলের ল্যাজে ইঁট বাঁধা; পাঁচিলের গর্ত্তে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে ইচ্ছা হয় বটে; কিন্তু ল্যাজে ইঁট বাঁধা রয়েছে, ইটের ভারে গর্ত্ত থেকে নীচে নেমে আস্‌তে হয়। বিষয়ীর মন ভিজে দেশলাইয়ের মত। ইনি যা বলেন ঠিক। যত ঘসো কাটি গুলি কেবল লোকশান্ হয়, কখনও জ্বলিবে না।

কেশব! ইঁনি সাকার বিশ্বাস করেন বলিয়া তোমার কি মনে খট্‌কা হইয়াছিল? এক কালে হইয়াছিল বটে। কিন্তু আজ তুমি সম্মুখে জ্যোতির্ম্ময় নীল চিত্র পটে যে দেব মন্দির শ্রেণীর ছবি দেখিতেছ, তাহা অন্ত চক্ষে দর্শন করিতেছ। তুমি দেখিতেছ, মৃণ্ময় আঁধারে চিন্ময়ী দেবী— 'আগে উপমা তারপর প্রতিমা,তারপর মা।' ধন্য তুমি! এই মহাপুরুষের বাক্যে বিশ্বাস করিয়াছ। মানুষ কতটুকু আর তার বুদ্ধিইবা কতটুকু। প্রাকৃত লোকের আবার বুদ্ধি! আর সেই বুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বর তত্ত্ব নিরূপণ! বামন উদ্বাহু হইয়া চন্দ্র ধরিবে! ধন্য তুমি! ঠাকুরের কথা গ্রহণ করিয়াছ—এক সের ঘটিতে চার সের দুগ্ধ ধরে না। ভগবানের পাদ পদ্মে সমাধি লাভ না করিলে তাঁহার তত্ত্বের আভাস কে দিতে পারে? 'হে Alcibiades * যদি মোকদ্দমার কথা বুঝিতে চাও, তাহা হইলে উকিলের কাছে যেতে হয়, যদি রোগের কথা জানতে হয়, তাহা হইলে ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হয়, ঈশ্বর তত্ত্ব নিরূপণ করিবে, তবে মহাপুরুষের সঙ্গ কর, গুরু বাক্যে বিশ্বাস কর। একথা Socrates শিষ্যদের বলেছিলেন। আজ ঠাকুর রামকৃষ্ণও এই কথা বলিতেছেন।' কেশব, তুমি আশ্চর্য্য গণিতে বিশ্বাস করিয়াছ! দুই আর তিনে সাত হতে পারে বিশ্বাস করিয়াছ! যে পুরুষ নিরাকার, তিনি আবার সাকার, এই কথা বিশ্বাস করিয়াছ! যিনি অব্যক্ত তিনি আবার ব্যক্তিরূপে প্রত্যক্ষ হন, যিনি অবাঙমনসোগোচরং তিনিই আবার শুদ্ধ মনের গোচর, 'আমি যা বুঝিতেছি তাই সত্য, অন্যে যা বুঝিতেছে

* Plato's Dialogues.

তাহা মিথ্যা' এই মতুয়র বুদ্ধি তুমি ঠাকুরের উপদেশে ত্যাগ করিয়াছ। ধন্য তুমি! ঐ দেখ, যাঁকে দেখিতে আসিয়াছ তিনি নিজে তোমায় দর্শন দিতে আসিতেছেন! যিনি তোমার অসুখের সময় রাত্রে নিদ্রা যাইতেন না, আর কাতর হয়ে গভীর রাত্রে বলিতেন, মা কেশবকে ভাল করে দাও; কেশব না থাকলে আমি কলিকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব? ঐ দেখো সমাধিস্থ; তাঁহার নৌকা আসিতেছে। যাঁর রাতুল চরণ একদিন কমল কুটীরে উপাসনার ঘরে পুষ্প পাত্রস্থ বিবিধ কুসুম লইয়া ভক্তি ভরে পূজা করিয়াছিলে! সেই একদিন! যে শুভ দিনে মানুষে ঈশ্বর দর্শন করিয়াছিলে! 'নরহরি' রূপ দেখে মোহিত হয়েছিলে! সেই একদিন! যেদিন সন্তান ভাব (Sonship) কাহাকে বলে প্রত্যক্ষ করেছিলে। ঐ নৌকা আসিয়া লাগিল, কেশব! তুমি ঠাকুরকে নিরাপদে নামাইবার জন্য শশব্যস্ত হইয়াছ!

নৌকা আসিয়া লাগিল। সকলেই দেখিবার জন্য ব্যস্ত। ভীড় হইতেছে। ঠাকুরকে অনেক কষ্টে হুঁস করাইয়া ঘরের ভিতর লইয়া যাওয়া হইল। এখনও ভাবস্থ, একজন ভক্তের উপর ভর দিয়া আসিতেছেন। পা নড়িতেছে মাত্র। জাহাজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কেশবাদি ভক্তেরা প্রণাম করিলেন, কিন্তু কোন হুঁস নাই। ঘরের মধ্যে একটি টেবিল, খানকত চেয়ার। একখানি চেয়ারে ঠাকুরকে বসান হইল। কেশব এক খানিতে বসিলেন, বিজয়ও বসিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা যে যেমন পাইলেন, মেজেতে বসিলেন। অনেক লোকের স্থান হইল না। তাঁহারা বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বসিয়া আবার সমাধিস্থ, সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলেন। সকলে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। কেশব ঘরের, মধ্যে অনেক লোক হইয়াছে, ঠাকুরের কষ্ট হইতেছে দেখিলেন। বিজয় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত হইয়াছেন ও তাঁহার কন্যার বিবাহ ইত্যাদি কার্য্যের বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতা দিয়াছেন; তাই বিজয়কে দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইলেন। কেশব আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। ঘরের জানালা খুলিয়া দিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[কেশবাদি ভক্ত সঙ্গে—হরিকথা প্রসঙ্গ ও ভজনানন্দ]

ব্রাহ্ম ভক্তেরা একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। সমাধি ভঙ্গ হইল। এখনও ভাব পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে। ঠাকুর আপনা আপনি অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন, মা আমায় এখানে আনিলে কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব?

ঠাকুর কি দেখিতেছেন যে সংসারী ব্যক্তিরা বেড়ার ভিতরে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, বাহিরে আসিতে পারিতেছে না, বাহিরের আলোকও দেখিতে পাইতেছে না, সকলের বিষয় কর্ম্মে হাত পা বাঁধা? তাঁহারা কেবল বাড়ীর ভিতরের জিনিসগুলি দেখিতে পাইতেছেন, আর মনে করিতেছেন যে,জীবনের উদ্দেশ্য কেবল দেহসুখ ও বিষয় কর্ম্ম, 'কামিনী ও কাঞ্চন'। তাই কি ঠাকুর এমন কথা বলিলেন, মা আমায় এখানে আনলে কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা কর্‌তে পারব?

সভা মধ্যে গাজিপুরের নীলমাধব বাবু আছেন। ঠাকুরের ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হইতেছে দেখিয়া, তিনিও আর একজন ব্রাহ্মভক্ত পাউহারি বাবার কথা পাড়িলেন।

একজন ব্রাহ্মভক্ত (ঠাকুরের প্রতি)। মহাশয়, এঁরা সব পাউহারি বাবাকে দেখেছেন। তিনি গাজিপুরে থাকেন। আপনার মত আর একজন।

ঠাকুর এখনও কথা কহিতে পারিতেছেন না। ঈষৎ হাস্য করিলেন।

ব্রাহ্ম ভক্ত (ঠাকুরের প্রতি)। মহাশয় পাউহারি বাবা নিজের ঘরে আপনার ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন।

ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—

"খোলটা।"

'বালিস ও তার খোলটা'—দেহী ও দেহ। ঠাকুর কি বলিতেছেন যে দেহ বিনশ্বর, থাকিবে না। দেহের ভিতর যিনি দেহী, তিনিই অবিনাশী, অতএব দেহের ফটোগ্রাফ লইয়া কি হইবে? দেহ অনিত্য জিনিস, এর আদর করে কি হবে? বরং যে ভগবান্ অন্তর্য্যামি রূপে মানুষের হৃদয় মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারই পূজা করা উচিত।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন ;—

"তবে একটি কথা আছে। ভক্তের হৃদয় তাঁহার আবাস স্থান। তিনি সর্ব্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্ত হৃদয়ে তিনি বিশেষ রূপে আছেন। যেমন কোন জমিদার তাঁহার জমিদারির সকল স্থানে থাকতে পারেন। তবে অমুথ বৈঠকখানায় তিনি প্রায়ই থাকেন। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।

[এক ঈশ্বর ; তাঁহার ভিন্ন নাম জ্ঞানী ও ভক্ত]

"জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলেন, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলেন, আর ভক্তেরা তাঁকে ভগবান্ বলেন।

একই ব্রাহ্মণ। যখন সে পূজা করে, তাহার নাম পূজারী ; যখন রাঁধে তখন নাম রাঁধুনি বামুন, যখন রুটি বিস্কুট ব্যাচে তখন নাম রুটি বিস্কুটওয়ালা। যিনি জ্ঞানি, জ্ঞানযোগ ধরে আছেন, তিনি নেতি নেতি এই বিচার করেন। ব্রহ্ম, এ নয় ও নয়, জীব নয় জগৎ নয়। এইরূপ বিচার করিতে করিতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, আর সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ঠিক্ ব্রহ্মজ্ঞানীর ধারণা ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ; নামরূপ এই সব স্বপ্নবৎ ; ব্রহ্ম কি যে তা মুখে বলা যায় না ; তিনি যে একজন ব্যক্তি (Person) তাও বলবার যো নাই।

"জ্ঞানীরা ঐরূপ বলেন, যেমন বেদান্তবাদী। ভক্তেরা কিন্তু সব অবস্থাই লয় ; জাগ্রত অবস্থাও সত্য বলে লয় ; জগৎকে স্বপ্নবৎ বলে না। ভক্তেরা নামরূপ মানে। ভক্তেরা বলে, এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য্য। আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র সূর্য্য, পর্ব্বত সমুদ্র, জীব, জন্তু, এ সব ঈশ্বর করেছেন। তাঁহারই ঐশ্বর্য্য। তিনি অন্তরে হৃদয় মধ্যে ; আবার বাহিরে আছেন। উত্তম ভক্ত বলে তিনি নিজে এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব—জীব জগৎ হয়েছেন। ভক্তের সাধ যে চিনি খায়। চিনি হতে ভালবাসে না। (সকলের হাস্য)।

"ভক্তের ভাব কিরূপ জান! হে ভগবান 'তুমি প্রভু আমি তোমার দাস,' 'তুমি মা আমি তোমার সন্তান', আবার 'তুমি আমার সন্তান আমি তোমার পিতা বা মাতা।' 'তুমি পূর্ণ আমি তোমার অংশ।'

ভক্ত এমন কথা বল্‌তে ইচ্ছা করে না যে 'আমি ব্রহ্ম'।

"যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার, করতে চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির করতে চেষ্টা করে। তাই প্রথম অবস্থায় নির্জ্জনে স্থির আসনে অনন্যমন হয়ে ধ্যান চিন্তা করে।

"কিন্তু একই বস্তু। নাম ভেদ মাত্র। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান্‌। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম; যোগীর পরম আত্মা; ভক্তের ভগবান্‌।"

এদিকে আগ্নের পোত কলিকাতার অভিমুখে চলিতে লাগিল, ঘরের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে যাঁহারা দর্শন করিতেছিলেন ও তাঁহার অমৃতময়ী কথা শ্রবণ করিতে ছিলেন, তাঁহারা, জাহাজ চলিতেছে কি না, এ কথা জানিতেও পারিলেন না। ভ্রমর পুষ্পে বসিলে আর কি ভন্ ভন্ করে? ক্রমে পোত দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইল। সুন্দর দেবালয়ের ছবি দৃশ্যপথের বহির্ভূত হইল। পোতচক্রবিক্ষুব্ধ নীলাভ গাঙ্গবারি তরঙ্গায়িত, ফেনিল, কল্লোলপূর্ণ হইতে লাগিল। ভক্তদের কর্ণে সে কল্লোল আর পৌঁছিল না। তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন, সহাস্য বদন, আনন্দময়, প্রেমানুরঞ্জিত নয়ন, প্রিয়দর্শন অদ্ভুত এক যোগী! তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন, সর্ব্বত্যাগী একজন প্রেমিক বৈরাগী; ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না! কথা চলিতে লাগিল।

(ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, জীব জগৎ এ সব শক্তির খেলা। আর বলে যে বিচার কর্‌তে গেলে এ সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু, শক্তিও স্বপ্নবৎ অবস্তু।'

"কিন্তু হাজার বিচার কর সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। 'আমি ধ্যান কর্‌ছি' 'আমি চিন্তা কর্‌ছি' এ সব শক্তির এলাকার মধ্যে। শক্তির ঐশ্বর্য্যের মধ্যে।

"তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, এককে মানলেই আর একটীকে মান্‌তে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি। অগ্নি মানলেই দাহিকা শক্তি মান্‌তে হয়, দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না। আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকা শক্তি ভাবা যায় না। সেইরূপ আবার সূর্য্যকে বাদ দিয়ে সূর্য্যের রশ্মি ভাবা যায় না; আবার সূর্য্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্য্যকে ভাবা যায় না। দুধ কেমন? না, ধোবো দোবো; দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না; আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না।

"তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে ভাবা যায় না, আবার শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না; নিত্য (Absolute) কে ছেড়ে লীলা (Relative) কে ভাবা যায় না; আবার লীলা (Relative) কে ছেড়ে নিত্য (Absolute) কে ভাবা যায় না।

"আদ্যাশক্তি লীলাময়ী। তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। তাঁহারই আর একটি নাম কালী।

কেশব (সহাস্য বদনে)। কালী কত ভাবে লীলা করিতেছেন, সেই কথা গুলি আর একবার বলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। তিনি নানা ভাবে লীলা কর্‌ছেন। তিনি মহাকালী,

নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামা কালী। মহাকালী নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিলনা, নিবিড় আঁধার, তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করেছিলেন। শ্যামাকালীর অনেকটা কোমলভাব। বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থের বাড়ীতে তাঁহারি পূজা হয়। যখন মহামারি, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতি বৃষ্টি হয়, তখন রক্ষাকালীর পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহারমূর্ত্তি, শব, শিবা, ডাকিনী যোগিনী মধ্যে ও শ্মশানের উপর থাকেন; রুধির ধারা গলায় মুণ্ডমালা, কোটীতে নরহস্তের কোটী বন্ধন।

"যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নির কাছে যেমন একটা ন্যাতাক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাড়িতে গিন্নি পাঁচ রকম জিনিস তুলে রাখেন (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। হাঁ গো! গিন্নিদের ঐ রকম একটা হাঁড়ি থাকে। তার ভিতর সমুদ্রের ফেনা নীলবড়ি, ছোট ছোট পুঁটুলি বাঁধা শশা বীচি, কুমড়ো বীচি, লাউ বীচি এই সব রাখে। দরকার হলে বারকরে। মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টি নাশের পর ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন।

(ঈশ্বর কি জগতের বাহিরে ?।)

"আবার সৃষ্টির পর সেই আদ্যাশক্তি এ জগতের ভিতরেই থাকেন। তিনি জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে 'উর্নাভীর' কথা। মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা নিজের ভিতর থেকে জাল বাহির করে, আবার সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর এই জগতের আধান আধেয় দুই।

"কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ করছেন না, এই কথা যখন ভাবি তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি, নাম রূপ ভেদ।

"যেমন জল, water, পানি। এক পুকুরে তিন চার ঘাট্ আছে। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায়; তারা বলে 'জল'। আর এক ঘাটে মুসলমানেরা জল খায়; তারা বলে 'পানি'। আর একঘাটে ইংরেজেরা জল খায়, তারা বলে water.

"তিনি একই; কেবল নামে তফাত্। তাঁকে কেউ বলছে 'আল্লা' কেউ বলছে, God, কেউ বলছে 'ব্রহ্ম',; কেউ বলছে 'কালী,' কেউ কেউ বলছে রাম, হরি, যিশু, দুর্গা।

"কালী কি কালো? যতক্ষণ দূরে ততক্ষণ কালো, তাঁকে জানতে পারলে আর কালো নয়।

"আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ দেখায়, কাছে দ্যাখো কোন রং নাই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে করে তুলে দ্যাখো, কোন রং নাই।"

এই কথা বলিয়া প্রেমোন্মত্ত হয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ গান ধরিলেন—

মা কি আমার কালো রে।
কালরূপ দিগম্বরী, হৃৎপদ্ম করে আলো রে॥

(ভববন্ধের বন্ধনহারিণী তারিণী)

"বন্ধন আর মুক্তি, এই দুইয়ের কর্ত্তাই তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব,কামিনী